মধ্যপ্রাচ্যের ডায়েরি

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ.

মধ্যপ্রাচ্যের ডায়েরি

অনুবাদ
মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
শিক্ষক, মাদরাসাতুল কাউসার
আল ইসলামিয়া, শ্যামলী, ঢাকা

সম্পাদনা
আহসান ইলিয়াস
শিক্ষক, জামিয়া ইসলামিয়া মুস্তফাগঞ্জ,
সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ

মধ্যপ্রাচ্যের ডায়েরি

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী

অনুবাদ — মাওলানা সিরাজুল ইসলাম

সম্পাদনা — আহসান ইলিয়াস

প্রকাশক — মাকতাবাতুস সালাম

প্রকাশকাল — ৫ জানুয়ারি ২০১৩

প্রচ্ছদ — প্রিন্ট গ্যালারী

কম্পোজ — বাইতুল কিতাব কম্পিউটার্স

মূল্য — ৪২০ টাকা

উৎসর্গ

আব্বা-আম্মা
ও সকল আসাতিজায়ে
কেরামের সুস্থ
ও সুদীর্ঘ হায়াতে তাইয়েবা
কামনায়
–অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

বিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা দায়ী সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী রহ. উম্মাহর গাফলত ও অবচেতন মনকে জাগিয়ে তুলতে দীনের দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের প্রায় সব কটি দেশেই ছুটে ফিরেছেন। তার হৃদয় উৎসারিত আহ্বান আরব-অনারবে জাগরণ সৃষ্টি করেছে। ১৯৫১ সালে দাওয়াতী কর্মসূচি নিয়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের মিসর, সুদান, সিরিয়াসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন। সেখানে তিনি যুবক ও তরুণ প্রজন্মের কাছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে করণীয়-বর্জনীয় কার্যাবলি তুলে ধরেন। তার ব্যথিত-কাতর আকুতিগুলো অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি নিরলসভাবে ছুটে গিয়েছিন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সভা-সেমিনারে। এই সফরের দিনলিপিগুলো তিনি সাজিয়েছেন 'শরকে আওসাত কি ডায়েরি' নামে। এতে তিনি আরবের হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি, কীর্তি ও অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে তাদেরকে সজাগ ও উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। বিশেষত তিনি দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনতকে তাদের মাঝে প্রচার করেন। পাশাপাশি তিনি ভারতবর্ষের ওলামায়ে কেরামের অবদান দীনী কর্মকাণ্ডগুলো তুলে ধরেন। এই গ্রন্থে ওলামায়ে কেরাম ও তালিবানে ইলমসহ সকলের জন্য রয়েছে চিন্তার খোরাক ও হৃদয় জাগানোর উপকরণ। বাংলা ভাষায় গ্রন্থটি এখনও অনূদিত না হওয়ায় জাতির খেদমতের লক্ষে আমরা তা প্রকাশের উদ্যোগ নিই। বইটি নির্ভুল ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর করতে আমরা চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুলত্রুটি বিজ্ঞপাঠকের চোখে পড়লে আমাদেরকে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইলো। পরবর্তী সময়ে এর পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। আল্লাহ গ্রন্থটির সংকলক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মঙ্গল করুন। আমিন।

বিনীত
মাওলানা আব্দুল আজীজ আযহারী

তারিখ
১০.০২.১৪৩৪ হি.
২৩.১২.২০১২ ঈ.

অনুবাদকের আরজ

আলহামদু লিল্লাহ! অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিয়ে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি খুব আনন্দিত। বন্ধুবর মাওলানা মাহবুবুর রহমান বইটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। [আল্লাহ তাকে সফল ভবিষ্যৎ দান করুন]। তার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনুবাদের কাজ শুরু করি। ইতোমধ্যে বিষয়টি অনেকেই জেনে যায়। তারা বইটি হাতে পাওয়ার জন্য চাতক পাখির মতো উদগ্রীব থাকে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্ততা ও ঝামেলার কারণে সময়ে সময়ে অনুবাদের কাজ থেমে যায়। বইটি সম্পর্কে অপেক্ষারত পাঠকদের বারবার জিজ্ঞাসা দ্রুত অনুবাদ শেষ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাওলানা আহসান ইলিয়াস বইটি সম্পাদন করেছেন। তার কৃতজ্ঞতা আদায়ের ভাষা আমার জানা নেই। [আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন]।

বইটি মূলত একটি রোজনামচাধরনের সফরনামা। এর থেকে পাঠকের অনেক কিছু শিখার জানার আছে। বিশেষ করে একজন মুমিনের দেশ-ভ্রমণ কী উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত, কেমন হওয়া উচিত, তার শিক্ষা এতে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের তৎকালীন সামাজিক চালচিত্র, রাজনীতি; দীনী ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন স্মৃতিময় স্থানের বিশদ বিবরণও এতে রয়েছে।

অনুবাদ সাবলীল ও সুখপাঠ্য করার চেষ্টা করেছি। শাব্দিক অনুবাদের তুলনায় লেখকের ভাব ও মর্মকে ফুটিয়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। এক্ষেত্রে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। কোনো পাঠকের তা দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানীনগর'র মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আহসানুল্লাহ কাসেমীর কথা উল্লেখ না করলেই নয়। হুজুরের হাতেই আমার লেখালেখির জীবন শুরু হয়েছে। তার অবদানেই আজ কিছু লিখতে পারছি। [আল্লাহ তাকে সুস্থ ও দীর্ঘ হায়াত দান করুন]। যারা এ বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অর্থ, শ্রম ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন তাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালা জাযায়ে খায়ের দান করেন। আমীন!

মাওলানা সিরাজুল ইসলাম
শিক্ষক, মাদরাসাতুল কাউসার আল ইসলামিয়া
শ্যামলী, ঢাকা

সূচিপত্র

লেখকের পরিচয়

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী রহ. নদবী ছিলেন কালোত্তীর্ণ এক বিপ্লবী মহাপুরুষ। প্রাজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ। আধ্যাত্মিক জগতের কালজয়ী সাধক। আরবিকসাহিত্যের প্রাণপুরুষ। বিংশ শতাব্দীর বহুমাত্রিক বিরল প্রতিভা। ভারতের উত্তরপ্রদেশস্থ রায়বেরেলী জেলার 'তাকিয়াকিলাঁ' গ্রামে ১৩৩২ হিজরির মুহররম মাসে তাঁর জন্ম।

তিনি ছিলেন বালাকোটের অমর শহীদ আমিরুল মুমিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ রহ. এর পঞ্চম অধস্তন বংশধর। শহীদের উষ্ণ রক্তধারা তার ধমনীতে প্রবহমান ছিল। সাইয়েদ বংশের উত্তরাধিকার তিনি জন্মসূত্রে পেয়েছিলেন। সকল মত ও পথের ঊর্ধ্বে তাঁর ছিল অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। সর্বমহলে সমানভাবে গ্রহণযোগ্যতা। শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম এই জ্ঞানতাপসের ক্ষুরধার লেখনী মুসলিমবিশ্বে নতুন প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি করেছিল। সাধারণ থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত সবাই ছিলেন তাঁর সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের গুণমুগ্ধ পাঠক। ইউরোপ, এশিয়া, নিকট ও দূর-প্রাচ্যের অসংখ্যা মানুষ তাঁর কিংবদন্তীতুল্য সাড়া জাগানো গ্রন্থরাজি পড়ে জীবনের দিশা পেয়েছে। অনেকের বুদ্ধিবৃত্তিক জড়তার ঘোর কেটেছে তাঁর বই অধ্যয়নে। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে লেখা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' তাঁর অনবদ্য গবেষণামূলক সেরা ইতিহাসগ্রন্থ। গ্রন্থটি পুরো দুনিয়ার বিবেককে নাড়িয়ে তোলে। বিদগ্ধ ও সচেতেন মহলের চিন্তা-চেতনায় এবং মেধা-মননে আলোড়ন সৃষ্টি করে। অতুলনীয় ভাষাশৈলী, শব্দের সুনিপুণ গাথুনি ও বিষয়বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে এটি ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দামা'র সমতুল্য। এ গ্রন্থটিই তাকে আরববিজহানে পরিচিত করে তোলে। এ ছাড়া তিনি ইসলামি ঐতিহ্য, দর্শন, জীবন-জিজ্ঞাসা, বিশ্ব-পরিস্থিতি, শিক্ষা-

সংস্কৃতিসহ সমাজ ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে লিখে গেছেন বহু অমূল্য গ্রন্থ। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলী রহ.[১] এর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদৰী রহ. এর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানী রহ. এর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর তাকওয়া প্রতিফলিত হয়েছে। দাওয়াতের ময়দানে তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যক্তি।

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এর ইনতেকালের পর আরব-বিশ্বে তাবলিগী আন্দোলনকে পরিচিত করার মহান লক্ষে তাবলিগের মারকায থেকে আল্লামা নদবীকে আরবে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে হিসেবে তিনি ১৯৪৭ সালের ১৯ জুলাই জিদ্দায় গিয়ে উপস্থিত হন। প্রথমে তিন মাস মদিনায় তার পর তিন মাস মক্কায় অবস্থান করে এ ব্যাপারে তিনি আরবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৫০ সালে এ উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার আরবে যান। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্ব ও আরবিভাষাজ্ঞান তাদের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষ সহায়ক হয়। কিন্তু মূলত আরবীয় শিক্ষিত ও সুধীসমাজের আকর্ষণের মূলকেন্দ্র ছিল মিসর। তাই তিনি ১৯৫১ সালে মিসর সফর করেন। তারপর সেখান থেকে সুদান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ভ্রমণ করেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর সেই সফরেরই দিনলিপি। এতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে সফরের অভিজ্ঞতা ও অর্জন তুলে ধরেছেন। মুসলিমবিশ্ব তার নিকট কি পেল তাও উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তুরস্ক, জেনেভা, লন্ডন, প্যারিস, স্পেন, বেলজিয়ামসহ আরও বহুদেশ সফর করেছেন তিনি। আধ্যাত্মিক জগতে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী

---

[১] ১৮৫৭ সালে ভারতের আজমগড়ে তাঁর জন্ম। মৃত্যু ১৯১৪ সালে। ১৮৮৩ সালে আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে আরবিভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আকিদাগত মতভেদ ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরবর্তীতে তিনি নদওয়াতুল ওলামায় চলে আসেন। ছয় খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'সীরাতুন নবী'। প্রথম খণ্ড লেখার পর তিনি ইনতেকাল করেন। তাঁর সুযোগ্য জামাতা সাইয়েদ সুলায়মান নদবী অবশিষ্ট পাঁচ খণ্ড সমাপ্ত করেন।

রহ. এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী রহ. এর খলিফা ছিলেন। বিশ্বের অসংখ্য আলেম, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি তার হাতে বায়আত হয়ে ছিলেন। ইলমে বাতেনের জন্য তারা তাঁর সবক ও পরামর্শ মেনে চলতেন।

অসাধারণ সাধনা ও অবদানের জন্য তিনি বিভিন্ন সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৮০ সালে সৌদিসরকারের পক্ষ থেকে 'ফয়সাল এওয়ার্ড', ১৯৮১ সালে দুবাই সরকারের পক্ষ থেকে 'সেরা ইসলামি ব্যক্তিত্ব এওয়ার্ড', ১৯৯৯ সালে অক্সফোর্ডের পক্ষ থেকে 'সুলতান ব্রুনাই এওয়ার্ড'সহ বহু পদক ও এওয়ার্ড তিনি লাভ করেন।

১৯৬১ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত চল্লিশ বছর তিনি নদওয়াতুল ওলামার রেক্টর ছিলেন। হাকিমুল ইসলাম কারী মুহম্মদ তাইয়েব রহ. এর পর তিনি ভারতের 'মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডে'র চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। 'রাবেতা আলমে ইসলামী'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠাতা পষিদের সদস্য ছিলেন। 'আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থা'র সভাপতি, অক্সফোর্ড ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি, দামেশকের আরবিভাষা অ্যাকাডেমির সদস্য, মদিনা ইসলামী ইউনিভার্সিটির মজলিসে শুরার আজীবন সদস্য ছিলেন। এসব ছাড়াও আরও বহু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের তিনি পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বি ছিলেন।

১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর/২২ রমজান ১৪২০ শুক্রবার ১১.৫০ মিনিটে পবিত্র কুরআন শরীফের সুরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় পরম প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন। রায়বেরেলীর তাকিয়াকিলার পারিবারিক কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

ভূমিকা

আরববিশ্বের লাইব্রেরিগুলোর কথা বলছি। প্রাচীন ও আধুনিক পর্যটক লেখকদের সফরনামায় ভরপুর সেগুলো। কারণ আরব মুসলমানরা ঝুঁকিপূর্ণ সফরের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতি থেকে অনেক অগ্রগামী। ভয় ও শঙ্কা বলতে তাদের স্বভাবে কিছু নেই। অসাধ্যকে সাধ্যের মধ্যে আনাই তাদের প্রকৃতি। তাই তো তাদের মধ্যে বড় বড় পর্যটক ও দুঃসাহসী বহু পরিব্রাজক জন্ম নিয়েছেন। এসব সফরনামার মধ্যে স্পেনের ইবনে জুবায়ের[১] মরক্কোর ইবনে বতুতা[২]'র সফরনামার খ্যাতি রয়েছে বিশ্বজোড়া। এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এই সফরনামা দুটো তৎকালীন মুসলিমবিশ্ব ও ইসলামি সমাজব্যবস্থার পূর্ণ চিত্র আমাদের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। আমাদের সামনে তুলে ধরেছে সমসাময়িক বরেণ্য ব্যক্তিদের জীবনচরিত। তবে সেইসব বই এর ব্যতিক্রম, যার সম্পর্ক সরকার-দরবার, যুদ্ধবিগ্রহের উপাখ্যান ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে। সফরনামায় যে চিত্র উল্লেখ করা হয় তা এসব বইয়ে সাধারণত পাওয়া যায় না। সেসব স্মারকগ্রন্থে এই অংশ খুব কম পাওয়া যায়, যা ওলামা-মাশায়েখ, তাদের নৈতিক গুণাবলি ও কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এমন গ্রন্থও কম যাতে হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাস, অনুভূতি ও অভিব্যক্তি সঠিকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুটো বই উল্লেখ করার মতো, যাতে মনুষ্য অনুভূতির সুতীক্ষ্ণ ভাবনার পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটেছে, যাতে রেকর্ড করা হয়েছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় ও প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা। তার মধ্যে একটি ইমাম

---

[১] বিশিষ্ট পর্যটক। ১১৪৫ সালে স্পেনে তার জন্ম। তিনি তিনবার প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। তৃতীয়বার ভ্রমণে বের হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুবরণ করেন। রিহলাতু ইবনে জুবায়ের-এ তার ভ্রমণবৃত্তান্ত রয়েছে। তিনি ৬১৪ হিজরি সনে ইনতেকাল করেন।

[২] বিখ্যাত মুসলিম পর্যটক। ১৩০৪ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর তানজিয়ারে তার জন্ম। ৩০ বছরে তিনি ৭৫ হাজার মাইল পরিভ্রমণ করেন। বাংলাদেশ ভ্রমণের সময়ে সিলেটের হযরত শাহজালাল রহ. এর সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। দেশে ফেরার পর মরক্কোর সুলতানের নির্দেশে সম্পূর্ণ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন। যা 'রিহলাতু ইবনে বতুতা' নামে পরিচিত। ১৩৬৯ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

গাজালী রহ.[১] এর المنقذ من الضلال। অন্যটি ইবনে জাওজী রহ.[২] এর صيد الخـــاطر। পুরনো সফরনামাগুলি বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখকদের জ্ঞান-গুণও অনস্বীকার্য। তারপরও বাস্তবসত্য কথা হল যে দেশ, সমাজ ও জীবনকে তারা ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য চিত্রিত করে গেছেন তা খুব সাদাসিধে ও নির্ধারিত গণ্ডির ভিতরে ছিল সুশৃঙ্খল ও প্রশান্ত। যাতে ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য, জটিলতা ও কাঠিন্য বলতে কিছু ছিল না। ছিল না তাতে আধুনিকতা ও বর্তমান জীবন আবহের ছোঁয়া। সে সময়টা চৈন্তিক আন্দোলন, রাজনৈতিক পালাবদল, নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন দল-উপদল, বহুধারার চিন্তা-দর্শন ও পরস্পর বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তখনকার মানুষের জীবনের রঙ ও ঢঙ ছিল এক ও অভিন্ন। সামাজিক জীবনধারায়ও কোনো বৈপরীত্য ছিল না। এই জন্য তাদের কাজ-কর্মও অনেক সহজ ছিল। এক পদ্ধতি থেকে অন্য পদ্ধতি, এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশের দিকে যাওয়ার তাদের প্রয়োজন পড়ত না। দ্বিতীয় কথা হল এসব পুরনো সফরনামা পর্যটন, পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার অনেক পরে লেখা হয়েছে। আবার কোনো কোনোটা পরবর্তীসময়ে কোনো রাজা বা মন্ত্রীর নির্দেশে রচনা করা হয়েছে।

ঘটনাবলির বিবরণ ও বিভিন্ন জায়গা নির্ধারণ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে অনেকের সন্দেহ পোষণ সত্ত্বেও যদি প্রখর মেধাশক্তিকে মেনে নেওয়া হয় তারপরও এতে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, যেসব অনুভূতি তাতে লিপিদ্ধ

---

[১] ইমাম গাজালী রহ.। বিখ্যাত মুসলিম দার্শনিক পণ্ডিত। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্বের মর্যাদায় ১০৯১ সালে বাগদাদ নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরবর্তীতে আধ্যাত্মিকতার ধ্যানে সবকিছু ত্যাগ করে বন-জঙ্গলে ও মরুভূমিতে ধ্যানে নিমগ্ন হন। প্রায় দশ বছর এভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সফর করেন। তিনি বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিমিয়ায়ে সায়াদাত তার প্রভাব সৃষ্টিকারী রচনা। ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। ১১১১ সনের ১৯ ডিসেম্বর পারস্যে ইনতেকাল করেন। মৃত্যুর দিন ফজরের নামাজ আদায় করে নিজ হাতে কাফনের কাপড় পরিধান করে শুয়ে পড়েন। কবি ফেরদৌসির পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

[২] আবদুর রহমান ইবনে জাওজী রহ.। আবুল ফারাজ আবদুর রহমান ইবন আবুল হাসান আলি জাওজী। যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ইতিহাস তত্ত্ববিদ। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ৫৯৭ হিজরির রমজান মাসে তিনি ইনতেকাল করেন।

করা হয়েছে তার উপর পুরোপুরি আস্থা রাখা যায় না। কারণ অনুভূতি দেয়ালের ছায়া বা পানির ঢেউয়ের মতো ক্ষণস্থায়ী। যখন কোনো অনুভূতি জাগ্রত হয় তখন মানুষ সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে নিতে পারে। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর কিছু সময় অতিক্রম হয়ে গেলে তখন স্মরণশক্তির সাহায্যে মানুষের জন্য তার আনন্দ-বেদনা, সঙ্কোচন-প্রশস্ততা লেখা ততটা সহজ হয়ে ওঠে না।

তৃতীয় কথা হল রোজনামচা লেখার প্রচলন ইতঃপূর্বে তেমন একটা ছিল না। এর প্রচলন সেসব পর্যটক লেখকদের অনেক পরে এসে শুরু হয়েছে। আর তখন কোথাও এর প্রচলন থাকলেও পাঠকের হাতে এসে তা পৌঁছুত না।

অধুনা বিশ্বে অনেক সফরনামাই লেখা হয়েছে। কারণ এখন প্রকাশনা শিল্পের অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। সহজ হয়ে গেছে দূর-দূরান্তে সফর করা। এ ছাড়া মানুষের মধ্যেও বেড়েছে পর্যটনের উচ্চাভিলাষ। তাদের হাতের নাগালে চলে এসেছে সফরের আসবাব ও উপকরণ। তবে এসব সফরনামায় বিজ্ঞান ও ভৌগোলিক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত অধিক পরিমাণে স্থান পাচ্ছে। বিশেষ করে সফরে তারা কীভাবে সময় কাটিয়েছেন এবং কোন কোন জিনিস তাদের আনন্দ যুগিয়েছে তারও উল্লেখ রয়েছে। ভ্রমণ-পর্যটনে প্রাচীন নিদর্শনাবলি এবং দর্শনীয় স্পটগুলোরও তাতে প্রতিফলন ঘটেছে, যা সফরের প্রতিপাদ্য। তবে জীবনের কিছু কিছু দিক তাতে চিত্রিত হলেও তা শুধু লেখকের রুচিবোধের গণ্ডির ভিতরে পড়ার কারণে হয়েছে। অথবা সেইদিকের সঙ্গে লেখকের কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে যাওয়ার কারণে। যেমন- পর্যটক সাহিত্যিক হলে সেদেশের সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেনে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হলে সেদেশের দীনী প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। আর রাজনীতিক হলে সেই অঞ্চলের রাজনীতিবিদ, রাজনৈতিক আন্দোলন বা এজাতীয় অন্য কোনো বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার জন্য সফরনামার বড় একটা অংশ বরাদ্ধ করেছেন।

এ ছাড়া এসব সফরনামার অধিকাংশই দীনী অনুপ্রেরণা, উদ্দীপনা, আকিদা-বিশ্বাস থেকে মুক্ত। তাতে নেই কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি। বইগুলোর লেখকেরা ক্যামেরার ছবিধারণ করার ভূমিকা পালন করেছেমাত্র। তারা যা ঘুরে দেখেছে তার উপর তাদের নেই কোনো

আলোচনা-সমালোচনা। নেই তাদের হৃদয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ভাব ও ভাবনা। সফরনামাগুলোতে যদি তাদের পরিবর্তে এমন লেখকের নাম লিখে দেওয়া হয় যে সেসমাজের সঙ্গে পরিচিত না, যার সঙ্গে সেখানকার সংস্কৃতি ও আকিদা, প্রেরণা ও চেতনার কোনো মিল নেই, তা হলে এতে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবে না। অনেকের কাছে বিষয়টি দৃষ্টিকটু হলেও কিছুলোক একে বইয়ের বিশেষত্ব হিসেবে দেখবে। কারণ যে লেখা দ্বারা লেখকের জামানা ও স্থান চেনা যায় না, তার আকিদা-বিশ্বাস, দীন-ধর্ম, মত ও পথ সম্পর্কে জানা যায় না, জানা যায় না তার প্রিয় ও আদর্শ মানুষ কারা, তা ছাড়া যে লেখা দ্বারা অনুমিত হয় না লেখকের প্রফুল্লতা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা, অনুভূত হয় না কষ্ট ও দুঃখের তিক্ততা, আনন্দ ও সুখের মিষ্টতা, সে লেখা কৃত্রিম, নিষ্প্রাণ। এমন লেখা মোটেই মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে না এবং এমন লেখা পৃথিবীতে টিকে থাকার আদৌ অধিকার রাখে না।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের শুরুর দিকে বক্ষ্যমান বইয়ের লেখকের মধ্যপ্রাচ্য সফরের সুযোগ হয়েছিল। তখন তিনি সেসব দেশের দীনী, ইলমি ও সামাজিক রীতি-নীতি ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। সেখানকার বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তাদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয়, মাসয়ালা-মাসায়েল, ইসলাহি আন্দোলন ও শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাদের সামনে মাতৃভূমি ভারতের পরিচয় তুলে ধরেছেন, যা দীর্ঘদিন ধরে আরবজাহান থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, বা অজানার চাদরে আবৃত ছিল। তিনি দাওয়াত ও ইসলাহের সেই অভিজ্ঞতা তাদের সামনে পেশ করেছেন, যা শেষ যুগে এসে ভারতের জমিনে শুরু হয়েছে এবং সফলতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছে।

অপর দিকে লেখক আরবজাহানের চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভিন্ন ইসলাহি আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। সেখানকার বড় বড় স্কলারদের থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাদের চিন্তাগত ও সাহিত্য বিষয়ক মনোভাব জেনেছেন। পাশাপাশি নিত্যনতুন মাসায়েল বোঝারও সুযোগ তার হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে আরববিশ্ব সফর করার পূর্বে লেখকের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অপূর্ব সমাবেশ ছিল। তার কৃষ্টি-কালচারে

ছিল বৈচিত্র্য। ব্যক্তিত্বে ছিল বিভিন্ন গুণের সমাহার। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, সামাজিক বিজ্ঞান, তাহজিব-তামাদ্দুন, জীবনদর্শন ইত্যাদি বিষয়ে তার সুগভীর রুচিবোধ ছিল। কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাও তার কম ছিল না। তার সময় কাটত লেখালেখি ও পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। এ ছাড়া মিসর, সিরিয়ার বিভিন্ন গবেষণাগার ও সাহিত্যসংগঠনের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। এসব কারণে আরববিশ্বের এই সফর পুরো জানাশোনার উপর ভিত্তি করে হয়েছে। কেবল সাক্ষাতের কমতি ছিল। তা এই সফরের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। সাথে সাথে আল্লাহর রহমত এই ছিল যে, এই সফর লেখকের সাড়া জাগানো গ্রন্থ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' প্রকাশিত হওয়ার পর হয়েছে। যার ফলে সেখানকার পরিবেশগুলোতে লেখক সফরের পূর্বেই পরিচিত হয়ে ওঠেন। এ কারণেই তিনি জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মীয় মহলে প্রবেশের পুরোপুরি সুযোগ পান। সেখানকার ইলমের সকল নির্ঝরনী থেকে জ্ঞানের 'শারাবান তহুরা' পান করেন। সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। বিভিন্ন ইলমি মজলিসে অংশগ্রহণ করেন। সুযোগমত প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জ্ঞান বিতরণ করেন আবার আহরণও করেন।

এই সফরে লেখকের দৃঢ়সংকল্প ছিল যে, বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যেসব কুশল ও ভাব বিনিময় হবে, নিজে যেসব আলোচনা করবেন এবং স্বচক্ষে যা কিছু দেখবেন তা প্রতিনিয়ত লিখে রাখবেন। বর্ণনার ক্ষেত্রেও বক্তা যেশব্দ ব্যবহার করবেন হুবহু তা-ই লেখার প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন। এই কারণে বইটিতে স্থানীয় বর্ণনাভঙ্গি ও সাহিত্যের পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটেছে। এতে পরবর্তী ঐতিহাসিকদের জন্য অনেক কিছু আহরণ করার আছে। পাঠক এতে বড় বড় ব্যক্তিত্বের বাস্তব অবয়ব দেখতে পাবেন। তাদের সামনে তৎকালীন সময়টা আপন আকৃতিতে ফুটে উঠবে। যে সময়ে শতধা বিভক্ত মনোভাব ও চিন্তাধারা, সামাজিক গোলযোগ ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল। এমনকি পাঠক এতে সেসব ঘটনার প্রতিফলন বা ভবিষ্যদ্বাণী পাবেন, যার নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। সেসব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাবেন, যারা এখন পর্দার আড়ালে। সেসব দূরবর্তী পরিবর্তন দেখতে পাবেন, যা দিগন্তজুড়ে ঝাপসা হয়ে ভেসে উঠেছে। তাই বলা যায় এই রোজনামচাটি জীবন্ত কথাচিত্রের অ্যালবাম।

এদ্দ্বারা পাঠক এমন এক যুগে কিছু সময় কাটাতে পারবেন, যা আর ফিরে আসবে না।

লেখক এতে বিভিন্ন আলোচনা ও প্রত্যক্ষ করা বিষয়গুলো লেখার পাশাপাশি নিজের মতামত ও অনুভূতিও উল্লেখ করেছেন। ভয়, শঙ্কা বা কোনো ধরনের লৌকিকতা ছাড়াই ক্ষেত্রবিশেষ কোনো কাজের প্রতিবাদ বা কোনো বিষয়ে নিজে প্রভাবিত হলে তা সচ্ছতার সাথে তুলে ধরেছেন। এটি এমন এক প্রাণময় মানুষের চিত্রায়ন, যার বক্ষে হৃদয় রয়েছে, যার রয়েছে সতন্ত্র আকিদা-বিশ্বাস, রয়েছে মূলনীতি ও মূল্যবোধ, যার হৃদয়জুড়ে রয়েছে সেসব দেশের ভালবাসা, যে দেশগুলোর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সঙ্গে তিনি জড়িত। এই পর্যটক নিজেকে সেসব দেশেরই একজন মনে করেন। তাদের সুখ-দুঃখে নিজেকে অংশীদার মনে করেন। তা ছাড়া তার নিকট সকল বিষয়ের মাপকাঠি হল ইসলাম, যা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা এসব দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। সারা পৃথিবীতে যার প্রচারের জন্য এ দেশগুলোকে সুনির্বাচিত করেছেন।

বইয়ের বিশিষ্টতার জন্য লেখকের কোনো ধরনের অজুহাত দাঁড় করানোর প্রয়োজন মনে হয় না। ভ্রমণ শেষে লেখক পুরো দেশের উপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দিয়েছেন। সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ভেবেছেন। যে বিষয়গুলো লেখককে অনুপ্রাণিত করেছে আর যেগুলো তাকে ব্যথিত করেছে অথবা যেসব জিনিস লেখক দেশের জন্য আশঙ্কাজনক মনে করেছেন বা যেগুলো ঘৃণার্হ সবকিছু পুরোপুরি আমানদ্দারির সঙ্গে বর্ণন. করেছেন। কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেননি। কারণ একজন আরব কবি বলেছিলেন, 'সমালোচনার মাঝে জাতির প্রাণ নিহিত।'

সফরনামাটি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে مذكرات سائح في الشرق العربي [মধ্যপাচ্য ঘুরে আসা এক পর্যটকের ডায়েরি] নামে প্রকাশিত হয়। তখন এর ভূমিকা লিখেছিলেন লেখকের বন্ধু আজহারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ মুসা। কায়রোর মাকতাবায়ে ওহাবাহ বইটি ছেপেছে। কিন্তু বইটি ভুলে ভরা ছিল। ভুল সংশোধনে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। লেখকের প্রতিটি বই কয়েকবার করে ছাপা হয়েছে কিন্তু এই বইটি শুধু একবার বের করা হয়। এরই মাঝে মিসরের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন চলে আসে। যার ফলে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার সুযোগ হয়নি।

তারপর লেখক জানতে পারলেন কিছু প্রকাশক বইটিকে দ্বিতীয়বার ছাপাতে চাচ্ছেন। তখন সন্দেহ ছিল বইটির উপকারিতা আগের মতো অবশিষ্ট আছে কি না। সন্দেহ ছিল সময়ের এই পরিবর্তনের পর এর গুরুত্ব সম্পর্কে। কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক যখন দ্বিতীয়বার বইটির উপর নজর বুলান তখন তার সামনে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, এটি মূলত একটি ঐতিহাসিক দস্তাবেজ, যা নিজেই অনেক মর্যাদার যোগ্য। কারণ সময় অতিক্রমের দ্বারা ঐতিহাসিক দস্তাবেজের মর্যাদা কমে না বরং বাড়ে। এই হিসেবে সময় যত পার হবে, এই রোজনামচা যে পরিবেশে লেখা হয়েছে তা আমাদের থেকে যতদূরে চলে যাবে বইয়ের তথ্য-উপাত্ত, চিত্রায়ন ও অনুভূতি তত মূল্যায়িত হবে।

এতে পাঠকদের মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য এবং সেসব ভাগ্যলিখন দৃষ্টিগোচর হবে, যা ইতিহাসের কোনো গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। দৃষ্টিগোচর হবে বিশ্ববরেণ্য আলেম, গবেষক, চিন্তাবিদ, মুসলিহে আখলাক, বিভিন্ন বিষয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ও খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের সেসব মন্তব্য, যা তাদের কোনো গ্রন্থে বা রোজনামচায়ে পাওয়া যাবে না। হতে পারে কোনো গবেষক বা ইতিহাস লেখক এতে এমন কোনো কড়া পেয়ে বসবে, যা দ্বারা তার ঘটনার ধারাবাহিকতা পূর্ণ হবে। পূর্ণ হবে সেই শূন্যতা, যা তাকে নিরাশ করে দিয়েছিল। অনেক সময় এসব সাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা, সাক্ষতকার প্রত্যক্ষ জিনিস থেকে এমন কিছু আহরণ করবে, যা অনুবাদ ও স্মারকগ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও ম্যাগাজিনের হাজারো পৃষ্ঠা উল্টালেও অর্জন করা সম্ভব হয় না। এদিকে লক্ষ্য করে লেখক বইটিকে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করার অনুমতি দেন। পাঠকমহল বইটির মাধ্যমে যারা অদৃশ্য পর্দার আড়ালে চলে গেছে অথবা যাদেরকে রাজনৈতিক বিপ্লব পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এ ছাড়াও যেসব ব্যক্তিত্বকে কোনো লেখক সাহিত্যিক প্রয়োজনের বেশি মর্যাদা দিয়েছে অথবা অপপ্রচারের কারণে যাদের প্রসিদ্ধি লাভ হয়েছে তাদেরকে আপন জায়গায় দেখতে পারবেন। ফলে অল্প সময়ে তাদের থেকে অনেক জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন। কারণ তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সফলতা এমন সম্পদ, যার মধ্যে সকলের অধিকার রয়েছে, যা থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম

উপকৃত হবে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই তা পাওয়া যাবে তারাই এর বেশি হকদার হবে।

পরিশেষে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করে দেওয়া জরুরি যে, লেখক এই সফরে লেবানন যাওয়ার সুযোগ পাননি। তার লেবাননের সফর হয়েছে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। তবে এখানেও তিনি পূর্বের ন্যায় রোজনামচা লেখাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন। এই রোজনামচা 'আলবা'সুল ইসলামি'তে প্রকাশ করা হয়। সফর শেষ হওয়ার ভিত্তিতে এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিকে বইটির শেষে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, বইটি দ্বারা সকলে ব্যাপকভাবে উপকৃত হোক। কারণ এর জন্য লেখককে সফরের অনেক ভোগান্তি পোহাকে হয়েছে। সইতে হয়েছে অনেক দুর্ভোগ। সময়ের স্বল্পতা ও অত্যধিক ব্যস্ততা সত্ত্বেও লেখক বিভিন্ন তথ্য ও অনুভূতি অত্যন্ত গুরুত্ব ও চিন্তা-ভাবনার পর লিখেছেন।

লেখক বড় আনন্দিত যে, দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার শিক্ষক মাওলানা শামসুল হক নদবী অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে পরিশ্রম করে এই বইয়ের উর্দু অনুবাদ করেছেন। তার অনুবাদ দীর্ঘদিন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'তামিরে হায়াত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকসমাজ খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন। তারপর কয়েকজন রুচিশীল ব্যক্তি একে বই আকারে বের করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। যাতে এর মাধ্যমে সকলে উপকৃত হতে পারে। অনুবাদ খুব সাবলীল, মনোলোভা হয়েছে। পড়লে মূল বই অধ্যয়নের মজা অনুভূত হয়। বইটি উর্দু সংস্করণ প্রকাশ করার দায়িত্ব নেন মাকতাবায়ে ফেরদাউস।

আবুল হাসান আলী নদবী
১১ জুলাই ১৯৭১

বিদায় হে হেজাজ

২০ জানুয়ারি ১৯৫১

সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমরা সবেমাত্র জেদ্দা সমুদ্রবন্দরে ইতালিয়ান জাহাজ 'আউন্ডা'য় উঠে বসেছি। জাহাজটি আমাদের নিয়ে মিসরের সুয়েজবন্দর অভিমুখে রওনা করে। বিদায়-মুহূর্তে আমি শেষবারের মতো জেদ্দাবন্দরের দিকে তাকাই। সেসময় অস্ফুট আওয়াজে এভাবেই আমি আমার অভিব্যক্তি জানাতে থাকি, হে আরবভূমি, আমরা তোমায় রেখে চলে যাচ্ছি বটে। তবে বিব্রত হয়ে না, চিরদিনের জন্যও না। আমাদের এই সফর মূলত তোমারই সম্পর্ক-সুবাদে, তোমার সেই প্রিয় বংশধরদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে, যারা রোম ও লোহিতসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি তাদের নিকট তোমার সালাম পৌঁছিয়ে দেব। তাদের থেকে হিসাব নেব, তোমার থেকে আলাদা হওয়ার পর কালের আবর্তে ঘটে যাওয়া নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনা তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছে। আর তারা সেই দাওয়াত ও তাবলিগের গুরুদায়িত্ব কতটুকু পালন করেছে, যা নিয়ে তাদের পূর্বসূরিরা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা আবার তোমার বুকে ফিরে আসব এবং তোমার কাছে আরবের মুসলিমদেশগুলোর নানা উপাখ্যান তুলে ধরব। সেখানে তোমার আদর্শের অবমাননা, তোমার বাণীর অবহেলা ও অবজ্ঞার যে দৃশ্যই অবলোকন করব, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তোমাকে অবহিত করব। 'কাফেলার রাহবার কখনো কফেলার সাথে মিথ্যা বলতে পারে না'। কেননা এ ক্ষেত্রে বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখা কিংবা অতিরঞ্জন কিছু বলা তার সহগামীদেরকে সমূহ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার শামিল।

আমার সফরসঙ্গী

এ সফরে আমার সাথে ছিলেন মাওলানা মুয়িনুল্লাহ নদবী ও মাওলানা আবদুর রশিদ আজমী নদবী। গতবছর থেকে তারা হেজাজে দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত করছেন। তারা আরবদের মাঝে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেন, যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নির্বাচিত করেছেন। হজের মৌসুমে আরব ও মুসলিমবিশ্ব থেকে আগত প্রতিনিধিদলগুলোর সাথে ভিন্ন ভিন্নভাবে সাক্ষাত করে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। শিক্ষিত

লোকদেরকে বিভিন্ন বই-পুস্তক উপহার দেন, যা তাদের মন-মস্তিষ্ককে আসল কর্তব্যের দিকে ফেরাতে, দীনী চেতনা জাগ্রত করতে এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়াও তারা ভারত ও পাকিস্তানের সাথীদের সাথে তাবলিগের সকল প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। তাদের সাথে আরবের বিভিন্ন জনপদে গাশত করেন, যাতে বয়ান ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতের মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনা পুনরুজ্জীবিতকরণের চেষ্টা চালানো হয়। এবং দীনের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, কোরবানি ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে মেহনত করার দাওয়াত দেওয়া হয়। এ সফরে তারা উভয়ে আমার সাথে থাকবেন। তারপর আমার সাথেই তারা ভারত ফিরে যাবেন।

আমরা শনিবার সকালে জনাব জালাল হোসাইনকে আমাদের মিসর রওনা হওয়ার সংবাদ তারবার্তার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছি। তিনি মিসরের 'মজলিসুশ শুয়ূখ'র[১] সদস্য। কয়েকদিন আগে আমি তার চিঠি পেয়েছি। তিনি আমার মিসর সফরের ইচ্ছা শুনে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এবং আমাকে খোশ আমদেদ জানিয়েছেন। তবে তিনি এখন লন্ডন সফরে যাচ্ছেন। সত্বর দেশে ফিরে আসবেন। তার সেক্রেটারি জনাব হোসনি সকরকে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে বলে গেছেন।

আমাদেরকে বিদায় জানাতে মাওলানা আবদুল্লাহ আব্বাস নদবী[২], সাইয়েদ রিজওয়ান[৩], সাইয়েদ তাহের[৪], আমার ভাগ্নে মুহম্মদ রাবে নদবী[৫] প্রমুখ জেদ্দাবন্দর পর্যন্ত আসেন। মুহম্মদ রাবে হেজাজে আরও দুই বছর থাকবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের মাঝে আরবিভাষা ও

---

[১] মিসরে দু'ধরনের আইন পরিষদ রয়েছে। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদকে ব্রিটেনে পার্লামেন্ট, ভারতে লোকসভা বলা হয়। মিসরে একে মজলিসুল আওয়াম বলা হয়। দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদকে ব্রিটেনে হাউস অফ লর্ডস, ভারতে বিধানসভা, মিসরে 'মজলিসুশ শুয়ূখ' বলা হয়।

[২] ডক্টর সাইয়েদ আবদুল্লাহ আব্বাস নদবী মক্কায় 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামিতে' কর্মরত ছিলেন। উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেন।

[৩] ডক্টর সাইয়েদ রিজওয়ান নদবী রিয়াদের 'ইমাম মুহম্মদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটি'র প্রফেসর।

[৪] মাওলানা সাইয়েদ মুহম্মদ তাহের মুজাফ্‌ফরনগরী 'নদওয়াতুল ওলামা'র উপসচিব।

মাওলানা সাইয়েদ মুহম্মদ রাবে' হাসানী নদবী 'দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা'র আরবিভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান।

সাহিত্য পাঠদানের ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্ব অর্জন করবেন। আমি এ সফরে তার আন্তরিকতার কথা ভুলতে পারব না। তিনি আমার সফর ও হৃদরের সঙ্গী। ইলমি কর্মকাণ্ডে আমার সহযাত্রী। আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র জমিনে আমার প্রিয়জনদের সাথে পুনর্মিলনের তাওফিক দান করুন।

কোথা সেই আজানের ধ্বনি

২১ জানুয়ারি ১৯৫১

রাত বেশ আরামে কেটেছে। প্রচণ্ড দমকা হাওয়া বয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। প্রত্যুষে ঘুম থেকে জেগে উঠি। শরীর-মন দারুণ হালকা বোধ হচ্ছিল। একজন মিসরি ফজরের আজান দিলেন। সকালবেলা সেখানে এটাই ছিল হকের প্রথম আওয়াজ, যা জাহাজ ও সমুদ্রের নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে গুঞ্জরিত হয়। এ আওয়াজ একসময় সারা পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলেছিল, জলে-স্থলে সবখানে নতুন প্রাণশক্তি ফুঁকে দিয়েছিল। কিন্তু আজ তা হাতেগোনা কয়েকজন ব্যতীত জাহাজের আর কাউকে সজাগ করতে পারেনি।

তিক্ত বাস্তবতা হল, আজান তার সেই প্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করার যোগ্যতা তার ম্লান হয়ে গেছে। এর পিছনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে পশ্চিমা বস্তুবাদ; দীন, আকিদা, ইবাদত ও নামাজ ব্যতীত সবকিছুতেই যার সাফল্য দেখা যায়।

যাই হোক, আল্লাহ তায়ালার তাওফিকে কিছু লোকের ঘুম ভেঙেছে। তাদেরকে নিয়ে আমরা জামাতে নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর সমুদ্র দেখা যায় এমন এক জায়গায় গিয়ে বসলাম। সমুদ্র তখন শান্ত ছিল। বাতাসও তেমন ছিল না। জাহাজে এমন কোনো ঝাঁকুনি ছিল না, যা আরোহীদের পেরেশানির কারণ হতে পারে।

জনাব আহমদ আবদুল গফুর আত্তার ও আলমিনহাল পত্রিকার সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস আনসারীর কথায় অনেকটা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেননা ইতঃপূর্বে তাদের মিসরসফরে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। খাওয়াদাওয়া দূরের কথা, স্বস্থান থেকে সরে অন্যত্র যাওয়াও তাদের জন্য দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। আমাকেও হজের দুই সফরে অনুরূপ বরং তারচেয়েও বেশি কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এক সপ্তাহ পর্যন্ত পানাহারের কোনো চাহিদা ছিল না। দুয়েকটি ফল, চাটনি আর

আচার খেয়ে কোনো রকম সময় কাটিয়েছি। আল্লাহ তায়ালার শোকরিয়া, এ সফরে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যায় পড়তে হয়নি। আশাকরি আল্লাহ তায়ালা বাকি দিনগুলোতেও ভালো রাখবেন।

আমাদের জাহাজটি ছিলো মালবাহী জাহাজ, যা সাধারণত জেদ্দা ও সুয়েজবন্দরের মধ্য দিয়ে চলাচল করে। এ সব জাহাজ কলম্বো ও ভারত সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ থেকে নারিকেল ও নির্মাণসামগ্রী নিয়ে আসে। জাহাজে জেদ্দা থেকে আনুমানিক পঞ্চাশজন যাত্রী নেওয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই মিসর ও হেজাজের অধিবাসী। ছয়জন ভারত ও পাকিস্তানের। বাকি অল্প কজন সুদানের।

একজন নওজোয়ান

সন্ধ্যাবেলায় এক তরুণের সাথে সাক্ষাত হয়। তার পিতা জেদ্দায় ব্যবসা করেন। এই তরুণ ভারত-পাকিস্তান সফর করে এসেছে। তার ব্যবহার দারুণ অমায়িক, গাম্ভীর্যপূর্ণ। শিক্ষা-দীক্ষায়ও পিছিয়ে নেই। আমি তাকে 'আসল ও নকল'[১] এবং 'হিদায়াত ও জিবায়াত'[২] বই দুটো গিফ্‌ট করি। সে বই দুটো অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করে এবং নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে। আরববিশ্বে বস্তুবাদের প্রাবল্য ও নৈতিকতার অধঃপতনে সে ভীষণ মর্মাহত।

জাহাজে আমরা সব নামাজ জামাতের সাথে আদায় করি। জামাতে বেশি অংশগ্রহণ করেন মিসরীয়রা। অন্যদের তুলনায় তারাই জামাতের বেশি গুরুত্ব দেন। তাদের অধিকাংশই চাকুরিজীবী ও সাধারণ কারিগর। হেজাজেই কাজকর্ম করেন। এখন দেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। তারা অন্যদের তুলনায় বেশি উদ্যমী, উদ্যোগী। উত্তম চরিত্রের অধিকারী। দীন ও ইলমের সম্মান এবং এর সাথে গভীর সম্পর্ক তাদের মাঝেই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

আসরের সময় থেকে আবহাওয়ায় কিছুটা পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকে। মনে হল আমরা তুলনামূলক শীতপ্রধান অঞ্চলের নিকটবর্তী হতে যাচ্ছি। আগামীকাল হয়তো আমাদেরকে শীতের চাদর মুড়ি দিতে হবে।

---

১ بين الصورة والحقيقة

২ بين الهداية والجباية

২২ জানুয়ারি ১৯৫১

আলহামদু লিল্লাহ, খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠি। জামাতের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করি। তারপর জাহাজের ছাদে প্রশান্তচিত্তে পায়চারি করতে থাকি, মানুষ যেমন জমিনে চলে। সাগর তখন শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল। ফলে জাহাজে কোনো নড়াচড়া ছিল না। দুশ্চিন্তায় ফেলার মতো টলমলও করেনি। কিছুক্ষণ পর চা-নাশতা করি।

আমার চারপাশ

জাহাজের এই ছোট্ট পরিসরে বিভিন্ন দেশের মানুষ আছে। তারা আমার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। দেখলাম, মহিলারা সীমাতিরিক্ত স্বাধীন। ছতর ঢাকার গুরুত্বটুকুও নেই। শরয়ী পর্দা তাদের মাঝে একেবারেই অনুপস্থিত। এ ছাড়া তারা মোটেই সদালাপী না। তাদেরকে সব বিষয়ে সব ধরনের আলোচনা নিঃসংকোচে করতে দেখেছি। যেন তারা সফরে না, নিজেদের ঘরে অবস্থান করছে।

পুরুষদের অবস্থাও ততটা ভালো না। স্বধর্মের কারো সাথে সাক্ষাত-পরিচয়ের কোনো আগ্রহই তাদের নেই। প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়ার এবং সামাজিক জীবনধারার কোনো নিদর্শন তাদের মাঝে অনুভূত হয়নি।

এসব বিষয় এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, আমাদের দেশগুলোয় ইসলামি পদ্ধতির জীবনধারা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। সীমাহীন অধঃগতিপ্রাপ্ত হয়েছে। এর স্থান দখল করে নিয়েছে এমন ছাচের জীবনব্যবস্থা, যা নিজেকে নিয়েই ভাবতে শেখায়, উদরপূর্তির চিন্তায় ব্যাকুল রাখে। অন্যের দিকে তাকানোর কোনও সুযোগ দেয় না। আমাদের দেশের মানুষ খুব ঘনিষ্ঠতা ও সদ্ভাব দেখাতে গিয়ে বলে থাকে, 'আমরা সবাই এক নৌকার যাত্রী'। কিন্তু আফসোস, আজ আমরা এক কিশতিতে, একে অপরের অনেক নিকটবর্তী তারপরও দূরত্ব ও সম্পর্কহীনতার কারণে মনে হয়, আমরা প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কিশতির অভিযাত্রী।

আমার এক সফরসঙ্গী আমাদের কাছে বসে-থাকা একব্যক্তিকে আমার লেখা কয়েকটি বই দেয়। বইগুলো দেখেই সে লেখককে চিনতে পারে। সাথে সাথেই সে বলে ওঠে, মক্কায় আমি আপনার সম্পর্কে শুনেছি। আপনার কোনো কোনো অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ারও আমার সৌভাগ্য হয়েছে। লোকটি তখন আমাদের সাথে মিশে যায়। তার ও আমাদের মাঝে ভিন দেশের পর্দাও দূর হয়ে যায়।

দিনভর আফ্রিকা মহাদেশের পর্বতমালা আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। জাহাজ সুয়েজ বন্দরের দিকে দৃষ্টি ফেরালে অসংখ্য পর্বতবীথি দেখতে পাই। হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে তুর পাহাড়। এ এলাকার সাথে পরিচিত এমন কোনো লোক পাইনি, যে আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলবে তুরে সিনা কোথায় অবস্থিত।

ধীরে ধীরে নদীর দু'পারের দূরত্ব কমে আসতে থাকে। একসময় তা আমাদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে চলে আসে। নদীর দুধারের তীরভূমি আমরা দেখতে পাই। আমাদের পাশ দিয়েই চলছে ছোট-বড় বহু নৌযান। মনে হয়, আমরা বড় কোনো রাস্তায় চলছি আর আমাদের ডানে বামে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি অবিরত দৌড়ে ছুটছে।

মিসরের ভালবাসা

আমাদের ধারণা ছিল সকালবেলা সুয়েজ বন্দরে পৌঁছে যাব। কোনো ধরনের লৌকিকতা ছাড়াই বলছি, অত্যধিক সফর করা সত্ত্বেও এ সফরের অনির্বচনীয় আনন্দ আমার হৃদয়ে এক নতুন ভাবের সঞ্চার করে, যা আমার শৈশবের এবং প্রথম সফরের স্মৃতিগুলো একে একে স্মরণ করিয়ে দেয়। মিসর আমার মন ও মগজে মাতৃভূমির ন্যায় গেঁথে আছে। কারণ, আমি মিসর সম্পর্কে কিশোরকাল থেকে অনেক কিছু শুনে এসেছি। সেখানকার পরিবেশ, প্রতিবেশ ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারেও সম্যক অবগতি লাভ করেছি। তা ছাড়া এ দেশের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় আমি নিয়মিত চোখ রাখি। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, আরবিসাহিত্যজগতে আমার বিচরণ তাদেরই অবদান। তাদের মাঝে এমন লেখক-সাহিত্যিক রয়েছেন, আমার সাহিত্যশৈলিতে যাদের প্রভাব অনস্বীকার্য। সাহিত্য রচনায় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আমি তাদের অনুসরণ করেছি। মিসরের প্রেসগুলোয় ছাপা হওয়া বই-পুস্তকের সাথে আমার সম্পর্ক মিসরের বাইরে অবস্থানরত যেকোনো আরবের ন্যায়। আমি সেখান থেকে প্রকাশিত মাসিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা ও প্রসিদ্ধ বহু সংবাদপত্র চিন্তার মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও পড়েছি। ইতিহাস কি রাজনীতি, সাহিত্য কি ধর্ম, মিসরি প্রেস থেকে প্রকাশিত যেকোনো বই আমার চোখ এড়াতে পারত না। আমি এ দেশের লেখক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সম্পর্কে আমার দেশের সাহিত্যিক-সাংবাদিকদের ন্যায় অবগত। তাদের মান-মর্যাদা সম্পর্কেও আমার বেশ

জানা-শোনা আছে। এরপর যদি আমার হৃদয়ে মিসরের ভালবাসা প্রবল হয়, তার সান্নিধ্যলাভ আমার এই পরিমাণ আনন্দের কারণ হয় তা হলে এতে আশ্চর্যের কী আছে!

মিসর উপকূলে

২৩ জানুয়ারি ১৯৫১

সূর্যোদয়ের পর-পরই আমরা সুয়েজ বন্দরে এসে পৌঁছুই। সুয়েজ শহর ও উপশহর উভয়টির জন্যই আমরা প্রতিক্ষিত ছিলাম। উভয়টিই দেখার জন্য আমরা উদগ্রীব ছিলাম। তীরের অদূরে জাহাজ নোঙর করে। তখন তীর থেকে ছোট ছোট বহু নৌযান আমাদের দিকে ছুটে আসে। তাতে মিসরের সরকারি পোশাক পরা কিছু লোকও ছিল। তাদের মাথায় লাল রঙের চমৎকার তুর্কি টুপি। এ ধরনের টুপির সঙ্গে আমি আগে থেকেই পরিচিত। তবে তা আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বিশেষ প্রতীক এবং তুর্কিদের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন গণ্য করা হয়। তাদের কেউ কেউ আমাদেরকে সালাম দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। এ সময় আমাদের নিকট ইসলামি ও অনৈসলামি দেশের মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এ পার্থক্য এমন কোনো মুসলমান ধরতে পারবে না, যে কোনো মুসলিমদেশে জন্মেছে এবং সেখানেই লালিত পালিত হয়েছে।

জাহাজের আইনি জটিলতা শেষ করে আমরা সামান-পত্র নিয়ে নিচে নেমে গেলাম। আমার ধারণা ছিল না যে, এত তত্ত্ব-তালাশ ও চেকের মুখোমুখি হতে হবে এবং ভোগান্তির এতগুলো স্তর অতিক্রম করতে হবে, যা সাধারণত বহির্বিশ্ব থেকে আগতদের ক্ষেত্রে করা হয়। ইতোমধ্যে একব্যক্তি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। সে গাইড হিসেবে আমাদের খেদমত করার আবেদন জানাল। আমরা তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেদন গ্রহণ করে নিই। সে আমাদেরকে পুলিশ অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়, যার বাহ্যিক অবয়ব দেখে মনে হল তিনি একজন বড় অফিসার। তিনি আমার প্রতি মনোনিবেশ করেন। আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি আমার নাম বলতেই তিনি বলে ওঠেন, জনাব জালাল হোসাইন আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য কায়রো থেকে আমার নিকট তারবার্তা পাঠিয়েছেন। এবং আমাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে বলেছেন।

তার সহায়তায় আমরা এখানকার সব ঝামেলা অতি দ্রুত কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হই। গাইড আমাদের মাল-সামানা উঠাতে এবং কায়রোর মারুফ রোডে অবস্থিত জালাল বের অফিসে যাওয়ার জন্য গাড়ি ভাড়া করতে সাহায্য করে। আমরা চলে আসার সময় পরিশ্রম অনুযায়ী তাকে কিছু হাদিয়া দিয়ে আসি।

কায়রোর পথে

আমরা গাড়িতে উঠে বসি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। গাড়ি কায়রোর উদ্দেশে চলতে থাকে। পথটি জনমানবশূন্য ধু-ধু মরুপ্রান্তর ঘেষে কায়রো পৌঁছেছে। কিছু দূর অতিক্রম করার পর ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে বলল, আমরা এখানে জোহরের নামাজ আদায় করব। সত্য বলতে কি, এই মিসরীয় ড্রাইভারের নির্মল চরিত্র, দীনদারির তুলনা ভারতীয় ড্রাইভারদের সঙ্গে চলে না। তাদের শ্রুতিকটু বাক্য ও কুলেনদেন সারা ভারতে প্রবাদ হয়ে আছে। দীনী ফারায়েজ ও নামাজের গুরুত্ব বলতে গেলে একেবারেই নেই। ড্রাইভারের এসব গুণ মিসরের সকল ড্রাইভারের, নাকি শুধু তার, তা আরও যাচাইয়ের মাধ্যমে অনুমান করা যাবে।

নামাজের পর আমরা গাড়িতে চড়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের গাড়ি মিসরের একটি সেনাছাউনি অতিক্রম করল। এ-ই প্রথম সেনাছাউনি, যা কোনো মুসলিমদেশে আমার দেখার সুযোগ হল। এটি দেখে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ি। মনের অজান্তেই দোয়া বেরিয়ে আসে।

আমরা নয়া মিসরে প্রবেশ করি। মনে হল আমরা ইউরোপের কোনো বড় শহরে অবস্থান করছি। সেখানে কোনো কোনো জায়গায় প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির ছাপ দৃষ্টিগোচর হয়। তবে তার মধ্যে পশ্চিমা সভ্যতার মিশ্রণ প্রবলভাবে রয়েছে। আমরা কায়রোর ভিতরের অংশের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি, যা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর জনসংখ্যা বিশ লাখেরও বেশি।

আমরা জালাল বের অফিসের উদ্দেশে মারুফ রোডে পৌঁছুই। অফিসে প্রবেশ করতেই তার সেক্রেটারি জনাব হোসনি সকর আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। তার কাছ থেকে জানতে পারি যে, জালাল হোসাইন সুয়েজের ডিসি এবং সেখানকার স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালকে আমাদের অভ্যর্থনা এবং সহযোগিতা করার জন্য তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু

আমরা অধ্যাপক আবদুহুকে ছাড়া কাউকে পাইনি। হোসনি সকর জালাল বের নিকট ফোন করে আমাদের আগমনের সংবাদ জানান। তারপর তিনি আমাদের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন। আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। হঠাৎ করে তার ঘনিষ্ঠ কেউ ইনতেকাল করার দরুন সুয়েজ না আসতে পারায় ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। আমি তার মর্যাদা ও বয়সের প্রতি লক্ষ্য রেখে, এর যথোচিত উত্তর দিই। তার এই আন্তরিকতা, উদ্দীপনা ও সুন্দর আখলাকের শোকরিয়া আদায় করি। তারপর তিনি বলেন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসছি। জনাব হোসনি সকর জানালেন যে, জনাব জালাল 'জমিয়তে মাকারিমুল আখলাকে'র ভবনে আমাদের জন্য দুটো রুম নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর আমাদের সংগে দেখা করার জন্য সংস্থার সেক্রেটারি শায়খ আহমদ উতমান[১] এক্ষুনি আসছেন।

কিছুক্ষণ পর শায়খ আহমদ উসমান চলে এলেন। অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে সালাম বিনিময় করেন। আমরা কথাবার্তা শুরু করি। প্রথমে একে অপরের সংগে পরিচিত হয়ে নিই। ইতোমধ্যে জনাব জালাল হোসাইন তার সেক্রেটারির নিকট ফোন করেন। তিনি সাময়িক কোনো ব্যস্ততার কারণে এখন উপস্থিত হতে পারবেন না বলে অপারগতা প্রকাশ করেন। সেক্রেটারিকে তিনি আপাতত 'হোসাইনমহল্লা'র কোনো হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু হোটেলের ম্যানেজার বিদেশিদেরকে এ জন্য রাখতে অসম্মতি প্রকাশ করেন যে, তাদের ভিসা ও পাসপোর্টে অনেক সমস্যা থাকে। ফলে হোটেল কর্তৃপক্ষকে নানান ঝামেলা পোহাতে হয়।

এখান থেকে আমরা 'আতাবাতুল খাদরা'র হোটেল মিসরে যাই। এখানেও একই সমস্যা দেখা দেয়। আমি যে বিদেশি এই অনুভূতি আমার মাঝে এই প্রথম আসে। এটা আমার ধারণাকে আরও মজবুত করে দেয় যে, বিদেশে যাওয়া-আসার কাগজপত্র সব প্রতিবন্ধকতা রহিত করা তো দূরের কথা একে বরং আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সফরকে আগের চাইতে আরও জটিল করে তুলেছে।

---

[১] মিসরে তার নাম উতমান। শুধু তার নয়, সে দেশের অনেকের নামই এরূপ। আমরা পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে এ নামটি সব জায়গায় উসমান লিখেছি।

সত্য বলতে কি, হোটেলের কর্মকর্তাদের অনর্থক বাড়াবাড়ি এবং অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হই। নিজের মধ্যে এক ধরনের অপমানবোধ অনুভব করি। আমি শায়খ উসমানকে বললাম, কোনোভাবেই আমরা হোটেলে থাকব না।

কিন্তু তিনি এতে রাজি হলেন না। আমাদেরকে তিনি আতাবারই 'হোটেল পার্লামেন্টে' নিয়ে গেলেন। এখানে সামান্য কিছু কথাবার্তা ও নিশ্চিত হওয়ার পরই ম্যানেজার অনুমতি দিয়ে দিলেন। আমরা হোটেলের প্রথম তলার একটি রুমে গিয়ে অবস্থান নিলাম। মাগরিবের নামাজ আদায় করতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়। নামাজের পর আহমদ উসমানের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। তিনি আমার নিকট 'জামইয়্যা শারইয়্যা'র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরলেন। আমি তাকে বললাম, আমি 'জামইয়্যা শারইয়্যা'র সেসব ব্যক্তিকে চিনি, যাদের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ হজে সাক্ষাত হয়েছে। আমি তার কাছে বন্ধুবর আলহাজ আলি শরিফের আলোচনা তুলি। তিনি বললেন, আমি এক্ষুনি তাকে আপনার আগমনের কথা জানাচ্ছি। তিনি আপনার কথা শোনলে অবশ্যই আসবেন। আমরা আলাপচারিতায় লিপ্ত ছিলাম। তাকে সংবাদ জানানোর কিছুক্ষণ পরই তিনি চলে এলেন। দীর্ঘ তিন বছর পর এই সাক্ষাতে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন।

মদিনায় তার সঙ্গে আমার কীভাবে প্রথম পরিচয় হয় তার পর সেখানে উভয়ের বারবার সাক্ষাত এবং একসাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বক্তৃতা প্রদান ইত্যাদি আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি এই বলে বিদায় নিলেন যে, আগামীকাল জোহরের পর আবার আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন।

২৪ জানুয়ারি ১৯৫১

সকালবেলা নাশতা করে জালাল বের অফিসে যাই। সেখানে তার সেক্রেটারি হোসনি সকরের সঙ্গে দেখা করি। তিনি জানালেন যে, জালাল বে এক্ষুনি চলে আসবেন।

কিছুক্ষণ পর জনাব জালাল হোসাইন এলেন। তিনি অত্যন্ত আবেগ ও আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর কথাবার্তা শুরু

হয়। গতকাল সন্ধ্যায় তিনি অফিসে এসেছিলেন। তখন তার কাছে আমার পাঠানো চিঠি পৌঁছান হয়। চিঠিটি পৌঁছুতে বেশ বিলম্ব হয়ে গেছে। গতকাল তিনি শায়খ আবদুল লতিফ সারহান আল-আজহারীরও একটি চিঠি পান। শায়খ আজহারী এখন সৌদি-সরকারের আমন্ত্রণে মক্কায় আছেন। তাকে দেওয়ার জন্য যেসব জিনিস আমি হোসনি সকরকে দিয়েছিলাম তার সব কটি তিনি পেয়েছেন।

জনাব জালাল বললেন, বরাবর আমি আপনার খোঁজ-খবর নিয়েছি। হোটেলের কর্মকর্তারা আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে শুনে আমি ভীষণ ব্যথিত হয়েছি।

আমাকে জানানো হয়েছে, হাজি শরিফের বাসায় আপনি আজ দুপুরের খাবার খাবেন। আগামীকাল, ইন্‌শাআল্লাহ্‌, সেই জায়গাটা দেখে আসবেন, যা আমি আপনার জন্য বরাদ্দ দিয়ে রেখেছি। আপনার পছন্দ হলে ভালো, নইলে অন্য কোনো জায়গা দেখব। আমি বললাম, যে জায়গা ঠিক করেছেন তা-ই চলবে।

আমি তাকে ভারতীয় কিছু নোট দিয়ে ভাঙিয়ে আনাতে অনুরোধ করলাম। তারপর তার থেকে বিদায় নিয়ে হাজি শরিফের বাসার উদ্দেশে 'শিবরা' যাই। সেখানেই জোহরের নামাজ আদায় করি। তারপর সেখানে যাই যেখানে তিনি তার নতুন বাড়ির নির্মাণকাজের দেখভাল করছিলেন। তার সঙ্গে দুপুরের খাবার খাই। আসরের নামাজের পর সেখান থেকে ফিরে আসি। থাকার জায়গায় এসে কয়েকটি ভিজিটিংকার্ড পাই। আমাদেরকে জানানো হয় যে, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্‌ বলিয়াবী সাথীদেরকে নিয়ে গত সপ্তাহে সুদান থেকে ফিরে এসেছেন। হেজাজে দাওয়াত ও তাবলিগের তিনি জিম্মাদার। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে একে একে তিনবার এখানে এসেছিলেন। কিন্তু একবারও সাক্ষাত পাননি। তার সঙ্গে সিন্ধুর ডিরেক্টর অব এডুকেশন বন্ধুবর সাইয়েদ আলি আকবরও এসেছিলেন। এখানে তারা একটি চিরকুট রেখে গেছেন। তাতে লেখা ছিল, তারা আজ আজহারের ভারতীয় ছাত্রাবাস 'রওয়াকুল হুনুদে' তাদের বন্ধু-বান্ধবকে আমার সঙ্গে সাক্ষাত-পরিচয়ের জন্য একত্র করবেন। আমাকে সেখানে অবশ্যই থাকতে হবে। তারা এশার সময় আবার আসবেন। আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্‌ ও সাইয়েদ আলি আকবর সময় মতো চলে এলেন।

ভারতীয় ছাত্রাবাসে

এখান থেকে আমরা তাদের সঙ্গে আজহারে যাই। যেখানে ছাত্ররা একত্র হয়েছে সেখানে গিয়ে পৌঁছুই। আমি ভেবেছিলাম হয়তো পাক-ভারতের অল্প সংখ্যক ছাত্র হবে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখি পুরো হলরুম ভরা ছাত্র। তাদের মাথায় ফেজ টুপি আর সাদা পাগড়ি। সকলের মধ্যেই এক অপূর্ব গাম্ভীর্য। তাদের উৎসুক চেহারা দেখে আমার মাঝেও চলে আসে এক নব উদ্যম। এমনিতেই আলোচনা করার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তার উপর যখন শোনতে পেলাম উপস্থিত ছাত্রদের একটা বড় অংশ তুরস্কের তখন আমার আনন্দ আরও বেড়ে যায়। মজলিসে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ারও ছাত্র ছিল। সিরীয় এক নওজোয়ান, মুহম্মদ তাওফিক কুনজি স্টেজে আসেন। আজহারের ইসলামিক স্টাডিজের তিনি সেক্রেটারি। অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে তিনি আমাকে অভিনন্দন জানান। তারপর শায়খ লোকমান নদবী উঠে এসে আমাকে আলোচনা করার অনুরোধ জানান। তিনি ভারতীয় ছাত্রাবাসের প্রোভোস্ট। কোনো লৌকিকতা ছাড়া আমার মনে যা আসে তা-ই তাদের সামনে তুলে ধরি। আমার ধারণা ছিল না যে, এমন একটি অনুষ্ঠানে আমাকে আলোচনা করতে হবে, যেখানে সিরিয়া, মিসর, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা উপস্থিত থাকবে।

আলোচনার সারমর্ম

ইসলাম একটি চিরন্তন জীবনব্যবস্থা, যাতে নতুন পুরানের ব্যবধান নেই। এই পার্থক্য শুধু মানবরচিত জীবনব্যবস্থায়, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা-সাহিত্যে বর্তমান। যে জাতিই এই চিরন্তন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, নিজেদের পথ চলাকে এর সঙ্গে জুড়ে দিবে তারাই পৃথিবীর বুকে টিকে থাকতে পারবে। স্থান-কালের প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। সেই প্রতিবন্ধকতা কোনো বিপ্লব বা রেনেসাঁর কারণেও যদি হয় তবু সকল বস্তুবাদী শক্তি তাদের সামনে মাথানত করতে বাধ্য হবে। এটাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের সাফল্যের মূলকথা। তারা নিজেদের শক্তি ও আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার হিসাব কষেছেন। তারপর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, রোম ও পারস্যের মতো শক্তিধর ও সমরশক্তিতে বলীয়ান সরকারগুলোর সঙ্গে তাদের পেরে ওঠা সম্ভব নয়।

কিন্তু তারা রাসুল সা. কর্তৃক আনীত সেই চিরন্তন জীবনব্যবস্থাকে গ্রহণ করেছেন এবং এর জন্য নিজেদের জান-মাল জীবন-মান ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন। ছিন্ন করেছেন জীবনের সকল বন্ধন। ভবিষ্যতের সকল পরিকল্পনা ঝেড়ে ফেলেছেন। তারা নিজেদেরকে ইসলামের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছেন যে, তাদের ব্যতীত ইসলামের মহীরুহে ফুল ফুটত না। আবার তারাও ইসলাম ছাড়া জীবিত থাকতে পারতেন না। যখন তাদের মাঝে এই উচ্চাভিলাষ ও সাহসিকতা প্রকাশ পায় এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে কল্যাণ ও তাকওয়ার নিক্তিতে পরিমাপ করেন, তখন তারা খোদায়ী নুসরতের উপযুক্ত হন, তখন আল্লাহ তায়ালা সারা পৃথিবীতে তাদের বিজয় দান করেন এবং ভূপৃষ্ঠে তাদের কদম মোবারক সুস্থির করে দেন।

আজহারের প্রিয় তালিবানে ইলম, তোমরাও নিজেদেকে পয়গামে ইসলামের জন্য তৈরি করে নিবে, সর্বদা দীনের উপর অটল থাকবে, নিজেদের জীবনকে দাওয়াত ও তাবলিগের সঙ্গে জুড়ে দিবে, নিজের অস্তিত্বকে ইসলামের সঙ্গে একাকার করে দিবে, তোমাদের দ্বারা ইসলাম পরিচালিত হবে, তোমরা ইসলাম নিয়ে চলবে, তা হলে অবশ্যই সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে, তোমরাই বিজয়ী হবে, জামানা তোমাদের সামনে মাথানত করবে, তোমাদের অনুগত হয়ে থাকবে।

আমি আলোচনা শেষ করতেই মুহম্মদ তাওফিক কুনজি দাঁড়িয়ে শোকরিয়া আদায় করেন। তারপর আমাকে 'জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিন'র হলরুমে আজহারের সেসব ছাত্রের উদ্দেশে আলোচনা করার দরখাস্ত করেন, যারা বিভিন্ন মুসলিমদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। আমি তার আবেদন মন্‌জুর করে নিই। এরপর তাকে বললাম, আপনার দাওয়াত গ্রহণ করার কারণ হল, এ ধরনের মজলিসে কথা বলে আমি আনন্দিত হই। আমি তার নিকট এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করি যে, তিনি আমাকে ছাত্রদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন। প্রথমে তিনি কিছু ছাত্রকে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তারপর ছাত্রদের বলে দেন, একে একে তাদের পরিচয় দিতে। তুর্কি, মিসরি, ফিলিস্তিনি ও সিরীয় ছাত্রদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। পরিশেষে আমি তুর্কি ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করি। এর জন্য তারা যদি আমাকে তাদের ছাত্রাবাসে যেতে বলে তা হলে

আমার কোনো আপত্তি নেই। তারপর যথারীতি অনুষ্ঠান শেষ হয়। আমরা 'হোটেল পার্লামেন্টে' ফিরে আসি।

২৫ জানুয়ারি ১৯৫১

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী[১], সাইয়েদ আলি আকবর[২] ও শায়খ উসমান আমার থাকার জায়গায় আসেন। কিছুক্ষণ পর, আমার থাকার জন্য নির্ধারিত জায়গায় আমাকে নিয়ে যেতে হোসনি সকর এলেন। আমি সেখানে যাই। জায়গাটা আমার পছন্দ হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় আজ-কালের মধ্যে আমরা এখানে এসে উঠব।

ড. আহমদ আমিনের সাক্ষাত লাভ

মিসরে পৌঁছার আগেই আমরা ড. আহমদ আমিনের[৩] সাথে ফোনালাপ করি। মক্কায় অবস্থানকালেও তার নিকট আমার মিসর সফরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছি। তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম আপনার সাথে কখন কোথায় সাক্ষাত হবে? তিনি বলেছিলেন, জিজায় আরব লিগের সংস্কৃতি বিভাগের অফিসে ১২টা পর্যন্ত আমাকে পাবেন।

আমি তাকে সরাসরি কখনো দেখিনি। তবে তার লেখা বহু বই অধ্যয়ন করার সুযোগ আমার হয়েছে। তার বর্ণনাভঙ্গি, ঘটনার বিশ্লেষণ, ইতিহাসের প্রতি শিকড়সন্ধানী দৃষ্টি দেখে আমি তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ি। এ কারণেই তাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'[৪] বইয়ের ভূমিকা

---

[১] মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী তাবলিগ জামাতের প্রসিদ্ধ মুরুব্বি। তিনি ভারতের মারকায নিজামুদ্দীনে থাকতেন। দাওয়াতের কাজ নিয়ে তিনি সুদানে এসেছেন। আমাদের মিসরে পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বে দাওয়াতের মেহনত করতে করতে তিনি মিসরে এসে পৌঁছান। এখানে তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

[২] সাইয়েদ আলি আকবর পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব। মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমণে বের হলে লেখকের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়।

[৩] মিসরের খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ। পাঠকনন্দিত লেখক। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে কায়রোয় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মিসর ইউনিভার্সিটি'র আরবি সাহিত্য বিভাগের ডিন ছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়ে ৪৭ বছর বয়স থেকে মৃত্যু অবধি 'আরব লিগে'র সংস্কৃতি বিভাগের প্রদনের দায়িত্ব পালন করেন। কায়রোর অনুবাদ, সঙ্কলন ও প্রকাশনা পরিষদের প্রধান ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শায়খ নদবী রহ. এর 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ দুহাল ইসলাম [ইসলামের সকাল] ও ফজরুল ইসলাম [ইসলামের ঊষাকাল]। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহজগত ত্যাগ করেন।

[৪] ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين

লেখার জন্য অনুরোধ করি। আমার মনে হয়েছিল, মিসরের লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই এই বইয়ের ভূমিকা লেখার বেশি উপযুক্ত। বইয়ের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার চিন্তাধারার যথেষ্ট মিল রয়েছে। ভেবেছিলাম, তিনি খুব আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে এবং আমার মনের চাহিদা অনুযায়ী কাজটি পুরা করবেন। কিন্তু আদৌ তেমনটি হয়নি।

আমার বহু বন্ধু তার লেখা ভূমিকা পছন্দ করেননি। তাদের অভিমত হল ভূমিকায় বইয়ের মূল বিষয়বস্তু ফুটে ওঠেনি। তার যথার্থ চিত্রায়ন হয়নি। এটা বরং বইয়ের দাবি ও মান ক্ষুণ্ন করেছে। তবে এক্ষেত্রে আমি ড. আমিনের উপর কোনো দোষ চাপাবো না। দোষ বরং তার যে তার কাছে অনেক কিছুর আশা করেছিল। কারণ সাংবাদিক-সাহিত্যিকদের মন-মেজাজ সবসময় একরকম থাকে না। সব বিষয়ে সর্বদা উপস্থিতজ্ঞানও থাকে না। অতএব অভিযোগ কিসের!

বইয়ের ভূমিকা লেখার ক্ষেত্রে তার এই আচরণ সত্ত্বেও তার প্রতি আমার পূর্বের ধারণার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। এখনো তিনি আমার নিকট ব্যাপক অধ্যয়ন, সুগভীর জ্ঞানসাধনায় সামসময়িক ব্যক্তিত্বের মাঝে অনন্য সাধারণ।

আমরা ধীরে ধীরে তার অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে হৃদয়ে এই চিন্তা উঁকি মারতে শুরু করেছে যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হবে। আলোচনা হবে। এতদিন তাকে চিনেছি তার লেখা পড়ে, তাঁর গবেষণা দেখে, তার চিন্তা-চেতনা এবং সাহিত্য ও ইলমি দক্ষতার অবয়ব প্রত্যক্ষ করে। এখন খোদ তাকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে যাচ্ছি। নিশ্চয় শারীরিক দিক দিয়েও তিনি হবেন অতুলনীয়, বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। তবে অধিকাংশ সময় ভাবনা, বাস্তবতার অনেক ঊর্ধ্বে হয়। আবার লেখক কলামিস্টদের ক্ষেত্রে এমন হয়ে থাকে যে, তাদের মৌখিক আলোচনার চাইতে লেখনীতে থাকে বেশি জাদুময়তা, হৃদয়কাড়া আকর্ষণ ও সম্মোহনী প্রভাব। দুটোর যেটাই হোক, আমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা এ সবের পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার আছে।

এ সব ভাবনা নিয়েই প্রবেশ করলাম সংস্কৃতি বিভাগের অফিসে। লোকজনকে ড. আহমদ আমিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা একটি বাগানের দিকে ইশারা করে বলেন- ওই তো তিনি। সেদিকে দৃষ্টি ফেরাতেই দেখি ছিমছাম-দীর্ঘকায় ও বর্ষীয়ান এক লোক। আমাদেরকে

খোশ আমদেদ জানাতে জানাতে এগিয়ে আসছেন। তাকে দেখতে রোগাটে মনে হল। অত্যধিক লেখালেখি ও অধ্যয়নের কারণে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি। চোখের জ্যোতিও অনেক কমে গেছে। ডাক্তারদের পরামর্শে দাঁত তুলে ফেলেছেন, ফলে কথা বলতে অনেক বেগ পেতে হয়। তার বাহ্যিক অবয়বে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। যৌবনকালে তিনি ছিলেন সুঠাম ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী। তিনি আমাকে করমর্দন ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে স্বাগত জানালেন। তার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। আলোচনার একপর্যায়ে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র প্রসঙ্গ ওঠে। তখন আমি তাকে বললাম, অনেকের ধারণা ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করে আমি আপনাকে কষ্টে ফেলে দিয়েছি। তিনি বললেন, না-না, আমি তো বইটি ভালো করে অধ্যয়ন করেছি এবং অনেক বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

ড. আমিনের চিন্তাধারা

তারপর তার সদ্য সমাপ্ত 'ইসলামের অতীত-বর্তমান' বইয়ের আলোচনা তোলেন। বইটি এখনো বাজারে ছেপে আসেনি। তিনি বলেন, বইটিতে আমি আমার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছি। জানি এটি বহু পাঠকেরই মন যোগাতে পারবে না। যেমন- নবুওয়াতের যুগ ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণভাবে কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। হযরত উমর রাদি. এর খেলাফতকাল ইসলামি ভাবধারায় ছিল না। ছিল আরবীয় ছাঁচে। এর পক্ষে অনেক প্রমাণও পেশ করেন তিনি।

তিনি এ কথাও লিখেছেন যে, 'বর্তমান সময়ে এমন কিছু ধর্মীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যেখানে ইজতিহাদের বিকল্প নেই। তাই এ দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। যেমন- অধুনা বিশ্বে মানুষের কর্মব্যস্ততা বেড়েই চলছে। তাই ব্যস্ততম লোকদের জন্য বাড়িতে থাকাকালীন দুই ওয়াক্ত নামাজ একত্রে পড়ার বৈধতা দেওয়া দরকার।

'এবং গ্রীষ্মকালে সূর্যের প্রখর তাপের দরুন মিল-ফ্যাক্টরিতে কর্মরত শ্রমিকদের কষ্টের সীমা থাকে না। তাই রমযান মাসে তাদের জন্য রোজার পরিবর্তে ফিদিয়ার অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন।

'এবং ফিকহার মধ্যে এমন কতক মূলনীতি রয়েছে, যার ভিত্তিতে অনেক সময় ছিন্নমূল মানুষের উপর জাকাত ফরজ হয়ে যায়। আবার

কখনো বিত্তশালীদের থেকে জাকাত রহিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নতুন করে ভাবা দরকার।

'এবং হজের মৌসুমে কোরবানির পরিবর্তে কিছু লোকের খর্জুর সদকা করার পরামর্শ দেওয়া উচিত। কেননা কোরবানির গোশত নষ্ট হয়ে পরিবেশ দূষিত করে ফেলে। ফলে রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়।'

দীনের মৌলিক নীতিমালার বিপরীত তার এসব দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারে আমি অসন্তোষ প্রকাশ করলাম। তবে যেহেতু তার সঙ্গে এটা আমার প্রথম সাক্ষাত ছিল তাই কথা আর সামনে বাড়াইনি।

আরব ও পশ্চিমা চিন্তাধারার পার্থক্য

তারপর তিনি আরব ও পশ্চিমি চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আরবীয় চিন্তাধারা কৃত্রিমতার ক্ষেত্রে অনন্য। এর বিধান ও উপমা চমৎকার। তবে সংক্ষিপ্ত। পশ্চিমি চিন্তাধারা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও শাখা-প্রশাখাগত দিক দিয়ে অপূর্ব। এই জন্য বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে তাদের মন-মেজাজ দৌড়ে চলে। জার্মান চিন্তাধারা নিয়েও তিনি আলোচনা করেন। তার গভীরতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, এটি তাসাউফের নিকটবর্তী। তারপর মুহম্মদ আসাদে[১]র 'সজ্ঘাতের মুখে ইসলাম'[২] গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেন। এবং গ্রন্থটির ব্যাপারে তিনি তার সন্তোষ প্রকাশ করেন।এটি ছিল

একটি ইলমি বৈঠক। তাই ইলম ও দীন উভয়টিই আলোচনার বিষয় ছিল। তিনি আমাকে দুপুরের খানার দাওয়াত দিলেন। বললাম, অন্য কোনোদিন আসব। তিনি আমাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র পাঁচ কপি উপহার দিলেন। আমি বললাম, আপনার আত্মকথা

---

[১] একজন নওমুসলিম। ১৯০০ সালের ২ জুলাই তৎকালীন অস্ট্রিয়ার এক বিখ্যাত ইহুদি পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯২২ খিস্টাব্দে বহির্ভ্রমণে বের হয়ে নানান বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সন্ঞ্চয় করেন। ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু মন চন্চল হয়ে ওঠে। অবশেষে ১৯২৫ সালে ২৫ বছর বয়সে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে ভারত সফরে এসে তার পরিচয় হয় আল্লামা ইকবালের সাথে। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে আল্লামা ইকবালের সাথে তিনি একযোগে কাজ করেন। 'মক্কার পথ' তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ। 'দ্য মেসেজ অব দ্য কোরআন' তার আরেক কীর্তি। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অনেক পর। স্পেনের ঐতিহাসিক শহর গ্রানাডায় ১৯৯২ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

[২] 'الاسلام علي مفترق الطرق'

'আমার জীবন'[৩] পড়ার আমার বেশ আগ্রহ ছিল। বইটি আমি ভারত ও হেজাজে কোথাও পাইনি। তিনি বইটির এক কপি আমাকে দিলেন। বইয়ের ইনারে লিখে দিলেন, 'আহমদ আমিনের পক্ষ থেকে শায়খ আবুল হাসানকে হাদিয়া।'

তারপর আমি বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। এই সাক্ষাত-পর্বে আমার সাথে ছিলেন আহমদ উসমান ও মাওলানা আবদুর রশিদ নদবী।

হ্যাঁ, আহমদ আমিন ভারত ও পাকিস্তান থেকে আগত আমার ওইসব চিঠিও দেখান, যা তার নামে এসেছিল। চিঠিগুলোর মধ্যে মাওলানা মাসউদ আলম নদবীর ভালবাসা ও সাহিত্যময় একটি চিঠিও ছিল, যা তিনি সাহিত্য, ভ্রাতৃভাব ও মমতার সাথে লিখেছিলেন। তার একটি নীতি হল, তিনি আমার নিকট চিঠি লেখার সময় কোনো ধরনের লৌকিকতার আশ্রয় নিতেন না। এ জন্য তার চিঠিগুলো হত সাহিত্যমানসমৃদ্ধ। ভালবাসায় টইটুম্বুর। আমাদের উভয়ের সব চিঠি একত্র করলে একটি বই তৈরি হয়ে যাবে। যদিও তাতে কোনো দার্শনিক বা তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল না।

রাতে আমাদের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহমুদ কিনদিল আগমন করেন। মিসরের 'জামইয়্যা শারইয়্যা'র সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 'আব্বাসিয়া'য় তার একটি ওয়ার্কশপ আছে। মক্কায় তার সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়েছিল। আমাদের উভয়ের মাঝে ছিল অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা। তিনি আমাদের হোটেলে থাকার ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, আমি কায়রো থাকতে আপনারা এমনটি কেন করলেন? আমরা তার কাছে ক্ষমা চাইলাম। তিনি দীর্ঘ সময় বসে থেকে আলোচনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তও নিলেন যে, আমরা জামইয়্যা শারইয়্যার কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করব। সেখানে তার সাথে আমাদের সাক্ষাত হবে।

জামইয়্যার[৪] মসজিদে আমার আলোচনা

২৬ জানুয়ারি ১৯৫১

গতরাতে আলহাজ আলি শরিফ টেলিফোনে আমাকে জানান যে, তিনি সাড়ে দশটায় এসে আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। আমরা তার এবং আহমদ

---

[৩] 'حياتي'

[৪] মিসরের একটি প্রসিদ্ধ সংস্থা। এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মাহমুদ খাত্তাব সুবাকী। তিনি একজন হক্কানী আলেম ও সুপ্রসিদ্ধ বুজুর্গ। ১৩৩৫ হিজরি সনে তিনি সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

উসমানের অপেক্ষায় ছিলাম। তারা যথাসময়ে এলেন। আমরা তাদের সাথে মসজিদে গেলাম। আহমদ উসমান জুমার খুতবাসহ নামাজ পড়ালেন। খুতবাটি স্থান-কাল হিসেবে খুবই চমৎকার ছিল। নামাজের পর হাজি শরিফ ঘোষণা দিলেন, 'ভারতীয় আলেম মেহমান এখন আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন।'

আমি মিম্বরে উঠে বসলাম। আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী কিছু আলোচনা করলাম। ইসলাম ও মুসলমানদের সেসব সমস্যা আলোচনায় তুলে ধরলাম, যা এখন সব দেশেই পাওয়া যায়। এবং এই সংস্থাকে সময়ের স্রোতে গা না ভাসিয়ে দৃঢ় ও অবিচল থাকার দরুন মোবারকবাদ জানালাম। ভারত ও মিসরের সেইসকল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করলাম, যারা ছিলেন সুন্নতের অনুসারী এবং তার অতন্দ্র প্রহরী।

তারপর বললাম, বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টাতে, পাশবিকতার প্রবল তোড় রুখে দিতে, দেশ, দেশের জনগণ ও ইসলামের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে আনতে প্রয়োজন ত্যাগ-তিতিক্ষার, প্রয়োজন আত্মবিসর্জন ও কোরবানির। উদ্যোগ-উদ্দীপনা এবং ইসলামের দাওয়াতকে ব্যাপক থেকে আরও ব্যাপক করা ব্যতীত এটা অর্জন হবে না।

বললাম, ইসলাম উত্তরাধিকারসূত্রেপ্রাপ্ত কোনো সম্পত্তি না, যা সাধারণত পুত্র পিতা থেকে, এক বংশ অপর বংশ থেকে পেয়ে থাকে। কারো কারো ধারণা এমনটাই। যারা এই ভুল বোঝাবুঝির শিকার তারা ইসলামের মূল ও মূল্য বোঝে না। কারণ কোনো কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই তাদের কাছে ইসলাম পৌঁছেছে। এ কারণেই তাদের নিকট ইসলামের কোনো ক্ষতির কথা পৌঁছুলে তাদের কানের পশমও নড়ে না। হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয় না। ধমনির রক্তপ্রবাহে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগে না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম দীনের জন্য রক্তসাগর পাড়ি দিয়েছেন। অতিক্রম করেছেন বিপদসংকুল সুদীর্ঘ সেতু। তাই তাঁদের নিকট সবচাইতে প্রিয় ছিল দীন। নিজের জীবনের চেয়ে প্রিয়। পরিবার-পরিজন এবং ধনসম্পদের চেয়েও বেশি প্রিয়।

তাই আমাদের উচিত ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখা, আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করা। সেখানে রয়েছে জাজ্বল্যমান এক দীর্ঘ অধ্যায়। দীনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার এবং বিপদ-আপদে

অটল অবিচল থাকার আখ্যান এবং ধৈর্যধারণের জীয়ন্ত উপাখ্যান। ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহাড়ার এবং আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি ও সুদৃঢ় সংকল্পের ইতিহাস। আমাদের উচিত আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নিজেদেরকেই প্রথমে দোষী সাব্যস্ত করা। তারপর নিজেদের আমল ঠিক করা এবং দীনের হেফাজতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া। কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে,

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيْنَ.

'লোকজন কি ধারণা করে বসে আছে যে, আমরা ঈমান এনেছি এ কথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের আর কোনো পরীক্ষা নেওয়া হবে না! অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। তারপর আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই জানবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী'।-[সুরা আনকাবুত, ২-৪ আয়াত]

আমি আলোচনা শেষ করলাম। তখন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মাহমুদ খাত্তাবের সাহেবজাদা ও খলিফা, সংস্থার প্রধান পরিচালক শায়খ আমিন খাত্তাব মিম্বরে ওঠেন। তিনি শুরুতে আলোচকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তারপর দীর্ঘ একঘণ্টা আলোচনা করেন। এতে দাওয়াত ও তাবলিগ এবং 'আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'র গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করেন। অনেক ফিকহী মাসয়ালা বিশ্লেষণ করেন। তার আলোচনা দ্বারা হাদিসের ব্যাপারে তার অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্ব এবং লোকজনের মাঝে তার স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও সবাই ধৈর্যের সাথে বসে ছিল। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ মজলিস থেকে ওঠেনি।

সংস্থার মসজিদে

মসজিদটি একেবারেই সাদাসিধে ধরনের। তেমন কোনো চাকচিক্য নেই। নামাজ ও খুতবায় সুন্নতের খেলাফ কিছু ছিল না। তবে খতিব সাহেব খুতবায় খোলাফায়ে রাশেদার কথা আলোচনা করেননি। তাঁদের জন্য দোয়া করেননি। এটা আমার কাছে নতুন বিষয় ছিল। প্রথম আজানও আমি শুনিনি। তবে নামাজে তা'দিলে আরকান ছিল। রুকু'-সিজদাও

অত্যন্ত ইতমিনানের সাথে আদায় করা হত। মসজিদের নিয়ম-নীতি ও মুসল্লিদের প্রশান্তচিত্ততা ও মনোভাব দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হই। শায়খ আমিন আলোচনা শেষ করতেই লোকজন আমার সাথে মুসাফার জন্য ভিড় কর়তে থাকে। আমি ভারতের 'মেওয়াত' ছাড়া কোথাও এ ধরনের ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে মুসাফা ও দোয়ার আবেদন করতে দেখিনি।

জামইয়্যা ও তার প্রতিষ্ঠাতা

জামইয়্যা শারইয়্যার প্রতিষ্ঠাতা শায়খ মাহমুদ খাত্তাব সুবাকী। তিনি ১২৭৪ হিজরি সনে মানুফিয়া জেলার সুবাক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একজন সাধারণ কৃষকের সন্তান হিসাবে তিনি লালিত-পালিত হন। তিনি তার পিতার বকরি চড়াতেন। পাশাপাশি একটি বাগানের দেখাশোনাও করতেন। তিনি কোনো লেখাপড়া জানতেন না। মাহমুদ খাত্তাব যখন যৌবনে পদার্পণ করেন তখন শায়খ আহমদ বিন মুহম্মদ জাবাল সুবাকীর খেদমতে উপস্থিত হন। সেখানে শায়খ আহমদের পরামর্শ অনুযায়ী জিকির-আজকার ও বিভিন্ন অজিফা পালন করতে থাকেন।

অবশেষে তিনি রিয়াজত ও মোজাহাদা করতে করতে এমন এক স্তরে পৌঁছেন, যে খোদ শায়খ তাঁর অন্য মুরিদদের ইসলাহ, সংশোধন ও দেখাশোনার দায়িত্ব তার হাতে সোপর্দ করেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে ইলমের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন।

তার বয়স তখন বিশের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তিনি ইলমের রত্নভাণ্ডার থেকে একেবারেই খালি। প্রথমে তিনি হাতের লেখা শেখেন। তারপর আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইলম অর্জনে মনোনিবেশ করেন। অল্প দিনের মধ্যে এমন পারদর্শিতা অর্জন করেন যে, তিনি ছাত্রদেরকে দরস দিতে শুরু করেন। এসব কিছু আনুমানিক এক বছর সমপরিমাণ সময়ের ভিতর হয়েছে, যা তিনি তার সুবিখ্যাত 'ফাতাওয়ায়ে আইম্মাতুল মুসলিমিন' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাজীবনে তার একটি নীতি ছিল, তিনি আজহারে লেখাপড়া করা অবস্থায় গ্রামীণ শিশুদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। আজহারে থাকতেন একজন ছাত্র হিসেবে। আর গ্রামে গিয়ে হতেন একজন ওয়ায়েজ ও মুরশিদ। তিনি বিবাহ-শাদিতে নাচ-গান, আনন্দ-উল্লাসসহ যেসব ইসলামবিরোধী কাজ হয় তা বন্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালান। এ দিকে

আজহারসহ বিভিন্ন মসজিদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিদআতের মূলোৎপাটনের লক্ষে কৌশলে কাজ করে যান। ভণ্ড পির- মাশায়েখদের সংশোধন করার জন্য তাদের সাথে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

তিনি আজহার থেকে সর্বোচ্চ নম্বরে উত্তীর্ণ হয়ে সনদ অর্জন করেন। তারপর তিনি দরস দিতে শুরু করেন। দরসের ফাঁকে ফাঁকে জবান ও কলমের জিহাদও চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৩৩৫ হিজরি সনে তিনি মুসলিম জনসাধারণকে কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে জীবন চালোনায় উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সংস্থার নাম রাখেন 'জামইয়্যা শারইয়্যা'। বিভিন্ন এলাকায় ওয়ায়েজ ও মুবাল্লিগদের পাঠানোই এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ও কাজ, যাদের দায়িত্ব হল সুন্নত অনুযায়ী মসজিদসমূহকে আবাদ করা এবং জনগণকে ইসলামি তাহযিব-তামাদ্দুনের ব্যাপারে সজাগ সচেতন করা।

তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও কোরবানির অভাবনীয় প্রভাব মিসরের জেলায় জেলায় পড়েছে। ফলে আজ দিকে দিকে বিশুদ্ধ আকিদা, খালেস তাওহিদের প্রতি দৃঢ়তা, শিরিক-বিদআতের প্রতি ঘৃণা এবং ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির সফল বাস্তবায়ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। শরিয়াহ মোতাবেক দাড়ি রাখা এবং মাথায় পাগড়ি বাধা এই সংস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। মুখে দাড়ি রাখা এবং মাথায় পাগড়ি থাকলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি এই সংস্থার একজন সদস্য। মিসর থেকে দাড়ি ও পাগড়ি প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। এমনকি আলেম ও দীনদার শ্রেণীর মধ্যেও এই সুন্নত পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছিল।

১৩৫৪ হিজরি সনে শায়খ মাহমুদ সুবাকী ইহলোক ত্যাগ করেন। শায়খের অবর্তমানে তার যোগ্য সাহেবজাদা শায়খ আমিন মাহমুদ খাত্তাব তার স্থলাভিষিক্ত হন। সংস্থার দায়িত্বশীলদের সাথে সাক্ষাত হলেই আমার হৃদয়ে ওলামায়ে দেওবন্দ ও তাদের অনুসারীদের কথা উঁকি মেরে ওঠে। সঠিক আকিদা পোষণ, সুন্নত পরিপালনে আগ্রহ, দীনের প্রতীকসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, একত্ববাদ ও আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে উভয় দলের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। যদি সিফাতে বারি তায়ালা ও মুতাশাবিহাত-এর মর্ম নিয়ে মতবিরোধ না থাকত তা হলে এই সংস্থার ও নজদের অধিবাসীগণ এক চিন্তাধারার অধিকারী হতেন।

আন্দোলনমুখী জীবনের স্থায়িত্ব

আমি অনুভব করলাম যে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি যেখানে পশ্চিমা সভ্যতার কাছে হার মেনেছে এবং নিজের মাথা বস্তুবাদের সামনে নুইয়ে দিয়েছে, সেখানে এই সংস্থা খুব আশাব্যঞ্জক অবস্থানেই আছে। সংস্থাটি সে আদর্শকেই বুকে ধারণ করে আছে এবং লালন করে আসছে, যা তার প্রতিষ্ঠাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। ভবিষ্যতে কি এই প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে থেকে পূর্বসূরিদের রুহানি ফয়জান দ্বারা উপকৃত হতে পারবে নাকি হারিয়ে যাবে কালের আবর্তে, অতল গহ্বরে? এই প্রতিষ্ঠান সমহিমায় টিকে থাকবে, যদি তার কর্মতৎপরতা আপন ধারা ও পথে অব্যাহত থাকে এবং যদি অব্যাহত থাকে তার গবেষণা, দাওয়াতি কার্যক্রম, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানি, যদি নতুন জামানা ও প্রজন্মের জন্য তৈরি করা হয় নতুনতর পথ ও পদ্ধতি, যদি গ্রহণ করা হয় কথা বলার নতুন ধারা।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বহু সংস্থা বা দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন একজন মুখলিস, চিন্তাশীল ও প্রভাবশালী ব্যক্তি কিন্তু তার পর এমন কিছু লোক স্থলাভিষিক্ত হয়, যারা তার আদর্শকে ভুলে যায়, যারা দলের কর্মনীতিতে কোনো নতুনত্ব সৃষ্টি করে না এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী কল্যাণকর কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না; দাওয়াতি কার্যক্রমেও এমন কোনো পরিবর্তন আনে না, যা নতুন প্রজন্মের জন্য হবে অধিকতর কার্যকরী। ফলে ধীরে ধীরে তাতে ধস নামতে থাকে। একপর্যায়ে সে তার প্রাণশক্তি হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। আয় আল্লাহ, এই সংস্থাকে এ ধরনের পরিণতি থেকে হেফাজত করুন।

জুমার নামাজের পর আমরা কিছুক্ষণ সংস্থার পরিচালকের নিকট বসি। তার মাথায় ছিল সাদা-কালো কেশ। চেহারা থেকে ঠিকরে পড়ছে ইবাদতের নুর ও জ্যোতির্ময়তা। ভাবগাম্ভীর্যেও এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তার জিন্দাদিল ও প্রাণবন্ত ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হই।

আমরা শায়খের মজলিস থেকে বেরিয়ে আসি। আমাদেরকে শায়খ আহমদ উসমান ও হাজি আলি বিদায় জানালেন। সেখান থেকে আমরা মাহমুদ কিনদিলের সঙ্গে চলে আসি এবং তার ওখানেই দুপুরের খানা খাই। এখান থেকে এশার সময় ফিরে আসি।

আরববিশ্বের অধঃপতন

আমার কয়েকজন বন্ধু জানিয়েছেন যে, অধ্যাপক সায়িদ রমজান কায়রো আছেন। শহরে-গ্রামে তার আসা-যাওয়া, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের সাথে তার দেখা-সাক্ষাত এবং তার কাজের তেজস্বিতার কথাও তারা আমাকে জানিয়েছেন। তাকে দেখার আগ্রহ আমার দীর্ঘ দিনের। বড় বড় ব্যক্তিত্ব ও ইসলামি আন্দোলন পরিচালনাকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করাই আমার এই সফরের মূল টার্গেট।

আমি হেজাজে থাকা অবস্থায় আরববিশ্বকে খুব কাছে থেকে দেখেছি। এসব অঞ্চলের নৈতিক অধঃপতন, সরকারের জুলুম-নির্যাতন, রাজনৈতিক অচলবস্থা, দীনের ব্যাপারে উদাসীনতা ও বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার কথা আগে থেকেই জানতাম। আমি এমন কয়েকজন আরব নেতাকে দেখেছি, যারা দেশ ও জনগণের সম্পদ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, যেমনটি সাধারণত ছোট শিশুরা কংকর নিয়ে খেলে। রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে নিয়ে কানামাছি খেলায় লিপ্ত। মতলব হাসিলের জন্য তারা নিজেদেরকে কাদা ছোড়াছুড়িতে লাগিয়ে রেখেছে। যাদের বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত নয়, তাদেরকে নেতা বানিয়ে ইসলামপ্রিয় ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

আমি দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মুসলিমবিশ্বের এই নাজুক পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন এমন এক গণআন্দোলন, যার ভিত্তি হবে ঈমান ও তাকওয়া, যার লক্ষ হবে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামি জীবনধারা ও সমাজব্যবস্থা।

আমরা আজ পানির স্রোতে ভাসছি। যুগ এগিয়ে গেছে বহুদূর। তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, ওয়াজ-নসিহত, লেখালেখি আর গ্রন্থরচনার মাধ্যমে এর মোকাবেলা সম্ভব না। সম্ভব না এমন কোনো সংস্থার দ্বারাও, যার চলার গতি অতি মন্থর।

যে ইশক রুখতে পারে হাজার স্রোতধারা

প্লাবনের সামনে বাধ হয়ে দাঁড়াতে পারে সে-ই যে তার থেকে আরও প্রবল, আরও শক্তিধর। ধারকে রুখতে পারে সে-ই যে তার চেয়ে অধিকতর ধারালো, তীক্ষ্ণ।

হেজাজে যেসকল লেখক-সাহিত্যিকের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাত হয়েছে এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যেসকল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার

সাক্ষাত-পরিচয় হয়েছে তাদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন আমার এ স্বপ্নকে দীর্ঘদিন লালন করেছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনে ছিল তাদের বিরাট প্রভাব। তাদের আমল ও ঈমানি শক্তির কোনো তুলনা ছিল না। তাদের প্রতিটি সদস্যই ছিল জ্ঞানী ও আশাবাদী। নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে তারা কোনো কাজই করত না। সকলেই ছিল ঈমানি জজবায় উজ্জীবিত। আল্লাহ চাইলে তাঁরাই পারত রাষ্ট্রের মোড় বদদীন থেকে দীনদারির দিকে ঘোরাতে। তাঁরাই পারত মানুষের চিন্তা ও আদর্শে পরিবর্তন আনতে; দীনের ব্যাপারে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা থেকে দীনকে ভালবাসার দিকে নিয়ে যেতে। কিন্তু...।

একপর্যায়ে ইখওয়ানদের উপর চালানো হয় জুলুম-নির্যাতনের স্টিম রুলার। মাহমুদ ফাহমি নুকরাশি পাশাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগ এনে নিতান্তই হঠাৎ শহিদ করা হয় ইখওয়ানের প্রধান পথপ্রদর্শক শায়খ হাসানুল বান্নাকে। দলকে ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে ইখওয়ানদেরকে করা হয় দেশান্তর। ফলে সকল আশাই মাটি হয়ে যায়। এটা ছিল আরব ও মুসলিমবিশ্বের জন্য এক মর্মন্তুদ ট্রাজেডি। তবে ইখওয়ানরা এখন আবার সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করেছে। তাদের মাঝে ফিরে আসছে বিগত সজীবতা। তারা এখন বিভিন্ন বইও প্রকাশ করছে।

আমি হেজাজে থাকাকালীন অধ্যাপক সালেহ ইশমাবীর নিকট চিঠি লিখেছিলাম। তাতে আমি মিসর সফরের অভিপ্রায় এবং তার সাথে সাক্ষাত করার আগ্রহের কথা জানিয়েছিলাম। মিসরে পৌঁছার পর কয়েকদিন পর্যন্ত ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সাথে আমার দেখা হয়নি। এমন কাউকেও পাইনি যে আমাকে অধ্যাপক সালেহ ইশমাবীর নিকট নিয়ে যাবে।

যখন আমি এখানে অধ্যাপক সায়িদ রমজানের উপস্থিতির সংবাদ পাই তখন তার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করি। তার সাথে দেখা করার পূর্বেই তিনি লোকমারফত সালাম পাঠিয়ে জানান যে, অচিরেই আমার সাথে তিনি সাক্ষাত করতে আসবেন।

শনিবার রাত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কতক নওজোয়ান ও কলেজের বহুসংখ্যক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আমার সাক্ষাতে আসেন। আমাদের সাক্ষাতটা ছিল দীর্ঘবিচ্ছিন্নতার পর দুই বন্ধুর মিলনের ন্যায়। সায়িদ

রমজানের কাছ থেকে জানতে পারলাম, মাওলানা মুহম্মদ নাজিম নদবী তার নিকট আমার আলোচনা করেছিলেন। আমার কিছু বইও তাকে উপহার দিয়েছিলেন।

তিনি আমার পাশে বসলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী ভাইয়ের ন্যায় আমার সাথে কথা বললেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি নিজের ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ যোগ্যতা প্রকাশ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। মনে হয় এর কল্পনাও তার মধ্যে আসেনি, যা সাধারণত অনেকের মধ্যেই এসে থাকে এবং কথার ফুলঝুড়িতে নিজেদের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। তার হাতের নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি এবং উপস্থিত লোকদের প্রতি ফিরে ফিরে সাবলীল ভাষায় কথা বলার দৃশ্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়ি। তার মেধার প্রখরতা ও প্রাণবন্ততা দেখে কেউ প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। কিছুক্ষণ আলোচনার পর মুসলিম রাষ্ট্র ও ব্যক্তিত্বের কথা রেখে 'রুহ ও আকলের দ্বন্দ্ব এবং রুহের উপর আকলের প্রাধান্য' নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ ছাড়া মুসলিম ও মুসলিমবিশ্ব নিয়েও আলোচনা হয়। পরিশেষে তিনি এ কথার উপর বিদায় নিলেন যে, আমাকে অধ্যাপক ইশমাবীর সাথে আগামীকাল পরিচয় করিয়ে দিবেন। এ ব্যাপারে তিনি আমাকে জোহরের পর সংবাদ জানাবেন। কিছুক্ষণ পর সাইয়েদ আলি আকবর এলেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আজ রাত্রে হোটেল পার্লামেন্টে আমার সাথে থাকবেন। আগামীকাল ভোরে বিমানে দামেশকের উদ্দেশে রওনা করবেন।

শায়খ হামিদ ফকীর সাক্ষাত লাভ

২৭ জানুয়ারি ১৯৫১

জনাব হোসনি সকর এলেন। আমরা আসবাবপত্র গুছিয়ে নিয়ে তার গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ি আমাদের নিয়ে রওনা হল নতুন ঠিকানা মিউজিক এভিনিউর দিকে। কিছুক্ষণ পর আমরা এ রোডের একটি বাজারে পৌঁছুলাম। জোহরের পর শায়খ হামিদ ফকীর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে 'জমিয়তে আনসারুস সুন্নাহ'র অফিসে গেলাম। অফিসটি ছিল কাওলাতুল আবেদিন রোডের পাশে। আমরা সংস্থার ভবনে প্রবেশ করলাম। আমাদের দেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক নওজোয়ান ছুটে এলেন। তার পরনে ছিল

বিশেষ ধরনের ইউনিফর্ম। তিনি আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, আমি সংস্থার দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছি। আমি মুহম্মদ আবদুল ওহহাব বান্না। তিনি আরও বললেন, শায়খ আবদুল মাজিদ আসরের পর আসবেন। আমরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ইতোমধ্যে আমরা তার নিকট আমাদের পরিচয়পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি।

আসরের পর শায়খ ফকী এলেন। তিনি সানন্দে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্বের কারণে ওজর পেশ করলেন। আমি তার সন্তোষজনক উত্তর দিলাম। তারপর তিনি বললেন, আমি আপনার বইয়ের একটি কপি সংগ্রহ করে পড়েছি। আমার ইচ্ছা ছিল, বইটির উপর একটি মন্তব্যপ্রতিবেদন লিখব। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন ক্ষুরধার লেখনীর। আমি লেখার চাইতে বলায় বেশি পারদর্শী। এসব ভেবে হাতে কলম নেওয়ার সাহস করিনি।

আমি বললাম, বেয়াদবি মাফ করবেন। আপনি বইটির ব্যাপারে মন্তব্য লিখলে আমি অত্যন্ত খুশি হব। তারপর আমি তাঁর নিকট আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খ আবদুল মাজিদ সালিম, বিশিষ্ট লেখক আহমদ মুহম্মদ শাকের এবং মিসরে অবস্থানরত শায়খ মুহম্মদ ইবরাহিম প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিলেন। তারপর তিনি আমাকে আনসারুস সুন্নাহর ছাপাখানায় নিয়ে গেলেন।

শায়খুল আজহারের সাক্ষাত

মাগরিবের পর আমরা আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খ আবদুল মাজিদের বাসভবনে গেলাম। তাঁর রুমে প্রবেশ করতেই অনুভব হল, আমরা কোনো মন্ত্রীর বাড়িতে এসেছি। প্রফেসর হামিদ ফকী কোনো ধরনের কৃত্রিমতা ছাড়াই শায়খের রুমে প্রবেশ করলেন। অনুমান করতে পরলাম যে, শায়খের সাথে তার পূর্ব-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এ কারণেই তাকে প্রবেশের জন্য অনুমতি নিতে হয়নি। শায়খের মজলিসে আজহারের বড় বড় অধ্যাপক এবং রাষ্ট্রের পদস্থ আমলা ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। আজহারের রেজিস্ট্রারার শায়খ আবদুল লতিফ দাররাজও এতে অংশগ্রহণ করেছেন।

শায়খ আবদুল মাজিদ উঠে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। জনাব ফকী আমাকে শায়খের সামনে এগিয়ে দিলেন। নদওয়াতুল ওলামা ও

দারুল উলুমের সাথে আমার সম্পর্কের কথাও তাকে জানালেন। আমি শায়খকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি আপনাকে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে সালাম পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তারা আজহারকে অনেক সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। শায়খ সুন্দরভাবে এর জবাব দিলেন। আমি তাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়ের এক কপি উপহার দিলাম। তারপর তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করলেন।

ভারতবর্ষের দীনীশিক্ষা

আমি ভারতীয় দীনী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা এবং তার প্রশংসনীয় দিকগুলো আলোচনা করলাম। আমি বললাম, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা এদেশের তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রম। কেননা এ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় অর্থায়ন ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়। কিন্তু সেখানে অর্থের যোগান দেয় সাধারণ জনগণ। সেসব প্রতিষ্ঠানে এমন সব ওলামায়ে কেরাম পাঠদান করেন, যাদের নিকট বেতনের তুলনায় আখেরাতের সওয়াব অগ্রগণ্য। সেখানে এমন ছাত্ররাই ভর্তি হয়, যারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে, তাদেরকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মোটেই তত্ত্বাবধান করা হবে না। সেখানে এমন ছেলেরাই আসে, যারা ধন-সম্পদের লালসা ত্যাগ করতে পারে। এ জন্যই তাদের মাঝে পাওয়া যায় জিহাদি প্রেরণা ও মনোভাব। পাওয়া যায়, আল্লাহর ওয়াস্তে খেদমত করার তীব্র বাসনা। অন্যায় প্রতিরোধে অগ্রগামিতা।

শায়খ বললেন, ইতঃপূর্বে আজহারও এমন ছিল। আমি বললাম, তা হলে অবশ্যই সেযুগ ছিল আজহারের সোনালিযুগ। তারপর বললাম, আমাদের দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার অধীনে পরিচালিত। এটি ভারতের বড় মাদরাসাসমূহের একটি। মুসলমানের দীন শিক্ষার মারকায। ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

ইতোমধ্যে হামিদ ফকী কথা টেনে নেন। তিনি দারুল উলুমের দীনী ও ইলমি খেদমতের প্রশংসা করেন। একপর্যায়ে বললেন, তার প্রধান... এতটুকু বলে ভাবতে থাকেন। হয়তো তার নাম ভুলে গেছেন। আমি সাথে সাথে বললাম, সাইয়েদ সুলায়মান নদবী[১]। তিনি বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ,

---

[১] ১৩০২ হিজরিতে তাঁর জন্ম। তাফসির, ইতিহাস, আরবি সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী

সাইয়েদ সুলায়মান নদবী। সম্ভবত তাঁর সাথে সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর সাক্ষাত হয়েছিল। আমি বললাম, দারুল উলুমের বর্তমান পরিচালক মাওলানা ইমরান খান নদবী। তিনি আজহারে লেখাপড়া করেছেন।

মজলিসে উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর অনেকে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ও তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, তারা ভারতে থেকেই পুরোপুরিভাবে দীনের উপর চলতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সেখানকার ধর্মীয় মারকাযসমূহ সম্পর্কেও তাদেরকে জানালাম।

আলোচনা শেষ হল। হামিদ ফকী উঠে দাঁড়ালেন। শায়খের কাছ থেকে বিদায় চাইলেন। আমাদেরকে বিদায় জানাতে শায়খ দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। তিনি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদার সাথে মেহমানদের বিদায় দিলেন।

আজহারের চ্যান্সেলর

তার সঙ্গে সাক্ষাত করে বোঝতে পারলাম, বিনয় ও চরিত্রমাধুরীতে তিনি অনন্য ব্যক্তিত্ব। একেবারেই মাটির মানুষ। ইলমের গভীরতা অনেক বেশি। অসাধারণ গাম্ভীর্যের অধিকারী। আজহারের চ্যান্সেলরের পদ তাঁর না হয়ে পারে না।

ফিরে আসার সময় হামিদ ফকীকে শায়খের ইলমি মাকাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি জানান, বর্তমানে মিসরীয় ওলামায়ে কেরামের মাঝে তাঁর দ্বিতীয়জন নেই। তিনি যখন ফুয়াদ এলাকার শরিয়াহ বোর্ডের ইমাম ছিলেন তখন থেকেই আমি তাকে চিনি। তারপর সেখানকার শরিয়াহ আদালতের সহকারী জজ হিসেবে কাজ করেন। মিসরের গ্রান্ড মুফতি হিসেবেও কিছুদিন দায়িত্ব পালন করেন। পরিশেষে এ পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে আজহারের চ্যান্সেলরের পদ অলংকৃত করেন। এমন ব্যক্তিত্বের জন্য এ পদই ছিল যথোপযুক্ত।

আমি তাকে আজহারের শিক্ষকদের ধর্মঘটের ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, বেতন-ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে তারা এমন

অসাধারণ আলেম। নদওয়াতুল ওলামায় পড়াশোনা শেষ করে সেখানেই তিনি শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত হন। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর প্রাণপ্রিয় ওস্তাদ। আরদুল কুরআন, নুকুশে সুলায়মান ছাড়া তার বহু গ্রন্থ রয়েছে। ১৩৭৩ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

করেছেন। তিনি আমাকে শায়খের মজলিসে ভারতীয় ওলামায়ে কেরামের নৈতিকতা ও তাদের ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে যে আলোচনা আমি করেছি সে সম্পর্কে তার বইয়ের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ করেন।

শায়খ হামিদ ফকীর ক্লাসে অংশগ্রহণ

পথিমধ্যে জানতে পারলাম এশার নামাজের পর তাঁর নিয়মিত ক্লাস হয়। আমি ক্লাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাঁর অনুমতি চাইলাম। তারপর তাঁর সঙ্গেই আনসারুস সুন্নাহর কেন্দ্রীয় অফিসে গেলাম। এশার নামাজ সেখানেই আদায় করলাম। সেখানে নওজোয়ান ও আধুনিক শিক্ষিতদের বিরাট এক জামাতের উপস্থিতি দেখে বোঝতে পারলাম সংস্থার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ডের বিষয়টি।

সকলে উপরের তলায় একত্র হয়েছে। তাদের সংখ্যা তিনশ কিংবা তারচয়েও বেশি হবে। সেমিনারের আলোচ্যবিষয় ছিল কুরআন শরিফের يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ [সুরা মারয়াম, ১২ আয়াত] আয়াতখানি। ক্লাসটি ছিল খুবই চমৎকার। বর্ণনাভঙ্গিও হৃদয়গ্রাহী। বিভিন্ন বিষয়ের উপমাগুলোও ক্লাসের সৌন্দর্য বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে তার আলোচনা-পর্যালোচনা শোনার মতো। আমি তার জাদুময়ী বক্তৃতা সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। উপস্থিত লোকদের হৃদয়রাজ্যে আসন গেড়ে নেওয়ার এই প্রতিভা সম্পর্কে আমার তেমন ধারণা ছিল না।

তবে একটি বিষয়ে আমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাকলিদ ও মাজহাব চতুষ্টয়ের ব্যাপারে তার মন্তব্য আমাকে আহত করেছে। এ ব্যাপারে তাঁর আলোচনায় তিরষ্কারের গন্ধ ছিল। মুকাল্লিদদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হল তারা দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে অন্ধ, বধির ও বোবা। এ ধরনের কথা কোনো মুখলিস দায়ী ও মুসলিহ'র মুখে মানায় না। এ ধরনের তির্যক মন্তব্য মানুষের হৃদয়ে অনীহা সৃষ্টি করে। দীনের কোনো উপকারে আসে না। হায়, তাদের এ ক্লাসে যদি বাহ্যিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি আত্মশুদ্ধির আলোচনা থাকত তা হলে বহু শ্রোতার আত্মগঠন ও সংশোধন সম্ভব হত। বাড়ত খোদাভীরুতা। সৃষ্টি হত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদগ্রীবতা। এটি সেসব লোকের জন্য বেশি প্রয়োজন, যাদের রয়েছে দীনের খেদমতের উচ্চাভিলাষ। তবে এ কথা অস্বীকার করার জো নেই যে, এটি একটি চমকপ্রদ ক্লাস। শ্রোতাদের জন্য প্রভূত কল্যাণকর।

ক্লাস শেষে আমাকে জানানো ছাড়াই মঙ্গলবার আমার আলোচনার কথা ঘোষণা করা হল। আমিও সাদরে গ্রহণ করে নিলাম। আমারও ইচ্ছা ছিল এই সংস্থার সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে কিছু বলব।

ক্লাসের পর সংস্থার শাখা-সেক্রেটারি প্রফেসর আলি আদলি মুরশিদী এসে আমার সাথে সাক্ষাত করেন। তার সাক্ষাতে ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। ছিল আন্তরিকতা। ইতঃপূর্বে তিনিই আমার 'জাহেলিয়া থেকে ইসলামের পথে'[১] পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন। আমাকে তিনি জানিয়েছেন, পুস্তিকাটি মিসর ও সুদানের পাঠকদের মাঝে সমাদৃত হয়েছে। এর জন্য সুদান থেকে বারবার অর্ডারও এসেছে। তিনি তালাশ করে অর্ডার অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে পাঠিয়েছেন। তিনি বুধবার এক কপি বই নিয়ে আমার সাথে দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

এখান থেকে আমরা বাসায় ফিরে যাই। বাসায় গিয়ে জানতে পারি অধ্যাপক সায়িদ রমজানের দূত এসেছিলেন। তিনি এ কথা জানিয়ে গেছেন যে, আগামীকাল অধ্যাপক সালেহ্ ইশমাবী তার অফিসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। তিনি আরও জানিয়ে গেছেন যে, জনাব সায়িদ তার বাসায় আমাদের জন্য দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করবেন এবং সেখানেই তার সঙ্গে আমাদের আলোচনা হবে।

ইখওয়ানি নওজোয়ান

২৮ জানুয়ারি ১৯৫১

সকালবেলা আজহারের দুইজন ইখওয়ানি বন্ধু ইউসুফ কারজাবী[২] ও মুহম্মদ দামিরদাশী আমাদের নিকট এলেন। উভয়ের চেহারা থেকে

---

[১] من الجاهلية الى الاسلام

[২] ইউসুফ কারজাবী। আরববিশ্বে সাড়াজাগানো লেখক, কবি ও সাহিত্যিক। জগদ্বিখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ। 'ফিকহুয-যাকাত' [ইসলামের যাকাত-বিধান] তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব। তিনি আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিসন্তান। ছাত্রজীবনেই তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের চিন্তাধারা ও কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন। এ জন্য তাকে স্বৈরশাসক জামাল আবদুন নাসেরের প্রচণ্ড রোশে পড়ে মিসর ছেড়ে কাতারে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। কর্মজীবনের বসন্তকাল কেটেছে কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনও তিনি সেখানে কর্মরত আছেন। একজন সুবক্তা ও বাগ্মী হিসাবে তিনি খ্যাতিমান ও শ্রোতা-নন্দিত। তার লেখা গ্রন্থের সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে বহু আগেই। তিনি শায়খ নদবীর ছাত্র বলে গর্ব করেন। তাকে নিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন 'الشيخ ابو الحسن الندوى كما عرفته'। গ্রন্থটি মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদবী 'এমন ছিলেন তিনি' নামে অনুবাদ করেছেন।

উৎসারিত হচ্ছিল মেধার প্রখরতা, দীনী মূল্যবোধ ও উচ্চাভিলাষ। এঁরা জ্ঞান-গরিমায় এত সমৃদ্ধ ছিল যে, দেখলেই চোখ জুড়িয়ে আসে এবং সে দেশে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। ইখওয়ানদের মাঝে এ ধরনের আরও কতইনা নওজোয়ান রয়েছে। সংগঠনটি মুসলমানদের মাঝে দীনী জজবা উজ্জীবিত করতে যুবশ্রেণীর মাঝে ইসলামি চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং তাদেরকে দীনের দিকে ফেরানো ব্যতীত কোনও কল্যাণকর দিক না থাকলেও এতটুকুই তাদের গর্বের জন্য যথেষ্ট।

ইখওয়ানদের যুবকরা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইটি অধ্যয়ন করেছে। বইটি তাদের মাঝে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বইখানা সংগ্রহে রাখার আগ্রহ তাদের মাঝে খুব বেশি। তার কারণ ছিল ইখওয়ানদের সংস্কৃতিবিষয়ক পরামর্শদাতা প্রফেসর আবদুল আজিজ কামেল তাদেরকে এটা পড়ার জন্য পরামর্শ দিতেন। ছাত্র দুজন আমাকে 'উসুলুদ দীন অনুষদে'র ছাত্রদের উদ্দেশে কিছু বলার দরখাস্ত পেশ করে। আমি সানন্দে তাদের আবেদন মন্‌জুর করে নিই। কারণ এটা আমার এই সফরের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। তাদেরকে আমি আমার অপ্রকাশিত বই 'বিশ্বের পক্ষ থেকে আরব উপদ্বীপের কাছে বার্তা'[৩] এবং 'আরব উপদ্বীপের পক্ষ হতে বিশ্বের কাছে বার্তা'[৪] সম্পর্কে আলোচনা করি। তারা তাদের পরিচিত লাইব্রেরি থেকে প্রকাশ করবে বলে বই দুটি নিয়ে যান।

এর কিছুক্ষণ পর আবদুল্লাহ আকিল এলেন। তিনি ইরাকের অধিবাসী। টগবগে নওজোয়ান। হৃদয়ে ইখওয়ানের চিন্তা ও দর্শন লালন করেন এবং এর জন্য সর্বাত্মক প্রস্তুতিও রয়েছে তার। তিনি শরিয়াহ অনুষদে লেখাপড়া করেন। আমি তাকে বললাম, মাওলানা মাসউদ আলম নদবী 'আরবের সফরনামা'য় তার এবং তার পরিবার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তিনি আমাকে প্রফেসর সালেহ ইশমাবীর অফিসে নিয়ে যেতে এসেছেন। আমরা উভয়ে বের হলাম। রাস্তায় তার সাথে আলোচনা হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিন আন্দোলন সম্পর্কে। আলোচনায় এই আন্দোলনের

---

[৩] من العالم الى جزيرة العرب

[৪] من جزيرة العر ب الى العالم

বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ কেউ বাদ পড়েননি। তিনি শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর লেখা কয়েকটি বই আমাকে দেওয়ার জন্য নিয়ে এসেছিলেন।

আমি প্রফেসর সালেহ ইশমাবীর সাথে সাক্ষাত করলাম। আমরা উভয়ে একে অপরের সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব ছিলাম। একে অপরের সাথে এমন উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতার সাথে মুআনাকা করলাম যেন আমাদের মাঝে রয়েছে দীর্ঘদিনের বন্ধুতা।

অধ্যাপক সায়িদ রমজান

জোহরের পর আমরা অধ্যাপক সায়িদ রমজানের নিকট গেলাম। সেখানে তার সাথে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা, সেখানে তাদের অবস্থান, দাওয়াতি অভিযান এবং বিভিন্ন ইসলামি দল-উপদল নিয়েও বিশদ আলোচনা হয়। তারপর সেখানেই খানা খেয়ে আসরের নামাজ আদায় করি। মাগরিবের পর আনসারুস সুন্নাহর অফিসে যাই। সেখান থেকে এশার নামাজের পর শায়খ মুহম্মদ হামিদ ফকীর সাথে সংস্থার একটি শাখার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে 'বুলাক' যাই। অনুষ্ঠান ছিল জমকালো ও জাঁকজমকপূর্ণ। বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় চারদিক ঝলমল করছিল। যেমনটি সাধারণত আমাদের দেশে 'ঈদে মিলাদুন-নবী' উদযাপনের সময় পরিলক্ষিত হয়। উপস্থিত লোকদের মাথায় উঁচু রক্তিম তুর্কি টুপি অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রফেসর হামিদ ফকী দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। শ্রোতারা তার আলোচনায় অভিভূত হয়ে পড়ে।

২৯ জানুয়ারি ১৯৫১

আমরা আজ রুটিন অনুযায়ী ড. আহমদ আমিনের সাথে সাক্ষাত করব। তাকে কিছু উপহার দেওয়া উদ্দেশ্য। উপহারগুলো আমরা হেজাজ থেকে বিশেষভাবে তার জন্যই নিয়ে এসেছি। একটি অনারবি মুসল্লা ও একটি বৈদ্যুতিক তসবিহ। আমরা উপহার নিয়ে তার অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি আজ নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে গেছেন। আমাদের আফসোস করা ছাড়া কিছুই রইল না।

আমরা প্রফেসর রাশাদ আবদুল মুত্তালিবের সাথে দেখা করলাম। তিনি অফিসে বসে কী যেন লিখছিলেন। অত্যন্ত শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ।

আমাদের সাথে সহজেই মিশে গেলেন। আমাদের পাশেই বসলেন। লেখালেখি ও ইলমি বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে আলোচনা হয়।

আমরা ড. আমিনের বাসায় ফোন করে জানতে পারলাম, তিনি 'ফুয়াদ অ্যাকাডেমি'তে রয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা তার বাসায় গেলাম। তিনি তখনো বাড়িতে এসে পৌঁছাননি। উপহারগুলো তার পুত্রের হাতে তুলে দিলাম। তারপর আমাদের পরিচয় দিয়ে চলে এলাম।

সন্ধ্যাবেলা আল্লামা আহমদ শাকিরের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করি। আনসারুস সুন্নাহর অফিসে ফোনে আলোচনা সেরে নিই। তারা জনাব হামিদের গাড়ি চেয়ে পাঠালেন, যাতে তিনি খুব দ্রুত অফিসে আসতে পারেন। কিন্তু জনাব হামিদ অনেক বিলম্ব করে এলেন।

মুহম্মদ বিন ইবরাহিমের সাথে সাক্ষাত

প্রফেসর আহমদ শাকির শায়খ মুহম্মদ বিন ইবরাহিমে[১]র সাথে সাক্ষাত করার পরামর্শ দিলেন। তিনি এখন জিজায় অবস্থান করছেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মিসরে এসেছেন। জিজায় একটি রুম ভাড়া নিয়েছেন।

আমরা তার নিকট গেলাম। রুমে প্রবেশ করে বোঝতে পারলাম, তিনি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তার রুমটি অভিনব পদ্ধতিতে সাজানো। আমরা তাকে সালাম দিলাম। আমাদের দীনী ভাই এবং তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব শায়খ ওমর বিন হাসানের একটি চিঠিও পেশ করলাম। শায়খ মুহম্মদ অন্ধ ছিলেন। তার সাথে যারা নিয়মিত থাকেন, তাদের একজনকে চিঠিটি দিয়ে পড়ে শোনাতে বললেন। তারপর কথা শুরু করলেন। আমি তাকে ওবায়দুল্লাহ জাহেদ দারবিশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি ভারত থেকে হিজরত করে এসেছেন। নজদের লোকজন পাঁচমুখে তাঁর প্রশংসা করেন।

শায়খ মুহম্মদ আবদুল করিম দারবিশ ও শায়খ আবদুল্লাহ দারবিশেরও আলোচনা করলেন। এই দুই বুজুর্গের আলোচনা প্রসঙ্গে মাওলানা শাহ

---

[১] তিনি সৌদি আরবের সবচেয়ে বড় দীনী ও ইলমি ব্যক্তিত্ব। রাবেতায়ে আলমে ইসলামির প্রধান। মদিনা ইউনিভার্সিটির আজীবন চ্যান্সেলর ছিলেন তিনি। তিনি দীর্ঘদিন আরবের প্রধান মুফতি এবং রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শায়খ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহহাবের বংশধর। আবদুল আজিজ বিন বাজ তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্র। দীর্ঘদিন তিনি 'ইফতা ও দাওয়াহ' বিভাগের মন্ত্রীও ছিলেন।

ইসমাইল শহিদ রহ.[১] ও সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.[২] -এরও আলোচনা করলেন। এ সময় আমি জানতে পারলাম শায়খ মুহাম্মদ ইবরাহিম ও শায়খ হামিদ, দুজনের কেউই তাদের জিহাদ-আন্দোলন সম্পর্কে মোটেই অবহিত নন। ঘটনাক্রমে তখন আমার কাছে الاعلام بمن فى تاريخ الهند من الاعلام [ভারতীয় প্রতিভার সন্ধানে] কিতাবটি [এটি 'নুজহাতুল খাওয়াতির'র সারসংক্ষেপ] ছিল। আমি শাহ ইসমাইল শহিদ রহ. এর আলোচনা পড়ে শোনালাম। শায়খ কিতাবটি পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সানন্দে আমি কিতাবটি তার নিকট রেখে এলাম।

শায়খ মুহম্মদ তার দাদার ব্যাপারে অনেক কিছু জানেন। কে তার সমালোচনা করেছে আর কে তার জবাব দিয়েছে তাও তিনি জানেন। তিনি তার পূর্বপুরুষদের কিতাব এবং ওলামায়ে নজদের ব্যাপারেও বেশ স্বচ্ছ ধারণা রাখেন। আমাদের বন্ধু মাওলানা মাসউদ আলম নদবীর সাথে রিয়াদে তার সাক্ষাত হয়েছিল। শায়খ তার আলোচনা করলেন। তার সাথে আমি শায়খুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলাম। তারপর আমরা সেখান থেকে বাসায় চলে এলাম।

৩০ জানুয়ারি ১৯৫১

আজ শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। বাইরেও প্রচণ্ড শীত। তাই রুম থেকে বের হইনি। সারাদিন 'ইসলামের ইতিহাসে উত্থান-পতন'[৩] গ্রন্থের বানান সংশোধন, সংযোজন ও প্রকাশের উপযোগী করার কাজেই ব্যস্ত ছিলাম।

---

[১] মাওলনা শাহ ইসমাইল শহিদ রহ. ছিলেন ভারতবর্ষের ইসলামি সংস্কার আন্দোলন ও জিহাদের অন্যতম শীর্ষনেতা। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. এর দক্ষিণ হস্তরূপে কাজ করেন। ১৮৩১ সালের ৬ মে বালাকোটের যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি শাহাদাতের অমিয়সুধা পান করেন। তাকবিয়াতুল ঈমান, মানসাবে ইমামত, সিরাতুল মুসতাকিম, তানবিরুল আয়নায়ন তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁর সমাধি বালাকোটে অবস্থিত।

[২] সাইয়েদ আহমদ শহিদ বেরেলবী রহ. ছিলেন মুসলিম ভারতের সংগ্রামী ধর্মীয় নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনাপতি। তিনি অযোধ্যার অন্তর্গত রায় বেরেলিতে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে ভারতবর্ষ স্বাধীন করা ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। শিখরা ইংরেজ সরকারের দোসর ছিল বলে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ১৮৩১ খিস্টাব্দে বালাকোটের যুদ্ধে তিনি শহিদ হন।

[৩] المد و الجزر فى تاريخ الاسلام

শায়খ আহমদ উসমান আমাকে ফোনে জানালেন, তিনি বিকেল ৪টায় আসবেন। এবং আমাকে শায়খ আমিন আলখাত্তাবের নিকট নিয়ে যাবেন। নির্ধারিত সময়ে তিনি এলেন। তার সাথে আমরা জামইয়্যা শারইয়্যার কার্যালয়ে গেলাম। এখানে আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করি। নামাজের পর শায়খ আমিনের সাথে সাক্ষাত করলাম। তিনি আমাকে শনিবার দুপুরের খানার দাওয়াত করলেন। আমার ইচ্ছা ছিল শায়খের সাথে আমাদের দেশে দাওয়াতের যে মেহনত ও পদ্ধতি চালু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলোচনা করব। হতে পারে তিনি এর কিছু নিয়ম-নীতির সাথে একমত পোষণ করবেন। এবং একে জনগণের জন্য কল্যাণকর মনে করবেন। হেকমত ও প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো সম্পদ, যা লুক্কায়িত থাকে। মুমিন তা যেখানে পায় সেখান থেকেই সংগ্রহ করে। আমি এই সুযোগকে গনিমত হিসাবে গ্রহণ করি এবং সানন্দে তার দাওয়াত কবুল করি।

জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়

আজ আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গেলাম। আমরা ড. আবদুল হামিদ সায়িদ মিলনায়তনে প্রবেশ করলাম। মিলনায়তনে প্রবেশ করতেই এই মর্দে মুমিনের কথা স্মরণ হয়ে যায়। তিনি ছিলেন মিসরের নওজোয়ানদের পথিকৃৎ। ইসলামি আন্দোলনের রাহবার ও সিপাহসালার। আমি তার কল্যাণ ও মর্যাদা বুলন্দির দোয়া করলাম। সংস্থাটির ভবনে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এসব বিভাগ তাঁর স্মৃতির নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আজ রাতে আজহারী আলেম এবং শুব্বানুল মুসলিমিনের পরিচালক প্রফেসর আহমদ শিরবাসী[৪]র বয়ান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তখনও এসে পৌঁছাননি।

জেনারেল সালেহ হরবের সাথে সাক্ষাত

আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের মহাপরিচালক জেনারেল মুহম্মদ সালেহ হরব পাশার রুমে যাই। তিনি অসুস্থতার কারণে ভবনের একটি

---

[৪] ১৯১৮ সালে মিসরে তার জন্ম। তিনি আজহারের ফতোয়া বিভাগের প্রধান ছিলেন। ধর্ম, ইতিহাস, আরবি সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা বিশটির বেশি। ১৯৮০ সালে তার মৃত্যু হয়।

রুমে একাকী থাকেন। আমরা তাকে সালাম দিলাম। তারপর তার নিকট শায়খ মাহমুদ শাবিলের একটি পত্র পেশ করলাম। তিনি আমাদের মিসর আসার সংবাদ শুনেছিলেন। ভদ্রলোকটি উচ্চ শিক্ষিত। নৈতিকতার দিকটিও তার প্রশংসনীয়। কথাবার্তায়ও যথেষ্ট মাধুর্য ও শালীনতা রয়েছে।

সংস্থার বিভাগসমূহ

জনাব পাশার ইচ্ছা ছিল, আমরা সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখব এবং এসব বিভাগের কার্যক্রমের একটা হিসাব নিব। এ জন্য আমরা সংস্থার জনৈক সদস্যের সাথে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বিভাগ দেখি। ক্লাবের সদস্যদের শরীরচর্চা ও কুস্তি-খেলায় মত্ত দেখতে পাই। তাদের ব্যায়ামের স্পৃহা এবং শরীর গঠনের প্রতি গুরুত্ব আমার ভাল লেগেছে। তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি দেখে আমার পাঞ্জাবের নওজোয়ানদের কথা স্মরণ হয়।

আমরা সংস্থার বিভিন্ন গ্রুপের ফটোসেশনের কাছ দিয়েও অতিক্রম করি। সেখানে তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অবস্থা দেখানো হয়েছে। মনে হল আমরা পশ্চিমা পদ্ধতিতে পরিচালিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করছি কিংবা আমরা শরীরচর্চার একটি উন্নত ক্লাবে রয়েছি।

আমরা সংস্থার লাইব্রেরিতেও যাই। সেখানে রয়েছে বইপুস্তকের এক বিশাল সংগ্রহ। গল্প-উপন্যাসের বইও কম নেই। অশ্লীল উপন্যাসও চোখে পড়ার মত। আসলে এটি একটি ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাধি সব দেশেই ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাম-গঞ্জও এসব অশ্লীল বইয়ের ছড়াছড়ি থেকে মুক্ত নয়।

আনসারুস সুন্নাহয় আমার আলোচনা

আজ রাতে আনসারুস সুন্নাহয় আমার আলোচনা ছিল। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছে যাই। বহু লোক আমাদের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল। সেখানে আমরা এশার নামাজ আদায় করি। তারপর আমি মিলনায়তনে প্রবেশ করি। সেখানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নওজোয়ান, সংস্থার সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের একটি বিশাল জামাত দৃষ্টিগোচর হয়। সংস্থার প্রধান শায়খ মুহম্মদ হামিদ ফকী সামনে এগিয়ে এসে ভূমিকাস্বরূপ কয়েক মিনিট আলোচনা করেন। তারপর আমাকে আলোচন করতে অনুরোধ করেন। আমি আলোচনা শুরু করি। আলোচনায় দাওয়াতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলি। এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আদব

ও শর্তসমূহ তাদের সামনে তুলে ধরি। আমি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে বলি, বহু মানুষ এমন রয়েছে, যারা অন্য কোনো কাজ করতে অক্ষম, তারা দাওয়াতের কাজকে সবচেয়ে সহজ কাজ মনে করে জীবনের প্রধানতম কাজ বানিয়ে নেয়। অথচ এই কাজ অনেক ব্যাপক, গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচেয়ে জটিল। এই কাজ কোনো রাজনীতি, অর্থনীতি বা কোনো মতাদর্শের প্রতি দাওয়াতের চেয়েও মর্যাদাপূর্ণ। সমাজে বিপ্লব ঘটানো, তাকে নতুন ছাঁচে সাজানো কিংবা কোনো সনাতন মতাদর্শকে পরিবর্তন করে নতুন মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা উন্নত নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জন করা ছাড়া অসম্ভব। এদিকে আহ্বানকারীদের একনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে থাকে। কিন্তু তা আহ্বান করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধক মনে করা হয় না। এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হল দাওয়াত ইলাল্লাহ। এর জন্য প্রয়োজন মহৎ চরিত্র, সর্বোত্তম নৈতিকতা এবং উন্নত মানবীয় গুণাবলীর। প্রয়োজন মজবুত ঈমান, সুদৃঢ় বিশ্বাস, অনুপম আত্মত্যাগ, ঈর্ষণীয় বীরত্ব, সুস্থ-মস্তিষ্ক, সঠিক জ্ঞান, একাগ্রচিত্ততা ও জিকিরে তরতাজা জবানের। ইবাদতে একনিষ্ঠতা, দোয়ায় রোনাজারি, দরবারে এলাহিতে মস্তক অবনত করার গুণ থাকাও আবশ্যক। শুধু তাবলিগের জন্যই না, তালিম ও তাযকিয়ার জন্যও প্রয়োজন এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের। এই সমস্ত গুণ সেই মহান নবীর প্রতিনিধিত্ব করে, যার উপর অর্পিত দায়িত্ব চারটি। এক. কিতাবের তেলাওয়াত। দুই. তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি। তিন. কিতাবের তালিম এবং চার. হেকমতের তালিম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ اٰيَاتِه وَيُزَكِّيْهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ

ভারতবর্ষে দীনের দায়ী ও মুজাহিদ

তারপর আমি ইসলামের প্রথম যুগের কয়েকজন দায়ীর জীবন্ত দৃষ্টান্ত উপস্থান করি। ভারতবর্ষের মুজাহিদদের ঘটনাবলীও বর্ণনা করি। যেমন, মাওলানা ইয়াহয়া আলি আজিমাবাদী, মাওলানা মুহম্মদ জাফর আহমদ থানেশ্বরী। এ ছাড়া ওই সকল লোকের কাহিনীও তুলে ধরি, যারা আল্লাহ তায়ালার এই বাণীর লক্ষ্য,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّنْ قَضٰى نَحْبَه وَمِنْهُم مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا

'মুমিনদের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর সাথে কৃত-অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছে। কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে এবং কেউ কেউ অপেক্ষা করছে। তারা নিজেদের অঙ্গীকার পরিবর্তন করেনি'। [সুরা আহযাব, ২৩ আয়াত]

তাদের সামনে সেসব ব্যক্তির দৃশ্যও তুলে ধরি যাদেরকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হলে আনন্দের সাথে সেই সংবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কারাগারে থাকা অবস্থায় এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

فلست أبالى اقتل مسلما * على اى شق كان لله مصرعى

وذلك فى ذات الاله وان يشأ * يبارك على اوصال شلو ممزع

'আমাকে মুসলমান অবস্থায় হত্যা করা হবে- এতে আমার কোনো পরোয়া নেই যে, আমি কোন পাশে পড়ব। আমার এই নিহত হওয়া আল্লাহর জন্য; তিনি ইচ্ছা করলে আমার অঙ্গের প্রতিটি টুকরায় বরকত দিতে পারেন।'

মাওলানা ইয়াহয়া আলি আজিমাবাদী জেলের জল্লাদদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, যারা তাঁর মাথার পাশে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে,

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِه اِلَّا اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِن سُلْطَان اِن الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰه اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰـكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

'আমার কারাগারের বন্ধুরা, কয়েকজন খোদা উত্তম নাকি এক-অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী আল্লাহ? তোমরা শুধুই কতক নামের উপাসনা কর, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষেরা নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তায়ালা এর জন্য কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহ

তায়ালার। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত না করার। এটাই সঠিক দীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বোঝে না'।

[সুরা ইউসুফ, ৩৯-৪০ আয়াত]

তাঁর এই আলোচনায় অমুসলিমরাও প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। তারপর আমি বললাম, তাঁর এই ফাঁসির রায় কীভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে পরিণত হল। যখন তাঁর ফাঁসির রায় ঘোষণা করা হয় তখন তিনি শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করার আগাম সংবাদে আনন্দে আটখানা হয়ে পড়েন। ইংরেজ বিচারক তাঁর এই আনন্দ পছন্দ করল না। সে চাইল তাঁর শাহাদাতের বাসনা পূর্ণ না হোক। তাই ফাঁসির রায় পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল।

বস্তুবাদ ও ইসলামি দাওয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

তারপর আমাদের দেশের দাওয়াতের মেহনত ও পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার মসজিদে সাপ্তাহিক[১] ইজতেমা এবং সর্বস্তরের লোকজনের নিজ খরচায় শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়া এবং জনসাধারণের প্রতি দাওয়াতের উত্তম ফললাভের একটি হিসাব তাদের সামনে পেশ করলাম। এরপর বললাম, বর্তমানে সকল দাওয়াত নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। চেতনা হারিয়ে গেছে। কিন্তু বস্তুবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তার প্রচারণাও চলছে জোরেশোরে। এটাই এখন আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমাদের জন্য প্রয়োজন নিজেদের শক্তি মজবুত করা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনকে আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলা, তা হলেই আমরা সক্ষম হব বস্তুবাদের রক্তচক্ষু উল্টে দিতে। বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে। জামানার উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে। সক্ষম হব মানুষের হৃদয়ে আচ্ছন্ন বস্তুবাদের পর্দা ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে। আমরা প্রভাব বিস্তারকারী দীনী ব্যক্তিত্ব এবং আকর্ষণ সৃষ্টিকারী রুহানি শক্তির বলেই বস্তুবাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারব।

---

[১] তৎকালীন তাবলিগের সাপ্তাহিক ইজতেমা দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার প্রশস্ত মসজিদে অনুষ্ঠিত হত। এখানে শহর ও গ্রাম থেকে বহু লোকজন বিছানাপত্র ও খাবারদাবার নিয়ে এসে শবগুজারি করত। পরবর্তী সময়ে তা রাইবেন্ডে স্থানান্তর হয়ে যায়।

শ্রোতাদের চেহারা দেখে বোঝতে পারলাম আমার আলোচনা তাদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আর এটি সম্ভব হয়েছে মুজাহিদদের প্রভাব সৃষ্টিকারী ওইসব ঘটনা দ্বারা, যা আমি ইতঃপূর্বে বর্ণনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে ওইসব ঘটনা দ্বারা এমন প্রভাব সৃষ্টি হয়, যা অন্য কিছু দ্বারা হয় না। আলোচনার পর শায়খ মুহম্মদ হামিদ আলোচকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। তারপর বিনয় প্রকাশ করে বললেন, এই আলোচনা দ্বারা সত্যিই আমার অনেক ফায়দা হয়েছে।

ড. আহমদ আমিনের সঙ্গে মতবিনিময়

৩১ জানুয়ারি ১৯৫১

গতরাতে প্রফেসর মুহম্মদ রাশাদ আবদুল মুত্তালিব আমাদের সাথে সাক্ষাত করে বলেন ড. আহমদ আমিন আমাদের সাথে দেখা করতে চান। তাই সকালে আমরা 'সংস্কৃতি অ্যাকাডেমি'তে [এদারায়ে সাকাফিয়া] যাই। ড. আমিন আমাদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে দেখা করেন। আমাদেরকে কিছু কিতাবও উপহার দেন। তার মধ্যে 'আলইকদুল ফরিদ'ও ছিল। কিতাবটি ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। এর সংশোধন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ড. আমিনও অবদান রেখেছেন। সরকারি গবেষণা ও গ্রন্থকেন্দ্র কিতাবটি প্রকাশ করেছে। তাঁর 'আত্মকথা'রও একটি কপি আমাকে দেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে একটি ফাউন্টেনপেনও উপহার দেন। আমি তার শোকরিয়া আদায় করে উপহারগুলো সানন্দে গ্রহণ করি।

তারপর আমরা আলোচনার টেবিলে বসি। প্রথমেই আমি তাকে বললাম, আমার একটি আশা, আপনি কুরআনের অধ্যায়ন ও পাঠদানে আপনার মূল্যবান সময় লাগাবেন। তিনি বললেন, 'ইসলামের অতীত-বর্তমান' প্রস্তুত করার পিছনে আমার সময় যাচ্ছে। অচিরেই এর ছাপার কাজ সমাপ্ত হবে। আমি বললাম, আমার আরেকটি আকাঙ্ক্ষা, আপনার কলম থেকে এমন কিছু যাতে প্রকাশ না পায়, যা স্বাধীন মন-মানসিকতার অধিকারী নওজোয়ানদের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করবে। তিনি বললেন, এ কি কোনো বাস্তব ঘটনা বর্ণনা করছেন নাকি সতর্ক করা উদ্দেশ্য? আমি বললাম, এটা আমার তামান্না ও দরখাস্ত। তিনি বললেন, যাচাই-বাছাই করে স্পষ্টভাবে বলা উচিত। আমি বললাম, আপনার কথা ঠিক। তবে বর্তমান মানুষ মন্দ জিনিস খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে। আর

কল্যাণকর বিষয় হাতছাড়া করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না। তিনি আমার কথা স্বীকার করলেন।

ড. আমিনের গ্রন্থ সম্পর্কে আমার অভিমত

আমি বললাম, আপনার 'নয়া জামানার নেতৃপুরুষ' গ্রন্থটি আমি হেজাজে থাকতে অধ্যায়ন করেছি। গ্রন্থটি আমার ভালো লেগেছে। আমি এথেকে অনেক কিছু জেনেছিও। বিশেষ করে আবদুর রহমান কাওয়াকিবী, খায়রুদ্দীন পাশা তুনেসী ও মাদহাত পাশা সম্পর্কে। বিশিষ্ট আলেম শায়খ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহহাব সম্পর্কেও বেশ কিছু জানা হয়েছে। আমি শায়খ মুহম্মদের খান্দানের কয়েকজন আলেমকে ওই অংশ পড়েও শুনিয়েছি। তারা একে সত্যায়ন করেছেন। আনন্দে তারা বলে উঠেছেন, আলহামদু লিল্লাহ। তবে কেউ কেউ শায়খের বাগদাদ সফরের ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে সে ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। আমি বললাম, এটি শায়খ ওমরেরও[১] অভিমত। ড. আমিন বললেন, আমি ইউরোপিয়ান লেখকদের বই দেখেছি, যা আমার লেখাকে সমর্থন করে। আমি বললাম, সাইয়েদ আমির আলিকে আপনি যে স্তরে রেখেছেন, তিনি ইসলাহ ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মোটেই সেই স্তরের না। তিনি ওই স্তরের লেখকদের একজন, যারা ইসলামের সৌন্দর্যকে ইংরেজিভাষায় তুলে ধরেছেন। এবং এই ভাষায় কিছু সৃজনশীল বই লিখেছেন।

অনুরূপ স্যার সাইয়েদ আহমদ খান[২]ও ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এত উঁচু স্তরের কেউ না যে স্থানে আপনি তাকে পৌঁছে দিয়েছেন। তার মেধার প্রখরতা তার ইলম থেকেও বেশি ছিল। ফলে তার থেকে এমন অনেক পদচ্যুতি ঘটেছে, যার দ্বারা মুসলমানেরাই ক্ষতিগ্রস্ত

---

[১] শায়খ ওমর বিন হাসান শায়খ মুহম্মদ বিন আবদুল ওহহাব রহ. এর বংশের একজন উঁচুমানের আলেম। দীর্ঘদিন তিনি রিয়াদের 'আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার সংস্থা'র পদস্থ অফিসার ছিলেন।

২ ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে তার জন্ম। মুসলমানদের মাঝে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধনের চিন্ত্মা পোষণ করতেন তিনি। আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটিশ সরকার তাঁর কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে 'স্যার' উপাধিত ভূষিত করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

হয়েছে। ভারতবর্ষে এমন বহু ব্যক্তিত্ব ছিলেন যাদের আলোচনা এই গ্রন্থে আসতে পারত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। আহমদ আমিন জিজ্ঞেস করলেন, তারা কারা? আমি বললাম, সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ.। তিনি বললেন, আফসোস, তাদের ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। আমি বললাম, আপনি সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. সম্পর্কে আপনার 'হেদায়েতপ্রাপ্ত কাফেলা' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। তবে তিনি সেখানেও পশ্চিমা লেখকদের বই থেকে ধারণা নিয়েছেন, যেসব বই মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনীতে ভরপুর এবং এ ব্যাপারে তাদের জ্ঞান অতি সামান্য। তারপর আমি বললাম, কবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল[১] এমন ব্যক্তিত্ব, যার আলোচনাও এই গ্রন্থে আসার উপযুক্ত। তিনি বললেন, তাঁর ব্যাপারে আমার এই পরিমাণ ধারণা ছিল না যে, তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখব। আমাদের বন্ধু আবদুল ওহহাব আজ্জাম তাঁর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। আমি কায়রোতে তার সাথে দেখা করেছি। তিনি খুব বড় মনের অধিকারী। আমি তাকে বললাম, কবি আল্লামা ইকবালের চিন্তা ও কবিতার উৎস ছিল তাঁর হৃদয়। আমি তার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছি, যা সৌদি রেডিও থেকে সম্প্রচার করা হয়েছে।

আজহার ও ফুয়াদ

এরপর আমরা অন্য বিষয়ে আলোচনা করি। ড. আমিন বললেন, অতি সম্প্রতি হল্যান্ডের একজন ছাত্র আমার সাথে সাক্ষাত করে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আজহার থেকে আপনি কি কিছুর আশা করেন? আমি বললাম, না। কারণ আজহার পুরনো ধারার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। অথচ যুবকদের মাঝে এখন চরম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কাজ করছে। পাশাপাশি আধুনিকতার জোয়ারও বয়ে চলছে হৃদয়-মনে। দ্বিতীয়ত শাহিমহল আজহারের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তারা নিজেরা কিছু করেও না, কাউকে

---

[১] কবি আল্লামা ইকবাল ছিলেন বিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাগরণের প্রধান তূর্যবাদক। ১৯০৮ সালে লন্ডন থেকে তিনি পিএইচ,ডি ডিগ্রি লাভ করার সাথে সাথে ব্যারিস্টারি পাস করেন। উপমহাদেশের মুসলমানদের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কবি ইকবাল সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে অলইন্ডিয়া মুসলিম লিগ অধিবেশনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। তার জন্ম ১৮৭৩ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শিয়ালকোট শহরে। ২১ এপ্রিল ১৯৩৮ সালে তিনি ইনতেকাল করেন। লাহোর জামে মসজিদ চত্বরে তিনি চির নিদ্রায় শায়িত।

করতেও দেয় না। তারপর সে বলল, ফুয়াদ ইউনিভার্সিটি[২] থেকে কি কিছু আশা করেন? আমি বললাম, না। সে প্রশ্ন করল, কেন? বললাম, এটি একটি পশ্চিমি ধারার বিদ্যাপীঠ।

রাজনীতিকে ইসলাম থেকে পৃথকীকরণ

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শায়খ আলি আবদুর রাজ্জাক'র 'ইসলাম ও বিচারব্যবস্থা'[৩] গ্রন্থের মতামতের সঙ্গে একমত? তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলেন। তারপর বললেন, শায়খ আলি আবদুর রাজ্জাক মনে করেন ইসলাম একটি রুহানি পয়গামের নাম। রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আমার ধারণা ও বিশ্বাস এর ব্যতিক্রম। সমাজবদ্ধ জীবনের সাথে ইসলামের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ইত্যাদির মাসায়েলের মূলনীতিও ইসলামে রয়েছে।

প্রফেসর আলি আবদুর রাজ্জাকের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি গবেষণাকে রাজনীতি ও সামাজিক সমস্যা থেকে পৃথক রাখা। এই উদ্দেশ্য কেবল ইজতিহাদের দরজা উন্মুক্ত রাখার দ্বারাই অর্জিত হতে পারে। দীনকে রাজনীতি থেকে পৃথক করার মোটেই প্রয়োজন নেই।

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার মাঝে সমন্বয় সাধন

আমি হেজাজের বিভিন্ন জায়গায় বলেছি, মুসলমান কি আধুনিক সভ্যতা ও ইসলামের মাঝে সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে সফল হবে অথচ স্বভাবতই আধুনিক সভ্যতা ইসলামের ক্ষতি করে চলেছে! এটা ওই সকল ব্যক্তির দুর্বলতার কারণে হচ্ছে যারা দীনের কর্ণধার।

ড. আমিনের দৃষ্টিতে ব্যর্থতার কারণ ও তার প্রতিকার

ড. আমিন বললেন, এই ব্যর্থতার দুটি কারণ। প্রথমত মুসলিমবিশ্বে এমন ওলামায়ে কেরামের সংখ্যা একেবারেই কম, যারা শরিয়তের লক্ষ্য ও

---

[২] ফুয়াদ ইউনিভার্সিটিকে পরবর্তী সময়ে কায়রো ইউনিভার্সিটি নামে নামকরণ করা হয়। এটি মিসরের সবচাইতে বড় বিশ্ববিদ্যালয়।

[৩] الاسلام واصول الحكم

উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং যারা পশ্চিমা সভ্যতাকে ইসলামের সাথে পর্যালোচনা করে ভালো-মন্দ বিচার করবেন। দ্বিতীয় কারণ যা আপনি আপনার 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক সভ্যতার ব্যাপারে মুসলমানদের অনুভূতিশক্তি একেবারেই কমজোর। এর প্রতিকার হল এ সম্পর্কে এমন সব আলেমকে জিজ্ঞাসা করা, যাদের দীন-দুনিয়া উভয় সম্পর্কে জ্ঞান রয়েছে। তারপর মুসলমানদের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল করা যে, পশ্চিমা সভ্যতা পুরোটাই কল্যাণকর বা পুরোটাই মন্দ এমন নয়। বরং এর মধ্যে দুটোই রয়েছে। কিছু বিষয় রয়েছে প্রশংসনীয়। আবার কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা ঘৃণা উদ্রেককারী।

এখান থেকে আমাদের আলোচনার বিষয় পাল্টে যায়। এরই মধ্যে ড. আমিন বললেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি আদব ও শিষ্টাচারের তুলনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরই বেশি। এর বিপরীত হল প্রাচ্য সভ্যতা। সে আদব ও শিষ্টাচারে, নীতি ও নৈতিকতায় উন্নতি লাভ করেছে বটে, কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে বহুদূর পিছিয়ে আছে।

'দুহাল ইসলাম' ও মুতাজিলা সম্প্রদায়

আমি বললাম, আপনার গ্রন্থ 'দুহাল ইসলাম'[১] সম্পর্কে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথম কথা হল আপনি মুতাজিলা[২]দেরকে অনেক উপরে উঠিয়ে ফেলেছেন। তাদের ব্যাপারে আমার অভিমত হল, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা ছিল শিশু বাচ্চার ন্যায়। তাদের কোনো রায়ই পরিপক্ব ছিল না। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তবে তারা মুহাদ্দিসদের চাইতে প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী ছিল। তাদের উপস্থিতি ছিল ইসলামের জন্য কল্যাণকর। কিন্তু রাজনীতিতে তাদের দখলদারিত্ব ঠিক হয়নি। আমি বললাম, তারা এটা করে নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। যেমনটি আপনার বইয়ে উল্লেখ

[১] 'দুহাল ইসলাম' নামেই গ্রন্থটি মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ বাঙলা অনুবাদ করেছেন।

[২] মুতাজিলা মতবাদ অনুসারীদেরকে মুতাজিলী বলা হয়। এটা তাদের অন্যদের দেওয়া নাম। আল্লাহর আদল-ইনসাফ ও তাওহিদ সম্পর্কে তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা নিজেদেরই শুধু আদল ও তাওহিদপন্থী মনে করত। বিস্তারিত জানতে 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' বইটি দেখুন।

করেছেন। তারপর তিনি বললেন, তাদের কিতাবগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। ঘটনাক্রমে কাজি আবদুল জাব্বার মুতাজিলীর একটি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি আমার হাতে এসেছে। অচিরেই আমি গ্রন্থটি প্রকাশ করব। এর মাধ্যমে আমরা দীনের ব্যাপারে তাদের অনেক অভিমত জানতে পারব।

তারপর আমরা বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাদেরকে আগামীকাল 'নীল হোটেলে' দুপুরের খানা খেতে দাওয়াত দিলেন। আমরা তার দাওয়াত সাদরে গ্রহণ করে নিই এবং 'সংস্কৃতি অ্যাকাডেমি'তে গিয়ে তার সাথে দেখা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসি।

শায়খ আহমদ শাকের

আসরের সময় আমরা প্রসিদ্ধ লেখক, সাবেক বিচারপতি আহমদ মুহম্মদ শাকেরের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে বের হই। শায়খ আহমদ উসমান এবং তাঁর বন্ধু আবদুর রহমান আফেন্দীর সাথে নয়া মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করি। এটি একটি আধুনিক ও উন্নত শহর। জানতে পারলাম কয়েক বছর পূর্বে শহরটি আবাদ হয়েছে। শহরে পৌঁছে আমরা 'জামইয়্যা শারইয়্যা'র মসজিদে নামাজ আদায় করি। তারপর আহমদ শাকেরের বাড়ির দিকে রওনা হই। তার বাড়ি মন্ত্রিদের বাড়ির চেয়ে বেশি জাঁকজমকপূর্ণ। সাধারণত আলেমদের বাড়ি এমন হয় না। আসতাগফিরুল্লাহ, আমি এখনও ভারতেই রয়ে গেছি। সেখান থেকে কবে বের হব! মিসরের আলেমদের শান-শওকত পাক-ভারতের আলেমদের থেকে ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যেমন ধন-সম্পদ দান করেছেন, তেমনি সুখময় জীবনও দান করেছেন। দেখলে আব্বাসীয় যুগের বিচারকদের কথা স্মরণ হয়।

আধুনিক সাজে সাজানো একটি রুমে আমরা তার সাথে দেখা করি। তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। কিছুক্ষণ আলোচনা হয় আজহার সম্পর্কে। আবার কিছুক্ষণ আলাপ হয় মিসরের ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থা সম্পর্কে। কথাবার্তায় বোঝতে পারলাম, শায়খ শাকেরের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। অত্যধিক অধ্যায়ন ও জীবনের অভিজ্ঞতা তার কথাবার্তা ও ফিকহি মতবিরোধের ক্ষেত্রে এনে দিয়েছে ব্যাপকতা। সৃষ্টি করেছে গভীরতা। আমি তাকে কিছু পুস্তিকা উপহার দিলাম। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' সম্পর্কে আলোচনা করি। তিনি বললেন, আপনার বইটি

বাজারে আসার সাথে সাথেই আমি সংগ্রহ করেছি। বইটি অফিসে সবসময় আমার সামনেই থাকে। তবে এখনো পড়া শেষ করতে পারিনি। আমি আমার আব্বাজানের লেখা 'ভারতবর্ষে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ'[১] গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আলোচনা করি। আমি তাকে বলি, আমার আশা যে, আপনি বইটি প্রকাশের ব্যাপারে কোনো লাইব্রেরির সাথে আলাপ করবেন। তিনি ক্ষমা চেয়ে বললেন, প্রকাশকদের উদ্দেশ্য ব্যবসায়ই বেশি হয়ে থাকে। তাদের কারো ব্যাপারে এই বিশ্বাস নেই যে, তারা ইলমি খেদমতের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু প্রকাশ করবে। তবে আমি বইটি দেখব। তারপর আপনার সাথে আলাপ করব।

আমরা বিদায় চাইলাম। কারণ মাগরিবের পর আজহারের 'শরিয়াহ অনুষদে'র ছাত্রদের সামনে আলোচনা করার সময় পূর্বেই নির্ধারিত ছিল।

ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশে

মাগরিবের পর আমরা 'শিবরা' যাই। এখানে তরুণ ও যুবকদের এক বিশাল জামাত দৃষ্টিগোচর হয়। আজহারের উসুলুদ-দীন অনুষদ, প্রকৌশল অনুষদ এবং ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স অনুষদের ছাত্ররা ছিল। যুবকরা আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, আপনি রাতভর আলোচনা করলেও আমরা বিরক্ত হব না। আমি তাদেরকে দীন ও দীনী আন্দোলন সম্পর্কে জানাশোনার ব্যাপারে আগ্রহী দেখতে পেলাম।

উসুলুদ্দীন অনুষদের মেধাবী ছাত্র, ইউসুফ কারজাবী স্টেজে এসে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলেন। তার হৃদয়-মন ছিল ইখলাস ও ঈমানি জজবায় পরিপূর্ণ। পরিশেষে আজ রাতের আলোচককে জানালেন খোশ আমদেদ। তারপর তাকে সাথিদের সামনে পেশ করলেন।

দুনিয়ার দুই রূপ

আমি আলোচনা শুরু করলাম। আলোচনার শুরুতে বললাম, এই পৃথিবীর দুটি অবয়ব রয়েছে। একটি এই জগতের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্কিত। এখানে আমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই। এ সম্পর্কে আমাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসাও করা হবে না। দ্বিতীয়টি হল

---

[১] 'الثقافة الاسلامية في الهند'

দুনিয়ার সৃষ্টিগত রূপ। আল্লাহ তায়ালা তার ইচ্ছা অনুযায়ী এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞাত। সকল কলা-কৌশল তাঁরই। তিনিই প্রতিটি জিনিসকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা মুকাল্লাফ [দায়িত্বপ্রাপ্ত] হলাম তাতে চিন্তা-ভাবনা করার এবং সৃষ্টির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার পরিচয় লাভ করার, যেমনটি আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আলকুরআনে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا

'যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে আর চিন্তা করে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির ব্যাপারে। [তারপর] বলে, হে আমাদের প্রভু, আপনি এগুলো এমনিতেই সৃষ্টি করেননি।' [সুরা আলে ইমরান, ১৯১ আয়াত]

কিন্তু আমরা এ জগতের সৃষ্টির মুকাল্লাফ না। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না যে, আকাশের তারকারাজিকে এভাবে বিস্তৃতআকারে কেন রাখা হয়েছে? পুব আকাশ থেকে সূর্য কেন উদিত হয়? আবার পশ্চিম আকাশে কেন অস্ত যায়? এখানে পর্বতমালা কেন দেওয়া হয়নি? ওখানে কেন দেওয়া হয়েছে? এজাতীয় বহুপ্রশ্ন।

আমরা দ্বিতীয় অবস্থার মুকাল্লাফ। এ সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিতও হব। এই জগতে সেসব আহকাম, যা আল্লাহ তৈরি করেছেন এবং ওই সমস্ত নীতিমালা, যাকে কানুনে এলাহি বলা হয়, তা অত্যন্ত পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত করে আমাদের পথ চলার জন্য পাঠিয়েছেন, তিনি আমাদেরকে এই জিম্মাদারি আদায়ের মুকাল্লাফ বানিয়েছেন। আমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে সেই কানুন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছেন। إِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيْفَةً 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।' [সুরা বাকারা, ৩০ আয়াত]। নবীগণ একের পর এক পৃথিবীতে আগমন করেছেন। তারা সেই কানুনে এলাহিকে সুবিন্যস্তভাবে সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করেছেন। মানবজীবনকে আল্লাহ তায়ালার পছন্দ অনুযায়ী গড়ে তুলেছেন। তাদের প্রত্যেকেই মানুষের সংশোধন ও আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। যখন বখাটে লোকেরা আল্লাহ তায়ালার বিধান উল্টে দিতে চাইল তখন তারা

বললেন, لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا আল্লাহর জমিনে সংশোধনের পর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। [সুরা আ'রাফ, ৮৫ আয়াত]

যখন কোনো গোত্র, দল বা জাতি কানুনে এলাহিতে আঘাত হানার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, আল্লাহ তায়ালা তাদের শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত এই নেজাম পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখা জরুরি। মানবরচিত আইনের চাইতে আল্লাহর আইনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অনেক বেশি। যারা এর বিরোধিতা করেছে, তারা পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, তাদের শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা জগতের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য।' [সুরা আনআম, ৪৪ আয়াত]

তবে মাঝেমধ্যে কেউ কেউ তাদের মনগড়া মতাদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের পাকড়াও করেন না। ক্ষণিকের জন্য সুযোগ দেন। তার মূল কারণ হল আল্লাহ তায়ালা এর মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। তাদের মাঝে বাছাই করেন, কে আল্লাহর নেজাম অনুযায়ী চলে আর কে মনগড়া নেজামের অনুসরণ করে। কুরআনুল করিমে ইরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلَآئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ اٰتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّه لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'তিনিই জমিনের মধ্যে তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন, তিনি যা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে দ্রুত। আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।' [সুরা আনআম, ১৬৫ আয়াত]

এখন পশ্চিমি দর্শনের যুগ

একসময় পৃথিবীতে রোমান ও গ্রিক-দর্শনের যুগ ছিল। তারপর গৌরবময় ইসলামি দীন ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামি যুগের পর আসে

ইউরোপীয়দের যুগ। এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতাদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের সকল ভালো গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাঠে নামে। ব্যয় করে এর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত। বর্তমানে পশ্চিমি দর্শনের যুগ চলছে। তারা নিজেদের সকল নৈপুণ্যের তীর একের পর এক ছুঁড়ে মেরে তূনীর খালি করে ফেলছে। নিজের ভালো থেকে আরও ভালো যোগ্যতা ও দক্ষতা নিয়ে ময়দানে ঝাপিয়ে পড়েছে। অপর দিকে কাজ ও চিন্তার ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরি স্বাধীন। বিভিন্ন উপায়-উপকরণ ও শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়েও তাদের প্রস্তুতি রয়েছে প্রচুর। ফলে তারা পৃথিবীর নেজাম বিগড়িয়ে রেখেছে।

হেরেমের সেই হাত পারবে পৃথিবীর মোড় ঘোরাতে

এ কথা আজ দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, এই পৃথিবীর পুনর্গঠন ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করতে সেসকল ব্যক্তিই পারবে, যাদের হাত হেরেম শরিফ নির্মাণে অবদান রেখেছে। সেই জাতি এর রূপ বদলে দিতে পারবে, যারা হেরেমের রক্ষক। এবং হেরেম যাদের কেবলা। এখন মূলত সজ্ঘাত ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে। সজ্ঘাত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ইসলামি দর্শনের মাঝে। এই যুদ্ধে, এই সজ্ঘাতে মুসলিম যুবকদের শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে। বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

বাস্তব কথা হল এই আন্দোলন ও দাওয়াত সাহাবায়ে কেরামের বাহুবলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করে থাকে সাহাবায়ে কেরাম, যাদের কোরবানিতে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে, যাদের মাধ্যমে ইসলাম পূর্ণতায় পৌঁছেছে, তারা ছিলেন দুর্বল প্রকৃতির, সুস্থ জীবনাচার থেকে বিচ্ছিন্ন। বিষয়টি এমন নয় যে, সামাজিক জীবনাচার তাদেরকে সমাজ থেকে পৃথক করে দিয়েছে এবং তারপর তারা ইসলামের দিকে ঝুকেছেন। তারা বরং জীবনাচারের ময়দানে ছিলেন বাহাদুর। সমাজ-জীবনে তারা ছিলেন মজবুত স্তম্ভ। এই জন্য কোরাইশ সম্প্রদায় যখন যুবসমাজকে ইসলামের প্রতি ধাবিত হতে দেখল তখন তারা বলে উঠল, إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ‘নিশ্চয় এটা এমন এক বিষয় যার পিছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে।’ [সুরা সোয়াদ, ৬ আয়াত]

মুজাহিদীনের বীরত্বের কয়েকটি উপমা

আমি তাদের সামনে সেসব নওজোয়ান মুজাহিদের আলোচনা করলাম যারা নিজেদের পুরো জীবন ও যোগ্যতাকে ব্যয় করেছে কমিউনিজমের প্রচার ও প্রসারের কাজে। ত্যাগ করেছে নিজের সকল আরাম-আয়েশ। তাদের মধ্য থেকে এক যুবকের ঘটনা বললাম। তার যেমন ছিল ধন-সম্পদ, তেমন ছিল সম্মান-মর্যাদা। কিন্তু সে ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দেয়। তার চাকুরি থেকে ইস্তফা দেয়। তারপর সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কমিউনিজমের সংবাদপত্র বিলি করতে থাকে এবং লোকজনকে উচ্চস্বরে দাওয়াত দিতে থাকে। অনেক সময় তার প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করত, কিন্তু এতে সে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করত না।

আমি বললাম, জাপানি যুবকরা নিজেদের মাতৃভূমি ও মতাদর্শের ব্যাপারে কি কিছুই করেনি?

তারপর তাদের সামনে ওইসকল যুবকের কোরবানি, আত্মত্যাগ ও বাহাদুরি তুলে ধরলাম, যারা সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. এর আন্দোলনে শরিক হয়েছেন, যারা ভারতের দক্ষিণে আফগান-সীমান্তেও তার সাথে ছিলেন, যারা শেষ সময় পর্যন্ত তাঁর আঁচল ধরে রেখেছেন এবং আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। আমি তাদের মধ্য থেকে সাইয়েদ মুসার ঘটনা উল্লেখ করি। তিনি আঠারো বছর বয়সে মায়ারের যুদ্ধে আহত হন। তার মাথার রক্তে চোখ ও চেহারা রক্তিম হয়ে যায়। কিন্তু তখনও তার ঠোঁট নড়ছিল। জবানে চলছিল আল্লাহর জিকির। সাইয়েদ আবু মুহম্মদ'র ঘটনাও তাদেরকে শোনাই।

জনাব ইউসুফ কারজাবী, মাওলানা ইয়াহয়া আলি আজিমাবাদী রহ. ও মাওলানা জাফর আহমদ থানেশ্বরী রহ. এর ঘটনা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি এই দুই বুজুর্গ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করলাম। আমি বললাম, দীন ও নৈতিক উন্নতির প্রয়োজন। প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও আত্মশুদ্ধির। কেননা কোনো ইসলামি রাষ্ট্র সঠিক জ্ঞান, নৈতিক উন্নতি ও আত্মিক পরিশুদ্ধি ব্যতীত স্থায়ী হয় না। সঠিক জ্ঞান, নৈতিক উন্নতি ও আত্মিক পরিশুদ্ধির প্রভাবের পরিধি হয় ব্যাপক ও বহুদূর বিস্তৃত।

প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করি। উপস্থিত সুধিমণ্ডলী পাক-ভারতের দাওয়াতি আন্দোলনের পদ্ধতি বিস্তারিত জানতে চান। আমি তাদের সামনে তার আলোচনা করি এবং সেখানকার দাওয়াতের পদ্ধতির বিশ্লেষণও করি। তারা আমার আলোচনায় অত্যন্ত আনন্দিত হন। তাদের মধ্যে অনেকেই আমার বই 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' অধ্যয়ন করেছেন।

অনেকেই আমাকে এখানে রাত যাপন করতে অনুরোধ জানান। আমি ওজর পেশ করি এবং অন্য একদিন তাদের সাথে রাত্রিযাপনের প্রতিশ্রুতি দিই। কারণ আমরা সেদিন অনেক ক্লান্ত ছিলাম। বাসায় পৌঁছুতে একটু বিলম্ব হয়ে যায়।

ড. আমিন : তাসাউফ ও যোগসাধনা

১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ সকালবেলা আমার বই 'বিশ্ব ও আরব উপদ্বীপ'[১] গ্রন্থের ভূমিকা লেখি। তারপর ড. আহমদ আমিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য 'জিজা'য় যাই। ডক্টর আমিন আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আলোচনার মাঝে তিনি আমাকে 'যোগ' ব্যায়াম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আমি বললাম, এই বিদ্যা ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপক। এসব লোকের কাছে শারীরিক ব্যায়াম, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং দেহ গঠনের অনেক কৌশল আছে। তারা নিজেদেরকে কষ্ট সহ্য করার এবং নিজেদের প্রবৃত্তি দমনের অভ্যাস গড়ার মাধ্যমে অনেক অস্বাভাবিক ও অলৌকিক জিনিস প্রকাশ করে থাকে। তারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজেদের মনের চাহিদার বিপরীত কাজ করে এবং নিজেদেরকে সকল প্রকার ভোগ-বিলাসিতা থেকে বিরত রাখে। তারা এজাতীয় বহু স্বভাববিরুদ্ধ কাজ করে। কোনো সন্দেহ নেই যে, যখন কেউ এভাবে সাধনা করবে তখন তার মধ্যে অলৌকিক জিনিস প্রকাশ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। কিন্তু যোগীদের এসব কর্মকাণ্ড অলি-আউলিয়ার কারামাত ও কামালাতের সামনে ভেল্কিবাজি বৈ কিছু নয়। আউলিয়ায়ে কেরাম কেবল সুন্নতের অনুসরণ করেন। তাদের লক্ষই হল আত্মশুদ্ধি। তারপর তাসাউফ

---

[১] بين العالم وجزيرة العرب

ও সুফিদের সম্পর্কে আলোচনা হতে থাকে। আলোচনা দ্বারা বোঝতে পারলাম, তাসাউফের প্রতি ডক্টর আমিনের বেশ আগ্রহ আছে। তিনি একজন নকশবন্দিয়া তরিকার শায়খের কাছে ইলমে তাসাউফ কিছুটা শিখেছিলেন। আমি বললাম, বাস্তব কথা হল, ওইসকল শায়খের ইলম ও অভিজ্ঞতার কিছু জিকির-আজকার ও মামুলাত থাকে, যার মাধ্যমে অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ও ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পায়।

হাকিম ও আরিফের পার্থক্য

ডক্টর আমিন বললেন, আমি কোনো এক গ্রন্থে পড়েছি যে, একবার ইবনে সিনা[১]র সঙ্গে প্রসিদ্ধ বুজুর্গ সুলতান আবু সায়িদ আবুল খায়েরের সাথে সাক্ষাত হয়। দুই বুজুর্গ একসাথে তিনদিন ছিলেন। পৃথক হওয়ার পর এক ব্যক্তি ইবনে সিনাকে শায়খ আবুল খায়েরের মর্যাদা ও মরতবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তখন ইবনে সিনা উত্তর দেন, তার সর্বোচ্চ মাকাম হল, আমি যা জানি তিনি তা দেখেন। অপর দিকে শায়খ আবুল খায়েরের কাছে ইবনে সিনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, ইবনে সিনা যা জানে আমি তা দেখি। আমি বললাম, আল্লামা ইকবাল এ দিকে ইঙ্গিত করেই বলেছেন, 'দীনের ভেদ সম্পর্কে আমরা যা জানি তিনি তা দেখেন। কারণ তিনি ঘরের ভিতরে আর আমরা ঘরের বাইরে।'

বহুত্ব থেকে একত্বের দিকে

আমি বললাম, গবেষণা ও ইলমের উদ্দেশ্য হল বহুত্ব থেকে একত্বের দিকে পৌঁছা। এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি। সবচেয়ে বড় ইলম। যখন কারো তা অর্জিত হয় তখন সে আসবাবউপকরণ ও বস্তুনিচয়ের জাল থেকে মুক্তি পায়। চিন্তার পেরেশানি তাকে স্পর্শ করতে পারে না। এই ইলম তাকে আসবাবের মাধ্যমে আসবাবের সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি বললেন, আমি আমার বন্ধুদের এক আসরে ছিলাম। সেখানে কারো

---

[১] ইবনে সিনা। আবু আলি হোসাইন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ। সিনা তার পিতামহের নাম। ইবনে সিনা নামেই তিনি পৃথিবীময় বিখ্যাত। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী এক বিস্ময়কর প্রতিভা। একই সাথে তিনি ছিলেন দার্শনিক, চিকিৎসক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ। ৯৮০ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে মাসে বলখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পড়াশোনা এবং গবেষণার মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। ৪২৮ হিজরিতে তিনি 'হামাদানে' ইনতেকাল করেন।

মধ্যে লৌকিকতা ছিল না। আমি সেই আসরে বলেছিলাম, শুধু আকলই ইলমের উৎস নয়। বরং মানুষের অন্তরও ইলমের উৎস। কিন্তু কয়েক বন্ধু এই মতে অটল ছিলেন যে, শুধু আকলই ইলমের উৎস। আমি তাদেরকে বললাম, মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রহ.[২] আকল নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বড় চমৎকার বলেছেন, আকল একেবারে নির্ভুল না। অনুরূপ মেধাশক্তিও নির্ভুল না। এ ছাড়া মানুষের কাশ্‌ফ ও বুঝকে পুরোপুরি সঠিক বলা মুশকিল। মূলত আকল ও মেধাশক্তি সকলের বোধগম্য ও স্পষ্ট একটি বিষয়, যা মানুষের অভ্যাস ও প্রবৃত্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। অনেক সময় সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিল এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, মানুষ তা অনুভবও করতে পারে না। যেমন, আয়নায় অনেক সময় বস্তুর বিপরীত ছবি ভেসে ওঠে।

ইলমের উৎস

আমি বললাম, ইলমের মূল উৎস অহিয়ে এলাহি এবং নবিগণের আনীত ইলম। নিঃসন্দেহে এর উপর বিশ্বাস রাখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল জনৈক জার্মান দার্শনিকও এ কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি তার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিবেকের পর্যালোচনা'য় শুধু আকলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন।

আমরা কায়রোর চিড়িয়াখানার ভিতর দিয়ে পায়চারি করছিলাম। সাথে সাথে আমাদের আলোচনাও চলছিল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে 'জাজিরাতুশ শায়ে'র কাছে পৌঁছে যাই। সেখানে একটি পুকুরের পারে ছাতার নিচে বসি। ডক্টর আমিন খাবার চাইলেন। পুকুরের নির্মল স্বচ্ছ পানি এবং বিভিন্ন প্রজাতির হাঁসের সাঁতার কাটার দৃশ্য আমরা উপভোগ করতে থাকি। এ দিকে ডক্টর আমিনের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনাও শোনতে থাকি। আলোচনায় ড. আমিন এ কথা স্বীকার করেন যে, তাসাউফের মাধ্যমেই বর্তমান সভ্যতার মোকাবেলা সম্ভব।

---

[২] শায়খ আহমদ সিরহিন্দি রহ. হচ্ছেন মুসলিম উম্মাহর একজন শীর্ষস্থানীয় সংস্কারক। এই উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় হাজার বছরের মুজাদ্দিদরূপে পরিচিত ও স্বীকৃত। এ কারণেই তাকে 'মুজাদ্দিদে আলফেসানি' বলা হয়। ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে [১৪ শাওয়াল, ৯৭১ হিজরি] পূর্বপাঞ্জাবের সিরহিন্দ নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই মহান সংস্কারক ১০ ডিসেম্বর ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সিরহিন্দে ইনতেকাল করেন।

শায়খ জামালুদ্দীন ও শায়খ আবদুহু[১] সম্পর্কে পর্যালোচনা

আমি বললাম, সম্ভবত সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী[২]র সাথে তাসাউফের সম্পর্ক ছিল। তিনি জিক্‌রে কলবীর আমলও করতেন। ড. আমিন বললেন, আমি জানি শায়খ মুহম্মদ আবদুহুও তাসাউফের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তারা উভয়ে একেবারে সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। ইনতেকালের সময় মুহম্মদ আবদুহু তাঁর উত্তরসূরিদের জন্য কিছুই রেখে যাননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শায়খ মুহম্মদ আবদুহুর নিকট পড়েছেন? তিনি বললেন, আমি তার দুটি ক্লাসে উপস্থিত হয়েছিলাম। তিনি বড় দানশীল লোক ছিলেন। অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দিতে বেশি পছন্দ করতেন। তার নিকট যা কিছু হাদিয়া আসত তা তিনি নিজের সাথী-সঙ্গী ও গরিব-অসহায়দের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। তিনি কাচা ইট দিয়ে তৈরী ঘরে বসবাস করতেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘অহদাতুল উজুদ বা সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহই সর্বেসর্বা’ এই দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে আপনার কী মন্তব্য? আমি বললাম, চিন্তা ও গবেষণার তুলনায় এই মাসয়ালার সম্পর্ক আমলের সঙ্গে বেশি। তিনিও এই মত প্রকাশ করেন। তারপর বললেন, কখনো কখনো মানুষের ভাগ্যে কিছু মূল্যবান মুহূর্ত ও বিভিন্ন রুহানি অবস্থার বিকাশ ঘটে। কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। আমি বললাম, এটা স্থায়ী হলে মানুষ তার সংসার ত্যাগ করে নির্জনবাসী হয়ে যেত। জীবনাচারের নিয়মতান্ত্রিকতা স্থির থাকত না। জীবন নিস্তেজ ও নির্জীব হয়ে পড়ত। তিনি বললেন, আমি কিছু লোকের ব্যাপারে শুনেছি তাদের নাকি এই অবস্থা সবসময় থাকত। আমি বললাম, এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষের পুরোপুরি এই যোগ্যতা অর্জন হয়ে যায়।

---

[১] ১৮৪৯ সালে মিসরে এক কৃষক পরিবারে তার জন্ম। জামালুদ্দীন আফগানী রহ. তার পথিকৃৎ ছিলেন। বৃটিশ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা রাখার কারণে তৎকালীন সরকার তাকে তিন বছরের নির্বাসনের দণ্ড দেয়। তখন তিনি বৈরুতে অবস্থান করেন। জামালুদ্দীন আফগানীর ডাকে সাড়া দিয়ে সেখান থেকে প্যারিসে চলে যান। ক্ষমা ঘোষণার পর তিনি আবার মিসরে আসেন। ১৯০৫ সালে তিনি ইনতিকাল করেন।

[২] উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী সংগঠক। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানে তার জন্ম। সমগ্র মুসলিম জাহানকে এক খেলাফতের অধীনে এনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তৎকালীন মিসর সুদানসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন।

শিক্ষকতা ও বিচারকার্য

বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলছিল। আমি বললাম, আপনার কি বিচারপতি হওয়ার আগ্রহ ছিল? তিনি বললেন, না। এই জন্যই আমি বিচারের দায়িত্ব ছেড়ে শিক্ষকতা শুরু করেছি। কারণ, বিচারকদের সামনে অনেক সময় এমন ছিন্নমূল মানুষ আসে যার প্রতি বিচারকগণ প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। অপর দিকে শিক্ষকতার ময়দানে এমন পুষ্পকলি সামনে আসে যা প্রস্ফুটিত হতে চায়। ডক্টর আমিন বললেন, আমার এক শিক্ষক আমাকে বলতেন, তোমার ঝোক ও মানসিকতা গণিতের প্রতি বেশি অগ্রসর। তুমি কেন সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছ? আমি বললাম, কারণ, আপনার সাহিত্য অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত। শিক্ষক বললেন, আমি সাহিত্যে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা পছন্দ করি। আমি কাব্যচর্চা পছন্দ করি না। কারণ তাতে যৌক্তিক ধারাবাহিকতা থাকে না।

তারপর দুপুরের খানা পরিবেশন করা হয়। আমরা খানা খেয়ে জোহরের নামাজ আদায় করলাম। তারপর বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। তিনি এখন অবকাশযাপনের জন্য 'আলেকজান্দ্রিয়া' যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ড. আবদুল হামিদ মিলনায়তনে

রাতে আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের ভবনে ড. আবদুল হামিদ মিলনায়তনে ডা. সায়িদ রমজানের আলোচনা শোনার জন্য একত্র হই। আলোচনা ছিল বেশ দীর্ঘ। প্রায় দুই ঘণ্টা আলোচনা হয়। আলোচ্যবিষয় ছিল 'ইসলামি ইত্তেহাদ'। আলোচনায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় দীনী রঙই ছিল বেশি। এদ্দ্বারা অনুভব করলাম মিসরীয় জীবনাচারে বড় ধরনের বিপ্লব ঘটেছে। সেখানে মাযহাব সম্পর্কে আলোচনা ছিল একেবারেই সামান্য। মানুষের কাছে সেটি ছিল একেবারে শ্রুতিকটু বিষয়। কিন্তু আজ তা সবার কাছে সমাদৃত। তা ছাড়া নওজোয়ানরাও ইদানীং দীনের দিকে ঝুঁকছে। মিলনায়তনে উপস্থিত লোকজন একাগ্রচিত্তে পুরো আলোচনা শোনে। বহু যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলোচনা শোনে। আলোচনার মাঝে শ্রোতাদের 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আবার কখনো কখনো তাদের করতালির শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে মিলনায়তন।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

সকালবেলা নাশতার পর আমরা আলহাজ আলি শরিফের দোকানে যাই। দোকানটি ছিল শিবরা এলাকায়। এখান থেকে 'আওসিমে' গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করব। সেখানে হাজি আতিয়া বাহওয়াশীর বাসায় দুপুরের খানা খাব। আওসিম এলাকায় পৌঁছার পর শায়খ আহমদ উসমান আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি এসে বললেন, মিসরে বজ্রপাত ঘটেছে। আমি বললাম, ঘটনা কী? তারপর তিনি বিস্তারিত বললেন। বললেন, ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা দাবি জানিয়েছে 'পেশাদার ও বাজারে নারীদেরকে' পূর্বের ন্যায় অনুমতি দেওয়া হোক। এবং তাদের উপর আরোপিত সকল নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক। কারণ, চলাচলের পথে ইভটিজিং চরম আকার ধারণ করেছে। পেশাদার নারীদের অনুমতি দেওয়া ছাড়া এটা রোধ করা সম্ভব না। এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন।

অন্য একদিন তিনি আমার নিকট আসেন। তখন তার মাঝে দীনী প্রেরণা ছিল বেশি। তিনি এসে আজহারের আলেমদের সমালোচনা করতে লাগলেন। বললেন, তারা বেতনভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট ডেকেছে। দীনী এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের জন্য কেন ধর্মঘট করে না তারা! নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মঘট করেছে। আল্লাহ ও রাসুলের জন্য কেন করে না!

আমি বললাম, আপনার কথা একদম ঠিক। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে দ্বিধা-জড়তা, আখলাক নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, লজ্জাহীনতা এবং স্বভাব বহির্ভূত আচরণ বাড়তেই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে শক্তিশালী দীনী প্রাণ সৃষ্টি না হবে এবং হাস্যকর ও অহেতুক বিষয়ের মোকাবেলায় দীনী চেতনা ও মর্যাদাবোধ সৃষ্টি না হবে।

সামাজ-জীবনে দীনী সচেতনতা

যতদিন পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি মানুষের মাঝে দীনী সচেতনতা সৃষ্টি না হবে এবং শাসকদের নীতি-নৈতিকতায় পরিবর্তন না আসবে, তাদের কর্মকাণ্ডের উপর তত্ত্বাবধায়ক না থাকবে ততদিন পর্যন্ত এই ব্যাধি দূর হবে না। মোটকথা এ ছাড়া কোনো প্রয়াসই সফল হবে না।

আমরা হাজি আতিয়ার গাড়ি নিয়ে বের হলাম। আমাদের সাথে প্রফেসর মুহম্মদ গানায়েমও ছিলেন। তিনি 'সাওতুল উম্মাহ' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। অপরদিকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর প্রেসসচিবও ছিলেন। আমরা গাড়িতে বসে মিসরের কেন্দ্রস্থল থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনছিলাম। আমি বললাম, এখেকে উপকৃত হওয়া এবং এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া লোকের সংখ্যা একেবারেই কম। বর্তমানে কুরআন তেলাওয়াত শোনা কত সহজ হয়ে গেছে! আমরা একটি গ্রামের দিকে রওনা হই। গ্রামটির নাম আওসিম।

পল্লি-গাঁয়ে

মিসরের গ্রামাঞ্চলে এটাই আমার প্রথম সফর। সেখানে গিয়ে আমার মনে হল, আমি ভারতের কোনো গ্রামে রয়েছি। এখানকার গ্রামাঞ্চল আর ভারতের গ্রামাঞ্চলের মাঝে তেমন একটা পার্থক্য নেই। আমরা যে গ্রামীণ জীবন দেখলাম এবং এর যেসব স্থানে ভ্রমণ করলাম তা একেবারেই অনুন্নত। এর সঙ্গে কায়রোর কোনো যোগসম্পর্কই নেই। কায়রো সভ্যতা-সংস্কৃতিতে উন্নতির সুউচ্চ সোপানে পৌঁছে গেছে কিন্তু এসব অঞ্চলের বেহাল দশা কে দেখবে! এর প্রতি রাষ্ট্রের মোটেই সুদৃষ্টি পড়েনি।

জীবনপ্রবাহে মতপার্থক্য

সমাজ, শহর বা শহরের নির্দিষ্ট কোনো এলাকার সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝে এই যে পার্থক্য, দেশ ও জাতির জন্য তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এটা সমাজে কমিউনিজমের অনুপ্রবেশের পথ সুগম করবে। জীবনোপকরণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত।

আমরা হাজি আতিয়া বাহওয়াশীর বাড়িতে পৌঁছুলাম। তার বাড়িতে একটি জাঁকজমকপূর্ণ ইমারত রয়েছে। শুনেছি তার ভবনটি নির্মাণ করতে

পঁচিশ হাজার পাউন্ড ব্যয় হয়েছে। তারপর আমরা মসজিদে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করলাম। বন্ধুবর সাইয়েদ আলি মাহমুদ শরিফ খুতবা দিয়ে নামাজ পড়ালেন। নামাজের পর আমার আলোচনা করার কথা ঘোষণা করা হল। আমি আলোচনার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সুরা আসরের তাফসির পেশ করলাম। আলোচনা শেষ করতে না করতেই লোকজন মুসাফাহার জন্য আমার উপর উপচে পড়তে লাগল। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে

আমি আশঙ্কা করতে থাকি, কোথাও পড়ে যাই কিনা কিংবা লোকজন আমাকে পদদলিত করে ফেলে কিনা। আমার সঙ্গীরা লোকজনকে মুসাফাহা করতে বাধা দিতে থাকে। কিন্তু কার বাঁধা কে মানে। মানুষের এমন উষ্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতা আমি আর কোথাও দেখিনি। মুসাফাহার জন্য এভাবে ভিড় করার কারণে আমি লজ্জিত বোধ করতে থাকি।

একজন মেহমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন তাদের এই সুধারণা বাস্তবে পরিণত করেন এবং আমাকে পরকালে লজ্জিত না করেন। তাদের এই ব্যবহার দেখে আমার হৃদয়ে দীনের প্রভাব ও কার্যকারিতার একিন বহুগুণ বেড়ে যায়। ভারতীয় অধিবাসী এই আমার সঙ্গে তাদের দীনী সম্পর্ক ছাড়া আত্মীয়তার কোনও বন্ধন নেই। কিন্তু তারা তাদের হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা আর ইখলাস নিয়ে আমার সাথে দেখা করেছে। পৃথিবীর বুকে কোনো ভিনদেশীর সঙ্গে এরূপ উচ্ছ্বাস ও আন্তরিকতা নিয়ে দেখা-সাক্ষাত করা হয় না। এখানে যা কিছু হয়েছে তার সবটাই একমাত্র দীনের টানে।

আমরা মসজিদ থেকে বের হলাম। জনাব জালাল হোসাইনসহ অনেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হাজি আতিয়া তাদেরকেও আমার সাথে খানার দাওয়াত দিয়েছিলেন।

কাঁচামাল নষ্ট হচ্ছে

আমার মত একজন মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে তাদের ভালবাসা ও সদ্ব্যবহারে সত্যিই আমি দারুণ প্রভাবান্বিত ছিলাম। আমার এই অনুভূতি আমার বন্ধুদের কাছেও প্রকাশ করি। তারপর তাদেরকে বলি, দুনিয়াতে কাঁচামাল যত ভালো ও তরতাজা পাওয়া সম্ভব তা আপনাদের মাঝে আছে। কিন্তু থাকলে কী হবে! তাদের এমন কোনো রাহবার নেই, যিনি একে ভালো কাজে লাগাবেন। এদ্দ্বারা উপকৃত হবেন। প্রফেসর জালাল হোসাইন আমার কথার সত্যায়ন করলেন। তারপর বললেন, আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ঘুরেছি। ইউরোপেও কয়েকবার সফর করেছি।

কিন্তু সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে মিসরের গ্রামীণ মুসলমানদের তুলনায় বেশি ঈমানের বলে বলীয়ান পাইনি। পাইনি তাদের কাছে এত বেশি দীনী ভালবাসা। এত সুন্দর আচরণ। কিন্তু আমরা হীনম্মন্যতার শিকার। আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ফলে ইউরোপের সমাজব্যবস্থাকে উন্নতির সোপান মনে করি। আল্লাহর কসম, আমরা আরব মুসলমান এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের মত ঈমানি শক্তি, সুস্থ মস্তিষ্ক ও স্বচ্ছতা আর কোথাও দেখিনি। প্রফেসর আবদুল ওহহাব তার কথার সমর্থন করলেন।

তারপর আমি পাক-ভারতের দাওয়াতের পদ্ধতি নিয়ে তাদের সামনে বিস্তারিত আলোচনা করি। সাধারণ জনগণের সাথে মিশে যাওয়া, শিক্ষিত ও স্বচ্ছল লোকদের এ পথে সাহায্য করা এবং গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে দীনের দাওয়াত নিয়ে ছড়িয়ে পড়া নিয়ে আলোচনা করি। তারপর বলি, ওইসকল ব্যক্তি মাসে বা সপ্তাহে কিছু সময় নির্ধারণ করে নেন সেসময় তারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে দীনের দাওয়াত দেন। প্রফেসর জালাল হোসাইন আমার কথা সমর্থন করলেন। তারপর তিনি ভারত ও পাকিস্তানে দাওয়াত ও তাবলিগের যা কিছু দেখেছেন এবং এদ্দ্বারা উভয় দেশের যে উপকার হয়েছে তা তাদের সামনে তুলে ধরেন। আমি উপস্থিত লোকদের মাঝে এই ফর্মুলা নিজ নিজ এলাকায় বাস্তবায়নের আগ্রহ দেখতে পেলাম। আলোচনা শেষে আমরা খানা খেতে যাই। খানা খেয়ে আসরের নামাজ আদায় করি। তারপর হাজি আতিয়া ও আলি মাহমুদের সঙ্গে কায়রো ফিরে আসি।

আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে

৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজহারের নিকটে থেকেও আজহারকে না দেখতে পাওয়া দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই না। এই জন্য আজহারে ধর্মঘট চলা সত্ত্বেও মনে মনে ভাবলাম যে, যতটুকু সম্ভব আজহারকে দেখে যাই, হোক তা ছাত্রাবাস, কোনো অ্যাকাডেমি ভবন কিংবা অফিস। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমে আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই।

সর্বপ্রথম আজহারের ঐতিহাসিক মসজিদ ও দরসগায় প্রবেশ করি। এই সেই দরসগাহ যে তৈরি করেছে হাজারও ইমাম ও মুহাদ্দিস, গড়েছে

অযুত-নিযুত ফকিহ ও মুসান্নিফ, যার সংস্পর্শে এসে কত মানুষ নেককার হয়েছে। হয়েছে দীনের সাচ্চা দায়ী। মুসলিমবিশ্বের অন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ইউনিভার্সিটি তার কাছেধারেও পৌঁছুতে পারেনি। দরসগাহ মসজিদের ভিতরেই। কী সুন্দর দৃশ্য! পবিত্র মসজিদ ও মহান দরসগাহ এক সঙ্গে! মসজিদে প্রবেশ করতেই সেই সকল আলেমে দীন, সালাফে সালেহীন ও দীনের সাচ্চা খাদেমদের কথা স্মরণ হয়, যারা চাটাই ও সাধারণ বিছানার উপর বসে রাজা-বাদশাদের উপর রাজত্ব করেছেন। তারাই দীন, ইলম ও জাতির নিঃস্বার্থ সেবক ছিলেন। ছিলেন আল্লাহর রাস্তার খাঁটি মুজাহিদ। মসজিদের ভিতরে ইলমের ঘ্রাণ অনুভূত হতে থাকে। ইলম ও ইখলাস, আল্লাহর ভয় ও দুনিয়ার ভোগবিলাসিতা ত্যাগ করার খোশবু অতীতের একটি পরিত্যাক্ত জায়গাকে সুরভিত করে তুলেছে। ধর্মঘটের পর যখন আবার নিয়মিত ক্লাস শুরু হবে তখন আবার আসব, ইনশাআল্লাহ।

আজহারের অফিসকক্ষে

মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা আজহারের অফিসে যাই। অফিসটি অনেক প্রশস্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ। মনে হয় রাষ্ট্রীয় কোনো দফতর। আমরা অফিসের প্রতিটি রুম ঘুরে দেখি। রুমগুলির দরজার সামনে লাগানো কাষ্ঠফলকের লেখাও পড়ি। একটিতে লেখা ছিল সাময়িক পত্রিকা 'আল-আজহার' কার্যালয়।

প্রফেসর ফরিদ অজদীর সঙ্গে আলোচনা

এখানে এসে আমরা থেমে যাই। প্রফেসর ফরিদ অজদীর কথা আমার স্মরণ আছে। তার সম্পর্কে আমি ছাত্রজীবন থেকে জানতাম। তার লিখিত 'বিশশতকের ইসলামি বিশ্বকোষ'[১] গ্রন্থটি অধ্যয়ন করেছি। এ ছাড়া তার বহু প্রবন্ধ পড়েছি। আমরা তার নিকট আমাদের ভিজিটিংকার্ড পাঠাই। তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠান। আমরা তার রুমে যাই। তিনি

---

[১] دائرة معارف القرن العشرين

আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানালেন। যখন জানতে পারলেন আমরা সুদূর ভারত থেকে এসেছি এবং তার লেখা গ্রন্থ ও বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা আছে তখন তিনি আমাদের এই সাক্ষাতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। আমি তাকে বললাম, আপনার পুরনো গ্রন্থ 'মুসলিম নারী'[২], যেটি আপনি কাসিম আমিনের লেখা 'মিসরীয় নারী'[৩]র মোকাবেলায় লিখেছেন, ভারতে অনেক আগেই উর্দু ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ[৪] তার যৌবনে বইটির অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ অত্যন্ত চমৎকার প্রাঞ্জল হয়েছে। তাতে রয়েছে অপূর্ব সাহিত্যস্বাদ। তারপর বললাম, আপনি মিসরের প্রবীণ লেখকদের একজন। আল্লাহ্ আপনার বয়সে বরকত দান করুন। আপনার বয়স কত? বললেন, বাহাত্তর বছর। আমি বললাম, আমরা আপনাকে দীনী ইলম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে জানি। ইউরোপীয় দর্শন ও আধুনিক শিক্ষার হাতিয়ারের মাধ্যমে আপনার ইসলামের প্রতিরক্ষামূলক খেদমত সম্পর্কে আমরা অবহিত আছি। তিনি বললেন, বর্তমানে ইসলামের খেদমত এবং এর মর্যাদা ও সৌন্দর্য জনসমাজে ফুটিয়ে তোলার এটিই উত্তম পন্থা।

---

[২] المرأة المسلمة

[৩] المرأة المصرية

[৪] উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন প্রথম সারির নেতা এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে মাওলানা আজাদ রহ. পিতার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। বিশ বছরেরও কম বয়সে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর লেখক এবং বিশিষ্ট আলেমরূপে খ্যাত হন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সম্পাদিত সাড়াজাগানো উর্দু সাপ্তাহিক 'আলহেলাল' প্রকাশিত হয়। আলহেলালে লেখা তাঁর সম্পাদকীয় এবং অন্যান্য প্রতিটি লেখাই এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পরবর্তী সময়ে সেসব লেখা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আলহেলাল সম্পাদনা করার সময় তিনি একাধিকবার কারা বরণ করেন।

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মাওলানা আজাদের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। তিনবার তিনি 'নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসে'র সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি স্বাধীন ভারতের শিক্ষামন্ত্রীরূপে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

ইংলিশ ও ফ্র্যান্স মিডিয়ামে শিক্ষা

আমি ফরিদ অজদীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা ইংরেজি ভাষায় পাঠদান করেন নাকি ফ্র্যান্স ভাষায়? তিনি বললেন, ফ্র্যান্স ভাষায়। তবে ইংরেজিকে আমি ফ্র্যান্স ভাষার উপর প্রাধান্য দিই। আমি বললাম, সম্ভবত ইংরেজি ভাষায় ইলমি গভীরতা বেশি। আর ফ্র্যান্স সাহিত্যে কাব্যের দিকটারই প্রাধান্য বেশি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বিষয়টি এমনই। তারপর আমি বললাম, ইংরেজ জাতি বাস্তব বিশ্বাসী। তাদের মাঝে গাম্ভীর্য ও অধ্যবসায় পুরোপুরিভাবে পাওয়া যায়। তিনি বললেন, ইংরেজরা কিছুটা রুহানিয়তের দিকে ধাবিত। তারা এ সম্পর্কে গবেষণাও করছে। অদূর ভবিষ্যতে তাদের থেকেই আলো ছড়াবে। আমি বললাম, বেয়াদবি মাফ করবেন, ইংরেজরা নিছক একটি বিষয় ও শাস্ত্র হিসেবে রুহানিয়তের দিকে ধাবিত। কারণ তারা তাদের অধ্যয়ন ও গবেষণায় সত্যসন্ধানী নয়। এ কথার পর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। যেন আমার মতের সঙ্গে একমত পোষণ করলেন।

তারপর আমরা ভারতের মুসলমান এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করি। তিনি বললেন, আমার আশা যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভবিষ্যতে ইসলামের দিকে ঝুঁকবে। আমি বললাম, আমারও এরূপ আশা ।

ঘটনাক্রমে 'মিফতাহু কুনূযিস সুন্নাহ' গ্রন্থের অনুবাদক প্রফেসর মুহম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকির সঙ্গেও এখানে সাক্ষাত হয়। গ্রন্থটি তিনি ওলন্দাজ থেকে আরবিভাষায় রূপান্তর করেছেন। তিনি মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। তারপর তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, সাইয়েদ নদবী আমার চিঠি ও উপহারের সুন্দর জবাব দিয়েছেন। আমার শোকরিয়া আদায় করেছেন। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসের প্রশংসাও করেছেন। আমি ফুয়াদ আবদুল বাকিকে আমার একটি বই উপহার দিই। তিনি বইটি সানন্দে গ্রহণ করেন। সবশেষে তিনি আমাদের সঙ্গে এই অফিসেই আবার দেখা করার এবং তার লেখা কিছু বই আমাদেরকে উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান।

আজহারের ছাত্রাবাস সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া

মিসরীয় লাইব্রেরিসমূহের সাবেক পরিদর্শক এবং 'রুচিশীল বিনোদন সঙ্গী'[১] গ্রন্থের লেখক প্রফেসর আলি ফিকরীর সঙ্গেও হঠাৎ সাক্ষাত হয়।

---

১ السمير المهذب

তার সাথে আমরা পরিচিত হই। অফিস থেকে বের হওয়ার পর আমরা 'শরিয়াহ অনুষদে'র ছাত্র মুহম্মদ দামিরদাশীর সঙ্গে শরিয়াহ অনুষদ ও তার লাইব্রেরি ঘুরে দেখি। তারপর আজহারের ছাত্রাবাসে যাই। ছাত্রাবাসের অব্যবস্থাপনা, অনিয়মতান্ত্রিকতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে আমার কষ্ট হচ্ছিল। এই হোস্টেল ছাত্রদের মাঝে নিঃসন্দেহে দুর্বলতা ও মুখাপেক্ষিতার অনুভূতি সৃষ্টি করবে, যাকে হীনম্মন্যতা বলে। অথচ কলেজ-ভার্সিটির জীবন এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনা ছাত্রদের মাঝে আভিজাত্য সৃষ্টি করবে। তা ছাড়া এখানে দীন ও ইলমের উপর গর্ব করার মতো এমন কিছুই নেই, যা হীনম্মন্যতার এই অনুভূতির মোকাবেলা করবে। ভাল হবে যদি আজহার এমন ছাত্রাবাস তৈরি করে, যা নিয়মতান্ত্রিকতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে অন্যান্য আধুনিক কলেজ, ভার্সিটি ও হোস্টেলকে হার মানাবে। আমরা শায়খ আমিন আলখাত্তাব ও অন্য মেহমানদের সাথে দুপুরের খানা খাই। আসরের সময় প্রফেসর রাশাদ আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে ওসমানি হুকুমতের সাবেক শায়খুল ইসলাম জনাব মুসতফা সবরী আফেন্দীর সাথে দেখা করতে যাই। তিনি অসুস্থ থাকায় সাক্ষাত করতে পারিনি। আমি আমার 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'সহ বেশ কটি গ্রন্থ তার নিকট উপহার হিসাবে পাঠাই।

আল্লামা জাহেদ কাউসারী[২]

এখান থেকে আমরা শায়খ সবরীর সহপাঠী ও বন্ধু, প্রসিদ্ধ লেখক আল্লামা মুহম্মদ জাহেদ কাউসারীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। তিনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয় ও ভদ্রতার সঙ্গে দেখা করেন। তার ভদ্রতা ও নম্রতা আমাদেরকে ওলামায়ে হিন্দের বিনয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। আলোচনার সিংহভাগই ছিল মাওলানা শিবলী নোমানী, মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর 'সিরাতুন-নবী' গ্রন্থের তুর্কি অনুবাদ, মাওলানা ইউসুফ বানুরী[৩] ভারতবর্ষের

---

[২] তাঁর মূল নাম মুহাম্মদ জাহেদ ইবনে হাসান। ১২৯৬ হিজরিতে তাঁর জন্ম। হাদিস ও ফিকাহ গবেষণায় তিনি অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তার রচিত শতাধিক গ্রন্থ রয়েছে। ১৩৭১ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

[৩] আল্লামা ইউসুফ বানুরী রহ.। উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদদের অন্যতম। আরবি

বহু দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে। আমাকে তিনি তার কতকগুলো গ্রন্থ ও পুস্তিকা উপহার দিলেন। আফসোস! আমার এখন দীনী কোনো বিষয়ে বহস-মুবাহাসা বা তর্ক-বিতর্কের তেমন কোনো আগ্রহ নেই। ইমামদের মর্যাদাহানীর ব্যাপারে যা লেখা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি আমার জানা নেই। অন্যথায় এটি হত একটি চিত্তাকর্ষক বৈঠক। পরিশেষে আমরা তার কাছে বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। তার বিনয়, সরলতা, ব্যাপক জ্ঞান, প্রফুল্লতাসহ এই বার্ধক্যেও লেখালেখি ও অধ্যয়নে ব্যস্ত দেখে আমার খুবই আনন্দ লাগল। অথচ এই বৃদ্ধ বয়সে ইলমি কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা অনেকেরই থাকে না।

মিসরের ফৌজদারি আদালতে

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আবদুল্লাহ আকিল ইরাকী এলেন। তার সঙ্গে আমাদের পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ফৌজদারি আদালতে যাই। আজ ইখওয়ানের আটককৃত কয়েক ব্যক্তির মামলার শুনানিতে ডা. সায়িদ রমজান বিতর্ক করবেন। ভাবলাম মিসরের বিচারব্যবস্থা কেমন দেখব। কেননা এটা মানুষের জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা আদালত চত্বরে পৌঁছুলাম। কয়েকজন চাপরাশি আমাদের তত্ত্ব-তালাশ করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। আদালতের ভিতরে ছাত্র-জনতা-আইনজীবীসহ বহু লোকজনের এক ভারী জমায়েত দৃষ্টিগোচর হয়। আদালতের দায়িত্বশীল পেশকার ও পিয়নদের মুখ থেকে এমন কিছু বাক্য শোনতে পাই, যা আমাদের দেশের আদালতের ব্যাপারে কল্পনা করা যায় না। যেমন- আপনাদের আগমন শুভ হোক। আদালত সাধারণত হয়ে থাকে হতাশা ও নিরাশার জায়গা, যার পরিবেশ হয় খুব ভয়ানক ও ভীতিপ্রদ। কিন্তু মিসরের আদালত সম্পূর্ণ এর ব্যতিক্রম। আমরা কতক চাপরাশিকে

সাহিত্যিক ও শিক্ষা গবেষণক। তিনি দরসে নেযামির যুগোপযোগী সংস্কারের প্রস্তাবক। কাদিয়ানী ফেতনা উৎখাতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেন তিনি। এরই ফলস্বরূপ পাকিস্তান সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া নিউটাউন করাচির প্রতিষ্ঠাতা। ৬ রবিউস সানি ১৩২৬ হিজরিতে পেশোয়ারে তাঁর জন্ম। ১৩৯৭ হিজরি জিলকদ মাসে তিনি ইনতেকাল করেন।

এ কথাও বলতে শুনেছি যে, উনি আমাদের মেহমান। আমাদের জন্য বরকত নিয়ে এসেছেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আরবের লোকজনের মেজাজে নম্রতা, প্রফুল্লতা ও আতিথেয়তার এমন বহুগুণ রয়েছে, যা এক মুহূর্তের জন্যও তাদের থেকে পৃথক হয় না। আমরা জাজ ও জুরিদের আসনের দিকে তাকালেই দেখতে পাই তাদের মাথার উপর একটি কাষ্ঠফলক। তার উপর কুরআনের এই আয়াতটি লেখা وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ 'যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার করবে, তখন ন্যায়বিচার করবে।' [সুরা নিসা, ৫৮ আয়াতাংশ]। আমি মনে মনে বললাম, আহা, ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে বিচারের ভিত্তি যদি এই আয়াতের উপর হত! এটিই যদি সেখানকার আদালতের প্রতীক ও বিধিবদ্ধ আইন হত! কাষ্ঠফলকটি বিচারকদের মাথার পিছনে না থেকে তাদের চোখের সামনে থাকলে ভালো হত! বিচারপতি ইউনিফর্ম পরিধান করে আদালতের এজলাসে বসেন। তারপর অভিযুক্ত কয়েদিরা এসে কাঠগড়ায় দাঁড়ায়।

আদালতে সায়িদ রমজানের প্রভাব সৃষ্টিকারী আলোচনা

সরকারপক্ষের আইনজীবী একপাশে বসে আছেন। ডা. সায়িদ রমজান ইখওয়ানের আইনজীবী হিসেবে আলোচনার জন্য দাঁড়ালেন। প্রথমে জাদুময়ী আলোচনা ও অতুলনীয় দুঃসাহসিকতার সাথে মোকদ্দমা উত্থাপন করলেন।

হযরত আদম আ. এর আল্লাহর খলিফা হওয়া, তারপর তাকে জান্নাত থেকে বের করা, হক-বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব, নববী শিক্ষার উপর চিরকাল শয়তানের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে শুরুতে আলোকপাত করলেন। এরপর ইসলামি খেলাফতের যৌবন ও বার্ধক্যের একটি চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরলেন। এরপর তাতারিদের আক্রমণ ও আগ্রাসন এবং ক্রুসেডারদের ধ্বংসলীলার কাহিনী শোনালেন। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপিয়ান ক্রুসেডারদের কথাও বললেন। ইংরেজদের প্রভাব বিস্তারের কারণসমূহ বর্ণনা করলেন। পরিশেষে ইসলামের সাথে ইহুদিদের চিরবৈরিতা, তাদের পদ ও মর্যাদা এবং মুসলিমবিশ্বের জন্য তাদের পক্ষ থেকে যেসব হুমকি রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা করলেন।

আলোচনার সারমর্ম বলতে গিয়ে বললেন, এই ভয়াবহ ও কঠিনতম পরিস্থিতিতে ইখওয়ানুল মুসলিমিন আন্দোলনের বিকাশ ঘটেছে। তারা এই

পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করে চলছে। ইখওয়ানদের অবস্থান আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদদের ন্যায়। তারা মোটেই রাষ্ট্রদ্রোহী বা অপরাধী না।

জনাব সায়িদ রমজান তার এ সকল আলোচনাকে কুরআনের আয়াত ও হাদিসে নববীর প্রমাণের মাধ্যমে মজবুত ও শক্তিশালী করে তুললেন। যখন তিনি আয়াত ও হাদিস প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন তখন আদালতে এক ধরনের দীনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। উপস্থিত লোকজনের অন্তর নরম হয়ে যায়। তাদের মাঝে আল্লাহর ভয় চলে আসে। আলোচক ও শ্রোতারা যে আদালতে রয়েছে, এ কথা তারা বেমালুম ভুলে যায়। তাদের মনে হতে থাকে তারা কোনো দীনী কন্‌ফারেন্স বা রাজনৈতিক সেমিনারে রয়েছে। সায়িদ রমজানের এই আলোচনা প্রমাণ করে তার অসাধারণ বাগ্মিতার, মজবুত ঈমান ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের কথা। প্রমাণ করে একটি পরিবেশ পরিবর্তনের যোগ্যতার কথা। এটাও প্রমাণ করে যে, তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিন আন্দোলন দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত।

তিনি যখন জুরির প্রতি দয়া ও ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেন এবং মুসলমান হিসেবে তার মাঝে ঈমানি অনুপ্রেরণা ও দীনী স্পৃহা পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চালান তখন উপস্থিত লোকজন অভিভূত হয়ে পড়ে।

শেষপর্যায়ে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেন ইখওয়ানের আটককৃত লোকজনের দিকে। তাদেরকে ধৈর্য ধরার ও অটল থাকার উপদেশ দেন। তারপর এ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত ও হাদিস পেশ করেন। তখন সকলের চোখ দিয়ে ঝরঝরিয়ে পানি পড়তে থাকে। আদালতের ভিতর কান্নার রোল পড়ে যায়। বিশেষ করে মহিলাদের স্থানে। আমরা আদালতের এই অভাবনীয় চিত্র দেখে অবাক হতবাক হয়ে বেরিয়ে এলাম।

শায়খ হাসানুল বান্নার পিতা

আদালত চত্বর থেকে আমরা শায়খ হাসানুল বান্না[১]র পিতা আহমদ বিন আবদুর রহমান বান্না সাআতীর নিকট যাই। ভারতে আমরা তাকে

[১] ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ সালে মিসরের আলেকজান্দ্রিয়াতে তাঁর জন্ম। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে ইখওয়ানের একটি কর্মীসভা থেকে ফেরার পথে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তার গাড়ি লক্ষ্য করে পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি করা হয়। সেখান থেকে হাসপাতালে স্থানান্তর করার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।

'আলফাতহুর রাব্বানি'[২] গ্রন্থের লেখক এবং হাদিসে নববীর একজন খাদেম হিসেবে চিনি। এখানে এসে জানতে পারলাম তিনি শায়খ হাসানুল বান্নার পিতা। যদিও বহু লোক এমন আছে, যারা তাদের পিতার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও কিছু লোক আছে, যারা তাদের জ্ঞানী সন্তানের কারণে বিশ্বনন্দিত হয়ে উঠেছেন।

আমরা তার বাড়িতে পৌঁছুলাম। দরজা নক করতেই তিনি বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘ বয়স ও জামানার নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনা তাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। অত্যধিক অধ্যয়ন ও লেখালেখি তাকে দুর্বল করে দিয়েছে। তিনি আমাদেরকে একটি রুমে নিয়ে গেলেন। রুমটির চারদিক কিতাবে পরিপূর্ণ। তিনি আমাদেরকে বললেন, মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের[৩] ন্যায় মুসনাদে ইমাম শাফেয়ীর[৪] পরিমার্জনের কাজ তিনি করেছেন। মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালাসী[৫]র উপরও কাজ করছেন। তারপর আমাদেরকে জানালেন, ভারত থেকে প্রকাশিত এই কিতাবের একটি কপি তিনি সংগ্রহ করেছেন। ভারতের আলেমদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তা আমাদেরকে অবহিত করেন। তাদের ইখলাস ও ইলমি খেদমতের প্রশংসা করেন। তারপর মেহমানদারির উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য কফি আনান।

---

[২] الفتح الربانى

[৩] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.। হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। নাম আহমদ ইবন মুহম্মদ হাম্বল। ১৬৪ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মাঝে তার শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। অভাবের দরুন একদিন শরীর থেকে জুব্বা খুলে বিক্রি করতে দেন। খালকে কুরআনের মাসআলায় তিনি কারা নির্যাতন ভোগ করেন। কারাপ্রকোষ্ঠে প্রহারে প্রহারে তাঁকে রক্তাক্ত করা হত। ২৪১ হিজরিতে ৭৭ বছর বয়সে তিনি ইনতেকাল করেন।

[৪] ইমাম শাফেয়ী রহ.। চার মাযহাবের অন্যতম শাফেয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। নাম মুহম্মদ ইবন ইদরিস শাফেয়ী। ১৫০ হিজরিতে তৎকালীন সিরিয়ার গাজা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে, অন্য বর্ণনামতে দশ বছর বয়সে তার মা তাঁকে মক্কায় নিয়ে যান। তিনি ইমাম মালেক রহ. ও ইমাম মুহম্মদ রহ. এর অন্যতম প্রধান ছাত্র। ৫৪ বছর বয়সে ২০৪ হিজরিতে মিসরে ইনতেকাল করেন।

[৫] প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। ১৩৩ হিজরিতে তাঁর জন্ম। সুফিয়ান সাওরী, জাবের ইবনে হাজেমসহ সহস্রাধিক ব্যক্তি থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করেছেন। তাঁর হাদিসসমূহ 'মুসনাদে তায়ালিসিতে' একত্রিত করা হয়েছে। ২০৪ হিজরীতে বসরায় তিনি ইনতেকাল করেন।

পিতার মুখে গর্বিত সন্তানের কাহিনী

আমি বললাম, ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণপুরুষ আপনার পুত্র শহিদ হাসানুল বান্না সম্পর্কে কিছু বলুন। তার শৈশব ও যৌবনকাল কেমন ছিল? কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ 'বাস্তব অবস্থা তোমাকে কোনো জ্ঞাত ব্যক্তিই বলতে পারবে'। [সুরা ফাতির, ১৪ আয়াত]। তিনি বললেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। তারপর বিস্তারিত আলোচনা করলেন। প্রথমে বললেন, দীর্ঘদিন ধরে আমার কোনো সন্তান হচ্ছিল না। আমার সন্তানের খুব আগ্রহ ছিল। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করতে থাকি, হে আল্লাহ, আমাকে একজন নেকসন্তান দান করুন। একবার আমি একটি ছোট্ট বাচ্চাকে নামাজ পড়তে দেখি। দৃশ্যটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে। মনে মনে বললাম, আমার সন্তানও এই বাচ্চার মতো নামাজ পড়বে এবং আল্লাহ তাকে অনেক জ্ঞানী বানাবেন। এর কিছুদিন পর আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। আমি সন্তানের নাম রাখি হাসান। কারণ, আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার মা আমার স্ত্রীকে হাসানের মা [উম্মে হাসান] বলে ডাকতেন। ছেলেটি যখন চার বছর বয়সে পদার্পণ করে তখন তাকে একটি মকতবে ভর্তি করিয়ে দিই। সে এক মকবত থেকে আরেক মকতব পরিবর্তন করতে থাকে। একপর্যায়ে তার সাতাইশ পারা হেফজ হয়ে যায়। আমি তাকে দামনাহুর এলাকার 'টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে' ভর্তি করার ইচ্ছা করি। কিন্তু সেখানে হাফেজ ছাত্র ব্যতীত কাউকে ভর্তি করানো হয় না। আমি একদিন তাকে ডেকে পাঠালাম। খুব অনুগত ও ভদ্র। বললাম, তোমাকে টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু তুমি এখনও হেফজ শেষ করনি। এ ব্যাপারে তোমার কী মত? সে বলল, আপনার যা মর্জি তাই করুন। আপনার নির্দেশ অমান্য করব না। আমি বললাম, স্লেট নিয়ে এসো। সে স্লেট নিয়ে আসে। আমি আয়াত লিখে দিতাম। সে মুখস্থ করত। এভাবে অল্প কদিনের মধ্যে সে কুরআন হেফজ শেষ করে। তারপর টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিই।

বালেগ হওয়ার পূর্ব থেকেই তার ইবাদতের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। রজব, শাবান ও রমজান এই তিন মাস সে রোজা রাখত। আমি তাকে বললাম, তুমি এখনও বড় হওনি। তোমার উপর রোজা ফরজ না।

তারপরও তুমি এত পেরেশান হচ্ছ কেন? সে বলল, আব্বাজান, রোজার প্রতি আমার খুব আগ্রহ জন্মেছে! এতে আমার কোনো কষ্ট হয় না। তারপর আমি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিই।

সে আমার মসজিদের দরসে নিয়মিত উপস্থিত হত। ইবাদতের ক্ষেত্রে সে সবার আগে থাকত। অনেক প্রবীণ ও বুজুর্গেরও আগে। তার দাওয়াত ও ইসলাহের প্রতিও অনেক আগ্রহ ছিল। তার একটি আশ্চর্য ঘটনা আছে। একদিন সে দামনাহুরে নদীর তীরে ঘুরছিল। তখন একটি নৌকার উপর তার দৃষ্টি পড়ে। নৌকায় একটা উলঙ্গ নারী-মূর্তি ছিল। এটা দেখে সে পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে দৌড়ে যায়। তারপর তাকে বলে, এ ধরনের মূর্তি লাগানো ঠিক না। কারণ এখানে অনেক তরুণ-তরুণী ঘুরতে আসে। তখন এদিকে তাদের দৃষ্টি যাওয়াটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং এই মূর্তি ভেঙে নৌকা থেকে ফেলে দেওয়া জরুরি। ইন্সপেক্টর তার কথায় কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর দায় সারার জন্য তার সাথে একজন পুলিশ পাঠিয়ে দিলেন। হাসান জানত মালিক এ মূর্তি ভাঙতে রাজি হবে না। তাই পুলিশকে আসার পথে কিছু নির্দেশনা দেয়। বলে মালিক যদি ভাঙতে রাজি হয় তা হলে ভালো কথা। আর রাজি না হলে প্রথমে তাকে বুঝিয়ে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করবেন যে, এটা হারাম। এটা লাগানো কোনোক্রমেই ঠিক হবে না। তখন সে এমনিতেই তা ভেঙে ফেলবে। কথামত পুলিশ মালিককে বুঝিয়ে মূর্তিটি ভেঙে ফেলে।

এখানে একজন আমলদার বুজুর্গ আলেম ছিলেন।[১] আমি তাকে তার খেদমতে উপস্থিত হতে বললাম। তারপর সে তার নিকট বসতে থাকে। একপর্যায়ে ওই বুজুর্গের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এতে সে অনেক লাভবান হয়।

তার মাদরাসার শেষ বছর। এই বছর কায়রোর দারুল উলুমের পাঠ্যসূচিতে আরবিভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি আধুনিক অনেক বিষয় সংযোজন করা হয়। আমি দারুল উলুমের শিক্ষাব্যবস্থা ও তার সুখ্যাতি দেখে তাকে সেখানে ভর্তি করার ইচ্ছা করলাম। আমি তাকে ডেকে বললাম, এই বছর দামনাহুর মাদরাসায় তোমার লেখাপড়া শেষ হচ্ছে।

---

[১] এই বুজুর্গ আলেমের নাম ছিল শায়খ যাহরান।

তাই আগামী বছর দারুল উলুমে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে থাক। সে বলল, আব্বাজান, আপনি আমাকে কুরআন, হাদিস ও ফিক্‌হ শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু আমার নিজের দায়িত্ব হল, গণিতশাস্ত্র ভালো মত শিখে নেওয়া। বিষয়টি এমনই হয়েছে। সে নিজে নিজেই এ বিদ্যা অর্জন করে নিয়েছে।

দারুল উলুমে ভর্তির জন্য সে কায়রো যায়। পরীক্ষার আগের রাতে বীজগণিতের ব্যাপারে তার ভয় হতে থাকে। না জানি এতে ফেল করে বসে। রাতে তার ঘুম চলে আসে। স্বপ্নে একজন বুজুর্গকে দেখে। তিনি তাকে বললেন, হাসান, পেরেশান হয়ো না। পরীক্ষায় তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি তা বলে দিচ্ছি। তারপর এই বুজুর্গ তার হাত ধরে নদীর দিকে রওনা হন। নদীর তীরে গিয়ে বইয়ের একটি পৃষ্ঠা নির্দিষ্ট করে দিয়ে বলেন এটি ভালো করে আত্মস্থ্ করে নাও। আহমদ আবদুর রহমান বলেন, আমার ছেলে হাসান শপথ করে বলত, ঘুম থেকে ওঠার পর আমার সেই পড়াটি মুখস্থ্ হয়ে যায়। যখন পরীক্ষা দিতে যাই তখন এই পড়াটিই আসে। তাই সহজেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাই।

হাসান তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে বরাবরই প্রথমস্থান অধিকার করতে থাকে। তার একজন সহপাঠি ছিল। ওই শহরেই তার বাড়ি। বয়সে সে ছিল হাসানের চেয়ে দশ বছরের বড়। সে তার সঙ্গে হিংসা করতে শুরু করে। একদিন সে এসিড ও বিষ নিয়ে আসে। তার চোখে এসিড ঢেলে তাকে অন্ধ বানিয়ে ফেলবে। আর মুখে ঢালবে বিষ। কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত! তার হাত পিছলে যায়। এসিড পড়ে তার মুখের উপর, আর বিষ তার মুখে ঢোকেনি। এসিডের যন্ত্রণায় হাসানের ঘুম ভেঙে যায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এসিড নিক্ষেপকারী হাসানের এক সাথী। বিষয়টি পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। কিন্তু লোকজন অপরাধীর জন্য হাসানের কাছে সুপারিশ করে। হাসান তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বলে, আল্লাহ তায়ালা তার ষড়যন্ত্র থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। এর শোকরিয়া হিসেবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি। এর প্রতিদান আমি আখেরাতের জন্য জমা রাখছি।

হাসান শেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে পাশ করে। 'ইসমাইলিয়া' জেলার একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে তার নিয়োগ হয়ে যায়। সেখানে

সে দাওয়াতি অভিযান শুরু করে। তারপর সেখানেই সে 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' প্রতিষ্ঠা করে। সে বিভিন্ন মসজিদ ও ছাত্রাবাসে গিয়ে প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে লোকজনকে দীনের দিকে আহ্বান করতে থাকে। ইসলামবিরোধী কথাবার্তা ও কার্যকলাপের উপর ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকে। জোরেশোরে চলতে থাকে তার আন্দোলন। এভাবে ধীরে ধীরে ইখওয়ানের পরিধি ব্যাপক হতে থাকে। একটি প্রশস্ত জায়গায় তার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আন্দোলনের কার্যক্রম ইসমাইলিয়া থেকে অন্যান্য জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ে। আলেকজান্দ্রিয়া, সুয়েজসহ সব জায়গায় হাসান একজন উদ্যমী দায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। সব জায়গায় সে ইখওয়ানের কমিটি করতে থাকে। একসময় সারা মিসরে এর শাখা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের জীবন ও নৈতিকতায় এর বিরাট প্রভাব পড়ে। এর গ্রহণযোগ্যতা মানুষের মাঝে বাড়তে থাকে। সেসম্পর্কে আপনার নিশ্চয় জানাশোনা আছে।

তারপর আমার ছেলে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি দেয়। সে দেখে এদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভিনদেশিদের হাতের মুঠোয়। তারা এদেশের মানুষের রক্ত শুষে খাচ্ছে। ব্যবসায় ও বাণিজ্য, শিল্প ও খনিজ সম্পদের উপর তাদের একচেটিয়া প্রভাব ও অধিকার। এই পরিস্থিতি তাকে বিভিন্ন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করে। উৎসাহিত করে বিভিন্ন কল-কারখানা গড়ে তুলতে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে সে দেশের ইঞ্জিনিয়ারদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করে, যারা কাজ করবে বিভিন্ন কারখানা ও ফ্যাক্টরিতে, যারা জাতিকে মুক্ত করবে বিদেশিদের হাত থেকে। তার এই উদ্যোগ ও প্রয়াস ইউরোপিয়ান কোম্পানি ও উপনিবেশবাদীদের চোখে লাগে। তারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে ব্যর্থ ও অবৈধ ঘোষণা করার ষড়যন্ত্র আঁটতে থাকে। অপর দিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নুকরাশি পাশার সঙ্গে ইখওয়ানের মতবিরোধ দেখা দেয়। ইখওয়ানরা তার বিরোধিতা করতে শুরু করে। পরিশেষে প্রেসিডেন্ট তাকে পদত্যাগ করতে বলে। তখন সে তার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেয়। হাসান ও তার সংস্থার সাথে নুকরাশি পাশার শত্রুতার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। পরবর্তী সময়ে তাকে এই পদে পুনর্বহাল করা হয়। কিন্তু ততদিনে ফিলিস্তিনে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অপর দিকে ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। তারপর নুকরাশি পাশার হত্যা ও হাসানের

শাহাদাতের ঘটনা ঘটে, যা সকলেই জানে। আপনাদেরও জানা থাকার কথা।

শায়খ আহমদ তার প্রিয় সন্তান ও কলিজার টুকরার কাহিনী অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে শোনান যেন তিনি কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করছেন। তার সাহসিকতা আর ঈমানি শক্তি দেখে আমরা হতবাক হই। দাওয়াত ও জিহাদের পথে তার ছেলের শাহাদাতের উপর তিনি সওয়াবের আশা রাখেন। এত মর্মন্তুদ ট্রাজেডি ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও তার ধৈর্য ধরা ও সত্যের উপর অটল অবিচল থাকা প্রমাণ করে তিনিও একজন জানবাজ বাহাদুর মুজাহিদ। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আমার মনে পড়ছে। এসব ক্ষেত্রে হযরত আলি রহ. আবৃত্তি করতেন,

'যদি জিজ্ঞাসা কর, কেমন আছ তুমি? তা হলে,
জামানার নানা দুর্যোগ দুর্ঘটনার উপর আমি অটল ধৈর্যশীল।
তবে আমার জন্য কঠিন হল, তুমি যখন আমার উপর কোনো কঠিন
বিপদ দেখ আর আমি দুর্বলতা প্রকাশ করি।
দুশমন তখন হাসতে শুরু করে, প্রিয়জনেরা পেরেশান হয়ে পড়ে।'[১]

তারপর আমরা তার থেকে অনুমতি নিয়ে বাসায় চলে আসি।

উলুবাহ পাশার সঙ্গে কথাবার্তা

বিকেল চারটায় আমরা বন্ধুবর আহমদ উসমানের সঙ্গে মুহম্মদ আলি উলুবাহ পাশার খেদমতে উপস্থিত হই। ১৯৩৩ সালে তিনি মুফতি আমিন আলহোসাইনীর সঙ্গে ভারতে গিয়েছিলেন। তখন লখনৌতে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায়ও তিনি এসেছিলেন। লখনৌতে থাকাকালীন আমি তার সঙ্গে দেখা করার জন্য হোটেল বারলিংটনে যেতাম। তখন আমার বয়স ছিল বিশ বছর। নয়া মিসরে আমরা তার সঙ্গে দেখা করি। আঠারো বছর পূর্বে তাকে যেমন দেখেছি এখন তার চেয়েও বেশি সুস্থ-সবল মনে হল। প্রথমে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না ইনি কি তিনিই না অন্য কেউ। পরে জানতে

---

১ فإن تسألني كيف أنت فإنني: صبور على ريب الزمان صليب
يعز على أن تري بي حكابة فيشمت عاد يساء جيب

পারলাম তিনি আমেরিকা গিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন। যার ফলে পূর্বের চেয়ে তার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য বহুগুণে বেড়ে গেছে। তিনি আমাকে গভীরভাবে দেখতে দেখতে বেরিয়ে এলেন, মনে হল তিনি এমন কাউকে চেনার চেষ্টা করছেন, যাকে কোথাও দেখেছিলেন।

তার সাথে আমাদের আলোচনা হয়। প্রথমে তিনি তার দারুল উলুম সফরের কথা বললেন। সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। পাকিস্তান সম্পর্কে তার নিজের চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং সেদেশের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক করার জন্য তার সরকারকে মনোযোগী করার বিষয়টিও আলোচনায় আনলেন। মিসর সরকারকে তিনি পাক-ভারতে নিজস্ব অর্থানুকূল্যে দীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।

পাক-ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান সম্পর্কে তার অভিমত

তিনি বললেন, ভারত, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের কাছ থেকে কিছু আশা করা যায়। কারণ, তাদের মাঝে পাওয়া যায় ঈমানি জজবা, দীনী অনুপ্রেরণা ও দুঃসাহসিকতা। তা ছাড়া আরববিশ্বের মূল চাবিকাঠি ইত্তেহাদ ও একতা। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তাদের মাঝে ততটা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা পাওয়া যায় না। তারপর বললেন, প্রাচ্যের এসব দেশ, যার আমি আলোচনা করেছি, নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য ও অধিক জনবল থাকা সত্ত্বেও মিসরকে মুসলিমবিশ্বের কর্ণধার মনে করে থাকে। অথচ পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী এমন এক দেশের শিক্ষামন্ত্রী যেখানে মিসরের চাইতে চারগুণ মুসলমানের বসবাস। তার এসব বলার উদ্দেশ্য হল মিসরকে দীন ও ইসলামের ক্ষেত্রে আমাদের ইমাম হিসেবে প্রমাণ করা। আমার দৃষ্টিতে মিসর সরকারের রাজনৈতিক কল্যাণ ছিল এসব নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তুলে সেখানে নিজের একটা শক্ত অবস্থান দাঁড় করিয়ে নেওয়ার মধ্যে। আমরা তার নিকট থেকে বেরিয়ে অধ্যাপক ইসমাইলের ওখানে নামাজ আদায় করলাম। তারপর তার গাড়িতে করে 'আতাবায়ে খাদরা' নামক স্থানে চলে এলাম।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমরা আজহারের অফিসে গেলাম। ফরিদ অজদীকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়ের একটি কপি উপহার দিয়ে বললাম, আমার অনুরোধ, আপনি 'আলআজহার' ম্যাগাজিনে এই বই সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখবেন। তিনি আমাকে প্রতিবেদন লেখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সূচিপত্র পড়ে বই সম্পর্কে নিজের সন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিছুক্ষণ পর মুহম্মদ ফুয়াদ আবদুল বাকি এলেন। তিনি তার تيسير المنفعة بكتابى مفتاح كنوز السنة والمعجم المفهرسالالفاظ الحديث النبوى[1] কিতাবের একটি কপি আমাকে দিলেন। আরেক কপি সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর নিকট পৌঁছিয়ে দিতে বললেন।

শায়খ মুহম্মদ গাজালীর সাক্ষাত

শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার দীর্ঘ .দিনের স্বপ্ন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের একজন উল্লেখযোগ্য রোকন। মিসরের বর্তমান চিন্তা-বিপ্লবের অধিনায়ক। আমার এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। আমি 'ইসলাম ও সাম্যবাদ', 'আক্রান্ত মুসলিম উম্মাহ' ও 'শিক্ষার উৎস' গ্রন্থের লেখকের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি। আমি সাক্ষাত লাভ করেছি এমন এক লেখক ব্যক্তিত্বের, ইখওয়ানরা যার কাছ থেকে পেয়েছে এক মহান বিপ্লবী চিন্তা। পেয়েছে রুহানি খোরাক ও বিশুদ্ধ ইসলামি সাহিত্য। তার সাক্ষাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি একজন সুশিক্ষিত, কর্মঠ, সুস্থ চিন্তার অধিকারী সহৃদয় মানুষ দেখলাম, যার মুখাবয়ব থেকে নুর চমকাচ্ছে। তার সঙ্গে সাক্ষাত করে জানতে পারলাম আমাদের প্রত্যেকে একে অপর সম্পর্কে লেখনীর মাধ্যমে অবহিত। তার গ্রন্থসমূহে আমি তার চিন্তা-চেতনা, নীতি ও আদর্শের চিত্র দেখেছি। আজ রেডিওতে তিনি ভাষণ দিবেন। হযরত হোসাইন রা. এর জন্মদিনে আজহারের শায়খ ও ওয়ায়েজগণের দীনী বিষয়ে আলোচনা রেডিওতে সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরাও তাদের সঙ্গে যাই।

---

[1] এটি 'মিফতাহু কুনূযিস-সুন্নাহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ

হযরত হোসাইন রা. এর জন্মদিন

এই দিনগুলোতে মিসরে হযরত হোসাইন রা. এর জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। এই সময় কায়রোর অলিতে-গলিতে জমকালো আলোকসজ্জা, রঙারঙি, রকমারি ফুল, নানা স্বাদের মিষ্টান্ন ও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। একদিকে দেখলাম একজন রুটি বণ্টন করছে। সেই রুটি নেওয়ার জন্য ধনী-গরিব সকলেই ভিড় জমাচ্ছে। ওদিকে অনুষ্ঠান সাজানো হয়েছে। রাস্তার দুধারে রয়েছে সারি-সারি দোকান। আলোয় ঝলমল করছে। এ ছাড়া এই সময় কায়রোর সব জায়গায় গ্রামের মানুষের জমায়েতও দেখা যায়। তারা হযরত হোসাইন রা. এর মেহমান। এই মজলুম শহিদের জশনে জুলুসে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তারা এসেছে। তাদের মধ্যে কতক লোক সেই জায়গা জিয়ারত করতে এসেছে যেখানে হযরত হোসাইন রা. এর কথিত মাথা মোবারক সমাহিত। অথচ তার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে এর কি কোনো ঐতিহাসিক বাস্তবতা আছে? কীভাবে তার মাথা কায়রো পৌঁছুল, কবে আনা হল, কে আনল, এসবের কি কোনো হদিছ আছে? এই সম্পর্কে শহরের আহলে ইলমদেরও কোনো মাথাব্যথা নেই। সাধারণ মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ হওয়াকেই দলিল ও আমলযোগ্য মনে করা হচ্ছে এবং এর উপরই শরিয়তের ভিত্তি রাখা হয়েছে।

এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে। একবার এক মহিলা তার সন্তানকে হত্যা করে ফেলে। তারপর তার মাথা দেহ থেকে কেটে হযরত হোসাইন রা. এর মাথার স্থানে রেখে দেয়। আর সেখান থেকে হযরত হোসাইন রা. এর মাথা নিয়ে এসে মিসরে দাফন করে দেয়। যাতে তার সমাধি লাভের মর্যাদা মিসরের অর্জিত হয়। মিসরিরা এই মহিলার অনেক সম্মান করে। তার কবরও জিয়ারত করে। হযরত হোসাইন রা. এর মাথার পাশেই তাকে দাফন করা হয়েছে। আসরের নামাজের পর আমরা শায়খ মুহম্মদ হামিদ ফকীর ওখানে যাই। মাগরিব পর্যন্ত তার জন্য অপেক্ষা করি। মাগরিবের পর তার সঙ্গে দেখা হয়। এশার নামাজ পড়ে আমরা ফিরে আসি।

সকাল থেকে মনটা ভাল যাচ্ছে না। রাতে লেখায় ব্যস্ত ছিলাম। শিরোনাম ছিল 'শোন হে মিসর'। বিষয়টি মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ফলে রাতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারিনি। এটা শুধু আজই না। যখনই কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তখন আমার এই অবস্থা হয়। রাতে একটু বিলম্বে শুয়েছিলাম। আবার ঘুম আসতে না আসতেই জেগে উঠি। তাই আজ মেজাজটা একটু ঢিলেঢালা ছিল। জোহরের পূর্বে শায়খ সালেহ ইশমাবীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। দীর্ঘদিন গত হয়েছে তার সাথে সাক্ষাত করেছি। বহুদিন যাবৎ তার সঙ্গে সাক্ষাত হচ্ছে না। মিসরে হাতেগোনা কয়েকদিন থাকব। এখানে থাকার সময় নির্ধারিত। এর মধ্যে তার সাথে দেখা না হওয়া সত্যিই দীর্ঘ সময় মনে হয়। যদি আমরা ঈমানি জজবায় পরিপূর্ণ ইসলামি চিন্তাবিদদের সঙ্গে দেখা করতে না পারি তা হলে মিসরে আমাদের থাকার সার্থকতা কোথায়?

যাই হোক, আমরা 'আদ্‌দাওয়াহ'র অফিসে গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করি। তার নিকট অল্পক্ষণ বসে ছিলাম। তার কাছে আমাদের একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- তিনি যেন আমাদেরকে এখানকার বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি সাক্ষাত করানোর প্রতিশ্রুতি দেন। একটি বই লেখা ও ছাপার কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আজ আমাদের সাথে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে ওজর পেশ করেন। বই প্রকাশ করা সত্যিই বড় ব্যস্ততার কাজ।

আমরা শায়খ আহমদ উসমানকে ফোন করে আমাদের এখানে আসার অনুরোধ করি। যাদের সঙ্গে আমরা সাক্ষাত করতে চাই তিনি আমাদেরকে যেন তাদের কাছে নিয়ে যান। কারণ আমরা তাদের কারো ঠিকানা জানি না।

আলফাতাহ্ ও তার সম্পাদক

আসরের সময় আমরা আলফাতাহ সাময়িকীর সম্পাদক প্রফেসর মুহিব্বুদ্দীন আলখতিবের সঙ্গে দেখা করতে 'জাজিরায়ে রওজা'য় যাই। আলফাতাহ ও তার সম্পাদকের সাথে আমার পরিচয় অনেক পুরনো। এই পরিচয় প্রায় বিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমি যখন ড. শায়খ তকিউদ্দীন হেলালী মারাকেশীর ছাত্র ছিলাম তখন ম্যাগাজিনটি দারুল

উলুমের ছাত্রসংগঠন আনত এবং আমাদের ঘরেও নিয়মিত আসত। ওটি আমাদের খুব প্রিয় ম্যাগাজিন ছিল। এতে আমির শাকিব আরসালান[১] ও শায়খ হেলালী নিয়মিত লিখতেন। আমার এবং আমার সঙ্গী মাওলানা মাসউদ আলম নদবীরও দুয়েক কলম লেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সেসময় আমার কয়েকটি গবেষণাপ্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। একটির শিরোনাম ছিল 'সময়ের ভাষা'। এতে ভারতের প্রসিদ্ধ কবি আকবর এলাহাবাদীর পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সমালোচনায় লেখা বিভিন্ন কবিতার অনুবাদও তুলে ধরেছিলাম। কবিতাগুলো ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও সাহিত্যের সমন্বয়ে ছিল।

শায়খ মুহিব্বুদ্দীনের বহু লেখা আমি পড়েছি। আলহাদিকা[২] বা বাগিচা গ্রন্থের কিছু অংশ পড়েছি। এটি আমাকে আধুনিক বিশুদ্ধ ইসলামি আরবিসাহিত্য সম্পর্কে অবগত করেছে। এদ্দ্বারা আমি বহু নতুন সাহিত্যিক সম্পর্কেও জেনেছি। অনুরূপ আয-যাহরা[৩] [মনোহর] গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ড পড়েও অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি।

মুহিব্বুদ্দীন খতিবের সঙ্গে সাক্ষাত

আমরা 'রওজা'য় যাই। এলাকাটি শহরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত। আমাদের সঙ্গী আহমদ উসমান বললেন, তিনি পৃথিবীর শেষ মেরুতে থাকেন। তার সঙ্গে কে দেখা করবে? আমি বললাম, তার সঙ্গে মুহিবই [যে তাকে ভালবাসে] দেখা করবে। তার সাথে দেখা হতেই আমার সেই সময়ের কথা স্মরণ হয়ে যায় যখন ছিল আমার ভরা যৌবন। জীবনের পাতা ছিল একেবারে স্বচ্ছ, অমলিন। আমি তাকে আলফাতাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, যখন সরকার আলফাতাহর পাঠকদের

---

[১] আমির শাকিব আরসালান ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য, লেখালেখি ও রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। তাই শায়খ মুহম্মদ আবদুহু ও জামালুদ্দীন আফগানীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উভয়ের মন-মানসিকতায় গড়া শাকিব আরসালান মুসলিমবিশ্বের উন্নতিকল্পে সারাজীবন লেখালেখি ও সাহিত্য রচনা করে গেছেন। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বৈরুতে ইনতেকাল করেন।

[২] الحديقة।

[৩] الزهراء

অপরাধী হিসেবে গণ্য করতে শুরু করল, তাদের ঘরবাড়িতে তল্লাশি শুরু করল এবং আলফাতাহ্ যারা রাখবে তাদেরকে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বলে ঘোষণা করল তখন থেকে পত্রিকার কাজ বন্ধ করে দিই। এ কথার দ্বারা তিনি ইখওয়ানদের দেশান্তরিত করা এবং তাদের ঘরবাড়ি তল্লাশি করার দিকে ইঙ্গিত করেন। তারপর তিনি পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে নিজের সম্পর্কহীনতা, এ দেশে জন্মগ্রহণ করেও ভিনদেশি হয়ে থাকা এবং তার নিরুৎসাহ অন্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন। আলোচনার মাঝে কথা টেনে নিয়ে আহমদ উসমান এখানকার কতক সাহিত্যিক ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত করানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন তিনি তাদের মাঝে সুযোগসন্ধানী ও চাটুকারদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, তারা বহুরূপী মানুষ। তবে তাদেরকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয় তা তারা পূর্ণ দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে সমাপ্ত করে থাকে। তাদেরকে যদি বলা হয় বাদশার আকৃতি তৈরি করতে অথবা তাদেরকে যদি বলা হয় বাদশার আকৃতি ধারণ করতে তখন তারা কোনোরূপে লৌকিকতা ছাড়া এত দক্ষতা ও রাজকীয়ভাবে সঙ্গে সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করবে যে, দর্শকদের দেখামাত্রই শতভাগ বিশ্বাস হয়ে যাবে যে, হ্যাঁ, ইনিই বাদশা।

আর সাহিত্যিকদের অবস্থা হল এই যে, যদি তাদেরকে বলা হয় কুরআনের দর্শন নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করুন তখন তারা অত্যন্ত সুচারুরূপে তা লিখে দিবে। এমনিভাবে রাসুল সা. এর জীবন ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ্রন্থ রচনা করতে বললেও তারা অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিবে। আবার যদি কোনো বাদশার জীবনী লিখতে বলা হয়, তা হলে তারা বাদশাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এবং তার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশায় তাদের এই যোগ্যতা দিয়ে সূক্ষ্মভাবে তা লিখে দিবে। এমনকি কুরআন-হাদিসের মূলনীতির বিরুদ্ধে কিছু লিখতে বললেও লিখতে তাদের বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হবে না।

তারপর বললেন, একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। ঘটনা বর্ণনাকারী একজন বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তখন ওই সাহিত্যিক তাকে বলেছে যে, যদি মুহম্মদও মিসরে চলে আসে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামি আইন বাস্তবায়ন করতে চায়, তা হলে আমিই সর্বপ্রথম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের

হব। নাউযুবিল্লাহ।

আসলে অবস্থা অনেকটা এমনই। জনাব মুহিব্বুদ্দীন যা বলেছেন তা বাস্তব সত্য। আজকাল বহু লেখক ও সাহিত্যিকের মাঝে এই বিষয়টি পাওয়া যায়। তারা ইসলামের কোনো বিষয়ের উপর লেখাকে নিজেদের পেশা এবং অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছেন। এটা শুধু মিসরেরই অবস্থা না বরং অন্যান্য মুসলিম দেশের এই একই দশা। মুহিব্বুদ্দীন আমার প্রবন্ধ 'সময়ের ভাষা'র ছাপানো কাগজগুলো দেখালেন। এই পুরনো লেখা দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত হই; কোনো মানুষ অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত হলে যেমন খুশি হয়ে থাকে। আমি লেখাটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম। লেখাটি তিনি প্রকাশ করেছেন। কিছু অংশ এখনো বাকি রয়েছে।

শায়খ আহমদ উসমান বললেন, আপনার কি হযরত হোসাইন রা. এর জশনে জুলুস ঘুরে দেখার আগ্রহ আছে? আমি রসিকতা করে বললাম, কেন নয়, অবশ্যই। আপনার মতো সুন্নতের অনুসারী, বেদআতের প্রতি ঘৃণা প্রকাশকারী ব্যক্তিত্ব আমার সাথে থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের এই জশনে জুলুসের কারণ সম্পর্কে জানা, যা মিসরে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়। পাশাপাশি তাদের দীনী অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া।

হযরত হোসাইন রা. এর জশনে জুলুস

জনাব আহমদ উসমানের সাথে প্রথমে আমরা একটা অনুষ্ঠানে যাই। হযরত হোসাইন রা. এর স্মরণে 'কুব্বাতুল গাওরা'য় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল মিসরের দুটি কোম্পানি। একটি শারকি বস কোম্পানি, অপরটি সায়িদ বস কোম্পানি। আমরা শুনেছি শায়খ সাবি শালান এই অনুষ্ঠানে কাসিদা পাঠ করবেন। আমরা সভাস্থলে পৌঁছে দেখি, লোকজনের উপস্থিতি একেবারেই নগণ্য। অথচ চারদিক এত জাঁকজমকপূর্ণ যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। প্রথমে আবদুস সামাদ খলিল আগে বেড়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন। আওয়াজ বাড়ি খাচ্ছিল। লাউডস্পিকার ছিল অনেক। একজন কারী অনুষ্ঠানের ভিতর তেলাওয়াত করছেন। আরেকজন অনুষ্ঠানের বাইরে। লাউডস্পিকারের মাধ্যমে তার আওয়াজ বুলন্দ করা

হচ্ছে। ফলে আয়াত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। খুশু'-খুজুর আর বিনয়-একাগ্রতার কথা কী বলব! তারপর আজহারী ওয়ায়েজদের প্রধান প্রফেসর হাসান সকর স্টেজে এসে মিলাদের উপকারিতা আলোচনা করেন। অনৈসলামিক কার্যকলাপ আর মানুষের হৈ-হুল্লোড়ে টিকতে না পেরে সেখান থেকে ভগ্নহৃদয়ে বেরিয়ে আসি। শায়খ সাবি শালানের সাথে দেখা করার জন্য মসজিদে হোসাইনের দিকে রওনা হই। রাস্তায় ছিল প্রচণ্ড ভিড়। কেউ মসজিদে হোসাইনের জিয়ারত করতে যাচ্ছে। কেউ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন দৃশ্য দেখছে। আবার কেউ ছুটছে আপন গন্তব্যের উদ্দেশে। পথ হারানোর ভয়ে আমরা একে অপরের হাত ধরে চলতে থাকি। অনেক কষ্টে মসজিদের নিকট পৌঁছুই। মসজিদে একটি জিকিরের আসর দেখতে পাই। তবে তাদেরকে জাকেরিনের তুলনায় শরীরচর্চাকারী টিমের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ মনে হল। পরে জানতে পারলাম, তাসাউফের কোনো এক সিলসিলার সাথে তাদের সম্পর্ক আছে। আহমদ উসমান বললেন, আরেকটু ঘুরে তার পর এখানে আসব।

আমরা ওই শিশুর মায়ের মাজারে[১] যাই। যে নাকি হযরত হোসাইন রা. এর মাথা বয়ে এনেছিল। যেমনটি সাধারণ মিসরীয়দের বিশ্বাস। মাজারের এই রাস্তায় চলছিল বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা, মানুষের শোরগোল আর হৈ-হুল্লোড়। রাস্তার দুপাশ ধরে পসরা সাজিয়ে বসেছে বিভিন্ন ধরনের সারি সারি দোকান। মানুষের উপচেপড়া ভিড়। তিলধারণের জায়গাটুকু নেই। এরই মাঝে কতক লোক আগুনের মশাল নিয়ে দৌড়াচ্ছে। কারো গায়ে আগুন লাগে কি না এ ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। চলছে যুবশ্রেণীর র‍্যালি, শোভাযাত্রা। একে অপরকে ধাক্কা দিয়ে রেলগাড়ির ন্যায় রাস্তা ফাঁকা করে চলে যাচ্ছে। এখানে আমরা মদের উৎকট গন্ধও পাই। ভিড় ঠেলে সামনে অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করলাম না। আল্লাহর

---

[১] মিসরে জনশ্রুতি রয়েছে দামেশকে হযরত হোসাইন রা. এর মাথা মোবারক পড়ে থাকতে দেখে এ মহিলার মনে আগ্রহ জন্মে যে, এর সমাধি লাভের সৌভাগ্য মিসরের হোক। তখন সে তার ছেলের মাথা কর্তন করে সেখানে রেখে দিয়ে হযরত হোসাইন রা. এর মাথা নিয়ে কায়রো চলে আসে। তারপর এখানে এই মাথা সমাহিত করা হয়। কাহিনীটির কোনো দালিলিক ভিত্তি নেই। কারো যুক্তিতেও ধরে না। ইবনে তাইমিয়া রহ. কাহিনীটির অসাড়তা ও ভিত্তিহীনতার উপর একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন।

পানাহ চেয়ে উল্টো ফিরে এলাম। মসজিদে পৌঁছে দেখতে পাই, সেই লোকগুলো এখনো জিকির করছে। তবে তারা এমনভাবে নড়াচড়া করছে, দূর থেকে কেউ দেখলে ভাববে তারা শরীরচর্চা করছে। নাক দিয়ে তারা জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিচ্ছে। শ্বাস নেওয়ার পাশাপাশি সকলে তাদের দেহকে কোমর পর্যন্ত ঝুকাচ্ছে। আবার কুঁজো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এতে অল্পক্ষণের মধ্যে তাদের দুর্বল হয়ে পড়ার কথা। মজলিসের মধ্যখানে একজন শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবক। মাথায় ফেজ টুপি। সে কোনো এক বুজুর্গের কাসিদা পাঠ করছে। কাসিদার কিছু কবিতার মতলব ছিল, 'আমার গোপন ভেদ যদি ওই দূরের পর্বতমালার উপর রাখা হয় তা হলে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সমুদ্রের উপর রাখা হলে সমুদ্র শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হবে। যদি কোনো মুর্দার উপর রাখা হয়, আমাদের মালিকের নির্দেশে সে জিন্দা হয়ে যাবে।' এ জাতীয় অর্থবিশিষ্ট আরও অনেক কবিতা। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব দৃশ্য দেখছি। হঠাৎ দেখি এক বৃদ্ধের উন্মাদনা শুরু হয়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে সকলের সাথে মুআনাকা করল। তারপর ধীরে ধীরে তার অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এল। আমরা এক ব্যক্তিকে বলতে শোনলাম, 'উনি নবীজির আশেক'। পরে জানতে পারলাম এসব লোক 'শান্নাবিয়া আহমদিয়া' তরিকার সাথে সম্পর্ক রাখে। মসজিদের অপর পাশে আরেকটি মজলিস দেখি। লোকজন বলল, তারা 'বায়ুমিয়্যা' তরিকার লোক।

যে দৃশ্যে আমি মর্মাহত

আমরা এই ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে রাস্তা পার হয়ে আসি। আসার পথে এমন কিছু দোকান সামনে পড়ে যেগুলোতে ছোট ছোট মজলিস চলছিল। এসব মজলিসে গায়ক, কারী, বক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোক ছিল। তারা সকলে আপন-আপন বিষয়ে জনগণকে মাতিয়ে রাখছে। কোনো কোনো মজলিসে সুরেলা কণ্ঠে উঁচু-নিচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত হচ্ছে। আবার কোথাও কাসিদা পাঠ হচ্ছে। কোথাওবা বিভিন্ন ধরনের কাহিনী-গাথা বর্ণনা করা হচ্ছে। লোকজন তা খুব করে শোনছে আর এদিক সেদিক দোলছে। একবার শেষ হলে দ্বিতীয়বার বলার জন্য চিৎকার দিয়ে উঠছে।

কোনো দীনদার সুস্থ মস্তিষ্ক ও সংবেদনশীল ব্যক্তি এসব কর্মকাণ্ড গ্রহণ

করতে পারে না। এসব দেখে সে অবশ্যই লজ্জিত ও মর্মাহত হয়ে সেখান থেকে চলে আসবে। এই দৃশ্য দেখে আমার কুরআনের একটি আয়াত মনে হয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا ওইসব লোকদেরকে পরিত্যাগ কর যারা দীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে। [সুরা আনআম, ৭০ আয়াত]। আফসোস! আজহারের ন্যায় জগতসেরা ইউনিভার্সিটির অদূরেই এসব কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ সংঘটিত হচ্ছে।

মুহম্মদ গাজালীর সঙ্গে

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আমরা শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর নিকট যাই। তিনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসা নিয়ে দেখা করেন। আমরা তার সাথে আলোচনা করি। দীন-ইলমসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। আলোচনায় তিনি এমন কতক লেখকের কথা তোলেন, যারা ইসলামি আইনের উপর কলম ধরেছে। ধর্মীয় কিতাবসমূহে বর্ণিত ইসলামের মৌলিক নীতিমালার বিরোধিতা করেছে। অথচ তারা দীনী পরিবেশেই লালিত-পালিত হয়েছে। আবার দীনী শিক্ষায়ই শিক্ষিত হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের এই দুঃসাহস দেখানোর কারণ কী? এর সম্পর্ক কি তাদের সত্তার সাথে না ওইসব ঘটনার সাথে, যা তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে। সাধারণত দীনের বিরোধিতা দীনদার লোকদের চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণে হয়ে থাকে, যা বর্তমানে অনেক দেশেই হচ্ছে।

ধর্ম-বিরোধিতার কারণ ধার্মিক লোকদের অসদাচরণ

মুহম্মদ আলগাজালী আমার কথার সত্যায়ন করে বললেন, ওই জাতীয় লেখকদের একজন সম্পর্কে আমি জানি। সে আজহারে আমার সহপাঠি ও বন্ধু ছিল। সে একটি দীনী সংগঠনের রোকন হয়। তার জীবন চলছিল একেবারে নিঃস্ব ও দারিদ্র্য অবস্থায়। অপর দিকে তার দীনদার রাজনীতিক সঙ্গীরা ছিল সচ্ছল। তারা ছিল অঢেল ধন-সম্পদের মালিক। কিন্তু তারা তার কোনো খোঁজ-খবর নেয়নি। দুয়েক মুঠো চাল দিয়েও তারা তার

সহযোগিতা করেনি। বন্ধুত্বসুলভ আচরণ দূরের কথা, মানবতাসুলভ ব্যবহারও তারা দেখায়নি। এই পরিস্থিতি তাকে বিগড়ে দিয়েছে। ফলে দীনদার লোকদের প্রতি তার ধারণা পাল্টে গিয়েছে। একবার এই ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রীয় পদে লোক নিয়োগ দেওয়ার দায়িত্ব আসে। তখন সে দীনদার লোকদের তুলনায় বদ-দীন ব্যক্তিদেরকেই নিয়োগ দিতে লাগল।

শায়খ গাজালী যা বলেছেন তা ওইসব ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা কোনো দীনী পরিবেশে বড় হয়ে পরবর্তী সময়ে দীনের শত্রু হয়ে গেছে। মানুষ যদি অনুভূতিসম্পন্ন ও হুশিয়ার হয়, তা হলে এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন এনে দিবে। সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কসের সঙ্গে এ জাতীয় ঘটনাই ঘটেছে। দীনের সাথে বৈরিতা পোষণকারী ব্যক্তিদের অধিকাংশের পথচ্যুত হওয়ার এটাই সর্বপ্রধান কারণ।

তারপর ইউনিভার্সিটির শিক্ষাব্যবস্থা, সেখানকার অধ্যাপক ও কতক লেখক-সাংবাদিক সম্পর্কে আলোচনা হয়। শায়খ গাজালী আফসোস করে বলেন, তাদের মধ্যে এমন অনেক শিক্ষিত লোক রয়েছে, যারা গভীর ও সুদূরপ্রসারী জ্ঞানের অধিকারী, যাদের অধ্যয়নের পরিধি সুবিস্তৃত। তাদের কেউ কেউ আবার লোকসমাজে 'জীবন্ত জ্ঞানকোষ' হিসেবে পরিচিত। তারা ইতিহাস, ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মুসলমানদের উত্থান-পতন সম্পর্কে এমন কিছু গ্রন্থ রচনা করেছে, যা পাঠকসমাজে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। কিন্তু তাদের আমল একেবারে শূন্যের কোঠায়। নামাজের প্রতি তাদের তেমন গুরুত্ব দেখা যায় না। আমার আশংকা হয়, না জানি তারা মুরজিয়াদের মতাদর্শ গ্রহণ করে বসে। তারপর তারাও মুরজিয়াদের ন্যায় আমলকে বর্জন করে বসে। এই ধরনের লোকের শিক্ষকতার ব্যাপারে আমার অন্তর মোটেই সায় দেয় না। ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও আমি সংশয়ে ভুগছি, যার শিক্ষাব্যবস্থা ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয়ে পরিচালিত। এসব প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হল এমন কিছু ব্যক্তি তৈরি করা, যারা দীনী ইলমের পাশাপাশি দুনিয়াবি জ্ঞানেও পারদর্শী হবে। কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে দীনের তুলনায় দুনিয়ার প্রাধান্য থাকে বেশি। তাদের ছাত্রদের মাঝে বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় না।

আজহারের শিক্ষাব্যবস্থা

মুহম্মদ আলগাজালী আজহারের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, আজহার ইসলামের মূলনীতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং এর সামগ্রিকতা নিয়ে আলোচনা ছাড়া অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও অনর্থক বিষয় নিয়ে ঘাটাঘাটির পিছনে প্রচুর সময় নষ্ট করে। সেখানে দীনের প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা একেবারেই কম। আমি বললাম, তা হলে আজহারের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ দিক দিয়ে? তিনি বললেন, আব্বাসীয় যুগে আমদানি করা দর্শন, বিজ্ঞান ও ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজহার উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

দীনী দাওয়াত ও মাজহাবী বিরোধ

এ বিষয়ে আমরা উভয়ে একমত যে, যেসব দীনী দাওয়াত শুধু মানুষের ইসলাহের উদ্দেশ্যে হবে, তা মাজহাবী মতবিরোধ থেকে মুক্ত রাখা উচিত। সেখানে ফিকহের এমন কোনো বিষয় আলোচনা করা সমীচীন নয় যাতে আলেমদের মাঝে ইখতেলাফ রয়েছে। এই অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে শায়খ গাজালী বললেন, হয়তো আপনি অনুভব করেছেন যে, যখন আমি আমার গ্রন্থে এমন কোনো মাসয়ালা উল্লেখ করি, যাতে ব্যাপকতা রয়েছে, তখন খুব সতর্কতার সাথেই তা বর্ণনা করি। কারণ, মতবিরোধে পড়ে থাকলে মুসলিম উম্মাহ কখনো উন্নতির সুউচ্চ সোপানে পৌঁছুতে পারবে না। তারপর তিনি বললেন, ওইব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী অভিমত যে একটি বই লিখে তার নাম দিয়েছে 'উম্মাহর উন্নতি ও কল্যাণ ইমামের পিছনে কেরাত পড়ার মধ্যে?' নামটি শুনে আমরা সবাই হেসে ফেললাম।

হিজাব সম্পর্কে শায়খ গাজালীর দৃষ্টিভঙ্গি

শায়খ মুহম্মদ গাজালী পর্দার ব্যাপারে মধ্যপন্থা পছন্দ করেন। তার দৃষ্টিভঙ্গি হল, শরয়ী পর্দা এমন হওয়া উচিত যাতে মহিলারা দীনের খেদমত, উন্নয়ন ও সেবামূলক কার্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারপর ইখওয়ানদেরকে গ্রেফতার ও দেশান্তরিত করার সময় কীভাবে মেয়েরা কাজ করেছে তা শোনালেন। গ্রেফতারকৃত ইখওয়ানদের পরিবারকে তারা কীভাবে আশ্রয় দিয়েছে। তারাই কয়েদি ও তাদের পরিবারের মাঝে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল। এসব বীরাঙ্গনা নারী না হলে তাদের পরিবারকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হত। তারপর বললেন, পর্দা এই

পরিমাণ হবে, যা তাদেরকে আবৃত রাখে। অর্থাৎ এমন ঢিলেঢালা পোশাক হবে, যা খোদাভীরু মহিলার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়।

দীনের জন্য আত্মবিসর্জনের স্পৃহা

শায়খ গাজালী আমার এই মতের সাথে একমত হলেন যে, মিসরের মানুষ, বিশেষ করে যারা গ্রামে বাস করে, সকলেই নির্ভেজাল কাঁচামালের ন্যায়। তাদেরকে যদি সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে গড়ে তোলা যায়, তা হলে তাদেরকে দিয়ে অনেক কাজ নেওয়া যাবে।

তারপর আমরা অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, যার সম্পর্ক সকল ইসলামি দলের সঙ্গে। দীনের উন্নতির জন্য যারা চেষ্টা করে যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে। বিষয়টি হল দীনী জজবা এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও আত্মবিসর্জনের স্পৃহা সবসময় একরকম থাকে না। কখনো প্রবল থাকে আবার কখনো এর মধ্যে ভাটা পড়ে, যা সকল ইসলামি দলের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে এ জজবা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতায় কম-বেশ হবে না? এ ব্যাপারে কতক অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত হল, দলের সদস্যদের রুহানি খোরাকের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের মাঝে জিকিরের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের জন্য নিয়মিত এমন কিছু মামুলাত নির্ধারণ করতে হবে, যা তাদের দীনী জজবা সতেজ রাখবে। তাদেরকে জ্বালাবে, আলোকিত করবে, আলোড়িত করবে। নিঃস্পৃহ করবে না। সারকথা হল একটি ইসলামি দলের এসব দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ এটিই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। এটিই জীবন চলার পথে শক্তির যোগান দিবে।

আলোচনার পর আমরা তার নিকট বিদায় চাইলাম। এই আশার উপর তিনি আমাদেরকে বিদায় দিলেন যে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি আবার একত্রে মিলিত হব।

একজন শতায়ু ফিলিস্তিনির সাক্ষাত লাভ

আসরের নামাজের পর আমরা বন্ধুবর সাইয়েদ ইয়াসিন শরিফের পিতামহ শায়খ আরিফ বিন আবদুর রহমান শরিফের সঙ্গে দেখা করতে যাই। ফিলিস্তিনের অধিবাসী এই প্রবীণ মানুষটি পশ্চিম আকসার একটি

প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও পরিচালক ছিলেন। তার বয়স পঁচানব্বই বছর ছাড়িয়ে গেছে। শরণার্থীর ন্যায় নিজের কিছু সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে নয়া মিসরে থাকেন। আমাদের সাথে অত্যন্ত ভালবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে দেখা করেন। আমাদের সাক্ষাতে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন। আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। আর বারবার বলতে থাকেন, 'আমি ইসলামের খোশবু পাচ্ছি।' তিনি কিছুক্ষণ পর পর আরেকটি বাক্য বলতে থাকেন, 'হায় আফসোস, মসজিদে আকসা আজ মলিন!' তার এই বাক্যটি আমাদের হৃদয়ে ভীষণ প্রভাব ফেলে। চোখ অশ্রুসজল হয়ে পড়ে। তিনিও রুমাল দিয়ে চোখের পানি মুছতে থাকেন। তখনও ফিলিস্তিনে ধ্বংসযজ্ঞ চলছিল। মসজিদে আকসা ও হরমে ইবরাহিমের নুর ও বারাকাত নিয়েও বারবার আলোচনা করতে থাকেন। এতে স্থানদুটো দেখার এবং সেখানে নামাজ পড়ার তীব্র আগ্রহ আমাদের মাঝে সৃষ্টি হয়।

আমরা তার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করি। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি আমাদেরকে বিদায় জানাতে এগিয়ে এলেন। ফুয়াদ সরণী ও ইমাদুদ্দীন এভিনিউ হয়ে আমরা বাসায় চলে আসি। রোড দুটো খুব জাঁকজমকপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের মটর গাড়ির সয়লাব। রাস্তার ভিড় ঠেলে কোনোটা আসছে কোনোটা যাচ্ছে। আসার পথে একটি সিনেমা হলও চোখে পড়ল। হলটিতে ছবি চলছিল। গেইটে সারি-সারি বহু লোক দাঁড়ানো। তারা নিজের পালা আসার অপেক্ষা করছে। রাস্তার দুইপাশে নানা রকমের দোকানপাট। দোকানগুলির সাইনবোর্ড আরবিতে না হলে আমরা মনে করতাম, ইউরোপের কোনো শহরে আছি।

ড. মুহম্মদ গামরাদীর সঙ্গে কথাবার্তা

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

সকাল দশটায় আমরা ড. মুহম্মদ আহমদ বেগ গামরাদীর সাথে দেখা করতে 'আব্বাসিয়া' এলাকায় যাই। ছাত্রজীবনে ড. গামরাদীর 'জাহিলি সাহিত্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ'[১] গ্রন্থ পড়ে তার ব্যক্তিত্বের সাথে সর্বপ্রথম

---

[১] মিসরের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ও গবেষক লেখক ড. তহা হোসাইন 'জাহিলি সাহিত্যে' [আলআদাব আলজাহিলি' নামে একটি সমালোচনা গ্রন্থ লিখেন। গ্রন্থটি যুবসমাজের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। কিন্তু এদ্দ্বারা দীনদারমহল ভীষণ আহত হন। লেখক প্রাচীন আরবি

পরিচিত হই। তারপর তার লেখা বিষয়ভিত্তিক বহু প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন বইয়ের শুরুতে লেখা ভূমিকা ও মুখবন্ধ পড়ারও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এসব লেখা তার ধর্মীয় মর্যাদাবোধ ও চিন্তা-চেতনার জানান দেয়। তার সঙ্গে আমার দেখা করার বেশ আগ্রহ ছিল। আহমদ উসমান আমাদের সাক্ষাতের জন্য তার কাছ থেকে একটি সময় চেয়ে নিয়েছেন।

কতিপয় সাহিত্যিকের দীনবিমুখতার কারণ

আমি তাকে যেমন আশা করেছিলাম তেমন পেয়েছি। যেমন তার শিক্ষা-দীক্ষা তেমন ঈমানি বল ও জজবা। আমি তার সাথে ওইসব লেখক, কলামিস্ট ও সাংবাদিকের আলোচনা তুলি, যারা দীন থেকে দূরে চলে গেছে, যাদের এমন কিছু বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে যেগুলোতে ইসলাম ও ইসলামি আকিদাকে কটাক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি বললেন, এটা তাদের পূর্ব-প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে হয়েছে। আমি বললাম, তাদের মধ্যে অনেকে এমন আছে, যারা আজহারে পড়াশোনা করেছে। তিনি বললেন, আপনার কথা ঠিক। তবে তারা ছাত্রজীবনেই আজহারে ব্যতিক্রম চিন্তার লোক হিসেবে চিহ্নিত ছিল। কুরআন ও হাদিস পড়ে তাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হত না। তারা সবসময় আরবি সাহিত্য ও কাব্য নিয়েই ব্যস্ত থাকত।

সাহিত্যে ধর্মহীনতার প্রভাব

তিনি বললেন, আমাদের দেশের শিল্প-সাহিত্য দীর্ঘদিন থেকে বদ্দীনের শিকার। আবু নাওয়াসের মত কবিদের লেখা পাঠকসমাজে বেশি সমাদৃত। আর এসব লেখকের সাহিত্য পড়ুয়াদের কাছ থেকে এই আশা করা যায় না যে, তারা দীনদার ও ইসলামপ্রিয় হবে। তা ছাড়া এসব পাঠকের জীবন কাটে ভার্সিটির পরিবেশে। তার উপর তারা অধিকাংশ সময় ইউরোপ সফর করে থাকে। আমি বললাম, আপনি এই সময়কার মানুষ। এই

কাব্য সাহিত্যের শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে আপত্তি ও সংশয় উত্থাপনের প্রয়াস চালিয়েছেন। মূলত এটি ছিল চরম ইসলামবিদ্বেষী প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারার উৎকট প্রতিফলনমাত্র। ড. মুহম্মদ গামরাদী ছিলেন আধুনিক শিক্ষিত ও আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান। তিনি ড. তহার 'জাহিলি সাহিত্য' গ্রন্থের সমালোচনায় এটি রচনা করেন। আমির শাকিব আরসালান এই গ্রন্থের ভূমিকায় এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

পদ্ধতির প্রশিক্ষণের মাঝে লালিত-পালিত হয়েছেন। এরপরও এই ঘোলাটে পরিবেশ থেকে কীভাবে বেঁচে এলেন? আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনার আঁচলে এর সামান্য ছাপও নেই। তিনি বললেন, তাদের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। কারণ আমার বাড়ির পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ দীনী ও ইলমি পরিবেশ। তা ছাড়া আমার ভাই যখন আজহারে পড়াশোনা করতেন, তখন আমি তার সাথে আজহারে আসা-যাওয়া করতাম। আমি আজহার ও আজহারের স্টাফদের সেই জামানা দেখেছি, যা এই সময়ের চেয়ে উত্তম ও উন্নত ছিল। আমার বাড়ির পরিবেশ এবং সেই সময়টাই আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমি বললাম, দীন ও দীনদারদের সাথে তাদের বৈরিতার মূল কারণ সম্ভবত মুসলমানদের অধঃপতন এবং তাদের আপাত দুরবস্থা। কেননা যাদের অন্তরে ইসলামের শিকড় ভলোভাবে বদ্ধমূল হয়নি, তারা এই পরিস্থিতির শিকার হলে দীন ও দীনদারদের কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া স্বাভাবিক। তিনি কিছুটা সুর পাল্টে বললেন, যখন তাদের কাছে দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়া হয় তখন তারা বদ্দীনের সাথে কেন শত্রুতা পোষণ করে না। আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা যাকে তাওফিক দিবেন এটা সে-ই পারবে।

সাহিত্যের পরিবেশ কীভাবে দীনমুখী হবে?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সাহিত্যের মোড় দীনের দিকে ঘোরানো যায় কীভাবে? তিনি বললেন, ইসলামি আন্দোলন ও ইসলামি ভাবধারায় জীবন গঠনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে দীনের প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। কারণ, লেখক, কলামিস্ট ও সাহিত্যিকদের একটি চিরাচরিত নিয়ম হল, বাজারে যে জিনিসের চাহিদা বেশি, মানুষ যার প্রতি খুব উদগ্রীব তা তারা জাতির সামনে তুলে ধরে। মানুষ যখন দীনের দিকে ঝুকবে, দীনের ব্যাপারে তাদের অনুসন্ধিৎসু হৃদয় তৈরি হবে তখন লেখক-সাহিত্যিকেরা সেসব জিনিস তাদের সামনে তুলে ধরবে, যা তাদের নিকট পছন্দনীয়, এবং তাদের কাছে মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। আমি বললাম, আপনি আজহারের জন্য কোন্ বিষয়টি পছন্দ করেন?

আজহারের জন্য প্রস্তাব

তিনি বললেন, শায়খ জাওয়াহিরীর সময় আমি আজহারের শিক্ষকদের জন্য একটি ট্রেনিং সেন্টার খোলার প্রস্তাব করেছিলাম। সেখানে আজহারে

যেসব বিষয় পড়ানো হয় সেসব বিষয়ে ট্রেনিং দিয়ে যোগ্য শিক্ষক গড়ে তোলা হবে। এতে আজহারকে অন্তত শিক্ষক সঙ্কট নিয়ে হতাশায় ভোগতে হবে না। কারণ, অনেক সময় আজহারে এমন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় যারা বিরূপ ও ব্যতিক্রম চিন্তার ধারক, যারা আজহারের শান ও মান অনুযায়ী হন না, দীন ও দীনের মাপকাঠি সম্পর্কে যাদের পরিচ্ছন্ন মন-মানস থাকে না। এসব শিক্ষক আজহারের পরিবেশকে ঘোলাটে করে তোলে। সন্দেহের সৃষ্টি করে। দীনী মাপকাঠি, আকায়েদ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে ছাত্রদেরকে দ্বিধা-জড়তায় ফেলে দেয়। ফলে দীনের ব্যাপারে ছাত্রদের কুধারণা সৃষ্টি হয়। যারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হবে তারা বিজ্ঞানকে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার ন্যায় ছাত্রদেরকে পড়াবে। দীনের সাথে এর সামঞ্জস্য সৃষ্টি করবে।

প্রাচ্যে বিজ্ঞান গবেষণা

কিন্তু মনে হয় আমার এই প্রস্তাব লাল ফিতার ন্যায় বলি হবে। আদৌ কার্যকর হবে না। তবে এখনো আমি এই অভিমতের উপর অটল। তারপর তিনি বললেন, প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে বিজ্ঞান গবেষণায় ঘাটতি রয়েছে। আমি মনে করি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবেই অর্জন করা উচিত। পশ্চিমি কোনো বিদ্যা হিসাবে নয়। আমরা পশ্চিমাদের সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পক্ষপাতি না। তা ছাড়া পশ্চিমারা বিজ্ঞানের উপর মোহর এঁটে দেয়নি যে, আমরা তা পড়তে পারব না। তবে পড়ার ক্ষেত্রে এই বিদ্যা দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে এবং যা প্রমাণিত হয়নি বরং গবেষণাধীন রয়েছে এই উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখা উচিত।

মিসরের অনুকরণের ব্যাপারে সতর্কতা

ড. গামরাদীর আরেকটি কথা হল, তিনি ভারত, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের ব্যাপারে দারুণ আশাবাদী। আমি তাকে বললাম, বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানে দীনের যে জোয়ার চলছে আরববিশ্বে তা দেখা যায় না। তিনি আমার এই কথা শুনে বললেন, তবে তাদের মিসরের অনুকরণের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, তারা মিসরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে পেশ করে বলে বেড়াবে, আজহারের মত ইউনিভার্সিটি থাকা সত্ত্বেও সে দেশে যেটা চলছে আমরা তা গ্রহণ করলে অসুবিধা কোথায়?

আজহারের ভবিষ্যৎ

আজহার ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, আজহারের বিরুদ্ধে এখন নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। ইংরেজদের ইঙ্গিতে আজহারকে ভিন্ন ভিন্ন কলেজ, মাদরাসা ও দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবয়বে ভাগ করে ফেলা হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল শহরের এক স্থানে বিশাল এক জামাতের ইলমে দীন হাসিল করতে দেখে ইংরেজদের চক্ষুশূল হয়। ফলে একে তারা নিজেদের জন্য বড় ধরনের হুমকি মনে করতে থাকে। তারা বিভিন্ন শহর ও জেলায় আজহারের শাখা প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দেয়। এতে তারা খোঁড়া যুক্তি দেখিয়ে বলে, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ছাত্রদের কায়রো আসার ভোগান্তি পোহাতে হবে না। তারা নিজ নিজ এলাকায় থেকেই আজহারে পড়াশোনা করতে পারবে। এই প্রস্তাব ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের জন্য তো ভালো, কিন্তু এদ্দ্বারা আজহারের শক্তি দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। আমি জনাব গামরাদীকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি উপহার দিই। তারপর বিদায়ের অনুমতি চাই।

কেল্লা ও তার মসজিদ

আমরা ড. গামরাদীর বাসা থেকে বের হয়ে 'কেল্লা'র দিকে রওনা হই। মুহম্মদ আলি পাশা কাবির'র শাসনামলে এই কেল্লা রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেখানকার জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদটি আমরা পরিদর্শন করি। মসজিদের নির্মাণশৈলী, সৌন্দর্য এবং মজবুতি আমাদের পছন্দ হয়। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, মসজিদটি নির্মাণজগতের একটি জীবন্ত উপমা। তারপর আমরা অন্য একটি ভবনে যাই। ভবনটিতে খেদিব সরকারের সচিবালয় এবং সরকারি সকল বিভাগের অফিস ছিল। ভবনের এক বেলকনিতে দাঁড়িয়ে আমরা কায়রো এবং সেখানকার শানদার মসজিদগুলো দেখি। দেখি উঁচু উঁচু মিনারা। জিজা এলাকার পিরামিডের মনোলোভা দৃশ্যও উপভোগ করি। দৃশ্যগুলো আমাদের কাছে চিত্তাকর্ষক ও দুর্লভ মনে হয়েছে। তখন শীতকালের সূর্যোদয় ও দ্বিপ্রহরের মাঝামাঝি সময় ছিল। হালকা মিষ্টি রোদ সোনালি চাদর দিয়ে পুরো শহর ঘিরে রেখেছিল।

কেল্লার লাইব্রেরি

আমরা কেল্লার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করি। সেখানে 'মিসরীয় ইতিহাস'[১] গ্রন্থের সব কটি খণ্ড একত্রে দেখতে পাই। গ্রন্থটির নাম জেনেছিলাম 'আরব ও মিসরের সাহিত্য ও রাজনৈতিক ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে। 'আললিওয়া' [কেতন] পত্রিকার কয়েক সংখ্যাও সেখানে দেখি। এর দেখভাল করতেন এবং এতে প্রবন্ধ লিখতেন মরহুম মুসতফা কামেল। 'আলমুওয়াইয়্যাদ'র একটি ফাইলও দেখতে পাই। তারপর আমরা আহমদ জাকি পাশার লাইব্রেরিতে প্রবেশ করি। লাইব্রেরিটি তিনি উইল করে দিয়ে গেছেন। এটি একসময় তার বাসগৃহের সৌন্দর্য ছিল। এখানে তার রেখে যাওয়া অন্য কিছু স্মৃতিও দেখতে পাই।

সামরিক জাদুঘর

আমরা সামরিক জাদুঘর দেখতে যাই। এখানে ফেরাউনসহ হেজাজের রাজা-বাদশাদের বহু স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষিত আছে। আমরা জাদুঘরের প্রতিটি কক্ষ ঘুরে ঘুরে দেখি। বৈচিত্র্যময় ও মূল্যবান অনেক জিনিসই আমাদের নজর কাড়ে। আমাদের সঙ্গে শায়খ উসমানের ছেলে জাকারিয়া কামালও ছিল। সে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করার সময় বহুবার ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে এখানে এসেছে। এই জন্য তার অভিজ্ঞতাও ছিল বেশি। সে আমাদেরকে অনেক জিনিস বুঝিয়ে দেয়। সফরটি আমাদের জন্য খুব চিত্তাকর্ষক ছিল।

বিভিন্ন মসজিদ ও সমাধি

আমরা মসজিদে সুলতান হাসানে আসরের নামাজ আদায় করি। তারপর মসজিদে রেফায়ী পরিদর্শন করি। এখানে বাদশা ফুয়াদ ও তার পিতা খেদিব ইসমাইলসহ বহু ব্যক্তিত্বের সমাধি ছিল। অনেক কবরের পাশ দিয়ে আমরা অতিক্রম করি। আমি বললাম, ওলামা, সালেহীন ও আউলিয়াদের প্রত্যেকের জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন সমাধি তৈরি করা হত, তা হলে জীবিতদের তুলনায় মুরদারের শহর বড় হয়ে যেত। জীবিতদের ঘর বানানোর জন্য এক বিঘত জায়গাও পাওয়া মুশকিল হত।

---

[১] الوقائع المصرية

কবর সম্পর্কে নবীজির অবস্থান

ইসলাম কবর পাকা করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে সত্যিই ভালো করেছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রাসুলের কবরকে নুরে নুরান্বিত করুন। তিনি কবর পাকা করাকে আশঙ্কাজনক মনে করতেন এবং এ সম্পর্কে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে গেছেন। এর ব্যতিক্রম হল খ্রিস্টান ও ইহুদিসম্প্রদায়। তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তারা তার কবরের উপর একটি ঘর নির্মাণ করত। রাসুল সা. তাদের এই সংস্কার বর্জন করেছেন। আসরের পর আমরা হাজি আহমদ আতিয়া রিজওয়ানের হোটেলে দুপুরের খাবার খাই। হোটেলটি তাওফিকিয়া রোডে অবস্থিত। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেল। মালিকও বেশ ভদ্র। মাগরিবের পর আমরা বাসায় ফিরে আসি। দিনের একটি বড় অংশ আমরা আজ ঘোরাঘুরির মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দিই। আজকের দিনটি বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার দিন।

মসজিদে আমর বিন আস রা.[১]

৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ প্রত্যুষে আমরা জনাব আহমদ উসমানের সঙ্গে 'ফুসতাত' শহর দেখার জন্য যাই। প্রথমে আমরা আমর ইবন আস রা. এর নির্মিত মসজিদে প্রবেশ করি। মসজিদটি মূল সীমানা থেকে এখন অনেক বড়। সময়ে সময়ে রাজা-বাদশারা একে প্রশস্ত করেছেন। তবে হেজাজের মসজিদসমূহের নির্মাণশৈলী এখনও আছে, যা মিনার মসজিদে খায়েফ এবং হারামাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মিসর ভূখণ্ডে ইসলামের প্রথম যুগের মসজিদ এটি। তাওহিদ, তাকওয়া ও এক আল্লাহর ইবাদতের উপর মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়েছিল। মসজিদে প্রবেশ করে আমরা রুহানি ও আত্মিক স্বাদ অনুভব করি। কারণ মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন এক মহান ব্যক্তি, যিনি রাসুল সা. এর মোবারক হাতে বাইয়াত হয়েছেন। রাসুলের সাথে বহুবার মুসাফাহার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

---

[১] কায়রোর বিখ্যাত মসজিদ। হযরত আমর বিন আস মিসর জয় করার পর এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। ৮০ জন সাহাবী মিলে এর কিবলা নির্ধারণ করেন। হযরত আমর বিন আসই এ মসজিদের প্রথম ইমাম। ইসলামের প্রথম যুগে বিচার বিভাগের কাজ এ মসজিদেই সম্পাদন করা হত।

মসজিদে আমরে আমাদের অনুভূতি

মসজিদের ভিতরে আমাদের হৃদয়ে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, যা মিসরে অন্য কোনো মসজিদে হয়নি। মসজিদটি সাদাসিধে ধরনের। তেমন কোনো চাকচিক্য নেই। একেবারে অবহেলিত। চারপাশে ময়লা-আবর্জনা ও খরকুটোর স্তূপ।

অহেতুক কাজ

আমি শুনেছি বাদশা ফারুক প্রতিবছর এই মসজিদে জুমাতুল বিদা আদায় করে থাকেন। সম্ভবত তখন ব্যবস্থাপনা কমিটি মসজিদে সুন্দর সুন্দর গালিচা বিছিয়ে বাদশাকে তাদের দায়িত্বহীনতা ও মসজিদের এ করুণ অবস্থার কথা বোঝতে দেয় না।

মসজিদের ভিতরে একটি স্তম্ভের চারপাশে লোহার জালি লাগানো দেখতে পাই। জানতে পারলাম, মসজিদ নির্মাণের সময় ভারি হওয়ার দরুন স্তম্ভটি ওঠাতে শ্রমিকদের পেরেশানিতে পড়তে হয়। এর উপর ভিত্তি করে তারা বলে, স্তম্ভটি নিজের কালিমা ও পাপ-পঙ্কিলতার কারণে মসজিদের কাজে ব্যবহার হতে অস্বীকার করেছে। তখন থেকে মুসলমানরা তাকে জুতোপেটার মাধ্যমে শাস্তি দেয়। একে অপমানিত করে। সরকার স্ত স্তটি সংরক্ষণের জন্য চারপাশে জালি লাগিয়ে দেয়, যা 'রাগী মুজাহিদদে'র জুতাপেটা থেকে একে হেফাজত করে। এর মাধ্যমে সরকার তার দায়িত্ব উত্তমরূপে আদায় করেছে।

সেখানে সাইয়েদা নাফিসা নিয়মিত বসতেন এবং ইলমি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমরা আরেকটি স্তম্ভ দেখি। লোকজন স্তম্ভটি চোষত। চোষতে চোষতে স্তম্ভটিতে গর্ত হয়ে গেছে। সরকার জালি লাগিয়ে এই অহেতুক কাজও বন্ধ করে দিয়েছে।

প্রাচীন শহর

মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা মিসরের প্রাচীন শহর 'ফুসতাতে'র উদ্দেশে রওনা হই। শহরটি মিসরের প্রথম ইসলামি দারুস সালতানাত। আমরা খ্রিস্টানদের কবরস্থান, তাদের ক্রুশ ও গির্জার পাশ দিয়ে এগিয়ে যাই। হায়! ইসলামি শহরের উপকণ্ঠ যদি ইসলামি ছাঁচে হত তা হলে

অন্তরে শহরের আজমত ও মহব্বত আরও বৃদ্ধি পেত। হৃদয় প্রশান্তি লাভ করত।

আমরা ফুসতাতের সীমানায় প্রবেশ করি। তারপর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত প্রাচীন স্থাপত্যের বিভিন্ন ধ্বংসাবশেষ ও বিরান ভূমি অতিক্রম করি। তখন আমার হৃদয়পটে সাহাবায়ে কেরামের শহর, তাদের সেনাছাউনি, মুজাহিদদের তাঁবু ইত্যাদির বিভিন্ন দৃশ্য ও আকৃতি ভেসে বেড়ায়। আমি মনে মনে বলতে থাকি, সম্ভবত এখানে জুবায়ের ইবনুল আওয়ামের তাঁবু ছিল। এইখানে উবাদা ইবনে সামেতের তাঁবু ছিল। ওখানে মনে হয় মুহম্মদ ইবনে মাসলামা অবস্থান করেছিলেন। এটা হয়তো আমর ইবনুল আসের বাড়ি। যেখানে এখন কায়রো সেখানে কোনো মজদুর বা ফকিরও বসবাস করতে চাইত না। কিন্তু এই সাধারণ ঘরের বাসিন্দাদের হাতেই একসময় রোমসাম্রাজ্যের পতন হয়েছে।

এই মিসরে হযরত আমর রা. সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকা উড়িয়েছেন। তার ছেলে প্রসিদ্ধ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে আমর সম্ভবত এই জায়গায়ই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতেন। এইখানেই তিনি হাদিসের দরস দিতেন।

কল্পনা দিয়ে বাস্তবতাকে ঢেকে রাখা যায় না

এসব আমার কল্পনায় ভাসছিল। কিন্তু আমি আমার এই চিন্ত সেই মোবারক যুগের সঙ্গে মিলাতে চাচ্ছি। আবার সেই সোনালি যুগের অবতারণা করব। তারপর সেখানকার পরিবেশ ও প্রতিবেশ ঘুরে দেখব। ভুলে যাব আধুনিক মিসরের কথা। আমি যে এখন চোদ্দশ শতাব্দিতে আছি ভুলে যাব সে কথাও।

কিন্তু কল্পনা দিয়ে বাস্তবতাকে ঢেকে রাখা যায় না। আমি আমার এই চেষ্টায় ব্যর্থ হলাম। আমি দেখি এই পৃথিবীতেই রয়ে গেছি পৃথিবীর নানা আওয়াজ আমার কানে ঝংকৃত হচ্ছে। যেসব দৃশ্য দেখছি তা এ যুগেরই।

আমরা সেসব প্রাচীন নিদর্শনের কাছে যাই, যা এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর থেকে বের করে আনা হয়েছিল। এখানে অল্প সময় অবস্থান করি। যারা এগুলো দেখাশোনা করেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করি। তাদের কাছ থেকে শহরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবগত হই। আব্বাসিয়া-উমাইয়্যা বংশের শাসনামলের বিভিন্ন শহর সম্পর্কেও ধারণা লাভ করি। আলোচনার

মাঝে একটি মোটর আসে। গাড়ি থেকে কয়েকজন তুর্কি প্রফেসর এবং প্রত্নতত্ত্বের খ্যাতিমান গবেষক হাসান আবদুল ওহ্হাব নেমে আসেন। আহমদ উসমান আমাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারা আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। তারপর হাসান আবদুল ওহ্হাব বিভিন্ন প্রাচীন আরবীয় নিদর্শন সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেন। আমরা তার এই এহসানের শোকরিয়া আদায় করি এবং আগামী সোমবার তার সঙ্গে আবার সাক্ষাত করার প্রতিশ্রুতি দিই।

এখান থেকে আমরা 'শারকাসে'র উদ্দেশে রওনা করি। সেখানে গিয়ে শায়খ সুলায়মানের মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করি। নামাজের পর দীনী বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি। এতে পাক-ভারতের দীনী দাওয়াতের পদ্ধতির বিশ্লেষণ করি। এর কিছু উপকারিতা, কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরি। এরপর আমরা শায়খ আহমদ উসমানের বাসায় দুপুরে খাবার খেতে যাই। খাবারের পর 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ' সা. এর অফিসে যাই। সেখানে কাউকে পাইনি। আমাদের ভিজিটিংকার্ড রেখে সেখান থেকে আল্লামা সাইয়েদ খিযির হোসাইনের সাথে দেখা করার জন্য 'হিদায়াতুল ইসলামিয়া'র ভবনে যাই।

কিন্তু তার সাথেও সাক্ষাত হয়নি। 'মসজিদে সাইয়েদা জায়নাবে' গিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। মসজিদটি অনেক বড় ও জাঁকজমকপূর্ণ। কেল্লার মসজিদের পর এটিই কায়রোর সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ।

১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজকের অধিকাংশ সময় দারুল কুতুব আল-আরাবিতে আমার বই 'বিশ্ব ও আরব উপদ্বীপ' এবং আনসারুস সুন্নাহ্য় 'ইসলামের ইতিহাসে উত্থান-পতন'র প্রুফ দেখার কাজে ব্যস্ত থাকি।

প্রফেসর মুহম্মদ আলি তাহেরের সঙ্গে আলোচনা

মাগরিবের পর আমরা নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী ইয়াসিন শরিফের সাথে 'শুরা' পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ আলি তাহেরের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। আমির শাকিব আরসালানের সাথে তার সম্পর্ক থাকার এবং তার বিভিন্ন বই প্রকাশ হওয়ার কারণে তার ব্যাপারে আমরা ভারত থেকে

জানতে পারি। তার নতুন বই 'বন্দিশিবিরের দিনলিপি'র কিছু অংশ হেজাজে থাকাকালীন আমি পড়েছি। তার নিকট পৌঁছে দেখি সেখানে ফিলিস্তিনের জেনারেল আবদুল্লাহও আছেন। আমরা ফিলিস্তিন সম্পর্কে আলোচনা করি। মুহম্মদ আলি তাহের ফিলিস্তিন সম্পর্কে অনেক জ্ঞান রাখেন। তিনি বললেন, আমি ফিলিস্তিন সমস্যা সম্পর্কে একটি বই লিখতে ইচ্ছা করেছি, যে বইয়ে ফিলিস্তিনের পুরো ইতিহাস এবং তার সকল সমস্যার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরব। আমার আশংকা হয় না-জানি ফিলিস্তিন ইতিহাসের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যায়। যেমন মুসলমানদের হাত থেকে বের হয়ে গেছে। এখন কোনো বই লেখা না হলে পরবর্তী লেখক-ঐতিহাসিকগণ এই সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাবেন না। আমার ইচ্ছা বইটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা রাখবে, যাতে প্রমাণসহ বিভিন্ন তথ্যের উল্লেখ থাকবে। ফিলিস্তিনের বিষয়টি একেবারে স্পেনের ন্যায়। আলমুকরি[১] যদি 'নাফহুত তীব'র মতো গ্রন্থ রচনা করে না যেতেন তা হলে ইতিহাসের পাতা থেকে স্পেন কবে হারিয়ে যেত!

ফিলিস্তিন ট্রাজেডি

তারপর তিনি ফিলিস্তিন ট্রাজেডি এবং আরববিশ্বের অবহেলা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাদের সীমালংঘনের কথাও ছাড়েননি। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তারা এখন নিরস্ত্র। নিজেদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুও সংরক্ষণ করতে পারছে না তারা। ইহুদিরা আসছে আর শহরবাসীকে গ্রাস করে নিচ্ছে। যদি সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো জনগণকে তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিত, তা হলে তা হত জাতির জন্য গনিমত। তারা বাহাদুরের মতো লড়াই করে নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করত যেমন তাদের পূর্বপুরুষেরা রক্ষা করেছে।

---

[১] বিখ্যাত সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। তার মূল নাম আহমদ ইবনে মুহম্মদ অলমুকরী। ১৫৮৪ সালে তার জন্ম। তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'নাফহুত তীব'। ১৬৩১ সালে তিনি মিসরে ইনতেকাল করেন।

তারপর আমাদের আলোচনা ওলামা ও মুসলিম নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক অবক্ষয় সম্পর্কে চলতে থাকে। আমি বললাম, ইতঃপূর্বে ওলামায়ে কেরাম রিজাল শাস্ত্র অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনায় কিতাব লিখতেন। কিন্তু যখন রাজনীতি ও নেতৃত্বের এই নতুন যুগ শুরু হয়, সর্বক্ষেত্রে রাজনীতি ছড়িয়ে পড়ে, ইলমের জায়গায় সে স্থান করে নেয়; আর সাধারণ লোকজন তাদের নেতা এবং ইসলামি নেতৃত্বের উপর সমালোচনা করতে থাকে, তখন থেকে আর আলেমদের এই বিষয়ে কিতাব লেখা হয় না।

আমি তাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়ের একটি কপি হাদিয়া দিই। তিনি আমাকে তার সম্পাদিত 'আমির শাকিব আরসালান স্মারকগ্রন্থ'টি দিলেন। গ্রন্থটি ওইসব প্রবন্ধের সমষ্টি, যা শাকিব আরসালানের শোকসভায় পাঠ করা হয়েছিল। প্রবন্ধগুলো মরহুমের বন্ধু-বান্ধব ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণ লিখেছেন। তিনি আমাকে তার আরও দুটি গ্রন্থ 'ফিলিস্তিনের মাটিতে ইঙ্গ-মার্কিন বিভৎসতার ইতিবৃত্ত'[২], 'ইহুদিদের গাদ্দারি ও আরবদের ধৈর্যধারণ'[৩], ও 'বন্দিশিবিরের দিনলিপি'[৪] দেন। ইতোমধ্যে তার সাথে সাক্ষাত করতে অন্য কয়েকজন লোক আসে। তিনি আমাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তাদের মধ্যে জামিয়া আরাবিয়ার সহকারী সাধারণ সম্পাদক জনাব আহমদ শাকিরী এবং ইয়ামানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব কাজি মুহম্মদ আবদুল্লাহ ওমারীও ছিলেন। মঙ্গলবার কাজি আবদুল্লাহর সঙ্গে কাসরুল জাজিরা হোটেলে দেখা করার সিদ্ধান্ত হয়। আহমদ শাকিরীর সঙ্গেও এই দিন বা বুধবার সাক্ষাত করার কথা হয়।

গোসলখানার নির্লজ্জ দৃশ্য

১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ বাদশা ফারুকের জন্মদিন। সারা শহর নতুন সাজে সেজেছে। মিসরের জনগণের সাথে তাদের বাদশাদের সম্পর্কের কথা প্রাচীনকাল

---

২ اوراق مجموعة عن فظائع الانجليز في فلسطين

৩ غدر اليهود وصبر العرب

৪ معتقل ها لستب

থেকেই প্রসিদ্ধ। আদিকাল থেকেই প্রসিদ্ধ যে, তারা বাদশাদের জন্য নিজেদেরকে বিলিয়ে দিতে কুণ্ঠাবোধ করত না। আহমদ উসমান বললেন, আজ আপনাকে নিয়ে আমি আবেদিনের শাহিমহল ঘুরে দেখব। তিনি আমাদের নাম রেজিস্টারভুক্ত করলেন। মিসরের প্রথা এবং তাদের আনন্দ-উল্লাস সম্পর্কে জানতে আমি তার এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিই। এরই মধ্যে আমি একটি গোসলখানায়ও প্রবেশ করি। গোসলখানাটি তুর্কি নিয়মে তৈরী। গোসলখানায় প্রবেশ করতেই উলঙ্গ যুবক-যুবতী ও বৃদ্ধদের ভিড় দেখতে পাই। পশু ও তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য ছিল বলে মনে হল না। শরিয়ত ও মানুষের স্বভাববিরোধী এই কার্যকলাপ দেখে আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। গোসল না করেই সেখান থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসি।

সংবাদপত্রের নির্লজ্জ আচরণ

বাদশা ফারুকের জন্মদিন উপলক্ষে আজকের সংবাদপত্রগুলো বাদশা ও তার জীবনসঙ্গিনীর ছবি ছেপেছে। ছবিগুলো দেখলে যেকেউ মনে করবে আজই যেন তাদের বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়েছে। ছবিগুলো কোনো মুসলিম নারীর জন্য মানানসই ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে যে নারী মিসরের রানী হতে যাচ্ছেন তার ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশ করা মোটেই উচিত হয়নি। অথচ ছবিগুলোর উপর ভালোমন্দ সকল মানুষেরই নজর পড়বে।

আসলে এখন মানুষের রুচিবোধ পাল্টে গেছে। সংবাদপত্র সব স্বাধীন। এর উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। যা ইচ্ছা তা-ই তারা প্রকাশ করতে পারে। একে অপছন্দ করার লোকও কম, যাদেরকে গোনায় ধরা যায় না।

শায়খ আহমদ উসমান এলেন। আমরা 'কসরে আবেদিন'র উদ্দেশে বের হই। সেখানে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিহিত এক জামাত দর্শনার্থী দৃষ্টিগোচর হল। আমরা উপস্থিতি খাতায় দস্তখত করি।

পিরামিডে

আমরা মিসরের পিরামিড[১] দেখতে যাই। এটা বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের একটি এবং প্রাচীনতম নিদর্শনসমূহেরও একটি। কৈশোরে পিরামিডের কথা পাঠ্য পুস্তকে পড়েছি। শুনেছি অনেক গল্প। আমরা সেখানে এমনভাবে যাই যেন এর জন্য আমাদের চোখ উদগ্রীব ছিল। হৃদয় ছিল পাগলপারা। পৌঁছে দেখি নির্জীব পাথরের এক সুউচ্চ অট্টালিকা। আমরা এই ভেবে আশ্চর্য হলাম যে, মাকতাম পাহাড়[২] থেকে পাথর এখানে কীভাবে আনা হয়েছে!

নিরর্থকতার স্মারক

আমরা সেখানকার বৃহত্তম কবরটিও ঘুরে দেখেছি। এটি 'সম্রাট খুফুর কবর' নামে প্রসিদ্ধ। আমি স্বীকার করি এইসব পিরামিডের শান শওকত, স্বীকার করি তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব। কিন্তু স্থপতির ভাগ্যে এই কবরের দুই গজ মাটির চেয়ে বেশি কিছুই জোটেনি। ধিক তার সেই কর্তৃত্বের, ধিক তার সেই নেতৃত্বের, যার মাধ্যমে সে এই অহেতুক কাজের জোগান দিয়েছে এবং নিজের স্মৃতি জাগরূক রাখার জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত হাজারো মানুষের শ্রম ব্যয় করেছে। এটা দেখে আমার একটি আয়াত স্মরণ হয়,

---

[১] প্রাচীন মিসরের সম্রাট ও ধনবান ব্যক্তিদের সমাধিতে পাথরের নির্মিত বিশালাকার স্মৃতিসৌধ। এর ভিত্তি সমচতুর্ভূজ, কিন্তু উপরের দিকে চারপাশ ক্রমশ ছোট হতে হতে ত্রিভূজ আকারের হয়ে এক বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। তামার বাটালি ও হাতুড়ি দিয়ে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো কেটে গ্রানাইট ও চুনাপাথরসহযোগে বিশাল এক দল শ্রমিক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে পিরামিড নির্মাণ করত। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০-২৩০০ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। পিরামিড প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

তৎকালীন মিসরের রাজারা ভাবতেন, মৃত্যুর পর তারা আবার রাজা হবেন। তাই তাদের মৃতদেহ ঔষধ দিয়ে এমনভাবে কবরস্থ করার ব্যবস্থা চালু করেন, যাতে সেটা নষ্ট হয়ে না যায়। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মৃতদেহকে মমি বলা হত। প্রথম দিকে রাজার মমি সাধারণভাবেই সমাহিত করা হত। সঙ্গে দেওয়া হত নানা রকম ধনরত্ন, স্বর্ণালঙ্কার ও ভোগ বিলাসের সরঞ্জাম। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে দস্যুরা এসব সামগ্রী লুট করত। ফলে কবর আরো সুরক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলে পিরামিড নির্মাণ শুরু হয়। রাজারা জীবিত অবস্থায় পিরামিড নির্মাণ করাতেন। মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ সে পিরামিডের ভিতরে নির্দিষ্ট জায়গায় সমাহিত করা হত। সবচেয়ে বিশালাকার পিরামিডটি কায়রো শহরের কাছে জিজা নামক স্থানে অবস্থিত। এটি রাজা খুফুর পিরামিড নামে পরিচিত। খিস্টপূর্ব প্রায় ২৬০০ অব্দে এটি নির্মিত হয়। ৭৫০ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত এই পিরামিডের উচ্চতা ৪৫১ ফুট।

যার বাস্তবতা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ 'তোমরা কি প্রত্যেকে উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ?' [সুরা শুআরা, ১২৮ আয়াত]। আফসোস, মানুষ কীভাবে এই অনর্থক কাজে নিজের শক্তি, যোগ্যতা ও মূল্যবান সময় নষ্ট করে।

এখান থেকে আমরা কয়েকটি উপাসনালয়ে যাই। সেখানে বিভিন্ন ম্যুরাল ও শিলালিপি লাগানো ছিল। ছিল বিভিন্ন মূর্তি ও ভাস্কর্য। আমাদের গাইড স্থাপত্য গবেষকদের কাছ থেকে যা শুনেছেন এবং বিভিন্ন উপাসনালয় ও পুরোহিতদের সম্পর্কে যা জেনেছেন, তা আমাদের নিকট বর্ণনা করতে থাকেন। আমরা সবচেয়ে বড় মূর্তি 'আবুল হাওল'[১]কেও দেখেছি। কয়েক ঘণ্টার এই সফরে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে আমরা সোজা বাসায় চলে আসি।

আজহার এবং তার আশপাশ

১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ বাইরে হালকা বৃষ্টি ছিল। তবে এই বৃষ্টি ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক ছিল না। দশটার পূর্বে আমরা বেরিয়ে যাই। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক খ্যাতিমান স্থাপত্যগবেষক প্রফেসর হাসান আবদুল ওহহাবের সঙ্গে দেখা করার এবং আজহারের আশপাশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখার পূর্বনির্ধারিত সময় ছিল আজ।

আজহারের লাইব্রেরিতে

আজহারের প্রধান ফটকে আমরা সবাই একত্র হই। আমাদের সাথে আহমদ উসমান ছিলেন। এখান থেকে আমরা আজহারের লাইব্রেরিতে যাই। লাইব্রেরিটি দ্বিতীয় খেদিব আব্বাস হিলমীর সময় 'ইমবাগাবিয়্যাহ মাদরাসা'য় ছিল। সেখান থেকে আজহারে আনা হয়েছে। এর কিছু অংশ

---

[১] বাদশা খুফুর পুত্র খাফরের প্রতিকৃতি এটি। এর দৈর্ঘ্য ২৪০ ফুট। উচ্চতা ৬৬ ফুট। প্রতিকৃতিটির নাক একটি মানবদেহের সমান। ঠোঁট ৭ ফুটের অধিক লম্বা। মুখমণ্ডল পুরুষাকৃতির। পুরো প্রতিকিটি একটিমাত্র পাথরে তৈরী। বর্তমানে এর মুখাবয়ব বিকৃত হয়ে গেছে।

রাখা হয়েছিল এরই নিকটবর্তী 'তিবরিসিয়া মাদরাসা'য়। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন ধরনের কিতাবের বিশাল সমাহার ছিল। অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত পাঠাগারও এখানে উইল করে দিয়ে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মরহুম সুলায়মান পাশা ইবাজার ব্যক্তিগত পাঠাগার।

প্রফেসর হাসান আমাদেরকে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর বহু পাণ্ডুলিপি দেখান। আমরা এখানে অনেক পুরাতন কিতাব, দুর্লভ পাণ্ডুলিপি ও রাজকীয় কুরআন শরিফ, পঞ্চসুরা সম্পর্কে জানি। এগুলো দুনিয়ার সকল লাইব্রেরির জন্য সৌন্দর্যবর্ধক। এই তালিকায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস সম্পর্কে অবহিত হই, তা হল আবুল ইসহাকের বিখ্যাত 'দারুল খিলাফাহর রীতিনীতি' গ্রন্থ। এই পাণ্ডুলিপিটি লেখকের নিজের কপি থেকে নকল করা হয়েছে। এতে আব্বাসিয়া শাসনামলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। আয়-ব্যয়ের একটি ফিরিস্তিও দেওয়া আছে। জনাব হাসান লাইব্রেরির বিভিন্ন ভবন, মঞ্চ ও গ্যালারির নির্মাণশৈলীর প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নির্মাণকাল ও ইতিহাস নিয়েও আলোচনা করেন।

তারপর আমরা আজহারে যাই। প্রাচীন আজহারও পরিদর্শন করি, যা ফাতেমি খলিফা মুয়িজ লি-দীনিল্লাহ নির্মাণ করেছেন। তারপর আমির আবদুর রহমান কাতখাদাসহ অনেকেই তার সীমানা বাড়িয়েছেন।

প্রফেসর হাসান এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, যেসব জিনিস দিয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে যুগে যুগে তাতে যাকিছু সংযোজন করা হয়েছে তার বর্ণনা দিতে থাকেন। জনাব হাসান এ দেশের স্থাপত্যশিল্পের একজন রুচিশীল ও সমজদার গবেষক।

আজহার থেকে আমরা বের হলাম। 'মাদরাসা মানসুর কালাউনে' যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাজারে প্রবেশ করলাম। আমরা বাদশা সালেহ নাজমুদ্দীন আইয়ুবীর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করি। সালেহ নাজমুদ্দীন 'মানসুরা' এলাকায় এক যুদ্ধে ক্রুসেডারদেরকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছিলেন। তিনি মাদরাসাটি মাজহাব চতুষ্টয় সম্পর্কে পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমরা মাদরাসার সুন্দর মিনারা দেখে অভিভূত হই।

জনাব হাসান বললেন, মসজিদের ভিতর বাদশাদের মরদেহ সমাহিত করার প্রথা আইয়ুবী শাসনামলের শেষ দিকে এসে শুরু হয়। ফাতেমি যুগে

এর প্রচলন পাওয়া যায় না। আইয়ুবী বাদশাদেরকেই এভাবে মসজিদে দাফন করা হতে থাকে।

মাদরাসা মানসুর কালাউন

আমরা খান খলিলীর বাজার অতিক্রম করার সময় মাদরাসা মানসুর কালাউনে প্রবেশ করি। মাদরাসার শান্দার ভবনগুলো ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথিত আছে, কেবল চোদ্দ মাসে এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রধান ফটকেও এটি লেখা আছে। কিন্তু জনাব আবদুল ওহ্হাব নিশ্চয়তার সাথে বললেন, এটি নির্মাণ করতে সাত বছর আট মাস সময় লেগেছে। তিনি প্রমাণ হিসেবে পেশ করলেন, নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে ৬৮৩ হিজরি সনের রবিউস সানি মাসে। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। আর সুলতান মানসুরের ইনতেকাল হয়েছে ৬৮৯ হিজরির জিলকদ মাসে। ৬৯০ হিজরির ১ মহররম শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাকে সেখানে রাখা হয়। মহররম মাসের ২ তারিখে সেখান থেকে 'মাদরাসায়ে মানসুরিয়া'য় তার নিজের তৈরী করা কবরে স্থানান্তর করা হয়। তখন এখানকার ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে থাকলে এখানেই দাফন করা হত। কেল্লায় নেওয়া হত না। ভবনটিতে মাদরাসার পাশাপাশি একটি গম্বুজ এবং একটি হাসপাতাল রয়েছে, যা নির্মাণশিল্পের এক অসাধারণ নিদর্শন। কায়রোর ইসলামি ভবনগুলোর মধ্যে এটি অনন্য সাধারণ ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটা পুরনো 'ফাতেমি মহল্লা'র মাঝামাঝি মুয়িজ লি-দীনিল্লাহ রোডের পাশে অবস্থিত।

সুহায়মির বাড়িতে

মাদরাসা মানসুর কালাউন থেকে আমরা একটি ঐতিহাসিক বাড়ি দেখতে যাই। বাড়িটি তুর্কি শাসনামলের রাজপ্রাসাদের নির্মাণশৈলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাড়ির মালিক অত্যন্ত দীনদার ছিলেন। সম্পদের পাশাপাশি তার ইলমও ছিল। বাড়িটি পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাদের বাড়িঘরের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। নির্মাণের দিক দিয়ে বর্তমান যুগের তুলনায় বসবাসের জন্য বাড়িটি অনেক আরামদায়ক। বাড়ির মালিক সুহায়মি নামে প্রসিদ্ধ।

আসরের পর 'ইসলামের ইতিহাসে উত্থান-পতন'র[১] প্রুফ দেখার কাজে ব্যস্ত থাকি। মাগরিবের পর আনসারুস সুন্নাহর প্রেসে সময় দিই।

ইয়ামানের পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আলোচনা

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ আমরা ইয়ামানের পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সচিব কাজি আবদুল্লাহ ওমারীর সঙ্গে দেখা করতে 'কাসরুল জাজিরা' হোটেলে যাই। তার কক্ষে প্রবেশ করি। রুমটি খুব চাকচিক্যপূর্ণ। বাহ্যিক সাজ-সজ্জাও জমকালো। এখানে থাকা সেসব দেশের প্রতিনিধিদের মানায়, যারা অঢেল অর্থবিত্তের মালিক। যাই বলা হোক, চলমান রাজনীতির এই যুগে প্রাচ্যের সরকারগুলোকে ইউরোপের অনুসরণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তিনি আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। খোশ আমদেদ বলেন। এ সময় তার হৃদয়ের প্রশস্ততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। আমরা তার সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি।

আমি তার নিকট ইয়ামানের সঙ্গে পাক-ভারতের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরি। 'তাজুল আরূস' গ্রন্থের লেখক ভারতীয় আলেম আল্লামা সাইয়েদ মুরতাজা জুবায়দী বুলগ্রামীর আলোচনাও করি। তিনি দীর্ঘদিন ইয়ামানে থাকার করণে জুবায়দী উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মাওলানা শায়খ হোসাইন বিন মুহসিন আনসারীর কথাও বলি। তিনি বর্তমান শতাব্দির অধিকাংশ মুহাদ্দিসের ওসতাদ। তারপর তাকে বললাম, আমার ইলম ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ইয়ামানের অনেক বড় অবদান রয়েছে। কারণ আমি শায়খ খলিল বিন মুহম্মদ বিন হোসাইন ইয়ামানীর ছাত্র।

তার নিকট ইয়ামান ঘুরে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি। কারণ আরববিশ্বের মধ্যে একমাত্র ইয়ামানই বিগত দিনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। অন্যান্য দেশ পশ্চিমি সভ্যতার রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। সেসব দেশ ভ্রমণ করার দ্বারা মানুষের নতুন কোনো জ্ঞান অর্জন হয় না। এসব দেশের একটি দেখে

[১] المد والجزر في تاريخ الاسلام

অন্যগুলোকে এর সাথে মিলিয়ে নিলেই যথেষ্ট। তিনি আমার এই আগ্রহ দেখে খুশি হন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন।

ইয়ামানের সামনের পথ

তিনি আমাকে ইয়ামান দেখার আমন্ত্রণ জানান। আমি তাকে বললাম, আরববিশ্ব এখন পরাধীন। তারা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল তোড়ে ভাসছে। তাদের কোনো নিজস্বতা ও স্বাধীনতা নেই। কিন্তু ইয়ামান এখনও স্বাধীন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া সে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহণ করবে না। দ্রুত কোনো সিদ্ধান্তও নিবে না। পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা ও জীবনধারার উপর এমনভাবে ঝাপিয়েও পড়বে না, যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির উপর ঝাপিয়ে পড়ে কিংবা কীট-পতঙ্গ মোমবাতির উপর ঝাপিয়ে পড়ে। বরং তাদের সেই অংশই শুধু গ্রহণ করবে, যা ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না। তাদের ক্ষতিকর সব জিনিস বর্জন করবে। আমার আশঙ্কা হয় ইয়ামান দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দরুন কখন আবার এ কথা মনে করে বসে যে, আমরা উন্নত জীবনব্যবস্থা থেকে পিছনে পড়ে আছি এবং তখন সে সেই জীবনব্যবস্থার নাগাল ধরার জন্য জোরে কদম ফেলতে থাকে। তারপর হোঁচট খায় বা পথ হারিয়ে ফেলে। হতে পারে তখন সে এমন অভাবনীয় সমস্যার সম্মুখীন হবে, যার সমাধান সম্ভব না কিংবা সে এমন ক্ষতির সম্মুখীন হবে যা পূরণ হওয়ার নয়।

ইসলামি রাষ্ট্রে জীবনব্যবস্থা

আমি বললাম, আমার মতে কোনো ইসলামি রাষ্ট্রে ইসলামি জীবন ব্যবস্থার স্থায়িত্বের ভিত্তি জনগণের সঠিক দীনী অনুভূতির উপর। এই অনুভূতি সৃষ্টি হবে ব্যাপক দাওয়াত, জনগণের সাথে সুসম্পর্ক, তাদেরকে দীনী প্রশিক্ষণ এবং সর্বস্তরের মানুষের মাঝে দীনী অনুপ্রেরণা জাগ্রত করার মাধ্যমে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিক্ষাব্যবস্থা। এটি কুরআন-হাদিসের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। ভুল ও প্রতারণা থেকে মুক্ত হতে হবে। আমাদেরকে কুরআন-হাদিস এবং বিজ্ঞানের নতুন অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কারের যেখানে ইউরোপ প্রাচ্য থেকে অনেক অগ্রগামী, তার সমন্বয়

করতে হবে। আমাদের আশা ইয়ামান উভয় শক্তিকে একত্র করবে। এবং উভয়ের মাঝে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে একটি সঠিক রূপরেখা তৈরি করবে। যদি ইয়ামান এমনটি করতে পারে তা হলে সে আরববিশ্বের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে, যা সম্পূর্ণ ইসলামি নয় আবার পুরোপুরি পশ্চিমি ধাচেরও না। আমি এজাতীয় অনেক কথা সংক্ষিপ্তভাবে তাকে বলি। তিনি মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোনেন। এবং আমার এই মতের সাথে একমত পোষণ করেন। তিনি খুব মেধাবী এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি। আলোচনা শেষে তিনি আমাকে ইংরেজিতে রচিত একটি বই উপহার দেন। বইটি ইয়ামান, সেখানকার দর্শনীয় কিছু স্থান ও ভবন এবং বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাসসংবলিত। আলোচনার মাঝে ইয়ামানের প্রতিনিধি জনাব আলি মুয়াইয়্যিদ কয়েকজন ইয়ামানি নাগরিককে নিয়ে তার নিকট আসেন। তিনি আমাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি বললাম, اتاكم أهل اليمن 'আপনার নিকট আহলে ইয়ামান এসেছে'[১]। জনাব আবদুল্লাহ ওমারী সানাআ সফরের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আছেন। আগামী মাসে ইনশাআল্লাহ ফিরে আসবেন। আল্লাহ তার এই সফর সফল ও নিরাপদ করুন।

সিরিয়ার ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ

এশার নামাজের পর সাইয়েদ ইয়াসিন শরিফ সিরীয় ছাত্রাবাসের এক রুমে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার ছাত্রদেরকে একত্র করেন। আমরা যথাসময়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছুই। ছাত্রদেরকে দেখে আমার মনে হল আমরা ভারতের কোনো আধুনিক ইউনিভার্সিটিতে অবস্থান করছি। আজহারে বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক মুহম্মদ কুনজি। তিনি পরিচয় ও স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর আমি ছাত্রদের যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের উপর আলোচনা করি। তাদেরকে আত্মশুদ্ধি ও রুহানি খোরাক সংগ্রহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। ইবাদতের আগ্রহ ও উচ্চাভিলাষ, ফারায়েজ ও ওয়াজিবাতের পাবন্দির উপর জোর দিই।

---

[১] এতটুকু একটি হাদিসের অংশ।

তাদেরকে লক্ষ করে বলি, ফরজসমূহের এহতেমাম ও জামাতের সাথে নামাজ পড়ার কথা কী বলব! আপনাদের তো নফল ও তাহাজ্জুদের প্রতিও অভ্যস্ত হওয়া উচিত।

তারপর বললাম, আমরা যদি সেসব ব্যক্তিত্বের জীবনী খুলে দেখি, যারা দীনের খেদমত করেছেন, সমাজে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে বিপ্লব ঘটিয়েছেন, তা হলে তাদেরকে পাব রুহানিশক্তির অধিকারী। অন্তরের ব্যথা, সর্বদা ইবাদত ও জিকিরে লিপ্ত থাকার ক্ষেত্রে তারা ছিল সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। যদি কেউ পরিপূর্ণ ঈমান ও একিন, রুহানিশক্তি ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দীনী ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হয়, তা হলে সে মানুষের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। পারে না সমাজজীবনে কোনো পরিবর্তন আনতে। এখনকার মানুষের ইলম এত বেশি, যদি তা কোনো শহরের অধিবাসীদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয় তা হলে সকলেই আলেম হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের অন্তর খুব দুর্বল। তাদের মাঝে নেই আমলের উচ্চাভিলাষ। বর্তমানে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক উন্নতি লাভ করেছি। কিন্তু এই ইলম আমাদেরকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না। আমাদের ঈমান সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের ঈমানের মতো দেখি না। আমাদের নামাজও তাদের নামাজের মতো হয় না। এর মূল কারণ হল ঈমান ও আমলের তুলনায় আমাদের ইলম ও জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। এখন আমাদের উচিত নিজেদের হিসাব নিয়ে আত্মগঠনে সময় দেওয়া। প্রতিটি কাজ ইখলাসের সাথে আন্‌জাম দেওয়া এবং ইসলাম ও বস্তুবাদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই নিজেদেরকে তৈরি করে নেওয়া। আমরা যদি নিজেদেরকে দীনী জজবা ও পরিপক্বতার মাধ্যমে প্রস্তুত না করি, ইসতেকামাত ও অবিচলতার গুণ আমাদের মাঝে না আসে, আমাদের অন্তঃকরণ যদি ঈমানের বলে বলীয়ান না হয় তা হলে এই যুদ্ধে আমাদের টিকে থাকা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। সম্ভব হবে না শক্তিশালী, চিত্তাকর্ষক ও মোহনীয় বস্তুবাদের সামনে দাঁড়ানো। আমার আশা এই আলোচনা বিফলে যাবে না। শ্রোতাদের মাঝে কিছু না কিছু প্রভাব সৃষ্টি করবেই।

'আলআলামুল আরাবি' পত্রিকা অফিসে

১৪ মার্চ ১৯৫১

সকালবেলা আমরা 'আলআলামুল আরাবি'র অফিসে যাই। অফিসটি ইবরাহিম পাশা রোডে অবস্থিত। সেখানে গিয়ে পত্রিকার সম্পাদক জনাব আসআদ হোসাইনীকে খোঁজ করি। তিনি তখন বাসায় ছিলেন। তার নিকট আমাদের আগমন সংবাদ পৌঁছানো হয়। অবিলম্বে তিনি অফিসে এসে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমি তাকে বললাম, আমরা ভারত থেকে এসেছি। আপনার এই পত্রিকা আমার অত্যন্ত প্রিয়।

ফিলিস্তিনিদের ব্যর্থতার আলোচনা

তারপর আমি তাকে বললাম, 'আলআলামুল আরাবি'র বিভিন্ন সংখ্যায় ফিলিস্তিনিদের ব্যর্থতার কিছু কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। আমার নিকট তাদের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হল, তারা রুহানিভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। তারা তাদের ঈমানি শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সরকার থেকে সাধারণ জনগণ, যারা যেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কারো মাঝে সেই দীনী জজবা ও অনুপ্রেরণা নেই। তারপর বললাম, বস্তুবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যমদূত তাদের উপর চেপে বসেছে এবং তাদের ঈমান হরণ না করে বরং তাদের রুহানিশক্তি কেড়ে নিয়েছে।

আমার এসব কথা শুনে তিনি বললেন, আরবদের তুলনায় এখন ইউরোপিয়ানদের রুহানিশক্তি বেশি। তারা এই শক্তির বলে লড়াই করে যাচ্ছে। আক্রমণ প্রতিহত করছে। আমি বললাম, পশ্চিমাদের দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক চেতনাই তাদেরকে উপরে উঠিয়ে দিয়েছে। এটি রুহানিশক্তির স্থান দখল করে তাদের জন্য একটি বড় শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপর দিকে আরবজাতি তাদের রুহানিশক্তি খুইয়ে ফেলেছে। পরবর্তীসময়ে তারা এমন কিছু অর্জন করেনি, যা এই শূন্যস্থান পূরণ করবে। তা ছাড়া তাদের মাঝে কোনো রাজনৈতিক চেতনা নেই। দীনী রুহ নেই। যার ফলে সর্বত্র তাদের পরাজয়ের গ্লানি বইতে হচ্ছে। তিনি বললেন, আমার মতে আরব সরকারগুলোর সাম্প্রদায়িক মন-মানসিকতাই তাদের পরাজয়ের অন্যতম মূল কারণ। এই মানসিকতা নিয়েই তারা ফিলিস্তিনের ময়দানে লড়াই করছে। এই বিষয়টি আমি কয়েক সংখ্যায় উল্লেখ করেছি। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি তা পড়েছি। উপস্থাপনা ও বর্ণনাভঙ্গি আমার পছন্দ হয়েছে।

'আরববিশ্বের দায়িত্ব ও জিম্মাদারি'

তারপর আমি 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদ 'আরববিশ্বের নেতৃত্ব' তার সামনে খুলে ধরি। সামান্য পড়েই তিনি তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। শেষ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের কয়েকটি শিরোনাম আমি নিজেই পড়ে শোনাই। যেমন, 'রুহানি প্রস্তুতি', 'শিল্প-প্রযুক্তিগত ও সামরিক প্রস্তুতি', 'নতুন শিক্ষাব্যবস্থা সংগঠন'। আমি তার এই সময়দানকে গনিমত মনে করি। কারণ সাংবাদিকরা কোনো কিছু অধ্যয়নের তেমন একটা সময়-সুযোগ পান না। তারা তাদের চিন্তা-চেতনা পাঠকদের সামনে ফুটিয়ে তোলার চিন্তায়ই ব্যস্ত থাকেন বেশি। আমি তার মূল্যবান সময় থেকে একটু সময় বের করে বইটি পড়ার অনুরোধ করে একটি হাদিয়া দিই। তিনি পড়ার প্রতিশ্রুতি দেন। বইটি ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করার জন্য আমার ছবি চাইলেন। আমি ছবি দিতে অনীহা প্রকাশ করি। কিন্তু আমি সম্মত হই আমার চিন্তা ও অনুভূতির ছবি দিতে। সম্মত হই আমার কলম যে ছবি এঁকেছে তা দিতে। তিনি তা-ই মন্‌জুর করে নেন।

পরিশেষে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 'রিসালাহ'র অফিসে যাই। অফিসে আহমদ হাসান যাইয়াতকে না পেয়ে 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ'র কেন্দ্র দারুল আরকামে চলে আসি। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম জনাব হোসাইন ইউসুফ সফরে আছেন। আগামীকাল ফিরে আসবেন। তারপর দুপুরের খানা খেয়ে শিব্‌রা চলে আসি। এখানেই আমাদের সাথে আহমদ উসমানের সাক্ষাত হয়েছিল। তারপর আমাদের বন্ধু আলহাজ আলি শরিফের সাথে হাসান আবদুল ওহহাবের বাসায় যাই। তার সঙ্গে ঐতিহাসিক বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। তার বিশ্লেষণ, অধ্যয়ন ও মতামতের ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছি যে, কায়রোতে সাইয়েদা নাফিসা ব্যতীত আহলে বাইতের কারো কবর ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত নয়। তাকে আল্লামা সাইয়েদ মুরতজা বুলগ্রামীর সমাধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি জুবায়দী উপাদিতে প্রসিদ্ধ। তিনি বললেন, তার স্ত্রীকে সাইয়েদা রুকাইয়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। আমারও মনে হয় তাকে সেখানে সমাহিত করা হয়েছে। তারপর তিনি ঐতিহাসিক রেকর্ড উল্টিয়ে দেখেন এটাই ঠিক।

তার এখানে 'এদারায়ে সাকাফিয়্যা'র রচনা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক মুহম্মদ রাশাদ আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গেও দেখা হয়। তার ও হাসান আবদুল ওহহাবের সাথে আগামী সোমবার দুপুর দুইটায় 'দারুল কুতুব আলমাসরিয়্যা' ও 'দারুল আসার আলআরাবিয়্যা' ঘুরে দেখার সিদ্ধান্ত হয়।

হাসান আবদুল ওহহাবের বাসা থেকে আমরা আহমদ উসমানের সঙ্গে 'আশিরায়ে মুহম্মদিয়া'র অফিসে যাই। সেখানে সংস্থার মহাপরিচালক প্রফেসর মুহম্মদ জাকি ইবরাহিমের সঙ্গে দেখা করি। তারপর 'আশিরায়ে মুহম্মদিয়া'র কিছু বই-পুস্তক দেখি। আমি বললাম, বর্তমানে ফিকহী বিতর্ক এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সমালোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত। তার পরিবর্তে এ সময়ে বস্তুপূজা ও চারিত্রিক অবক্ষয় মোকাবেলার কাজে ব্যয় করা উচিত। সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা দীনী দাওয়াতের কাজে সীমাবদ্ধ রাখা দরকার।

আমার জানা ছিল না যে, আজ সংস্থার নিয়মিত দরসের নির্ধারিত তারিখ। আবার সেই দরসে অংশগ্রহণ করে আমাকে আলোচনা করতে হবে। যাই হোক, মুহম্মদ জাকি আমাকে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার দাওয়াত দিলেন। আমি তার দাওয়াত কবুল করে নিই। প্রথমে আহমদ উসমান, ভারতে চালু হওয়া দাওয়াত ও তাবলিগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ আলোচনা করেন। আমি তার আলোচনার সত্যায়নসহ আরও কিছু বিশ্লেষণ করি। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসি।

আজ আমরা পুনরায় ইয়াসিন শরিফ এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবীর সঙ্গে 'রিসালাহ' অফিসে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম, আহমদ হাসান যাইয়াত সফরে আছেন। আগামী সোমবার অফিসে আসবেন।

জনাব আলি গায়াতীর সঙ্গে

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

'মিমবারুশ শারক' পত্রিকার সম্পাদক আলি আলগায়াতীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমরা খেদিব ময়দানের দিকে রওনা হই। ভারতে আমি এই পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম। পত্রিকাটিতে আমি ঈমানি ঝলক অনুভব করতাম। পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আমার দেখা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কারণ

পত্রিকার সম্পাদক এমন ব্যক্তিত্ব, যিনি হৃদয়ে দীনী অনুভূতি লালন করেন। দীনের বিজয় ও সাফল্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। সব জায়গায়ই এ ধরনের লোকের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। এসব ছোট ছোট দীনী পরিবারের মধ্যে সম্পর্ক হওয়া দরকার। জনাব গায়াতী তার বাসায়ই আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তার মাথার চুল ধবধবে সাদা। চেহারা দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছিল ঈমানি নুর। প্রথমে তাকে আমার পরিচয় দিই। তারপর আমার কিছু পুস্তিকা এবং তার পর 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইটি তার সামনে পেশ করি। তিনি আমাকে ভারত ও পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, দীনী পরিবেশ এবং উভয় দেশের সরকারের মনোভাব সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকেন। আমি আমার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি।

আরববিশ্বের দৃষ্টান্ত

ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের দীনী অনুপ্রেরণার কথা ভুলে রেখে গেছি। আমি তাকে বলেছি, আরববিশ্বের তুলনায় ভারত-পাকিস্তানের মুসলমানদের মাঝে ঈমানি জজবা ও দীনের প্রতি আজমত বেশি পাওয়া যায়। বেয়াদবি মাফ করবেন, আরববিশ্বের মুসলমানদের মাঝে এখন দীনের প্রতি অনীহা ভাব চলে এসেছে; পরিতৃপ্ত ব্যক্তির খাবারের প্রতি যেই ভাব থাকে। আরববিশ্বের দৃষ্টান্ত হল একটি শিশু বাচ্চার মত, যে লালিত-পালিত হয়েছে সম্পূর্ণ দীনী পরিবেশে। সময় কেটেছে তার বিভিন্ন কিতাব ও ইসলামি পত্রপত্রিকার মাঝে। কিন্তু ঘটনাক্রমে দীন ও ইলমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জজবা তার নিঃশেষ হয়ে গেছে। এটা স্পষ্ট যে, এখন সে দীন ও ইলমের যথার্থ মর্যাদা দিবে না। এর সঠিক মূল্যায়ন সে করবে না। তদ্রূপ আরববিশ্ব একসময় দীনের সাচ্চা দায়ী ছিল। কিন্তু সে এখন দীন, রাসুল ও কুরআনকে রুসুমের দৃষ্টিতে দেখে, যাতে নেই কোনো প্রাণ ও আকর্ষণ, নেই সম্মান-মর্যাদা। এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হল ভারত-পাকিস্তান। সেখানকার জনগণ ইসলামকে একজন নওমুসলিমের দৃষ্টিতে দেখে। তাদের মধ্যে রয়েছে দীনের প্রতি তীব্র আগ্রহ-উদ্দীপনা। পৈত্রিকসূত্রে ইসলাম পাওয়া লোকদের মধ্যে সাধারণত এটি দেখা যায় না।

মোটকথা, দীনের প্রতি ভারত-পাকিস্তানের মুসলমানদের ন্যায় গুরুত্ব আরবদের মাঝে নেই। তারপর আমি তার নিকট উভয় দেশের

মুসলমানদের দীনী অনুপ্রেরণা এবং দাওয়াত ও তাবলিগের কথা তুলে ধরি। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বই থেকে 'মুহম্মদ সা. আরববিশ্বের প্রাণ' শিরোনাম দিয়ে যা কিছু লিখেছি তা তাকে পড়ে শোনাই। তিনি লেখাটি অত্যন্ত পছন্দ করেন এবং এর সাথে একমত পোষণ করেন।

'মিমবারুশ শারক' ও তার সম্পাদক

আমি জনাব গায়াতীর সাথে 'মিমবারুশ শারক' পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি বলেন, পত্রিকাটি আমি জেনেভা থেকে প্রকাশ করতাম। সেখানে আমি তিরিশ বছর থেকেছি। কিন্তু আল্লাহর শোকর, আমি দীনের উপর অটল ছিলাম। সেখানকার পরিবেশ আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। পারেনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাইরাস আমার মাঝে সংক্রমিত হতে। অথচ জেনেভা ইউরোপের একটি উন্নত শহর। তারপর আমি যখন মিসরে ফিরে আসি তখন ড. জাকি মোবারক 'আলইহরাম' পত্রিকায় আমাকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিবেদন ছাপেন। প্রতিবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমি এমন একজন মিসরিকে চিনি, যিনি দীর্ঘ সাতাইশ বছর জেনেভায় থেকেছেন। কিন্তু সেখানকার পারিপার্শ্বিকতা তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি তার আজহারী চিন্তা-চেতনা নিয়েই মিসরে ফিরে এসেছেন। আমাদের আশা ছিল তিনি দেশে এসে দেশ ও জাতির সেবা করবেন। জনগণের মাঝে নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলো ছড়াবেন। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি।' আমাদের পত্রিকার যেমন প্রচার-প্রসার হওয়া দরকার ছিল তেমনটি হয়নি। এর মূল কারণ ছিল পত্রিকা-কর্তৃপক্ষ সর্বদা দীনের মূলনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তবে পরবর্তী সময়ে পত্রিকাটি ব্যাপক প্রচার ও পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। আমাদের বন্ধু আমির শাকিব আরসালান রসিকতা করে বলতেন, 'মিমবারুশ শারক' আখিরাতে সফল। তিনি আরও বলতেন, আমি ওই সকল লোকের জামানা পেয়েছি, যারা 'আন্তর্জাতিক ইসলামি ঐক্য' [প্যান ইসলামিজম] এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আমি একবার এই বিষয়ে বাদশা আবদুল আজিজ ইবনে সউদের সঙ্গে কথা বলি। তখন তার নিকট ইসলামি ঐক্য এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করি। তখন তিনি বলেছিলেন, হযরত সালমান ফারসীর ঘটনা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

আমি জনাব আলি গায়াতীকে বললাম, মিমবারুশ শারক'র মতো পত্রিকার জন্য উত্তম হবে ফিকহী বিষয় এবং স্থানীয় মতবিরোধ সম্পর্কে কোনো লেখা প্রকাশ না করা। পত্রিকাটির লক্ষ থাকবে শুধু মানুষের চরিত্রগঠন এবং দীনের দাওয়াত প্রদান। তিনি আমার এই কথার সাথে একমত পোষণ করেন। এরপর বললাম, যতদিন আমরা মিসরে থাকব আপনার সাথে যোগাযোগ রাখব। আমাদের এ কথায় তিনি আনন্দিত হলেন। তারপর আমাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে বিদায় দিলেন।

দারুল আরকামে

'মিমবারুশ শারক' থেকে আমরা 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ'র কেন্দ্র দারুল আরকামে আসি। জনাব হোসাইন ইউসুফের সঙ্গে দেখা করতে এসে এর আগে কয়েকবার ব্যর্থ হয়েছি। এবার তার সাথে দেখা হয়। আমরা এমন একজন মুসলিম নওজোয়ানের সাথে দেখা করি, যার হৃদয় ঈমান ও ইখলাসে পরিপূর্ণ, যিনি আধুনিকতা ও উলঙ্গপনার বিরুদ্ধে কলমের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তার লেখা থেকে যেন আগুন ঝরে। আমি তাকে একজন মেধাবী এবং উৎসাহী যুবক হিসেবে দেখতে পাই। যৌবনের উদ্যম ও হৃদয়োত্তাপ তার অনুপ্রেরণা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। পাক-ভারতে এই পত্রিকার পাঠকদের সাথে তার রুহানি সম্পর্ক ও গভীর ভালবাসার কথা জানাই। বেহায়াপনা, নোংড়ামী ও উলঙ্গ ছবির বিরুদ্ধে তার সফল জিহাদের প্রশংসা করি।

অশ্লীল সাহিত্যের মোকাবেলায় প্রয়োজন শক্তিশালী সংগ্রামের

আমি তাকে বললাম, নোংড়া, অশ্লীল ও লাগামহীন সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রয়োজন শক্তিশালী সংগ্রামের। প্রয়োজন রুচি ও মননশীল সাহিত্য সৃষ্টি ও বিকাশের। তিনি বললেন, 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ' পত্রিকায় অশ্লীল পত্র-পত্রিকার বিরুদ্ধে যেসব লেখা প্রকাশ করা হয়েছে তার প্রতিক্রিয়া হল, একবার আমাকে অধ্যাপক ফিকরি ইবাজা 'আলমুসাওয়ার'র অফিসে ডেকে পাঠান। অতীতে এ বিষয়ে ছাপানো লেখাগুলির ব্যাপারে ওজর পেশ করেন। তারপর অঙ্গীকার করেন এ ধরনের লেখা এই পত্রিকায় আর

প্রকাশ করবেন না। এই অঙ্গীকারের উপর তিনি তিন বছর অটল ছিলেন। তারপর পত্রিকা আবার পূর্বের ছাঁচেই চলতে থাকে। আমি বললাম, এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা উচিত। কারণ, বস্তুবাদী লোকেদের মেজাজ এমন থাকে যে, তাদেরকে হুমকি ও ভীতিপ্রদর্শনেই কাজ আদায় হয়ে যায়।

তিনি বললেন, আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন, 'আলমাকতাম' সত্যিই একটি ব্যতিক্রমধর্মী পত্রিকা। এতে কখনোই মদের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়নি। অথচ পত্রিকাটির নিয়ন্ত্রণ খ্রিস্টানদের হাতে। ইংরেজদের সাথে এর বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমরা তার এই কৃতিত্ব স্বীকার করি। সমগ্র মিসরে এই পত্রিকাটিতেই উলঙ্গ ছবি সবচেয়ে কম ছাপা হয়। অশ্লীল বিষয়ের লেখাও তেমন একটা প্রকাশ করা হয় না। তিনি আরও বললেন, একবার রোমান খ্রিস্টানদের ধর্মগুরুর স্থলাভিষিক্ত জনৈক ব্যক্তি আমির মুহম্মদ আলি তাওফিককে চরিত্র বিধ্বংসী ও কুপ্রবৃত্তি জাগ্রতকারী ছবি প্রকাশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। বিষয়টি যুবরাজের কানে গেলে তিনি উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি সেসব সংবাদ ও পত্রিকার কিছু নির্বাচিত অংশ কেটে নিয়ে রাজদরবারে রিপোর্ট করেন। আজহারও তার এই কাজে শরিক হয়। আমরা ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। কিন্তু বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীসময়ে কী হয়েছে তা আর জানতে পারিনি।

আমি হোসাইন ইউসুফকে বললাম, আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব এবং 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ'র নওজোয়ানদের সঙ্গে আমাকে সাক্ষাত করিয়ে দিন। আমি তাদের সাথে দেখা করে কথা বলব। তিনি এর প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর আমাদেরসহ আরও কিছু বন্ধু-বান্ধবকে বৃহস্পতিবার দুপুরের খাবারের দাওয়াত দিলেন। শোকরিয়া আদায় করে আমরা তার দাওয়াত কবুল করে নিই।

মাগরিবের পূর্বে আমরা আনসারুস সুন্নাহর অফিসে যাই। সেখান থেকে আলি আদলি মুরশিদীসহ আরও কিছু লোক নিয়ে মুহম্মদ আফেন্দী আবদুল ওহহাব বান্নার বাসায় যাই। তার বাসাটি নয়া মিসরে। তিনি আনসারুস সুন্নাহর একজন কর্মঠ ও পরিশ্রমী সদস্য। সেখানে আনসারুস সুন্নাহর বহু সদস্য ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সাথে আমার দেখা হয়। তাদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করি। তারপর এখানেই রাতের খাবারে অংশগ্রহণ করি। শনিবার আবেদিন এলাকায় অবস্থিত সংস্থার অফিসে দুপুরের খাবার খাওয়ার শর্তে সেখান থেকে বিদায় নিই।

আজহারে জুমার নামাজ

১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

এখন পর্যন্ত কায়রোর কোনো বড় মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার সুযোগ হয়নি। জুমার দিন বিভিন্ন শহরের প্রচলিত রেওয়াজও দেখতে পারিনি। আফসোস, প্রতিটি শহরেই দীনের বিশেষ রঙ রয়েছে। রয়েছে বিভিন্ন রুসুম-রেওয়াজ, যা অন্য শহর থেকে আলাদা। এসব রুসুম-রেওয়াজ স্থানীয় বিভিন্ন অভ্যাস থেকে গড়ে উঠেছে। এসবের সাথে দীনের আদৌ সম্পর্ক নেই।

আজ আমরা আজহারে গিয়ে জুমার নামাজ আদায় করার সিদ্ধান্ত নিই। নামাজের এক ঘণ্টা পূর্বে মসজিদে পৌঁছে যাই। স্বাভাবিক নিয়মে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বসে থাকি। কিছুক্ষণ পর একজন কারী সাহেব আসেন। মিসরে জোরে সুরা কাহাফ তেলাওয়াতের রীতি অনেক আগে থেকেই চলে আসছে। কারী সাহেব লাউডস্পিকারে তেলাওয়াত শুরু করেন। এক আয়াত তেলাওয়াত করার পর শ্রোতারা সমস্বরে চিৎকার দিয়ে উঠে তার সুরেলা কণ্ঠের প্রশংসা করতে থাকে। দ্বিতীয়বার এই আয়াত পড়ার জন্য আবদার জানাতে থাকে। এসব হৈ-হুল্লোড় আর চিল্লাচিল্লি শুনে মনে হল আমরা ভারতের কোনো মেলায় আছি। আবার সকলে এ কথাও বলছে, 'আল্লাহ আপনাকে যেই নেয়ামত দিয়েছেন তা থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করবেন না।' বাহ! কারী এক আয়াত পড়ার পর সেই আয়াতকে তিন-চারবার আরও চমৎকার সুরে নতুন ভঙ্গিতে পড়ছেন। শ্রোতারা তেলাওয়াত শুনে এদিক-সেদিক দুলতে থাকে আর চিৎকার করতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে আমরা সত্যিই বিপাকে পড়ি। না পারি নফল নামাজ পড়তে, না পারি ভালোভাবে কেরাত শোনতে। এ পদ্ধতির কেরাতে অন্তরে কোনো স্বাদ অনুভব হয় না। আমি এই ভেবে বিস্মিত হলাম যে, আজহারের আলেমগণ মসজিদে এভাবে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি দিলেন কীভাবে অথচ এটা আজহারের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এই অঞ্চলের দীনী মারকাজ। এখানে যা হয় তা প্রমাণ হিসেবে অন্যত্র উপস্থাপিত হয়। এখানকার কর্মকাণ্ড গ্রামের মানুষের জন্য ফতোয়ার মর্যাদা রাখে। একটি মুসলিম রাষ্ট্রের জাতীয় মসজিদে নামাজ এমন ছিল, যা দেখে একজন আহলে ইলম মুসলমান সন্তুষ্ট হতে পারেননি।

জুমার পর আমরা শায়খ আমিন আলখাত্তাবের ওখানে যাই। সেখান থেকে তিনি এবং আহমদ উসমানের সঙ্গে আমাদের বন্ধু আলহাজ আলি মাহমুদ শরিফের বাসায় যাই। ওলামা ও বন্ধু-বান্ধবের এক জামাতের সাথে এখানে দুপুরের খাবার খাই। তাদের মধ্যে শায়খ মুহম্মদ তহা সাকিতও ছিলেন। তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার লাইব্রেরির জন্য তার সদ্য প্রকাশিত درجات الناس عند ملوكهم [দারাজাতুন-নাস ইনদা মুলূকিহিম] বইটি আমার নিকট দিলেন।

'আলকাহেনা'য় মাগরিবের নামাজ পড়ি। মসজিদটি বাজারে হওয়ার কারণে মুসল্লিতে ভরপুর ছিল। আমরা শুনেছি এখানে বড় বড় ব্যক্তির জানাজার নামাজ পড়া হয়। মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা ইয়াসিন শরিফের সাথে এক জায়গায় যাই। সেখানে ইখওয়ানের বিশেষ কিছু ব্যক্তির সমবেত হওয়ার কথা। জায়গাটি মূলত এক ইখওয়ানি আইনজীবীর অফিস। এখানে শহিদ হাসানুল বান্নার ভাই আবদুর রহমান বান্নার সাথে দেখা হয়। এরি মধ্যে বহু ইখওয়ান সদস্য চলে আসে। তাদের সাথে পরিচয়পর্বের পর আলোচনা শুরু হয়। আমাদের পরপরই জনাব সালেহ ইশমাবী, মুহম্মদ ফরিদ আবদুল খালেক, সাদুদ্দীন ওলিলী, জনাব সালেহ কুদুর, মুহম্মদ আবদুল হামিদ, আবদুল হাফিজ সায়ফী প্রমুখও আসেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কাছে আমার আশা

আজ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দায়িত্বশীলদেরকে নিয়ে আয়োজন করা অনুষ্ঠানে আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। এটি কোনো নিয়মতান্ত্রিক অনুষ্ঠান ছিল না। ইখওয়ানের আন্দোলন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আমি বললাম, আমি এরই মধ্যে আরববিশ্বের বেশ কটি দেশ সফর করেছি। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়েছি। পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন যদি নিজস্ব ফর্মুলা অনুযায়ী সংগঠিত হতে পারে তা হলে তারাই আরববিশ্বকে চারিত্রিক অবক্ষয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। এ কারণে আমি এই আন্দোলনকে অনেক গুরুত্বের সাথে দেখি। একে অন্তর দিয়ে ভালবাসি। কিন্তু প্রবাদ আছে, যেখানে ভালবাসা সেখানে হাজারো কুধারণা। সেই হিসেবে আমি কিছু মতামত ও অভিজ্ঞতা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি,

যা আমি ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলন অধ্যয়ন করে অর্জন করেছি। আমি আপনাদের ভাই কিংবা আপনাদের পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তা উপস্থাপন করছি।

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। বিষয়গুলো সেসব দাওয়াতের জন্য প্রয়োজন, যা ইখওয়ানের নিয়মনীতি মেনে চলে। সেসব আন্দোলনের জন্য প্রয়োজন, যা ইখওয়ান আন্দোলনের চিন্তা-চেতনা নিয়ে বিকশিত হয়েছে।

প্রথম বিষয় ঃ ঈমানের বীজ বপন

রাষ্ট্রক্ষমতায় বসার পূর্বে, প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও সাংগঠনিক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পূর্বে মানুষের হৃদয়ে সর্বপ্রথম ঈমানের মৌলিক ও প্রাথমিক বিষয়গুলোর বীজ বপন করা উচিত।

সফলতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছুতে হলে, বৃক্ষ থেকে পাকা ফল পেতে চাইলে কাজের এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলন ও তার কর্মীদের এর উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে। ব্যয় করতে হবে নিরলস শ্রম প্রচেষ্টা। কিন্তু যদি আন্দোলন পরিচালনাকারীরা তাড়াহুড়া করে এই স্তর অতিক্রম করে কিংবা দাওয়াতের মাধ্যমে জনগণের আত্মগঠন ব্যতীত রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়, তা হলে ক্ষমতার এই মহীরুহ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এথেকে আশানুরূপ ফল আসবে না।

ইসলামি দাওয়াতের প্রথম দিকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। দাওয়াতের কাজে মক্কায় তেরো বছর ব্যয় হয়েছে। তারপর মদিনায়ও এই কাজে কেটেছে কয়েক বছর। রাসুল সা. এর জীবদ্দশায় তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনার সময়, দাওয়াত ও তাবলিগের সময়ের চেয়ে খুব কম। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা ইখওয়ানের এই দাওয়াতের ব্যাপারে কল্যাণের ফায়সালা করেছেন। নেতৃত্বের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা সত্ত্বেও তাদেরকে দাওয়াতের প্রথম স্তরে থাকতে বাধ্য করেছেন। সম্ভবত এটা এলাহি সিদ্ধান্ত, যাতে দাওয়াতের কাজ পাকাপোক্ত হয়ে যায় এবং এর কর্মীবাহিনী আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসেবে গড়ে ওঠে। দাওয়াতের মূলনীতিগুলো আরও মজবুত হয়ে যায়। এ এক সুবর্ণ সুযোগ। ইখওয়ানের উচিত এই

সুযোগকে গনিমত মনে করে একে পুরোপুরি কাজে লাগানো। দাওয়াতের প্রচার-প্রসার, মানুষের অন্তরে এলাহি বীজ বপন, দীনী ব্যক্তিত্বের প্রশিক্ষণ এবং সর্বস্তরের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে এক মিনিটও নষ্ট হতে দিবে না।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ ব্যক্তিগঠন

দ্বিতীয়ত এমন কিছু লোক তৈরি করা, যারা দাওয়াতের কাজকে সামনে এগিয়ে নিবে। একে সঠিকভাবে পরিচালনা করবে। যারা লোকজনকে প্রশিক্ষণ দিবে। পূরণ করবে পূর্ববর্তীদের শূন্যস্থান। প্রতিটি দাওয়াতি আন্দোলন বা আন্‌জুমান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যদি কাজের জন্য নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলা না হয়, তা হলে তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। দেখা যাবে অল্প দিনের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ একের পর এক নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন যোগ্য ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন বা আন্‌জুমান দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

তৃতীয় বিষয় ঃ রুহের খোরাক

রুহ বা আত্মার এমন খোরাক পৌঁছানো, যা দায়ী ও আন্দোলনরত কর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সজীব ও সতেজ রাখবে। তাদের ব্যয় করা যোগ্যতার উত্তম প্রতিদান পাওয়ার জামিনদারি করবে। মানুষ প্রদীপের ন্যায়। যখন প্রদীপের তেল শেষ হয়ে যায় তখন তা এমনিতেই নিভে যায়। আমি অনেক রাজনৈতিক আন্দোলন ও দীনী দাওয়াত দেখেছি, যার পরিচালক ও নেতৃত্বদানকারীগণ নিজেদেরকে জেল-জুলুমের জন্য পেশ করেছেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাদের ভিতর শিথিলতা চলে এসেছে। তাদের জজবা থেমে গেছে। তখন তারা পিছুটান নিতে শুরু করে। যেখান থেকে কাজ শুরু করেছে সেইখান থেকে বহু পিছনে ফিরে আসে। সাধারণ মানুষ, এমনকি 'বাজারে' লোকেদের চাইতেও নীচে নেমে পড়ে।

অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, সাময়িক কোনো জজবা বা কোরবানির উপর নির্ভর করা যায় না। সফলতা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন আত্মত্যাগ। এটা অর্জিত হবে রুহানি খোরাক, আল্লাহর জিকির ও ঈমানি স্বাদে পরিপূর্ণ অন্তরের মাধ্যমে।

আমি বললাম, শায়খ হাসানুল বান্নার জীবনী পড়ে বোঝতে পারলাম, তার নিকট আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ছিল। তিনি এমন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, যাকে আল্লাহ তায়ালা ইখওয়ানের আত্মগঠন ও দাওয়াতের নেতৃত্বদানের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করেছেন। তিনি এই পয়েন্টগুলোর প্রতি পরিপূর্ণভাবে লক্ষ রাখতেন।

সবশেষে আমি শহিদ বান্নার সহকর্মীদেরকে তার সম্পর্কে কিছু শোনাতে বললাম। তার চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

হাসানুল বান্নার ব্যক্তিত্ব

মুহম্মদ ফরিদ আবদুল খালেক শহিদ হাসানুল বান্নার এই পয়েন্টগুলোর প্রতি লক্ষ রেখে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার ব্যাপারে আলোচনা করেন। তার রুহানি প্রশিক্ষণ ও মানসগঠন সম্পর্কেও বহু কিছু তুলে ধরেন। ইখওয়ানদের মাঝে তার প্রভাব এবং তার সাথে গভীর সম্পর্কের কথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, শায়খ হাসানুল বান্না সকল ইখওয়ানির নাম জানতেন। তিনি তাদের অবস্থা এবং তাদের পারিবারিক নানান সমস্যা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে বসে শোনতেন। কাজের চাপ যখন অনেক বেড়ে গেছে তখনও এর ধারাবাহিকতা পরিত্যাগ করেননি। রাজনৈতিক ব্যস্ততার মাঝেও একটি পত্রিকার দেখাশোনার সমস্ত দায়িত্ব পালন করতেন। কখনো কখনো সারারাত জেগে থেকে কাটিয়ে দিতেন। মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করতেন।

ইখওয়ানের প্রশিক্ষণ-চিন্তা

তিনি অধিকাংশ সময় বলতেন, আহা, কেউ যদি আমার অন্য সব কাজে সহায়তা করত, তা হলে আমি পুরো সময় ইখওয়ানের প্রশিক্ষণে ব্যয় করতাম। জনাব আবদুল খালেক সংগঠনের শিক্ষানীতি ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতি চিত্তাকর্ষক ও সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। তারপর আমি যেসব কথা বলেছি তার সাথে একমত পোষণ করেন। তার সঙ্গীরাও আমার কথা সমর্থন করেন। তারা আমাকে জানান, শায়খ হাসানুল বান্না এই তিনটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি মোটেই বেখবর বা উদাসীন ছিলেন না। আমাকে তারা এই আলোচনাকে একটি পরামর্শ বা ভবিষ্যৎ পথচলার গাইড হিসেবে লিখে দিতে বললেন। তারা ছেপে ব্যাপকভাবে প্রচার করবেন। আমি তাদের এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করি।

আগ্রহের সাথে তারা আমাকে বললেন, আমাদের বারবার এ ধরনের সাক্ষাতের প্রয়োজন। আমিও তাদের নিকট এজাতীয় মজলিসে উপস্থিত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

ফরিদ আবদুল খালেক আমাদেরকে বুধবার মধ্যাহ্নভোজের দাওয়াত দিলেন। কোনো ধরনের লৌকিকতা ছাড়াই আমরা দাওয়াত কবুল করে নিই। তারপর যথারীতি অনুষ্ঠান শেষ হয়। মজলিসে উপস্থিত সকলের মাঝেই ছিল এক ধরনের আনন্দ। তারা অনুভব করছিল একজন নতুন সঙ্গীর সাথে সম্পর্কের স্বাদ।

১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ আমরা 'সুন্নতে মুহম্মদিয়া প্রেসে' যাই। এই প্রেসেই আমার লেখা 'ইসলামের ইতিহাসে উত্থান-পতন' বইটি ছাপাত দিয়েছি। এখান থেকে 'আনসারুস সুন্নাহ'র অফিসে যাই। সেখানে কয়েকজন বন্ধুর সাথে আজ সাক্ষাতের পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল। তারা যথাসময়ে উপস্থিত হন। তাদের সঙ্গে আমরা মুহম্মদ আফেন্দী আবদুল ওহ্হাব বান্নার বাসার উদ্দেশে নয়া মিসর যাই। আমাদের এখানে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আলি ইয়াবিস নজদীর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি আর-রাদ্দুল কাবিম আলা মুলহিদিল কাসিম [কাসিমীর নাস্তিকতার দাঁতভাঙ্গা জবাব][১] গ্রন্থের লেখক। দুপুরের খানা এখানেই খেয়ে নিই। মাগরিবের পূর্বে আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি। তারপর 'দারুল কিতাব আলআরাবি'তে যাই। উদ্দেশ্য ছিল এখান থেকে 'বিশ্ব ও আরব উপদ্বীপ' গ্রন্থের কয়েকটি কপি নিয়ে আসব। কিন্তু সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, এখনো বইয়ের প্রচ্ছদ ছাপা হয়নি।

১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

জোহর পর্যন্ত হেজাজের বন্ধুদের কারো নিকট চিঠি লেখা আবার কারো চিঠির উত্তর লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। জোহরের পর আনসারুস সুন্নাহর অফিসে যাই। সেখান থেকে শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আলি ইয়াবিসের বাসায় যাই। তার বাসায়ই দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। শায়খ আবদুল্লাহ আমাকে তার গ্রন্থের এক কপি উপহার দিলেন। আমি বসে বসে বইটির পাতা উল্টিয়ে দেখি। সাইয়েদ কুতুব সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন তার উপরও মোটামুটি নজর বুলিয়ে যাই। লেখাটি আমার পছন্দ হয়েছে।

---

[১] الرد القويم على ملحد القصيم

বিষয়বস্তুর মানও খুব উচ্চাঙ্গের। এই লেখা থেকেই লেখকের মজবুত ঈমান, ইলমি গভীরতা ও ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা প্রতিভাত হয়।

আমি কাসিমীর সাথে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করি। উপস্থিত কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু বাসার মালিক আমার সাথে একমত পোষণ করেন। আমার ইচ্ছা ছিল তার সাথে সাক্ষাত করে তার ভ্রান্ত চিন্তা সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হওয়া।

এখান থেকে আমরা আবার আনসারুস সুন্নাহর অফিসে যাই। সেখানে শায়খ মুহম্মদ হামিদ ফকীর সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনি মুহম্মদ বিন ইবরাহিম বিন আবদুল লতিফ আলে শায়খের শুশ্রূষার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। মুহম্মদ বিন ইবরাহিম হাসপাতাল থেকে বাড়িতে চলে গেছেন। জিজায় তার বাড়ি। তার পিছনে পিছনে আমি ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী জিজায় যাই। বাড়িতে পৌঁছে তার সঙ্গে দেখা করে কুশল বিনিময় করি। তার অপারেশন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। অস্ত্রপচার সফল হয়েছে। শরীর এখন অনেকটাই সুস্থ। আমরা তার সাথে হেজাজে দীনী ও চারিত্রিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করি। তিনি আমার বই পড়েছেন। আমার চিন্তা-চেতনার সাথে তিনি একমত পোষণ করেন।

আল্লামা খিযির হোসাইনে[১]র সাক্ষাত

আমি ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ 'হিদায়াতুল ইসলামিয়া'র অফিসের সামনে নেমে পড়ি। সংস্থার পরিচালক জনাব তহা সাকিত আমাদেরকে সন্ধ্যা ছটায় আসতে বলেছিলেন। সেখানে আমরা সংস্থার চেয়ারম্যান উসুলুদ-দীন অনুষদের সাবেক প্রফেসর আল্লামা মুহম্মদ খিযির হোসাইনের সাথে সাক্ষাত করি। তার সম্পর্কে অনেক আগে থেকেকেই অবহিত ছিলাম। তিনি সাহিত্য ও দীনী ইলমের জগতে অনন্য ব্যক্তিত্ব। বিভিন্ন স্থানে দেওয়া

---

[১] ১৮৭৬ সালে তিউনিসিয়াতে তাঁর জন্ম। যায়তুনা ইউনিভার্সিটিতে তিনি লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের সৌন্দর্য জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'আস্ সাআদাতুল উজমা' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করেন। এটিই তিউনিসিয়াতে সর্বপ্রথম আরবি ম্যাগাজিন। ১৯২০ সালে তিনি মিসরে আসেন। সেখানে ইলমি গবেষণা ও বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগী হন। ১৯৫৮ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

তার বহু বক্তব্য এখন বই আকারে প্রকাশ হচ্ছে। তিনি অসুস্থতার দরুন সময় মতো না আসতে পারায় ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

যায়তুনা ইউনিভার্সিটি

আমি তাকে বললাম, আপনি কতদিন যাবৎ মিসরে আছেন? তিনি বললেন, এখানে আমি তিরিশ বছর ধরে আছি। আমি মূলত আলজেরিয়ার অধিবাসী। আমার জন্ম হয়েছে তিউনিসে। মিসরে আসার পূর্বে প্রায় দশ বছর সিরিয়াসহ অন্য অনেক শহরে কাটিয়েছি। তিউনিসের যায়তুনা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি। তারপর জার্মানিতেও কিছুদিন থেকেছি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজহার ও যায়তুনা ইউনিভার্সিটির মধ্যে বড় ও পুরনো কোনটি? তিনি বললেন, আজহারই বড় ও পুরনো। ছাত্রসংখ্যা ও উন্নতির দিক দিয়ে দ্বিতীয় স্থানে যায়তুনা। বর্তমানে সেখানে ছাত্রসংখ্যা দশ হাজারের কাছাকাছি। অবশ্য তিউনিসের মোট জনসংখ্যা ৩৫ লাখের বেশি হবে না।

তারপর তিনি বললেন, আমি কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধেও কিছু কাজ করেছি। কাদিয়ানিয়াত ও তাদের কতক ব্যক্তির ব্যাপারে কিছু প্রশ্নও করেছি। তিনি আমাকে তার লেখা কয়েকটি বই উপহার দিলেন। এগুলোর মধ্যে 'রাসায়িলুল ইসলাহ' [আত্মশুদ্ধির পত্রাবলী]ও ছিল। গ্রন্থটি তিন খণ্ড বিশিষ্ট। এতে দীন, সমাজ ও চরিত্র সম্পর্কে তার প্রবন্ধগুলোকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। 'ইসলামের যুদ্ধনীতি'[২] ও 'জীবনের লক্ষ্য'[৩] নামের দুটো গ্রন্থও দিলেন। গ্রন্থ দুটি মূলত তার সমগ্র কবিতাসংকলন। কাদিয়ানিদের সম্পর্কে তার 'কাদিয়ানিসম্প্রদায়'[৪] বইটিও আমাকে দিলেন। তাকে দেখে এবং তার সাথে আলোচনা করে আমার ভারতীয় বহু ইলমি ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ হয়। সেখান থেকে আমরা বাসায় ফিরে আসি।

---

[২] اداب الحرب فى الاسلام

[৩] خواطر الحياة

[৪] طائفة القاديانية

প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প

১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

জোহর পর্যন্ত বিভিন্নজনের পাঠানো চিঠির উত্তর লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। জোহরের পর আমরা একটি জাদুঘরে যাই। সেখানে জনাব হাসান আবদুল ওহহাব আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি আমাদেরকে ঘুরে ঘুরে অ্যারাবিয়ান মিউজিয়াম দেখান। পাশাপাশি কোন জিনিস কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, তার গুরুত্ব কী এবং প্রত্নতত্ত্বের আলোকে এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য কী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। আমরা আরবের বিভিন্ন নিদর্শন দেখার সাথে সাথে মিসরে ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসও অধ্যয়ন করি। প্রাচীন হাড়ি-পাতিল, বিভিন্ন কাষ্ঠখণ্ড ও অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও আমরা অনেক কিছু দেখি, যা ফুসতাত অঞ্চল খোদাই করার সময় পাওয়া গেছে। আমরা ধারণা করেছিলাম, এসব জিনিস সাহাবা ও মিসর বিজেতাদের সময়কার হবে। পরবর্তী সময় আমাদের ধারণা ঠিক প্রমাণিত হয়। হাসান আবদুল ওহহাব বলেছিলেন, এসব জিনিস ফাতেমি যুগ বা তারও পূর্বেকার। বিভিন্ন অট্টালিকার নমুনা, রঙিন মরমর পাথর, মাটির পাত্র, কাঠের দরজা, রঙ-বেরঙের প্রসাধনী, শবাধার, মসজিদের স্থানান্তরযোগ্য মেহরাব, মিম্বার ও জায়নামাজসহ অনেক কিছু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মিসর কাষ্ঠশিল্পে অনেক উন্নতি লাভ করেছে। কাঠের উপর ডিজাইন করে তৈরী করা বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য জিনিসও আমরা দেখি। এর মধ্যে কাঠের মোমদানি ছিল সবচেয়ে আশ্চর্যতম, যার দ্বিতীয়টি পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাদুঘর থেকে এই জাদুঘরটি বড়। এখানে রয়েছে দুর্লভ ও আশ্চার্যজনক বহু ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

অবশেষে হাসান যাইয়াতের সাক্ষাত লাভ

মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে আমরা 'রিসালাহ'র অফিসে যাই। সেখানে পত্রিকার সম্পাদক, 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাস'[১] গ্রন্থের লেখক আহমদ হাসান যাইয়াতের সাথে দেখা হয়। আমি কয়েক বছর দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় ইতিহাসের শিক্ষক ছিলাম। তখন এই গ্রন্থটি ৬ষ্ঠ

---

[১] تاريخ الادب العربى

শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। আমি ছাত্রদেরকে পড়িয়েছি। সেই সুবাদে গ্রন্থটির সাথে দীর্ঘ একসময় পর্যন্ত আমার সম্পর্ক ছিল। আমি লেখকের ভাষা ব্যবহার, সাহিত্যের মান ও বর্ণনাভঙ্গি দেখে দারুণ প্রভাবিত হই। ইতিহাস ও সাহিত্যের অপূর্ব সমন্বয় ছিল গ্রন্থটিতে। তবে তাতে ইতিহাসের তুলনায় সাহিত্যের উপস্থিতিই ছিল বেশি। তার সাথে আমার এই ইলমি সম্পর্কের কথা আলোচনা করি। আর এটি স্বভাবজাত বিষয় যে, মানুষ যখন নিজের কোনো কর্মফল দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছুতে দেখে তখন সে অবশ্যই খুশি হয়। যেমন কোনো কচি গাছে ফল ধরলে এবং আশপাশে গাছের ছায়া পড়লে মালিকের মন আনন্দে ভরে ওঠে।

তিনি মন খুলে আমার সাথে আলোচনা করেন। আমাকে তিনি পাক-ভারতের দীনী অবস্থা ও পরিবেশ, এখানকার মাদরাসা, ছাত্র এবং এ দেশে আরবিভাষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কিছুক্ষণ পর-পর বলতে থাকেন, আশ্চর্য! একজন ভারতী নিজ দেশে আরবি পড়ে কত সুন্দর ও সাবলীলভাবে আরবি বলতে পারে। আমরা ছিলাম চারজন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে 'আরবি সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের একাদশ সংস্করণের এক কপি করে হাদিয়া দিলেন। وحى الرسالة [নবুওয়াতের পয়গাম] গ্রন্থের তিন কপি দেন। প্রথমে আমরা এই মূল্যবান উপহার গ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি কবুল করার জন্য বারবার তাগাদা দিতে থাকেন। অবশেষে তার শোকরিয়া আদায় করে আমরা তা গ্রহণ করে নিই।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মিসরে আমরা যে কজন লেখক সাহিত্যিকের সাথে দেখা করেছি তাদের মধ্যে চরিত্র, প্রাণময় হৃদয় ও উদারতায় সবার ঊর্ধ্বে তিনি। আমি তার নিকট আমার লেখা 'শোন হে মিসর' পেশ করি। তিনি লেখাটি প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এরই মধ্যে জনাব সাতে বেগ হাসরী ও জনাব আদেল যাতির শায়খ হাসান যাইয়াতের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। জনাব আদেল যাতির গুস্তাফ লেবান সরফের বই 'আরবসভ্যতা'র[২] আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আমরা তাদের সাথে পরিচিত হই।

---

[২] حضارة العرب

তারপর সেখান থেকে আমরা বাসায় ফিরে আসি। বাসায় এসে দেখি, আজহারী আলেম শায়খ যাইনুল আবেদিন ফারারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তার দাওয়াতের একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। তিনি তার চিন্তায় এত আবিষ্ট যে, প্রতিটি মাসয়ালা এবং আধুনিক সকল সমস্যা তিনি এই চিন্তার আয়নায় দেখেন। তার চিন্তার সারমর্ম হল, গুনাহ সকল অশান্তির কারণ। মানুষ দুনিয়ায় যত ধরনের ভোগান্তির শিকার হয় সব তাদের গুনাহর কারণে। এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়া বা অন্য কোনো আঘাত লেগে হোঁচট খাওয়া ও গুনাহর কারণে হয়ে থাকে। জিনা ও হত্যা, দারিদ্র্যসহ কিছু নিকৃষ্ট রোগের কারণ। শিশুদের যেসব কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হতে হয় তা তাদের পিতা-মাতার কৃতকর্মের প্রতিফল।

তিনি তার এই মতাদর্শের উপর ভারী এক জামাত তৈরি করেছেন। তিনি নিজেই এর প্রধান। তারা حتى شكة الشوكة بذنب [কাঁটার খোঁচাও গুনাহর কারণে] নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তার এই দাওয়াত সেসব দেশের জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে যেখানে অন্যায়-অনাচার বেড়ে গেছে। বেড়ে গেছে আল্লাহর অবাধ্যতা। কল্যাণপ্রসূ হবে সেসব মানুষের জন্য, যারা গুনাহকে তুচ্ছ মনে করে।

আমার সদ্য লেখা 'শোন হে মিসর'[১] প্রবন্ধটি রিসালাহ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তাকে দিই। প্রবন্ধটি লেখার কাজ গতপরশু শেষ হয়েছে। প্রবন্ধটি কয়েকবার দেখে তিনি বলতে থাকেন, এ কি আপনার হাতের লেখা? আমি এই ভেবে আশ্চর্য হই যে, মিসরের উলামায়ে কেরাম ভারতীয় আলেমগণকে এবং যারা আরবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাদেরকে এর যোগ্য মনে করেন না। ভারতীয় আলেমগণ সুন্দর হস্তলিপিতে আরবি লিখতে পারেন তারা বিশ্বাস করতে চান না। যাই হোক, রিসালায় আমার এই লেখাটি ছাপা হয়। পরে শুনেছি মিসর ও মিসরের বাইরের পত্রিকার পাঠকরা লেখাটি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পড়েছে।

---

[১] اسمعي يا مصر

ফরিদ আবদুল খালেকের আমন্ত্রণ

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

জোহর পর্যন্ত লেখালেখি এবং তার পরিমার্জনার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। জোহরের পর মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ও ইয়াসিন শরিফের সঙ্গে মুহম্মদ আবদুল খালেকের বাড়িতে যাই। সেখানে জনাব মুহম্মদ আলগাজালী, আবদুল হাফিজ সায়ফী এবং আইন অনুষদের প্রফেসর ড. তাওফিক শাবী'র সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে থাকি। আলোচনার মাঝে তাসাউফ এবং তার সূচনাকাল নিয়ে কথা ওঠে। তখন আমি বললাম, প্রথমযুগে ইসলামি খেলাফত দুই দিকের নেতৃত্ব করত। যেমন ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক দিকের নেতৃত্ব দিত আবার চারিত্রিক ও রুহানি দিকেরও নেতৃত্ব দিত। খেলাফতে ইসলামিয়া মুসলমানদের জীবনে এই দুটি বিষয় সংরক্ষণের জিম্মাদার ছিল। সে একসঙ্গে উভয়বিধ সমস্যার সমাধান দিত। কিন্তু পরবর্তী সময়ে খেলাফত এমন কতক লোকের হাতে চলে যায়, যাদের ব্যক্তিত্বে উভয় বিষয়ের সমন্বয় ছিল না। তখন থেকেই দীন রাজনীতি থেকে পৃথক হতে থাকে। সরকার শুধু ব্যবস্থাপনার উপর জোর দিতে শুরু করে। অপর দিকে নৈতিকতা ও রুহানিয়াতের ময়দানে নেমে আসে চরম ধস। এই অঙ্গনে কাজ করার মতো মানুষের শূন্যতা বিরাজ করে। ব্যক্তি বা দল কারোরই এদিকে মনোযোগ থাকে না। মুসলিমবিশ্ব আনন্দ-উল্লাস, ভোগ-বিলাস, অর্থ-বিত্তের ছড়াছড়ি এবং নৈতিকতার চরম অবক্ষয়ের মতো ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে থাকে। পাশবিকতার এই প্রবল তোড়ে মুসলমানদের ভেসে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহর কিছু বান্দা ময়দানে নেমে আসেন। অনাচারের টুটি চেপে ধরে নৈতিকতার দাওয়াত দিতে শুরু করেন। শুরু করেন মানুষের রুহানি খোরাক জোগান দিতে। কিছু লোককে নিজেদের কন্ট্রোলে এনে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। যারা প্রশিক্ষণ নিয়েছে তাদেরকে আবার দাওয়াতি মেহনত করার জন্য পাঠাতে থাকেন বিভিন্ন জনপদে। তাদের এই দাওয়াতি অভিযানে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। বস্তুবাদের ভিত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন এ সকল মনীষী না হলে বস্তুবাদ মাকড়সার জালের মতো ছেয়ে যেত। জনাব তাওফিক শাবী বললেন, কিন্তু তাসাউফের ভিত্তি ইসলামসম্মত নয়। এতে রয়েছে উঁচু-নীচু বিভিন্ন স্তর। ইসলাম এর পক্ষপাতিত্ব করে না। বরং একে ভুল মনে করে। তাসাউফপন্থীদের বিশেষ

একটা ইউনিট রয়েছে। তারপর তাদের মাঝে আবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে। ইনি পীর, ইনি খলিফা, সে মুরিদ, ও খাদেম। আমি অনেক খানকায় সরলমনা লোকজনকে পীরদের গোলামি করতে দেখেছি। দেখেছি মানুষের বিনা বেতনের খাটুনি। বলা বাহুল্য, আমি তাসাউফের মাঝে হিন্দি ও গ্রিক দর্শনের গন্ধ পেয়েছি। তার সঙ্গে ইসলামের মোটেই সম্পর্ক নেই। হযরত হাসান বসরী রহ.[১] এবং তার সমসাময়িক লোকেদের মধ্যে এসবের কিছুই ছিল না। ইমাম গাজালী রহ. তাসাউফের কিছু বিষয়ের সমালোচনা করেছেন, যা এখন তাসাউফের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং সুফিদের মাঝে তা জোরেশোরে চলছে। যেমন- ওয়ারাসাত, ছেলে-সন্তান ও নাতি-পুতিদেরকে খলিফা বানানো। তারা নাকি গদিনশীন পীর।

তাসাউফ একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র

এই মতবিনিময়ের পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, তাসাউফ একটি স্বতন্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র। যখন মানুষের জীবনব্যবস্থা ইসলামি ছাঁচে পরিচালিত হবে, সত্যিকার ইসলামি মূল্যবোধের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই খেলাফত আইনি ব্যবস্থাপনাসহ নৈতিক ও রুহানি জিম্মাদারিও পালন করবে তখন অন্য কোনো পদ্ধতিতে আত্মগঠনের প্রয়োজন হবে না। আলোচনার মাঝে শায়খ বাহি আলখাওলী এসে উপস্থিত হন। তিনি বর্তমান ইখওয়ানের চিন্তানায়কদের অন্যতম। আমাদের এই ইলমি আলোচনায় তিনিও অংশগ্রহণ করেন। তার সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহ আমার অনেক আগে থেকেই ছিল। যাক, পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম ছাড়াই

---

[১] হাসান বসরী রহ.। বিখ্যাত তাবেয়ী ফকিহ। ইলম ও আমলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। খোদাভীতি, ইলম চর্চা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় জীবন কাটিয়ে দেন। তার পিতা হযরত ইয়াসার রাদি. ছিলেন যায়েদ ইবনে সাবেত রাদি. এর আযাদ করা গোলাম। আর মা খায়রা রাদি. ছিলেন উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা রাদি. এর আযাদ করা দাসী। শিশুকালে তার মা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকাকালে যখন তিনি কান্নাকাটি করতেন তখন উম্মে সালমা রাদি. [রাসুলের স্ত্রী] সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য স্তন মুখে দিতেন। ফলে তার স্তন দুধে ভরে উঠতো। এভাবে উম্মে সালমা রাদি. এর দুধপানে তিনি সৌভাগ্যবান হন। এর বরকতে জ্ঞান, হিকমত, খোদাভীতি ও ঈমান আমলের অধিকারী হয়ে তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন। হযরত উমর রাদি. এর খেলাফতের শেষ দুই বছরের পূর্বে হযরত হাসান মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। ১১০ হিজরির রজব মাসে বসরায় তিনি ইনতেকাল করেন।

আজ তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তারপর আমরা খাবারের প্রস্তুতি নিই। খাওয়ার পর সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়। শায়খ বাহি আলখাওলীকে কিছু বই উপহার দিই। আগামী রবিবার আটটায় আবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়।

আমাকে আবদুল হাফিজ সায়ফী শায়খ সালেহ হরব পাশা'র[২] সঙ্গে দেখা করতে বললেন। জনাব সায়ফী শুব্বানুল মুসলিমিনে আমার আলোচনা করার ব্যাপারে তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। এই জন্য তিনি মুনাসিব মনে করলেন যে, তার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়ে যাক। এতে আলোচনার সময় ও বিষয়ও নির্ধারিত হয়ে যাবে।

সুতরাং এই উদ্দেশ্যে আমরা তার নিকট গেলাম। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আলোচনা হয়। তিনি মিসর সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলেন। আমি বললাম, মিসর সম্পর্কে আমি বরাবর অধ্যয়ন করেছি। বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরেও দেখেছি। এখানে যেমন চিত্তাকর্ষক ও মনোলোভা বিষয় রয়েছে তেমনি রয়েছে বহু চিত্তবিকর্ষণকারী ও দৃষ্টিকটু বিষয়ও।

তিনি বললেন, মিসরের ভৌগোলিক অবস্থান উপকারের তুলনায় ক্ষতিই বেশি করেছে। আমি বললাম, মিসরের জন্য ক্ষতিকর জিনিসগুলোর মধ্যে বাণিজ্যিক সাহিত্যেরও বড় দখল আছে। তিনি বললেন, এটাকে অশ্লীল সাহিত্য বললেও অত্যুক্তি হবে না। তার নিকট তখন সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী, আন্তর্জাতিক খাদ্য অধিদপ্তরের সদস্য মাহমুদ তাওফিক হাফনাবীও উপস্থিত ছিলেন।

আহমদ শিরবাসী এবং তার লেকচার

আমরা জনাব সালেহ হরব পাশার কাছ থেকে উঠে গিয়ে আহমদ শিরবাসীর লেকচারে অংশগ্রহণ করি। তিনি একজন অত্যন্ত উঁচুমানের সাহিত্যিক। তার লেকচারও অনন্য ও অসাধারণ। তার আলোচনার বিষয় ছিল 'ইসলামে জন্মনিয়ন্ত্রণ'। আলোচনায় ব্যতিক্রমধর্মী কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। সুন্দর উচ্চারণ ও উপস্থাপনা এবং পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সমন্বয় ছিল তার

---

[২] সালেহ হরব পাশা মিসরের সাবেক জেনারেল। মাওলানা মুহম্মদ আলি জাওহার ও ডক্টর ইকবালকে তিনি খুব ভালো করে চেনেন। নিজের পুরো জীবনকে তিনি দীনের কাজের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তিনি শুব্বানুল মুসলিমিনের মহাপরিচালক।

এই লেকচারে। সাহিত্যের মাত্রা কম ছিল না। আলোচনায় তিনি বলেন, ইসলাম কোনো কোনো সময় বিশেষ কিছু কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ অনুমতি দেয়। তারপর এ কথার বিশদ ব্যাখ্যাও করেন। কিন্তু বর্তমানে মিসরে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো প্রয়োজন নেই। আমাদের ওইসব প্রিয় কুকুরের জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, যা মোটর গাড়িতে সওয়ার থাকে। মারা গেলে মহিলারা বিলাপ করে। শোকসভা করে। আবার এর জন্য মানুষের মতো কবরও তৈরি করে। মিসরের বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি জন্মনিয়ন্ত্রণকে মোটেই সাপোর্ট করে না। লেকচার শেষে আমরা সালেহ হরবের নিকট যাই। আগামী বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় আমার আলোচনার সময় নির্ধারণ করা হয়। আমি 'সঙ্ঘাতের মুখে পৃথিবী' আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন করি।

দারুল কুতুব আলমাসরিয়া

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

জোহর পর্যন্ত আমার পিতার লেখা جنة المشرق ومطلع النور المشرق বইয়ের[১] সংশোধন ও পরিমার্জনার কাজে ব্যস্ত ছিলাম। বইটি ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কীয়। এতে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানসহ বিভিন্ন বিষয় বৈচিত্র্য আলোচনা করা হয়েছে। ড. আহমদ আমিন আমাকে হিন্দি নামগুলো স্পষ্ট লিখে দেওয়ার জন্য বইটি দিয়েছেন।

জোহরের পর আমরা দারুল কুতুব আলমাসরিয়ায় যাই। আমাদের সঙ্গে শায়খ আহমদ উসমান ও জনাব রাশাদ আফেন্দী ছিলেন। রাশাদ এখানে অনেক আসা-যাওয়া করেন। এই লাইব্রেরিতে দুষ্প্রাপ্য বহু কিতাব ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এ সম্পর্কে রাশাদ খুব ভালো জানেন। এসবের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তার ধারণা বেশ স্বচ্ছ। আমাদেরকে নিয়ে তিনি লাইব্রেরি ঘুরে বেড়ান। এটি মুসলিমবিশ্বের সবচেয়ে বড় ও প্রশস্ত লাইব্রেরিসমূহের একটি। এখানে মুসান্নিফদের নিজ হাতে লেখা বহু পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত রয়েছে। ইস্তাম্বুলের [কনস্টান্টিনোপ] লাইব্রেরি ব্যতীত এর চাইতে বড় কোনো লাইব্রেরি কোথাও আছে কি না আমার

[১] এটি 'নুজহাতুল খাওয়াতির'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

জানা নেই। আমি সেখানে বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হাজার[২], আল্লামা জাহাবী, ইবনে শাজারী ও শারানীর মতো বিশিষ্ট লেখকদের হাতের লেখা বহু কিতাব দেখি।

আমরা কিতাবের বিস্তারিত তালিকা সাইয়েদ ফুয়াদের নিকট থেকে সংগ্রহ করি। আমাদের জানানো হয় যে, এখানে পাঁচ লাখ কিতাব রয়েছে। আমরা মাগরিবের কিছু পূর্বে এই চিন্তা করে লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে আসি যে, এত অল্প সময় এর জন্য যথেষ্ট না। যদি এত বড় লাইব্রেরি থেকে কিছু অর্জন করতে চাই, দীর্ঘ সময় নিয়ে আসতে হবে।

শায়খ হাসানাইন মাখলুফের সাক্ষাত

বাজারের একটি মসজিদে আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করি। সেখানে জামইয়্যা শারইয়্যার জনৈক সদস্যের দোকানে মিসরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি অত্যন্ত নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমাদেরকে হোলওয়ান সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং সেখানে তার সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর জোর তাগিদ দেন। আমরা তাকে কয়েকটি বই হাদিয়া দিই।

এশার নামাজের পর আবদুল্লাহ আকিল এবং তার এক বন্ধু আমাদের এখানে আসেন। তারা থাকতেই আবার আনসারুস সুন্নাহর পরিচালক মুহম্মদ আবদুল ওহহাব বান্না ও আলি আদলি মুরশিদীও তাশরিফ আনেন। অল্পক্ষণ বসে থেকে এক এক করে সকলে চলে যান।

ড. আমিনের কথাবার্তা

২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

খুব ভোরে জনাব রাশাদ চলে আসেন। তার সঙ্গে আমরা ড. আহমদ আমিনের নিকট যাই। তার আলেকজান্দ্রিয়া সফরের পর এখন পর্যন্ত তার

---

[২] হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ.। প্রকৃত নাম আহমদ ইবন নুরুদ্দীন। জ্ঞান ও ইলমের জগতের বিশ্বনন্দিত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। হাদিসশাস্ত্রের মহাপণ্ডিত। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যে বিষয়ে তার রচনা নেই। কিয়ামত পর্যন্ত জ্ঞান পিয়াসীরা তাঁর নিকট ঋণী থাকবে। ৭৭৩ হিজরি সনে তিনি ফিলিস্তিনের আসকালানে জন্মগ্রহণ করেন। ৮৫২ হিজরির ২৮ জিলহজ মাসে ইনতেকাল করেন। বর্ণিত আছে দেশের বাদশা ও হযরত খিযির আ. তাঁর জানাজায় অংশগ্রহণ করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এর কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তিনি جنة المشرق ومطلع النور المشرق **[জান্নাতুল মাশরিক ওয়া মাতলাউন নুরিল মাশরিক]** নামক যে বইটি সংশোধনের জন্য আমাকে দিয়েছিলেন সেটি] পৌঁছিয়ে দিই। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে তার সঙ্গে আলোচনা হয়। আমি ওই চার কিতাব সম্পর্কে তার অভিমত জানতে চাই যে কিতাবগুলোকে ইবনে খালদুন সাহিত্যের মূলনীতি বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিতাব চারটি হল আবু আলি আলকালী[১]'র الامالى [আলইমালী], মুবাররাদের[২] تاريخ الكامل [তারিখুল কামিল], জাহেজের[৩] البيان والتبيان [আলবায়ান ওয়াত তিবয়ান] এবং ইবনে কুতায়বার ادب الكاتب [আদাবুল কাতিব]।

সাহিত্যের মূলনীতি চতুষ্টয়ের ব্যাপারে তার অভিমত

তিনি বলেন, ادب الكاتب [আদাবুল কাতিব] একটি বিশুদ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ। আর تاريخ الكامل [তারিখুল কামিল] এর লেখকের বিষয় নির্বচনের তেমন যোগ্যতা ছিল না। কোনো বিষয় চয়ন করার যোগ্যতা সুস্থ রুচিবোধের মাধ্যমে অর্জন হয়। عقد الفرائد [ইকদুল ফারায়েদ]'র লেখকের ভাষায় তারিখুল কামিলের লেখক অনেক সময় সাহিত্যের নিম্নমানের অংশও উদ্ধার করেছেন। এই চারটি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল 'আলবায়ান ওয়াত তিবয়ান'। আমি বললাম, কিন্তু গ্রন্থটি বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়ে গেছে। এতে বিক্ষিপ্ত ও পুরনো সাহিত্যের কিছু নমুনা জমা করা হয়েছে। ভারতের কোনো কোনো সাহিত্যিকের বক্তব্য 'আলবায়ান ওয়াত

---

[১] তাঁর মূল নাম ইসমাইল ইবনে কাসেম। ৯০১ হিজরিতে তার জন্ম। দীর্ঘ ২৫ বছর বাগদাদে পড়াশোনা করে কর্ডোভায় চলে যান। সেখানেই ৯৬৭ সালে তার মৃত্যু হয়। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আন নাওয়াদের', যা 'ইমালুল কালি' নামে অধিক পরিচিত।

[২] ৮২৬ সালে বসরায় তার জন্ম। তার মূল নাম মুহম্মদ ইবনে ইয়াজিদ। 'আল কামিল' তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ৮৯৯ সালে বাগদাদে তার মৃত্যু।

[৩] ইমাম জাহেজ রহ.। তৃতীয় শতকের ইলমি ব্যক্তিত্ব। বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তার যুগের সকল বিষয়ের পণ্ডিত হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বহুগ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেন। আলবায়ান ওয়াত তিবয়ান এবং দেওয়ানে রাসায়েল তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ। ২৫৫ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

তিবয়ান' হল حماسة [হামাসা]র গদ্য রূপ। ডক্টর আমিন বললেন, মারযুকী[৪] হামাসার ব্যাখ্যাগ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, 'হামাসা'র আসল নাম 'আলবায়ান ওয়াত তিবয়ান' মারযুকীর কথা অনেকটা যুক্তিগ্রাহ্য। কারণ 'আলবায়ান ওয়াত তিবয়ান ও হামাসা'র মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

আবু হাইয়ানকে জাহেজের উপর মর্যাদা দান

তারপর ডক্টর আমিন বললেন, আমি আবু হাইয়ান তাওহিদীকে জাহেজের উপর প্রাধান্য দিই। কারণ, তার সময়টা অনেক গভীরের। আমি বললাম, আপনি কিন্তু আপনার 'দুহাল ইসলাম' গ্রন্থে জাহেজ সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি তার যুগ ও সমাজের সঠিক রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তখন তিনি বললেন, এমনিভাবে আবু হাইয়ানও নিজের পারিপার্শ্বিকতা, সমাজের মূল অবয়ব ফুটিয়ে তুলেছেন।

তারপর তার অন্য কিছু গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা হয়। আহমদ আমিন বললেন, তার লেখা গ্রন্থসমূহের একটি হল الحج العقلي [আলহাজ্জু আলআকলিয়্যু]। আমি বললাম, নামটি বিস্ময়কর। কারণ, হজ ইসলামের চারটি আরকানের মধ্যে এই দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ যে, এটি আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসার নমুনা পরিস্ফুট হয়। তিনি বললেন, জি, অবশ্যই। আমি কিতাবটি দেখিনি। আমার ইচ্ছা কিতাবটি পড়ব এবং তার উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে ভালো করে জানব।

'হামাসার'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ

তারপর 'হামাসা'র বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা ওঠে। আহমদ আমিন মারযুকীর ব্যাখ্যাগ্রন্থকে তাবরিজীর ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপর প্রাধান্য দেন। কারণ, তাবরিজীর ব্যাখ্যাগ্রন্থে শুধু আভিধানিক বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটি কবিতা বোঝার ক্ষেত্রে ছাত্রদেরকে সহায়তা করে না।

---

[৪] একজন আরবি সাহিত্যিক। তাঁর মূল নাম আহমদ ইবনে মুহম্মদ। ১০৩০ সালে তার মৃত্যু। 'শারহু দিওয়ানিল হামাসা' তার প্রসিদ্ধ কিতাব।

স্পেনিশ সাহিত্য

মাঝে স্পেনিশদের আলোচনাটা ছেড়ে দিয়েছি। আমি বললাম, স্পেনিশ জ্ঞান ও সাহিত্যে সেই গভীরতা নেই, যা প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যে স্পেনিশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যকে ভাসা-ভাসা মনে করা হয়। সেখানে সাহিত্যের দিকটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর সর্বদা বিজয়ী থাকে। আহমদ আমিন আমার এই অভিমতের সঙ্গে একমত পোষণ করলেন। আমরা তার নিকট থেকে এই প্রোগ্রাম করে চলে এলাম যে, আগামী রবিবার সাহিত্য অনুষদে তার সঙ্গে দেখা করব এবং অনুষদের বিভিন্ন শাখা ও লাইব্রেরি ঘুরে দেখব।

আতাবা থেকে আমরা আবদুর রশিদ নদবীর সঙ্গে দারুল কিতাব আলআরাবিতে যাই। লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী হাজি হিলমি মিনাবী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। সেখানে শায়খ গাজালী ও শায়খ বাহি আলখাওলীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের সঙ্গে এই অনাকাঙ্ক্ষিত সাক্ষাতে আমি যারপরনাই আনন্দিত হই। জনাব বাহি আলখাওলীর সঙ্গে সাক্ষাতকে আমি গনিমত মনে করি। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে থাকি। এরই মধ্যে জনাব সালেহ ইশমাবী উপস্থিত হন। বাহি আলখাওলী আমার সেই বইগুলো পড়েছেন, যেগুলো আমি মুহম্মদ ফরিদের বাসায় তাকে হাদিয়া দিয়েছিলাম। এ জন্য তিনি আজ আমার সঙ্গে সম্মান ও ভালবাসাপূর্ণ হৃদয় ও প্রশস্ত মন নিয়ে মিশেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, যখন দুজন মানুষের চিন্তা, আকিদা ও মতাদর্শ এক হয় তখন তাদের মধ্যে একটি রুহানি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এজন্যই তিনি কোনো ধরনের লৌকিকতা ছাড়াই বলে উঠলেন, 'শায়খ আবুল হাসান, আমি আপনার অবয়ব দেখেছি কিন্তু আপনাকে চিনেছি আপনার বই পড়ে।' তিনি আমার লেখাগুলোর উপর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারপর বললেন, আপনার বইগুলোতে আমি আঞ্চলিকতার কোনো প্রভাব পাইনি। বিশেষ কোনো শহরের পারিপার্শ্বিকতার ছাপও দেখিনি। যেমনটি অনেক লেখকের বই থেকে প্রতিভাত হয়ে থাকে। পাঠকমহল তাদের লেখা পড়ামাত্র বোঝতে পারে এই বইয়ের লেখক মিসরি নাকি ইরাকি। কিন্তু আপনার লেখায় তা অনুভব করিনি। আপনি সুদূরপ্রসারী চিন্তার অধিকারী। লেখালেখির সময় নির্দিষ্ট কোনো দেশ বা অঞ্চল আপনার সামনে থাকে

না। আপনি বরং পুরো মুসলিমবিশ্বকে সামনে রেখে লিখে থাকেন। আচ্ছা, আপনি যেখানে বসে লিখেছেন, যেখান থেকে আপনার লেখা ছাপা হয়েছে, সর্বোপরি আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থা আপনার লেখায় কেন প্রভাব ফেলতে পারেনি? আমি বললাম, সম্ভবত এর কারণ আমি হেজাজ ও আরববিশ্বকে সামনে রেখে লিখেছি। তখন ভারতবর্ষ আমার লক্ষ ছিল না।

তারপর আমি সেখান থেকে বাসার উদ্দেশে রওনা হই। আমার সঙ্গে বাহি আলখাওলীও আসতে থাকেন। আমি তার সম্মানার্থে আর না আসার দরখাস্ত করি। কিন্তু তিনি ফিরে যেতে অস্বীকার করে বললেন, আমি আপনার বাসা দেখার ইচ্ছা করেছি। তাই আপনার সঙ্গে যেতে চাই। তিনি বাসায় এসে কিছুক্ষণ বসেন। তখন তার সঙ্গে ইসলাম, মুসলমান ও কয়েকটি মুসলিমদেশ নিয়ে আলোচনা হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলনও আলোচনা থেকে বাদ পড়েনি। তার চিন্তার গভীরতা ও ঈমানি শক্তি দেখে আমি প্রভাবিত হই।

জোহরের পর আমরা শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ সা. এর মারকাজ দারুল আরকামে যাই। সেখানে ওলামা-মাশায়েখের এক ভারী জামাত আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তাদের মধ্যে আল্লামা সাইয়েদ মুবাশশির তারাযী আফগানীও ছিলেন। কয়েকজন আজহারী আলেমও ছিলেন। প্রথমে আমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হই। অল্প সময় অনুষ্ঠান চলে। সাইয়েদ মুবাশশির আফগানী মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন। অনুষ্ঠানের পর আমরা একটি রুমে গিয়ে দুপুরের খাবার খাই। তারপর সংস্থার বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখি। অল্পক্ষণ বসে 'সুন্দরী প্রতিযোগিতা' সম্পর্কে আলোচনা করি। প্রতিযোগিতায় কায়রোর তরুণীরাই বেশি অংশ নিয়েছিল। অনুষ্ঠানের সুধিমণ্ডলী বিষয়টিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছেন। সংস্থার পরিচালক এর প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠানোর জন্য স্মারকলিপি তৈরি করেছেন।

সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

সকাল ১০টার পর আমি এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী দারুল কিতাব আলআরাবিতে যাই। সেখানে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী হিলমি মিনাবী ও শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী আমাদের জন্য অপেক্ষা

করছিলেন। আজ সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে হোলওয়ান যাওয়ার সিদ্ধান্ত পূর্বেই ছিল। হিলমি মিনাবী সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ সেরে নেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র লেখক শায়খ আবুল হাসানকে চেনেন? সাইয়েদ কুতুব[১] বললেন, হ্যাঁ, তার সম্পর্কে আমি জানি। সাইয়েদ কুতুব বইটি বাজার থেকে সংগ্রহ করে পড়েছিলেন। মিনাবী তারপর তাকে বলেন, আপনি কি তার সঙ্গে দেখা করতে চান? তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন মিনাবী বলেন, আমরা তাকে নিয়ে আসছি।

আমরা আলহাজ হিলমি মিনাবীর গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়িটি হোলওয়ানের উদ্দেশে চলতে থাকে। হোলওয়ান কায়রো থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে। সেখানে পৌঁছে দেখি ইমাম জুমার খুতবা দিচ্ছেন। আমরা মসজিদে প্রবেশ করে জুমার নামাজ আদায় করি। জনাব হিলমি সাইয়েদ কুতুবের বাসা ভুলে গেছেন। তিনি বিভিন্ন লোকের নিকট তার বাসার লোকেশন জিজ্ঞেস করতে থাকেন। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল তার বাসা খুঁজে পেতে অনেক সময় নষ্ট হয় কি না। এদিকে সাইয়েদ কুতুব আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে, সে খবর আমাদের ছিল না।

আমরা তার বাসায় যাই। আমি তাকে বললাম, আমার কাছে জনাব আবদুল গফুর আত্তারের একটি পরিচয়পত্র ছিল। পত্রটি আমি ভুলে ঘরে

---

[১] বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম ও খ্যাতনামা সাংবাদিক। আট খণ্ডে সমাপ্ত 'তাফসির ফি জিলালিল কুরআন' তাঁর অনবদ্য অবদান। ১৯০৬ সালে মিসরের আসইউত জেলার মুসা গ্রামে তাঁর জন্ম। ১৯৪৫ সালে ইখওয়ানের সদস্য হয়ে দলটির আন্দোলনের কাজে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করেন তিনি। হাসানুল বান্নার শাহাদাতের পর তিনি দলের কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫৪ সালে ইখওয়ান কর্তৃক পরিচালিত সাময়িকী 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন'র সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাস পর কর্নেল নাসের সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দেয়। তারপর একটি বনোয়াট হত্যা মামলার অভিযোগে দলের নেতাদেরকে গ্রেফতার শুরু করে। গ্রেফতারকৃত নেতাদের মধ্যে সাইয়েদ কুতুবও ছিলেন। জেলে তার উপর বর্বরোচিত নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালের ১৩ জুলাই গণআদালতের বিচারে তাকে পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদুস সালাম আরিফের সুপারিশে কর্নেল নাসের তাকে মুক্তি দিয়ে তারই বাসভবনে অন্তরীণ করে রাখে। এক বছর যেতে না যেতেই তাকে আবার গ্রেফতার করা হয়। তাঁর বৈপ্লবিক গ্রন্থ 'ইসলামি সমাজ বিপ্লবের ধারা' রচনার অভিযোগে ১৯৬৬ সালের ২৫ আগস্ট তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

রেখে এসেছি। তার কাছেই আপনার পরিচয় পেয়েছি। তিনি আপনাকে অনেক মহব্বত করেন। আপনার কথা আমার নিকট বারবার বলতেন। সাইয়েদ কুতুব বললেন, এটা তার ভালবাসার কথা। আর প্রেমিকের কথা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয় না।

সাইয়েদ কুতুবের জীবনের পটপরিবর্তন

আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের 'মাদরাসায়ে ফিকরে'র একজন সাহিত্যিক হিসেবে জানি। রিসালাহ পত্রিকায় আপনার জ্ঞানগর্ভ, সাহিত্যময় ও বিশ্লেষণধর্মী বহু লেখা আমি পড়েছি। ইসলামি সাহিত্যের প্রতি আপনি কীভাবে ঝুঁকলেন? সাহিত্যজীবনে আপনার এই পটপরিবর্তনের রহস্য কী?

তিনি বললেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ আমার সাহিত্যের ওসতাদ। শব্দগুচ্ছের তুলনায় চিন্তার প্রতি আমার বেশি মনোনিবেশের কারণও তিনি। তিনিই আমাকে সাদেক রাফেয়ী ও মানফালুতী[২]র অন্ধ অনুকরণ থেকে ফিরিয়েছেন। কিন্তু অশ্লীল সাহিত্য ও কাব্য প্রেম থেকে আমাকে আমার রুচিবোধই দূরে রেখেছে। আমার অন্তর সর্বদা রুহ ও রুহানি জিনিসের সন্ধানেই থাকত। শৈশব থেকেই আমি বুজুর্গদের জীবনচরিত এবং তাদের বিভিন্ন কারামতের ঘটনার প্রতি আসক্ত ছিলাম। আমার বেড়ে ওঠার সাথে সাথে আমার এই চেতনারও অগ্রগতি হতে থাকে। আমি আমার স্বভাবজাত রুচিবোধকে অন্যদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে থাকি। এই জন্য তেগোরের[৩] মতো কবিদের লেখা পড়তেও আমি দ্বিধাবোধ করিনি।

দ্বিতীয় কথা হল, মাহমুদ আক্কাদ একজন চিন্তাশীল মহান ব্যক্তিত্ব। প্রতিটি মাসয়ালা তিনি যুক্তি ও চিন্তার আলোকে দেখেন। আর এই

---

[২] আরববিশ্বের সাড়া জাগানো কবি ও সাহিত্যিক। জামিয়া আজহারের কৃতিসন্তান। ছোট বেলায়ই কুরআন হিফজ করেন এবং শায়খ মুহম্মদ আবদুহু রহ. এর তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করেন। তিনি আরবি কবিতা, ছন্দ ও অলংকারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তার লেখার বর্ণনাভঙ্গি যাদুময়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী। আরবি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা নিয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার জন্ম মিসরের মানফালুত শহরে। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন।

[৩] বিশ্বকবি খ্যাত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [টেগোর]। কলকাতা শহরের জোড়াসাঁকোতে ১৮৬১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার কাব্যগ্রন্থ ৬৫টি। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পন। তার জীবনাবসান ঘটে ১৯৪১ সালে।

আন্দাজেই সকল বিষয় গবেষণা করেন। আমি মনে করতাম, আক্কাদের মতো মহান ব্যক্তিত্ব সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারেন না। কোনো স্বার্থের সামনে মাথা ঝোঁকাতেও পারেন না। কিন্তু তিনি সরকারের সঙ্গে আপোস করেছেন। সম্ভবত এর কারণ তিনি এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আর এই বয়সে অনেক কিছুই সহ্য করার ক্ষমতা মানুষ রাখে না। তা ছাড়া বৃদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি তার কয়েকটি বছর অনেক কষ্টে কেটেছে। হয়তো এসব কারণেই তাকে আপোসে যেতে উৎসাহিত করেছে।

আমি বললাম, আব্বাস মাহমুদ আক্কাদের ব্যাপারে আমার আশঙ্কা ছিল তিনি আবার কমিউনিজম গ্রহণ করে ফেলেন কি না। সেদিক থেকে তিনি ফিরে এলেন কীভাবে? সাইয়েদ কুতুব বললেন, এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত তিনি ভালো করে জানতেন যে, কমিউনিজম মানুষের বিবেকের উপর প্রহরী বসিয়ে দেয়। সে তার মস্তিষ্ক ধোলাই করতে থাকে। লেখালেখি বা নতুন কোনো মতপ্রকাশের অনুমতি সে মোটেই দেয় না। কমিউনিজম রুহানি শক্তি বলে কিছু বিশ্বাস করে না। দ্বিতীয় কারণ হল মিসরের কমিউনিস্ট নেতাদের কিছু ভুল পদক্ষেপ তাকে তা গ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করেছে।

আমি বললাম, তিনি শুধু চিন্তার মানুষ হওয়া সত্ত্বেও রুহানি শক্তির কথা কীভাবে ভাবেন? বললেন, তিনি রুহানিয়াতকে তার চিন্তার সীমা পর্যন্তই মেনে নিয়েছেন। 'রুহানি শক্তি বলতে কিছু নেই' এ কথা বলতে তিনি কাউকে অনুমতি দেন না।

সাইয়েদ কুতুবের গ্রন্থ

সাইয়েদ কুতুবের কয়েকটি বই নিয়ে আলোচনা হয়। যেমন, 'আলকুরআনে মহাপ্রলয়ের দৃশ্য'[১], 'আলকুরআনের শিল্প-সৌন্দর্য'[২], 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার'[৩]। তিনি এই বইগুলোর ইতিহাস বর্ণনা করেন। যেসব কারণে তিনি এই বইগুলো রচনা করেছেন তাও আমাদের

---

[১] مشاهد القيامة فى القرآن

[২] التصوير الفن فى القرآن

[৩] العدالة الاجتماعية في الاسلام

সামনে তুলে ধরেন। তারপর বললেন কীভাবে তিনি ইসলামি চিন্তা-চেতনার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছেন এবং ইসলামিয়াতের উপর ব্যাপক অধ্যয়ন করেছেন। আমরা তার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করি। আসরের নামাজ এখানেই আদায় করি। তারপর মাগরিবের পূর্বেই কায়রো ফিরে আসি।

কল্পনা ও বাস্তবতার পার্থক্য

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল আমি আমার হৃদয়-আকাশে সাইয়েদ কুতুবের অবয়বের একটি নকশা এঁকেছিলাম। যেমনটি আমি অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই করে থাকি। এ ব্যাপারে আমি খুব গুরুত্বও দিই। আমার জানা নেই অন্য কেউ এমনটি করে কি না। তাকে আমার কল্পনায় তিরিশ-চল্লিশ বছরের মাঝামাঝি বয়সের হালকা-পাতলা গড়নের, প্রশস্ত বক্ষ ও মজবুত গঠনের একজন সাহিত্যিককে চিত্রায়ন করি। কিন্তু সাক্ষাতের পর বোঝতে পারলাম তার বয়স তিরিশেরও কম। তার উচ্চতাও বেশি না। দারুল উলুম কায়রো থেকে তিনি শিক্ষা সমাপন করেছেন। তাকে দেখে মনে হয় না যে, তিনি দীনের বিভিন্ন বিষয়ে এত উচ্চ জ্ঞান রাখেন। তার আলোচনা দ্বারা অনুমান করলাম তিনি স্বচ্ছ-পরিষ্কার মন-মানসিকতার অধিকারী। চিন্তা-চেতনাও খুব উন্নত।

'ইসলাম ও পুঁজিবাদের সঙ্ঘাত' সম্পর্কে আমার অভিমত

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

জোহরের সময় লেখালেখি এবং সাইয়েদ কুতুবের গ্রন্থ 'ইসলাম ও পুঁজিবাদের সঙ্ঘাত'[৪] দেখায় ব্যস্ত থাকি। গ্রন্থটিতে লেখকের কলমের তেজস্বিতা, ঈমানি উদ্যম এবং ইসলামের পক্ষে তার ওকালতির ধরন আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে। এটা ইসলামের নতুন ধরনের সাফল্য বলা চলে যে, সে নিজের পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার লক্ষে এ ধরনের একঝাক ক্ষুরধার লেখক ও সাহিত্যিক নির্বাচন করে নিয়েছে।

---

[৪] معركة الاسلام والرأس مالية

হোসাইন ইউসুফের সঙ্গে

জোহরের পরও পড়াশোনা করতে থাকি। জনাব হোসাইন ইউসুফ ও আবদুল ওহহাবের আসরের সময় আসার কথা ছিল। কিন্তু তারা এলেন মাগরিবের পর। রাত নটা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। আমরা মিসরে চারিত্রিক অবক্ষয় ও তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করি। তারা উভয়ে আমাকে প্রথম ফুয়াদ[১] বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে অনুরোধ করেন।

আরবি সাহিত্য অনুষদ পরিদর্শন

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

সকাল নয়টায় আমরা 'ফুয়াদ ইউনিভাসিটি'র সাহিত্য অনুষদের উদ্দেশে জিজায় যাই। সেখানে গিয়ে প্রথমে ড. আহমদ আমিনের সঙ্গে সাক্ষাত করি। আরবিসাহিত্য অনুষদে আজ তার লেকচার ছিল। লেকচারের পর তিনি আমাদেরকে বিভাগীয় প্রধান ড. জাকি হম্মদ হাসানের নিকট নিয়ে যান। তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অনুষদ এবং এর বিভিন্ন শাখা ঘুরে দেখার আমাদের আগ্রহের কথা তাকে বলেন। জনাব জাকি মুহম্মদ আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। তারপর তিনি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কপি কার্যবিধি দেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নিয়ম-নীতিও দেখান। আহমদ আমিন তাকে বললেন, মেহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেরাউনি যুগের নির্মাণশৈলির সমালোচানা করেছেন। ড. জাকি হাসান ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন বিভাগ দেখানোর জন্য আমাদের সঙ্গে প্রফেসর জাকারিয়াকে দেন। তার সঙ্গে গিয়ে আমরা ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরিটি ঘুরে দেখি। লাইব্রেরির ইনচার্জ আমাদেরকে লাইব্রেরি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন অংশ এবং আর্কাইভ দেখান। তারপর আমরা ইউনিভার্সিটির বিশাল সেমিনার হলরুম দেখি। এই পর্যন্ত আমাদের যত হলরুম দেখার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। আমাদের সঙ্গে যেসব কর্মকর্তা ছিলেন তারা বলেন, বিশ্বে এটি দ্বিতীয় বৃহৎ

---

[১] তার মূল নাম আহমদ পাশা। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তার জন্ম। খেদিব ইসমাইল পাশার কনিষ্ঠ পুত্র তিনি। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে তার ভাই হোসাইন পাশার মৃত্যু হলে তিনি মিসরের সুলতান হন। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মিসর ইউনিভার্সিটির তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীতে তার নামে এর নামকরণ করা হয়। ১৯৩৬ সালে তার মৃত্যু হয়।

হল। এখানে তিন হাজার আসন রয়েছে। কর্মকর্তারা ডান দিকের স্টেজের দিকে আমাদেরকে যেতে ইঙ্গিত করেন। সেদিকে একটি বড় শানদার বৈঠকখানা রয়েছে। বৈঠকখানাটি এমন একটি পর্দা দিয়ে ঢাকা, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলে আবার বন্ধ হয়। কর্মকর্তারা বলেন, এ আমাদের মহান নেতার বৈঠকখানা। এদ্‌দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাদশা ফারুক। আমরা সেখানে প্রবেশ করি। রাজপ্রাসাদের শান-শওকত ও চাকচিক্যের একটি নমুনা আমরা সেখানে দেখি। এ ধরনের স্মৃতি এখন অনেক দেশেই পাওয়া যায় না। পরিশেষে আমরা মন্ত্রী মহোদয়গণের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে আসি। আইন ও কমার্স অনুষদের'র ভবনও এক নজর দেখে নিই। কর্মকর্তাদের সংখ্যার আধিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ এমন একটি বিষয়, যা আমি ভারতীয় কোনো ইউনিভার্সিটিতে দেখিনি।

সন্দেহ নেই যে, মিসর উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে জামানার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও তার উপর ব্যক্তি-কেন্দ্রিক সালতানাতের প্রভাব রয়েছে। এমনকি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোকে এদদ্বারা প্রভাবান্বিত দেখা যায়। মানুষের জীবনচাকাও শাহিখান্দানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। চারটি ইউনিভার্সিটি রয়েছে, যার প্রত্যেকটি খেদিব রাজবংশের কারো না কারো নামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সেগুলো হল 'প্রথম ফুয়াদ ইউনিভার্সিটি', 'প্রথম ফারুক[২] ইউনিভার্সিটি', 'ইবরাহিম পাশা ইউনিভার্সিটি'। আর আসয়ুতে রয়েছে 'মুহম্মদ আলি আলকাবির ইউনিভার্সিটি'।

কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে সহশিক্ষা

সহশিক্ষা উন্নত ইউনিভার্সিটিগুলোর ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। একে স্বাধীনতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির নিদর্শন মনে করা হয়। এরূপ মানসিকতার অধিকারী লোকের সংখ্যা এ পরিমাণ বেড়েছে যে, শিক্ষিতসমাজ এখন এ বিষয়ে সমালোচনার এক অক্ষরও শোনতে প্রস্তুত না। নারী-পুরুষের সংমিশ্রণের কারণে প্রতিনিয়ত লজ্জাজনক ঘটনা ঘটছে। সমাজে চারিত্রিক

---

[২] তিনি প্রথম ফুয়াদের পুত্র। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল নাজির অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তার শিশুপুত্র দ্বিতীয় ফুয়াদের পক্ষে তাকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করেন। ১৯৬৫ সালে ইউরোপে তাঁর ইনতেকাল হয়।

অবক্ষয় নেমে এসেছে। দীনী বাধ্যবাধকতা উঠে গিয়েছে। এ ছাড়া যুবকদের কুপ্রবৃত্তি জাগ্রত করার এবং তা চরিতার্থ করার প্রতি আহ্বানকারী অসভ্যতা তো রয়েছেই, যা দীনী শিক্ষাকে ভারসাম্যহীন মনে করে। এর সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এরূপ সহশিক্ষা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কীভাবে আশা করা যায় যে, বিষয়টি শুধু পড়া ও পড়ানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এতে পরস্পরের মধ্যে প্রেম বিনিময় হবে না। কোনো দুর্ঘটনাও ঘটবে না। আমার আশঙ্কা হয়, এই বিষয়টিই সমাজের সব ফেতনা-ফাসাদের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় কি না। যারা এসব শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে এর পরও ভালো কিছুর আশা করে তাদের সম্পর্কে জনৈক কবির এই চরণ দুটো ব্যতীত আর কীই বা বলা যায়,

'উত্তাল সমুদ্রের মাঝে কাষ্টফলক বেঁধে বলছ, হে আরোহী,
সাবধান, তোমার আঁচল যেন না ভিজে।'

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অনুষ্ঠানে

মাগরিবের পর আমরা ডা. খলিল ইশমাবীর বাড়িতে যাই। সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিশেষ কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের সামনে আমাকে কিছু বলার জন্য আবেদন করা হয়। আমার ধারণা ছিল না যে, এখানে কিছু বলতে হবে। যাই হোক, উপস্থিত মনে যা এসেছে তা-ই তাদের সামনে উপস্থাপন করি। আমি তাদেরকে লক্ষ করে বলি, বর্তমানে **ইখওয়ানের** দাওয়াতি কার্যক্রমের উপর যেই পরীক্ষা চলছে এটা মূলত পরীক্ষা না। একে বরং আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার মনে করি। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, عَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ 'হয়তো তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।' [সুরা বাকারা, ২১৬ আয়াত]।

ক্ষমতার মোহ পরিত্যাগ করতে হবে

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, কোনো দায়ী আল্লাহ তায়ালার তাওফিক ছাড়া দাওয়াতি কার্যক্রমে আসতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালাই তাদের মোড় এদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে সরকার বেআইনি ঘোষণা করেছে। এতে ইখওয়ানদের পিছনের ভুল-বিচ্যুতি সংশোধনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ইখওয়ানকে এই সুযোগ গনিমত মনে করে কাজে লাগাতে হবে। নিজেদের ঈমানি ভিত আরও মজবুত করতে হবে। দাওয়াতের মূলনীতিগুলোকে ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। পাশাপাশি জীবনের সবক্ষেত্রে ধীরে ধীরে শরিয়াহ আহকাম পালনে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করতে হবে। পদ ও পদবীর মোহ ত্যাগ করে অত্যন্ত ইখলাস ও স্পৃহা নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে হবে। সর্বদা দাওয়াতের কাজে এ পরিমাণ নিবিষ্ট থাকতে হবে যাতে কোনোক্রমেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন নিজেদের কল্পনায়ও না আসে।

তারপর আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহ তায়ালা একদিকে ক্ষমতা ও পদের লোভকে ঘৃণা করেছেন। অপর দিকে মুসলমানদেরকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

'এটি আখেরাতের ঘর। আমি একে তৈরি করেছি সেসব লোকের জন্য, যারা দুনিয়ায় পদমর্যাদা চায় না। আবার বিশৃঙ্খলাও কামনা করে না। শেষ সফলতা খোদাভীরুদের জন্য।' [সুরা কাসাস, ৮৩ আয়াত]।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

'সত্যিকার মুমিন হলে তোমরাই বিজয়ী হবে।' [সুরা আলে ইমরান, ১৩৯ আয়াত]

উভয় আয়াত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, পদ ও ক্ষমতার মোহ ঘৃণার্হ। আল্লাহ তায়ালা একে অপছন্দ করেন। আবার এই পদ ও ক্ষমতা আল্লাহ তায়ালার পুরস্কারও, যা তিনি খাঁটি মুমিন ও মুখলিস মুজাহিদদেরকে দান করেন। এই পুরস্কার পাওয়ার পরও আল্লাহ তায়ালার হুকুম এবং শরিয়তের বিধি-বিধান জনগণ ও রাষ্ট্রপর্যায়ে কার্যকর করার পূর্বে সর্বপ্রথম নিজেদের অন্তরে কার্যকর করতে হবে। এটি পালনে নিজেদেরকে অভ্যস্ত করতে হবে আগে। আল্লাহ তায়ালার হুকুমের সামনে যে পরিমাণ মাথা ঝুকানো হবে জনগণও সে পরিমাণ অনুগত হবে।

আমি তাদের সামনে একজন বুজুর্গের কাহিনী তুলে ধরি। বুজুর্গ একদিন একটি হিংস্র প্রাণীর উপর সওয়ার হয়ে আসছিলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকজন হয়রান-পেরেশান হয়ে পড়ে। বুজুর্গ সামনে এসে লোকজনকে বললেন, তোমরা আশ্চর্য হয়ো না। কারণ আমি আল্লাহর গোলাম হয়ে গেছি। আর আল্লাহ তায়ালা এই প্রাণীটিকে আমার গোলাম বানিয়ে দিয়েছেন। ঘটনাটি যদি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণের উপযুক্ত নাও হয়, তারপরও কোনো সমস্যা নেই। কারণ আমি যা বলেছি তার বাস্তবতা অনস্বীকার্য।

আগামী প্রজন্মের দায়িত্ব

আমি বললাম, দাওয়াতের গুরুত্ব ও জিম্মাদারি অনুধাবন করা জরুরি। শুধু বর্তমান প্রজন্মই না, ভবিষ্যৎপ্রজন্ম নিয়েও আপনাদেরকে ভাবতে হবে। যেমন একটি বৃক্ষের পুরো ভার তার বীজের উপর। শিকড়ের টেকসই ও মজবুত হওয়ার সম্পর্কও এর সঙ্গে। বীজ কমজোর হলে বৃক্ষ তেমন শক্তিশালী হয় না। তার শিকড়গুলোও থেকে যায় দুর্বল। তদ্রূপ মুসলিম উম্মাহর প্রথম শতাব্দীর ঈমান, তাকওয়া ও আজিমতের উপর ভিত্তি করেই নতুন প্রজন্মের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হবে। মুসলমানদের মধ্যে ঈমান, একিন ও দীনের যে শক্তি আমরা দেখছি তার এক প্রান্ত সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে মিলে গেছে। তাদের থেকেই এর শাখা-প্রশাখা দিগ্বিদিক ছড়িয়েছে। তারপর এ সবকিছুর সম্পর্ক এসবের উৎসমূল রাসুলে আরাবি সা. এর ঈমানের সঙ্গে।

খাওলী ও গাজালীর আলোচনা

আমার পর প্রফেসর বাহি আলখাওলী আলোচনা করেন। প্রথমে আমার বক্তব্যের বিশ্লেষণ করেন। প্রভাব সৃষ্টিকারী উপমা ও কাহিনীর মাধ্যমে বিষয়টি আরও ফুটিয়ে তোলেন। চিন্তা-চেতনা, মনোবল ও মনোবৃত্তিকে রুহানি দীক্ষার মাধ্যমে আরও উন্নত করতে বলেন। ভাব ও ভাবনায় তাদেরকে উন্নত হতে বলেন। নফসকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে মুক্ত রাখার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর বলেন, যখন কারো আমলে শিথিলতা দেখা দেয় তখন তার পরিবার-পরিজন, হিতাকাঙ্ক্ষী ও খাদেমদের আচার-ব্যবহারে প্রভাব পড়ে। অনেক

আহলুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমি আমার খাদেমদের রীতি-নীতি ও চাল-চলনে পরিবর্তন দেখে আমার আমলের শিথিলতা অনুমান করতে পারি। কতক বুজুর্গের সন্তানেরা বলেন, যখন আমাদের থেকে এমন কোনো আচরণ প্রকাশ পায়, যা আমাদের পিতাদের নিকট দৃষ্টিকটু, তখন তারা আমাদের উপর খুব দয়াপরবশ হন। আসমানের দিকে দুহাত তুলে দোয়া করেন, 'হে মহান প্রতিপালক, হয়তো আপনার নাফরমানি করে ফেলেছি, যার ফলে আমাদের সঙ্গে আমাদের সন্তানদের আচরণ পরিবর্তন করে দিয়েছেন। তাদের দ্বারা আমি কষ্ট পাচ্ছি।' এ ধরনের বহু উপমা পেশ করেন।

তার আলোচনা থেকে আমি তাসাউফের সুঘ্রাণ পাই। এটি সম্ভবত তার তাসাউফ সম্পর্কে অধিক অধ্যয়ন এবং এর প্রতি যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার কারণে হয়েছে।

তারপর শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী আলোচনা করেন। তিনি কিছু প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ব্যাপক ও মোবাহ বিষয় কাজে লাগানোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আত্মসংশোধন ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা গ্রহণের পরামর্শ দেন। আমার এবং বাহি আলখাওলীর আলোচনার বিষয় এক হওয়ার কারণে তিনি বিস্মিত হন। তারপর তিনি বলেন, আজ রাতে আমি যে আলোচনা করেছি তা তিনি ক্লাসে বলেছেন। শ্রোতারাও তার কথার সত্যায়ন করেন।

এই অনুষ্ঠানে সাইয়েদ সাবিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি খুব নেককার ও মর্যাদাশীল মানুষ। ইলমি যোগ্যতাও অনেক। শায়খ গাজালী তার নাম রেখেছেন মুফাক্কিহুল জামায়াত। আমি অনেকের নিকট তার প্রশংসা শুনেছি।

প্রফেসর আলি গায়াতীর সঙ্গে

২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ জোহরের পর আমরা 'মিমবারুশ শারক' পত্রিকার সম্পাদক আলি গায়াতীর নিকট যাই। তার সঙ্গে কয়েকদিন আগে সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। আমাদেরকে যথাযথ সম্মান দিতেও তিনি কমতি করেননি। সেখানে ফাতহি রিজওয়ানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনি মিসরের অন্যতম বিশিষ্ট আইনজীবী। মেয়েদের

ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা এবং তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও চাকুরিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি আমার মতামত জানতে চান। আমি বললাম, বিষয়টি আমি ভিন্ন কোনো সমস্যা হিসেবে দেখছি না। তবে আমার মতে একটি অনৈসলামিক ও চরিত্রহীন পরিবেশে এর অনুমতি দেওয়া ঠিক হবে না; যে পরিবেশে না ইসলামি আহকাম কার্যকর করা যায়, না শরিয়তের হুদুদ ও দণ্ডবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। হ্যাঁ, যদি পরিবেশ ইসলামি হয়, মানুষের জীবনে দীনদারির প্রাধান্য থাকে, শরিয়তের হুদুদ কার্যকর করা যায় এবং চারিত্রিক সচেনতা থাকে, তা হলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা অর্জন এবং জীবনের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে কোনো অসুবিধে নেই। তবে তা তাদের মন-মেজাজ ও শক্তি অনুযায়ী হওয়া জরুরি। তিনি আমার মত পছন্দ করলেন। জনাব গায়াতী আমার ছবি তুলতে চাইলে আমি জনাব আসআদ হাসানীর মতো তাকেও আমার ছবি না তোলার জন্য অনুরোধ করি। তবে তাকে আমার জীবনবৃত্তান্ত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই। যদিও তাতে আমার জীবনের বিশেষ কোনো কাজের উল্লেখ নেই। তবু তিনি এর উপরই সন্তুষ্ট হলেন এবং একে পত্রিকায় ছাপানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এবং তার মহান নেতা

মাগরিবের পর আমরা শায়খ বাহি আলখাওলীর বাসার উদ্দেশে 'কেল্লা' এলাকায় যাই। তার বাসায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় অবস্থান করি। ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে বেআইনি ঘোষণার পূর্বে ইখওয়ানুল মুসলিমিন সংগঠন, তার স্পর্শকাতর কার্যক্রম ও সহজ-সরল জনগণের চরিত্রে দাওয়াতের প্রভাব, ইখওয়ানি নওজোয়ানদের ঈমানি শক্তি, শৌয-বীর্য ও অবিচলতা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ইখওয়ানদের সম্পর্কে মিসরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইবরাহিম আবদুল হাদি পাশার ভাষ্য হল- এ ধরনের নওজোয়ান যদি আমার নিকট আশিজন থাকত, কারাগারে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়া সত্ত্বেও যাদের দৃঢ়তা ও অবিচলতায় বিন্দুমাত্র কমতি দেখা যায়নি, তা হলে আমি সারা পৃথিবীকে চ্যালেঞ্জ করে বসতাম। তারপর শায়খ খাওলী বলেন, যদি এই দাওয়াত না হত তা হলে মিসর অবশ্যই চরম নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ত। তার মাঝে নেমে আসত চরম অধঃপতন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই ইসলামি

দাওয়াতের মাধ্যমে এর ক্ষতিপূরণ করেছেন। এই দাওয়াত সকল বাধার সামনে শীসাঢালা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শায়খ হাসানুল বান্নার সঙ্গে ইখওয়ানদের হৃদ্যতা, পুরো মিসরে ইখওয়ানের শাখা প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের হৃদয়জুড়ে থাকা তার মহব্বত ও ভালবাসার অবস্থাও তিনি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মিসরের একটি পত্রিকায় এমনও লেখা হয়েছে যে, যদি শায়খ হাসানুল বান্না কায়রোতে হাঁচি দেয় তা হলে আসওয়ানের ইখওয়ানরা তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে উঠবে। জনাব খাওলী হাসানুল বান্নার সহপাঠি ছিলেন। দারুল উলুম কায়রোতে তারা একসঙ্গেই ভর্তি হয়েছিলেন। শেষ সময় পর্যন্ত তিনি হাসানুল বান্নার সঙ্গী ছিলেন। তিনি আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, বর্তমানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের যে অবস্থা ও অবস্থান তা সবার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। হাসানুল বান্নার বিদ্যা-বুদ্ধি, ইখলাস, দাওয়াতের প্রতি অটুট মনোবল ও ভালবাসার কিছু উপমাও তিনি তুলে ধরেন। আমরা অনুভব করতে পারলাম যে, জনাব খাওলী তার সহপাঠি হওয়া সত্ত্বেও তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। অন্তর দিয়ে তাকে ভালবাসতেন। তিনি তার দুর্দমনীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বভাবজাত যোগ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ হেজাজে শহিদ হাসানুল বান্নার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছেন জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তারপর একাধিকবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভাই, আপনি কি হাসানুল বান্নাকে দেখেছেন? আপনি কি তার বক্তৃতা শুনেছেন?

এসব আলোচনা দ্বারা অনুমিত হয় যে, শহিদ হাসানুল বান্না তার বন্ধু-বান্ধব ও সাথী-সঙ্গীদের গভীর হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। একজন প্রাণপ্রিয় নেতা হিসেবে তাদের অন্তরে তার স্থান ছিল প্রশ্নাতীত।

'আলআলামুল আরাবি' পত্রিকার অফিসে

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

আজ আমরা 'আলআলামু আলআরাবি' পত্রিকার অফিসে যাই। সেখানে জনাব আহমদ হোসনীর সঙ্গে সাক্ষাত করি। আমাদের সঙ্গে দুয়েকটি কথা বলে তিনি তার সেক্রেটারিকে দিয়ে প্রবন্ধ লেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মেহমানদের সঙ্গে তার এই অমনোযোগী আচরণ আমার ভালো মনে হয়নি। অথচ তিনি নিজেই এই সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছেন। তা

ছাড়া জাগতিক কোনো উদ্দেশ্য নিয়েও আমরা তার নিকট যাইনি। তিনি আমাদের দিকে আহমদ জামালুদ্দীনের 'আধুনিক গণতন্ত্র' বইটা এগিয়ে দেন। বইয়ের একটি পরিচ্ছেদ 'ধর্মের আধুনিক চিন্তা'র দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে পড়তে বলেন। আমি বিষয়টির উপর হালকা নজর বুলিয়ে যাই। বোঝতে পারলাম বইটি অল্প শিক্ষিত তরুণ সাহিত্যিকদের স্তরের। বইটির লেখকের অধ্যয়নে ব্যাপকতা ও গভীরতা নেই। তার চিন্তা-চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয় ভাবধারার আলোকে বাস্তবায়ন করতে চায়। সেযুগের কিছু ভাসা-ভাসা খেয়াল ও মতকে- যার মধ্যে জজবার প্রাধান্যই বেশি- ইসলামি সমাজে পুরোপুরিভাবে কার্যকর করতে চায়। লেখক মুসলিম দেশসমূহে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সমাধান অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত তা বাস্তবে ইসলামি সমাজ ও মুসলিম দেশগুলোর কোনো বিষয় না। বরং এগুলোর সঙ্গে খ্রিস্টজগত জড়িত, যা খ্রিস্টানদের চার্চের সৃষ্টি। চার্চ ও রাজদরবারের সংঘাতের কারণে এটা অস্তিত্বে এসেছে। এগুলো সেন্ট পৌলের বানানো মতাদর্শ। গ্যালিলিও[১] ও কোপারনিকাসের[২] গবেষণার মতদ্বৈধতার ফল। এসব লোক রাজনীতি থেকে দীনকে পৃথক রাখাকে একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা মনে করে। তারা এ কথা জোর দিয়ে বলে যে, ধর্ম ব্যক্তিগত বিষয়।

ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা এবং একে ব্যক্তিগত বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা একটি মারাত্মক ভুল মতাদর্শ। এর উপরই পশ্চিমা সভ্যতা ও ইউরোপের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত। এই মতাদর্শ বাস্তবায়নের ফলে ইউরোপ একটি উন্মাদ হস্তির রূপ নিয়েছে। সেখানে এখন মানবতা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। এসব লেখক-সাংবাদিকও কি চায় যে মুসলিম দেশগুলো সেই ধ্বংসাত্মক পথে অগ্রসর হোক? এই মতাদর্শের অসাড়তা পৃথিবীর সামনে এখন অস্পষ্ট নেই। কিন্তু হায়, এর গুণগান আর কত দিন চলবে!

---

[১] বিখ্যাত ইতালীয় বিজ্ঞানী। ১৫৬৪ সালে পিসা নগরীতে তার জন্ম। তাকে আধুনিক পরীক্ষণ বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে যান। ১৬৪২ সালে তার মৃত্যু হয়।

[২] প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ। সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর পরিক্রমণের মতবাদ তিনি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। ১৪৭৩ সালে পোল্যান্ডে তার জন্ম। মৃত্যু ১৫৪৩ সালে।

'আলআলামুল আরাবি'র পাঠকরা আরব জাতীয়তাবাদের দর্শন ও পশ্চিমা নিয়মনীতি অধ্যয়ন করতে আগ্রহী ও উৎসাহী। আমি চাইলাম তারা এ কথা জানুক যে, ইসলামপ্রিয় চিন্তাবিদ ও মুখলিস মুমিনগণ আলামুল আরাবিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন। তারা এই পত্রিকা থেকে কী আশা করেন। এই জন্য পত্রিকার সম্পাদক আহমদ হোসনীর নিকট পত্রিকার জন্য একটি প্রবন্ধ লেখার প্রতিশ্রুতি দিই। প্রবন্ধের শিরোনাম হবে 'আরববিশ্ব ও মুহম্মদ সা. সম্পর্কে প্রাচ্যের দার্শনিক ডক্টর মুহম্মদ ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি'। এতে তিনি খুব আনন্দিত হলেন। অতিসত্বর তা প্রকাশের ওয়াদা দিলেন। মজার বিষয় হল এই প্রবন্ধ কিছু লোকের অনুভূতিকে পাল্টে দিবে। তাদের অন্তরে ঈমানি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে।

শুব্বানুল মুসলিমিনে আমার আলোচনা

মাগরিবের নমাজের পর আমরা শুব্বানুল মুসলিমিনের অফিসে যাই। রাত্রে এখানে আমার আলোচনা করার কথা ছিল। গেইটে প্রথমে মুহম্মদ আল গাজালী[৩] তার পর প্রফেসর আহমদ শিরবাসী আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। তারা আমাদেরকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। জনাব আহমদ শিরবাসী বলেন, আমি আপনার বই 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' পড়া শুরু করেছি। তিনি বই সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এর বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা বলেন। তারপর তার নিজের লেখা কয়েকটি বই আমাকে হাদিয়া দেন। আমরা আলোচনা করতে থাকি। ইতোমধ্যে আজহারের 'আরবিভাষা ও সাহিত্য অনুষদে'র প্রফেসরগণ, ইখওয়ানের বহু সদস্য এবং অন্যান্য দীনী সংগঠন-সংস্থার বিশেষ বিশেষ লোকজন উপস্থিত হন। আজহারের শাখা-পরিচালক শায়খ আবদুল লতিফ দাররাজ, আরবিভাষা অনুষদের প্রফেসর আবদুল মুতআল সায়েদী, 'উমিনা বিল

[৩] বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ। ১৯১৭ সালে তার জন্ম। যৌবনকালে তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাথে যুক্ত হন। ১৯৮৯ সালে অগাধ পাণ্ডিত্যের কারণে বাদশা ফয়সাল তাকে পুরস্কৃত করেন। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তার কিতাব সংখ্যা ৫০ এর অধিক। ১৯৯৬ সালে সৌদিতে একটি ইসলামি কনফারেন্সে যোগদানের পথে তিনি ইনতেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

ইনসান'[১] [মানুষের প্রতি আস্থা] গ্রন্থের লেখক আবদুল মুনয়িম খাল্লাফ, 'আলইসলামু হায়িরুম বায়না আহলিহী'[২] গ্রন্থের লেখক প্রফেসর আবদুল্লাহ সাম্মাকও আসেন। এ ছাড়া বহু ইলমি ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হন। আলোচনার সময় হয়ে আসে। জনাব দাররাজ ও জনাব শিরবাসীর সঙ্গে আমি সভাকক্ষে প্রবেশ করি।

আহমদ শিরবাসীর স্বাগত ভাষণ

আহমদ শিরবাসী প্রথমে অনুষ্ঠানের বিশেষ আলোচকের পরিচয় তুলে ধরেন। ভারতের ইলমি কামালাত ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর তিনি বলেন, পাকিস্তান অস্তিত্বে আসার উপর আমাদের আনন্দ এ কথার জানান দিচ্ছে যে, ভারতে মুসলমানদের এক বিশাল জামাত রয়ে গেছে। রয়েছে সেখানে তাদের বিভিন্ন মহান কীর্তি ও অবদান এবং বহু ইলমি স্মৃতি। তাফসিরে কাশশাফ ও ইস্‌তালাহাতুল ফুনুনের মতো গৌরবময় কিতাব ভারতেই ছাপা হয়েছে, যা ভারতবর্ষের ইসলামি স্মৃতিগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিতাব দুটো চিরকাল অনন্য হয়ে থাকবে। আল্লামা সুয়ুতী[৩]র কিতাব الخصائص الكبرى [আলখাসায়েস আলকুবরা] আরববিশ্বের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়েরও খুব প্রশংসা করেন তিনি।

আলোচনার বিষয় 'সজ্ঘাতের মুখে পৃথিবী'

আমি আলোচনা শুরু করলাম। 'সজ্ঘাতের মুখে পৃথিবী' আলোচনার বিষয়। আলোচনার সারমর্ম হল, মানব ইতিহাসের এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমাকে নীলদরিয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, যা সুদীর্ঘ এক সীমা পর্যন্ত বরাবর প্রবাহিত হয়। তারপর অন্য দিকে মোড় নেয়। আবার

---

[১] اومن بالانسان

[২] الاسلام حائر بين أهله

[৩] তাঁনাম আবদুর রহমান। ৮৪৯ হিজরিতে মিসরে তাঁর জন্ম। হাদিস, তাফসির,ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য অতুলনীয়। দুই লক্ষ হাদিস তার মুখস্থ ছিল। তাফসিরে জালালাইনের প্রথম খণ্ড তিনি রচনা করেন। ৯১১ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

সেখান থেকে বরাবর চলতে থাকে। এভাবে ইতিহাসেরও দুটি ধারা রয়েছে। কখনো সে ধারাবাহিকভাবে একদিকে চলতে থাকে, ডানে-বামে মোড় না নিয়ে। আবার কখনো ধারাবাহিকতার গতি থেমে যায়। ভিন্ন পথে এর চাকা ঘুরতে থাকে। ধারাবাহিকভাবে চলা অবস্থায় কোনো কোনো সময় হাজার হাজার বছর চলে যায়। রাজ-রাজড়ার পরিবর্তন এর উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। এটা তখনো হয় যখন মানুষের জীবনব্যবস্থা এক থাকে। সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিও থাকে অভিন্ন। এক ও অভিন্ন লক্ষ নিয়ে সকলে সামনে অগ্রসর হয়।

গ্রিক যুগ থেকে বাইজেন্টাইন যুগ

ইতিহাস গ্রিক থেকে বাইজেন্টাইন যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এক নিয়মের অধীন ছিল। এই সময়ে মানুষের জীবনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আকল ও প্রবৃত্তির উপর। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই জীবনধারায় ধস নেমে আসে। এর আঁচল সংকুচিত হয়ে পড়ে। এর ব্যর্থতা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর রাসুল সা. এর আগমনের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দুনিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও প্রবৃত্তির উপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে আসমানি অহী ও কানুনে এলাহিকে গ্রহণ করে নেয়।

মহানবীর আগমন থেকে ইউরোপের নেতৃত্ব গ্রহণ

আল্লাহ্প্রদত্ত এই জীবনব্যবস্থা শত-সহস্র বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তখন একটি লক্ষকে সামনে রেখে মানুষের জীবনধারা প্রবহমান নদীর মত প্রবাহিত হয়। কখনো তা ব্যাপক ও শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। আবার কখনো দুর্বল ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। জীবনধারার এই নদীতে দুটো বিশালাকৃতির পাথর এসে পড়ে, যা তার স্রোতকে রুখে দেওয়ার উপক্রম হয়। প্রথম পাথরটি হল হিজরি পঞ্চম শতাব্দীর ক্রুসেড যুদ্ধের ধারাবাহিকতা। তখন মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের বাগডোর ছিল সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর[৪] হাতে। তিনি ছিলেন একজন উচ্চাভিলাষী ঈমানদার

---

[৪] সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ.। সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গির প্রধান সেনাপতি ইতিহাসখ্যাত মুসলিম বীর। দীর্ঘ ১৪ বছর ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাদেরকে ছন্নছাড়া করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাস সম্মিলিত খ্রিস্ট শক্তির জবরদখল থেকে উদ্ধার করেন। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ছিলেন

ব্যক্তিত্ব। তার হাতেই এই পাথর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দ্বিতীয় পাথর হল তাতারিদের আক্রমণ। সে সময় মুসলিমবিশ্বের ভিত কেঁপে উঠেছিল কিন্তু তখন তাদের ঈমানি ও রুহানি শক্তি চুল পরিমাণ কমেনি। ইসলামি দাওয়াত তাতারিদের উপর বিজয় লাভ করে। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। তারপর মুসলিমবিশ্বের উপর শুরু হয় পশ্চিমাদের আগ্রাসন, যা মানুষের এই সাধারণ চলার গতি থামিয়ে দেয়। ইতিহাসের মোড় পাল্টে দেয়। তারা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেয় তাদের দর্শন ও মনগড়া নিয়ম-নীতি।

পশ্চিমা নেতৃত্বের ব্যর্থতা

মানবজাতির নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপের ব্যর্থতা আজ সকলের নিকট স্পষ্ট। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এক সুতোয় গাঁথা। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন এক ও অভিন্ন। তবে কমিউনিজমের [সাম্যবাদ] উদ্ভাবন শুধু ক্যাপিটালিজমের [পুঁজিবাদ] সঙ্গে পাঞ্জালড়া এবং তার ভুল কাজগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য। সুতরাং যে সময় ক্যাপিটালিজম দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে তখন কমিউনিজমের অস্তি ত্বও শেষ হয়ে যাবে। মানুষের মাঝেও কমিউনিজম সম্পর্কে অনীহা ভাব চলে আসবে। তখন পৃথিবীতে শুধু ইসলামি জীবনব্যবস্থাই অবশিষ্ট থাকবে।

পৃথিবীর সামনে এখন দুটো পথ

ইউরোপের এই দুই জীবনদর্শন এখন সর্বশেষ চূড়ায় উপনীত। যে কোনো সময় তা ভেঙ্গে[১] পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এর তুলনা বৃক্ষের ওই পরিপক্ব ফলের সঙ্গে দেওয়া যায়, যা নিচে পড়ে যাওয়ার উপক্রম।

তাই পৃথিবীর মানুষের সামনে এখন দুটো পথ খোলা। হয়তো মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে তাদের হারানো নেতৃত্বের বাগডোর

দরবেশ চরিত্রের জ্ঞানী আলেম শাসক। নয়শত বছর পরও সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর বীরত্ব ও জিহাদের কথা মনে পড়লে পশ্চিমা খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা ভয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এই মহাবীর ১১৩৮ সালে ইরাকের তিকরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৩ সালের ৪ মার্চ দামেশকে ইনতেকাল করেন।

[১] সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজম এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

পুনরায় আকড়িয়ে ধরবে কিংবা পৃথিবী অন্য কোনো পথ গ্রহণ করবে। এবং এই পথ বা মতের উপর পৃথিবীর হাজার হাজার বছর কেটে যাবে। আর তখন ইসলাম মানবজাতির দিকনির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

আলোচনা সম্পর্কে আমার অনুভূতি

আলোচনা একটি ইলমি ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর উপর ছিল। আলোচনা লিখে তারপর তা উপস্থাপন করা আমার জন্য উত্তম ছিল। আমি চেয়েছিলাম উপস্থিত যা মনে আসে তাদের সামনে তা-ই তুলে ধরব। কিন্তু পরমুহূর্তেই বোঝতে পারলাম এভাবে আলোচনা করা এদেশের রীতির বিপরীত। এখানে আলেচানা লিখে উপস্থাপন করার প্রচলন বেশি। শ্রোতারা ভেবেছিল আমি আলোচনা লিখেছি। সত্য কথা হল আলোচনার উপর আমার নিজেরই আস্থা ছিল না। আমি অনুভব করেছি আমার মনের ভাব পুরো আদায় করতে পারিনি। পারিনি বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু শ্রোতাদের অনুভূতি ছিল এর বিপরীত। তারা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে আমার আলোচনা শুনেছে।

আলোচনার উপর পর্যালোচনা

আমার পর শায়খ আহমদ শিরবাসী, প্রফেসর আবদুল মুতআল সায়েদী, শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী ও প্রফেসর আবদুল মুনয়িম খাল্লাফ আমার বয়ানের বিশ্লেষণ করেন। তারপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তখন আহুত ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংস্থার লোকজন আমাকে ঘিরে অগ্রসর হয়ে একের পর এক মুসাফাহা করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখে আমি মনে মনে ভাবছিলাম- এসব লোক আমাকে না অন্য কাউকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। মুসাফাহা করছে অন্য কারো সঙ্গে। কারণ এই সম্মানের উপযুক্ত আমি না।

আমির আবদুল করিম খাত্তাবীর সঙ্গে আলোচনা

২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

দিনের শেষভাগে আমরা আমির আবদুল করিম খাত্তাবীর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে 'হাদায়িকুল কুব্বাহ'য় যাই। বারো কি তেরো বছর বয়সে আমি স্পেন ও ফ্রান্সে পরিচালিত তার জিহাদি কর্মকাণ্ডের সংবাদ

পাই। তার সম্পর্কে লেখা বহু প্রবন্ধ পড়ি। এ ছাড়া আমার সহপাঠি ও বন্ধু মুহম্মদ আলআরাবি মারাকেশীর নিকট থেকেও তার শৌর্য-বীর্য, অবিচলতা ও যুদ্ধের কলা-কৌশল সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। একবার আমির শাকিব আরসালান বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলম নদবীর নিকট একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি আমির আবদুল করিমের বীরত্ব, সাহসিকতা ও উচ্চাভিলাষের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব তিনি। তার এসব কথা আমাকে-তার সঙ্গে সরাসরি দেখা করতে উদগ্রীব করে তোলে।

আমরা তার বাড়িতে পৌঁছি। একজন মিসরি সিপাহী তার বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল। আমিরকে আমাদের আসার সংবাদ দেওয়া হল। তিনি এগিয়ে এসে আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। প্রথমে আমাদের দেশের কথা বলে তার সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর আলোচনা শুরু করি। আলোচনা করে বোঝতে পারলাম তিনি মুসলিমবিশ্ব সম্পর্কে অনেক ধারণা রাখেন। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে ভালোই জানেন। নির্বাসনে থাকাকালীন ভারতীয় বহু মুসলমানের সঙ্গে তার সাক্ষাত হয়। তিনি বিশ বছর নির্বাসনে ছিলেন।

তার জিহাদি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা লাভ

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি আপনি রণাঙ্গনে থাকাকালীন কতটুকু ভূমি জয় করেছিলেন? তিনি বললেন, আমরা প্রথমে পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার জয় করি। তারপর অনেক প্রশস্ত ও বড় জায়গা আমাদের হস্তগত হয়। প্রশ্ন করলাম, 'তাতওয়ান' কি আপনাদের হস্তগত হয়েছিল? তিনি বললেন, আমরা সেখানে আক্রমণের প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু আক্রমণের পূর্বেই তাদের সঙ্গে সন্ধি হয়ে যায়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার নেতৃত্বে কতজন মুজাহিদ জিহাদ করেছেন? তিনি বললেন, আমরা প্রথমে চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে জিহাদ শুরু করি। এই সংখ্যা বাড়তে বাড়তে চল্লিশ হাজার পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমি বললাম, তখন স্পেনিশ সৈন্যের সংখ্যা ছিল কত? বললেন, স্পেনিশ সৈন্যের সংখ্যা প্রথমে এক লক্ষ ছিল। সবশেষে তাদের সৈন্যসংখ্যা চার লাখে গিয়ে পৌঁছে। যেস্থানে আমরা যুদ্ধ করছিলাম তার আয়তন ছিল ছয়শ কিলোমিটার। শত্রুর উপর আক্রমণ করা এবং তাদের আক্রমণ প্রতিহত করা, উভয় কাজই এই স্থানে হয়েছে।

শত্রুরা আমাদের অভ্যন্তরে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দিয়েছিল। এটা দমন করাও শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করার চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না।

তারপর তিনি বললেন, ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়। লাগাতার চার বছর পর্যন্ত তা শুধু স্পেনিশদের সঙ্গে চলে। তারপর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সও এতে যোগ দেয়। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য সংখ্যা কমে আসার কারণে, তীব্র শৈত্যপ্রবাহ এবং দীর্ঘ দিন অবরোধে থাকার কারণে আমরা সন্ধি করতে বাধ্য হই। কোনো কোনো রণাঙ্গনে আমরা শত্রুদের থেকে যুদ্ধের অনেক সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি। এক স্থানে তো আমরা চারশ তিপ্পান্নজন শত্রুসেনার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছিলাম। আমরা আমাদের বিজিত এলাকায় শরিয়াহ আহকাম এবং হুদুদ বাস্তবায়ন করেছিলাম। প্রথমবার এক চোরের হাত কাটা হয়েছে। তারপর থেকে সম্পূর্ণ এলাকায় চুরি বন্ধ হয়ে যায়। পুরোপুরি নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার সঙ্গী-সাথী মুজাহিদদের কি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল? তাদের মাঝে কি দেশ রক্ষা এবং নিজেদের জাতীয়তাবোধের জজবা বিরাজমান ছিল? তিনি বললেন, তাদের অধিকাংশই দীনী জিহাদের অনুপ্রেরণা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। অন্যথায় এ পরিমাণ সফলতা অর্জন করা সম্ভব ছিল না। তাদের অন্তরও এদিকে ধাবিত হত না। আমি বললাম, আমরা শুনেছি, আপনি স্পেনের সেনাবাহিনীর একজন কমান্ডার ছিলেন। সেখানে কোনো এক কারণে আপনার মধ্যে দীনী সম্ভ্রমবোধ ও আরবীয় জাতীয়তাবাদের অনুভূতি জাগ্রত হয়। আর এই মনোমালিন্যের ফলেই এত বড় জিহাদের সূচনা। এই কথার কতটুকু বাস্তবতা রয়েছে? তিনি বললেন, আমি, না স্পেনিশ সেনাবাহিনীর কমান্ডার ছিলাম, না সেখানে এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেছে। আমি বললাম, আপনি তা হলে যুদ্ধের এসব কলা-কৌশল কোত্থেকে শিখেছেন? আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত এত বড় শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোকাবেলা করার শক্তি পেলেন কোত্থেকে? তিনি বললেন, যুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান আমার বিভিন্ন বইপত্র অধ্যয়ন ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হয়েছে। কারণ আমি স্পেনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন জিহাদে রত ছিলাম। আর সামরিক কলা-কৌশল তো আল্লাহপ্রদত্ত একটি

ভিন্ন যোগ্যতা, যা বই পড়ে বা স্বপ্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মাগরিবে আকসা এবং রিফ কি স্বাধীন হওয়ার সম্ভাবনা আছে? তিনি বললেন, স্বাধীনতা তো নিশ্চিত। তবে ফ্রান্স এত উদার না। ইংরেজদের পলিসি তার মোকাবেলায় খুব চটকদার।

আমির আবদুল করিম আমাকে বললেন, সময় করে আবার এসো। অনেক কিছু জানতে পারবে। আমি তার শোকরিয়া আদায় করলাম। তারপর সেখান থেকে শহরে ফিরে এসে 'শুব্বানুল মুসলিমিন'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাই। আজ সেখানে শায়খ আহমদ শিরবাসীর সঙ্গে সাক্ষাত করার পূর্বনির্ধারিত সময় ছিল। আধাঘণ্টার বেশি সময় অপেক্ষা করার পরও তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

১ মার্চ ১৯৫১

আজ 'ইসলামের ইতিহাসে উত্থার-পতন'র কভার-পেজ দেখতে এবং বইটি ছাপানোর ব্যাপারে তাগিদ দিতে 'সুন্নতে মুহম্মদিয়া' প্রেসে যাই। জোহরের কিছুক্ষণ পূর্বে ফিরে এসে জানতে পারি আহমদ শিরবাসী আমাদের এখানে তাশরিফ এনেছিলেন। তিনি 'শুব্বানুল মুসলিমিনে'র কার্যালয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু আমাদের সেখানে পৌঁছার সংবাদ কেউ তাকে জানায়নি। তার সঙ্গে কয়েকজন শিক্ষিত লোকও ছিলেন। তারা আমার বই 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তারাও আমাদের অপেক্ষায় বসে ছিলেন। আমার বড় আফসোস হল যে, এক জায়গায় থাকা সত্ত্বেও আমাদের মাঝে সাক্ষাত হয়নি। জেনারেল সালেহ হরব পাশার ভিজিটিংকার্ডও পেয়েছি। তিনি অনেক কষ্ট করেছেন। এমনিতেই অসুস্থ অবস্থায় চলাফেরা করা কঠিন, তার উপর তিনি আমাদের সম্মানার্থে দেখা করতে এসেছেন। আমরা অতিসত্বর তার সঙ্গে দেখা করে এর ক্ষতিপূরণ করব।

আসরের পরে প্রসিদ্ধ লেখক শায়খ আহমদ মুহম্মদ শাকেরের বাসার উদ্দেশে নয়া মিসরের 'মাকরিজি' রোডে যাই। অল্পক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ হয়। সেখানেই মাগরিবের নামাজ আদায় করি। আমার মরহুম আব্বাজানের কিতাব معارف العوارف في أنوار العلوم و المعارف [মাআরিফুল আওয়ারিফ ফি আনওয়ারিল উলুমি ওয়াল মাআরিফ] তার নিকট রেখে

গিয়েছিলাম। তিনি কিতাবটি পড়েছেন। 'দারুল মাআরিফের' কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছাপানোর ব্যাপারেও আলোচনা করেছেন। তারা কিতাবটি ছাপতে সম্মত হয়েছে। তবে তারা বলেছে, আগামী বছর পর্যন্ত সময় লাগবে। কারণ এখন অন্য কয়েকটি কিতাবের কাজ চলছে। আহমদ শাকের আমাকে কথা দেন যে, তিনি আবার 'দারুল মাআরিফে'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলবেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি 'দারুল মাআরিফ' এবং তাদের কার্যক্রম দেখার আগ্রহ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি শৈশবকাল থেকেই অবহিত। এর ছাপানো অনেক কিতাব আমি অধ্যয়ন করেছি। শায়খ শাকের দারুল মাআরিফের কতক কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ করে এই সিদ্ধান্ত নিলেন যে, আমরা আগামী সোমবার বিকেল পাঁচটায় প্রতিষ্ঠানটি দেখতে যাব।

দারুল আরকামে আমার বক্তব্য

আজ রাতে 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় দারুল আরকামে আমার বয়ানের পূর্বনির্ধারিত তারিখ। সেই সুবাদে আমরা সেখানে পৌঁছে এশার নামাজ আদায় করি। হোসাইন ইউসুফ আমাকে সামনে এগিয়ে দেন। আমি আলোচনা শুরু করি। ভারতবর্ষ ইসলামি দাওয়াতের যে পাঁচটি যুগ অতিক্রম করেছে তাদের সামনে তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।

প্রথম যুগ

১০৩৪ খ্রিস্টাব্দ। তখন মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দী রহ. এর যুগ। তিনি দেখলেন, ভারতবর্ষের সিংহাসনে একটি ইসলামি রাজবংশ। তারা হিন্দুদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, এমনকি মূর্তিপূজার দিকে ধাবিত হয়ে পড়েছে। এ সবের মূলে ছিল অশিক্ষিত বাদশা জালালুদ্দীন আকবর। তার মধ্যে বিধর্মীদের অনুসরণ, তাদেরকে পরিতোষণ এবং সকল ধর্মকে এককরণের একটা হীন মানসিকতা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া তার অধীনস্থরা তাকে একথা বুঝিয়েছে যে, নবুওয়াতে মুহম্মদীর যুগ শেষ হয়ে গেছে। আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে ছিল সে যুগ। তাই এখন সম্রাটের যুগ। তখন তিনি বিভিন্ন ধর্মের আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদতের সমন্বয়ে মনগড়া একটা ধর্ম তৈরি করেন। আর ইসলামি শরিয়তকে দেশ থেকে

পুরোপুরিভাবে বের করে দেন। এ সময় সমগ্র ভারতে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী সম্রাট এবং তার দরবারি চাটুকার আলেম সাহিত্যিকের প্রভাবে মূর্তিপূজার রঙে রঙিন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

মুজাদ্দিদ রহ. দেখলেন, দেশে এখন বিপ্লব সম্ভব নয়। অন্য কোনো পদ্ধতিতেও ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ নেই। কারণ তখন মোগল শাসনামলের যৌবন চলছিল। তাদের দুর্বলতার কোনো দিক ছিল না। তখন তিনি এক নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যে পদ্ধতি ছিল রাজদরবার এবং সরকারি পদস্থ কর্মকর্তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রথমে তিনি তাদের সঙ্গে ইলমি ও রুহানি সম্পর্ক গড়ে তোলেন। সিরহিন্দে বসে তাদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে থাকেন। নিজের মহৎ অভিপ্রায় এবং বিভিন্ন পরামর্শ তাদের সামনে পেশ করেন। একপর্যায়ে রাজদরবারের পুরো পরিবেশ রুহানিভাবে তার অনুগামী হয়ে যায়। মুজাদ্দিদে আলফেসানির মহান ব্যক্তিত্ব, ইখলাস, রুহানিয়াত এবং ইসলামের অসহায়ত্বের উপর তার মনস্তাপ তাদের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে তার প্রভাব সৃষ্টিকারী চিঠিগুলো তাদের মধ্যে ভাবান্তর সৃষ্টি করে। পাল্টে যায় হুকুমতের মোড়। তাদের মন-মস্তিষ্কে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সেখানে ইসলামের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। তারপর শায়খের সন্তান ও দৌহিত্রদের প্রভাবে তৈমুরি হুকুমতের সিংহাসনে আওরঙ্গজেব[১] আলমগিরের ন্যায় চরিত্রবান ন্যায়পরায়ণ ফকিহ বাদশা সমাসীন হন। তিনি এসে মুসলমানদের উপর থেকে ট্যাক্সের বোঝা রহিত করে অমুসলিমদের উপর জারি করেন। কুফরের সব নিদর্শন মূলোৎপাটন করে ইসলামের বিজয় পতাকা উড়ান। ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া রচনার নির্দেশ দেন, যা হিন্দুস্তানের সংবিধান হয়। এসব কিছু ছিল শায়খ এবং তার পরবর্তী প্রজন্মের প্রচেষ্টার ফল ও ফসল।

---

[১] মোঘলসম্রাট আওরঙ্গজেব ৩ মার্চ ১৭০৭ সালে ভারতের আহমদাবাদে ইনতেকাল করেন। তিনি ছিলেন মোঘলসম্রাজ্যের ষষ্ঠ প্রতিনিধি। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার শাসনামল স্থায়ী ছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে শাসন করা এই বাদশার রাজত্বকাল সম্রাট আকবরের পরই দীর্ঘতম। বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে তার শাসনামলের বিস্তৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আওরঙ্গজেব তার শাসনামরে ভারতবর্ষে শরিয়াহ আইন চালু করেছিলেন। ৪ নভেম্বর ১৬১৮ সনে আওরঙ্গজেব সম্রাট শাজাহান ও মমতাজের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় যুগ

এ ছিল হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রহ.[২] এর যুগ। তিনি ১১৭৬ হিজরিতে ইনতেকাল করেন। শরিয়তের সঠিক ইলমের প্রচার-প্রসারের কাজে তিনি মনোযোগী ছিলেন। জোরেশোরে চলা বেদআত ও কুসংস্কারের মোকাবেলা করেন। দেশের পরিবেশকে ইসলামি বিপ্লবের উপযোগী করে তোলেন। বিভিন্ন গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা তুলে ধরেন। তার এই প্রচেষ্টায় তৈরি হয় এক নতুন প্রজন্ম, যারা ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে এবং যাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি সম্ভ্রমবোধ। অনৈসলামিক পরিবেশের প্রতি যাদের অন্তরে সৃষ্টি হয় চরম ঘৃণা ভাব।

তৃতীয় যুগ

এই যুগ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রহ. এর সাহেবজাদা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী রহ. এর শিষ্যদের, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন সাইয়েদ আহমদ শহিদ বেরেলবী রহ. ও খ্যাতনামা মুজাহিদ মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ.। তারা এক ভারী জামায়াত প্রস্তুত করেন। তাদেরকে দীনী ও ইলমি প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তোলেন। তারপর তাদেরকে নিয়ে সীমান্ত প্রদেশে হিজরত করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে শিখদের পরাজিত করা, যারা পাঞ্জাব দখল করে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। তারপর হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হয়ে ইংরেজদের বিতাড়িত করে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। তারা এই উদ্দেশ্যে সফলও হয়েছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে শিখদেরকে পরাজিত করে তারা পেশোয়ার এবং তার আশপাশের এলাকায় ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলামের আর্থিক ও প্রশাসনিক নেজাম পুরোপুরি কার্যকর করেন। কিন্তু আফগানজাতি এই শাসনব্যবস্থাকে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও জাহেরি আকিদা-বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দেখে বিদ্রোহ শুরু করে। একে

---

[২] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রহ.। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দেসী দেহলবী রহ. মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. এর সংস্কারপন্থি চিন্তা-চেতনা ও আদর্শের অনুসারী। উপমহাদেশে হাদিস চর্চা ও তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিনি এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব। ১১১৪ হিজরির ৪ শাওয়াল তাঁর জন্ম। ১১৭৬ হিজরির ২৯ মহররম তিনি ইনতেকাল করেন।

তার চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছাতে দেয়নি। তারপর বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদদের সঙ্গে শিখ সৈন্যদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেখানে ১২৪৬ হিজরি সনে [১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ] সাইয়েদ আহমদ বেরেলবী রহ. ও তার সঙ্গী মাওলানা ইসমাইল রহ. -সহ বড় বড় বহু মুজাহিদ শাহাদত বরণ করেন। তারা শহিদ হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্টরা বিভিন্ন পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। এসব মহান ব্যক্তি এবং তাদের সঙ্গীরা হিন্দুস্তানে থাকা অবস্থায় হকের উপর অটল-অবিচল থেকে নিজেদের জান-মালের কোরবানি করতে থাকেন। তাদের মধ্যে বহুজন শাহাদত বরণ করেন। আর অন্যরা শাহাদতের অমিয় সুধা পান করার জন্য প্রহর গুনতে থাকেন। কিন্তু তাদের দৃঢ়তায়-অবিচলতায় বিন্দু পরিমাণ ঘাটতি আসেনি।

চতুর্থ যুগ

এ ছিল বালাকোটের মুজাহিদ-জামায়াতের শিষ্যদের যুগ। তাদের প্রতি আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গের যুগ। তারা দেখলেন, সমগ্র ভারত ইংরেজদের দখলে চলে গেছে। সারা দেশে পুরোদমে তাদের রাজত্ব চলছে। ইংরেজদের বিজয়ে মুসলমানদের মাঝে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ১৮৫৭ সালের সিপাহি-জনতার বিপ্লব আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর চরম হতাশা তাদের মাঝে কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে তারা ইসলামি জীবনব্যবস্থার সংরক্ষণ, মুসলমানদেরকে দীনী ও নৈতিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের আশাবাদী করে তোলা এবং ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির আগ্রাসন মোকাবেলা করা, সর্বোপরি সকল ফেতনা-ফ্যাসাদের দ্বার রুদ্ধ করার জন্য কোনো পথ না দেখে দীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যেসব মাদরাসা হবে ইসলামের দুর্গ। দীনী ইলম ও শরিয়তের আশ্রয়স্থল। এই উদ্দেশ্যে তারা দারুল উলুম দেওবন্দ, মাজাহিরুল উলুম ও দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা প্রতিষ্ঠা করেন।

পঞ্চম যুগ

এ ছিল ওই মহান ব্যক্তিবর্গের সাথী-সঙ্গী ও ভক্তবৃন্দের যুগ, যার প্রাণপুরুষ ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ ইলিয়াস রহ.[১]। তিনি ১৩৬৩ হিজরিতে

---

[১] তাবলীগ জামাতের উদ্ভাবক। শায়খুল হাদিস মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. এর চাচা। ১১০৩

ইনতেকাল করেন। তার সময়ে মুসলমানরা পথহারা হয়ে যথেচ্ছভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। ঈমানি ও রুহানিভাবে তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাদের থেকে দীনী বুঝ ও অনুভূতি একেবারে উঠে যায়। ব্রিটিশসরকার এবং ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। ফলে সর্বদা তারা ব্যস্ত থাকে বস্তুপূজা ও পার্থিব জীবন নিয়ে। এসব অবস্থা মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. কে বড় চিন্তিত করে তোলে। আর তখন যেসব দীনী মাদরাসা ও দরসগাহ ছিল তা এই বিবর্তিত পরিবেশের অকূল দরিয়ার মাঝে ছোট ছোট অনুল্লেখযোগ্য দ্বীপের মতো। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। মাওলানা ইলিয়াস রহ. মনে করলেন, সর্বস্তরের মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক করতে হবে। তাদের নিকট আমাদেরই প্রথম যেতে হবে। কারণ তারা তাদের মস্তিষ্কের রোগ ও দুর্বলতা অনুভব করতে পারছে না। তখন তিনি ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর দাওয়াত দিতে শুরু করেন।

মাওলানা কান্দলবী অত্যন্ত জজবা নিয়ে পুরোদমে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। জামায়াত নিয়ে শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে ছুটে যান। লোকজনকে এই কাজের প্রতি উৎসাহিত করতে থাকেন। মাওলানার এই কাজ ভারতের এমন এক এলাকা থেকে শুরু হয় যেখানকার মানুষ সবচেয়ে নিরক্ষর ও পথভ্রষ্ট। চরিত্রগত দিক দিয়েও তারা ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। দীনের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। এলাকাটির নাম মেওয়াত। ভারতের রাজধানী দিল্লির দক্ষিণে এটি অবস্থিত। মাওলানা এখানকার লোকজনকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার দাওয়াত দেন। এই সময়কাল কখনো এক মাস হত। আবার কখনো এর চেয়ে বেশি হত। মাওলানা অনুভব করেছেন যে, এসব লোক যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের পরিবর্তিত পারিপার্শ্বিকতা এবং ঘরোয়া পরিবেশ থেকে বের হয়ে না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা দীন শিখতে পারবে না। তাদের চরিত্রের

হিজরিতে দিল্লির নিকটবর্তী কান্দালায় তাঁর জন্ম। ১৩৩৪ হিজরিতে তাঁর বড় ভাই মাওলানা ইয়াহয়ার মৃত্যুর পর তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা ও মসজিদের দায়িত্ব মৃত্যু পর্যন্ত পালন করেন। ১৩৬৩ হিজরিতে নিজামুদ্দীনে তাঁর ইনতেকাল হয়।

সংশোধন হবে না। এই এলাকার হাজার হাজার মানুষ মাওলানার ডাকে লাব্বায়িক বলেছেন। প্রত্যেকে কয়েকবার করে সময় লাগিয়েছেন। বিশাল ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়েছেন। কখনো পদব্রজে আবার কখনো জানবাহনে চড়ে। যার ফলে তাদের চরিত্রের সংশোধন ও আমলের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। জীবনধারা পাল্টে গেছে। দীনী জজবা জাগ্রত হয়েছে।

দাওয়াতের এই কাজের জন্য বিশেষ কোনো অর্থায়নের বা কোনো কালেকশনের প্রয়োজন পড়েনি। প্রয়োজন পড়েনি অফিসিয়াল নিয়মতান্ত্রিকতার। একেবারে সাদাসিধেভাবে এই কাজ অগ্রসর হয়েছে, যা ইসলামের প্রথম যুগের দাওয়াতের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্যপূর্ণ। এগুলো সেসব মুখলিস দায়ী এবং মুজাহিদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যারা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে পড়েছেন এবং সকল ব্যয়ভার নিজেরাই বহন করেছেন। একমাত্র আল্লাহর জন্য সকল বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ মাথা পেতে নিয়েছেন।

আলোচনার শেষে আমি 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ'র লোকজনকে দাওয়াতের এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে বলি। নতুন অভিজ্ঞতার জন্য এভাবে কাজ শুরু করার দাওয়াত দিই। পদ্ধতিটির পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আমিও তাদের সঙ্গে বিভিন্ন শহর ও মারকাজে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করি।

হোসাইন ইউসুফ এই প্রোগ্রামকে স্বাগত জানান। তিনি ওয়াদা করেন যে, সংস্থার বিভিন্ন ব্রাঞ্চ থেকে লোক নির্বাচন করে দাওয়াতের এই কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে আমাকে জানাবেন। আমার পর প্রফেসর আলি আদলি মুরশিদী আলোচনা করেন। তিনি 'সাইয়েদা জায়নাব' এলাকার আনসারুস সুন্নাহর বিভাগীয় প্রধান। আমার বক্তব্যের তিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি শ্রোতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেন।

২ মার্চ ১৯৫১

আজকের দৈনিকগুলো মুসলমানদের সামনে মরক্কোয় সঙ্ঘটিত একটি হৃদয়বিদারক সংবাদ নিয়ে এসেছে। ফ্র্যাঞ্চ সেনাবাহিনী মরক্কোর ক্ষমতাশীনদের বিরুদ্ধে শক্ত ও কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছে। তারা শাহিমহল

ঘিরে ফেলেছে। সেখানকার হাজার হাজার মানুষকে জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে রেখেছে। মরক্কোর এই রক্তাক্ত কাহিনী আজ সবার মুখে মুখে।

বানহা সফর

আগে থেকেই আমাদের বানহা সফরের কথা ছিল। এই সফর অবশেষে শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর সঙ্গে হয়। আজই প্রথম আমি এখানকার কোনো রেলস্টেশন দেখি। মিসরে এটাই আমার প্রথম ট্রেনসফর। এদেশে আমার ট্রেনে ভ্রমণ করার খুব ইচ্ছা ছিল। আমরা আমাদের দেশের ট্রেনের সিট এবং রেলস্টেশনের ভিড়ভাট্টার মধ্যে বড় হয়েছি। সম্ভবত মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় আমার ট্রেনের সফর শুরু হয়। যাই হোক, আমরা স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠে বসলাম। আমার হৃদয়ে তখন শৈশবের সেই আনন্দ অনুভূত হতে থাকে।

মিসরের গ্রামীণ দৃশ্য

ট্রেন রওনা হয়। আমরা ট্রেনে বসে মিসরের গ্রামীণ দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। এদের সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছিলাম। দেখি কয়েকজন মিসরি কিষান হাল চাষ করছে। দেখতে দেখতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আমরা বানহায় পৌঁছে যাই। সেখানে শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী, আবদুর রউফ, বানহার সর্ভে ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা মুখলিস ইখওয়ানি জনাব সাইয়েদ মুহম্মদ আহমদ ও বানহার ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সেক্রেটারি জনাব মুহম্মদ আবদুল হালিম ঈসা প্রমুখ আমাদেরকে স্বাগত জানান। আমরা আমাদের মেজবান হাজি আবদুল্লাহর বাসায় যাই। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বানহা শাখার প্রধান। সেখানকার বুজুর্গ ও অনুসৃত ব্যক্তিদের একজন। তার সঙ্গে আমরা দেখা করি। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। তিনি আমাদেরকে মিসরের বিভিন্ন কাহিনী শোনান। ঈমানি জজবা, দীনী মহব্বত ও জিন্দা দিলের কারণে তিনি কিছুক্ষণ পর-পর খোশ আমদেদ বলতে থাকেন।

মসজিদে আমার বয়ান

কিছুক্ষণ পর আমরা মসজিদে যাই। সেখানে জুমার নামাজ আদায় করি। জনাব গাজালী খুতবা দেন। খুতবার বিষয় ছিল 'ব্যক্তিত্বের ক্ষমতা

ও প্রভাব'। আসলেই এ দিকে মুমিনদের লক্ষ্য রাখা উচিত। খুতবায় দীনের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপরও আলোকপাত করেন। নামাজের পর আমার বয়ানের ঘোষণা দেওয়া হয়। আমি উঠে আলোচনা শুরু করি।

সাধারণ জীবন ও ঈমানি জীবনের পার্থক্য

দুটি দিকের সমন্বয়ে মুসলমান। প্রথমটি হল, মানুষের সাধারণ জীবন। এতে দুনিয়ার সকল জাতিই সমান। সে মুসলিম হোক কিবা অমুসলিম। জীবনের এই দিকের চাহিদা হল- মানুষ খাবে, পান করবে, ব্যবসায়-বাণিজ্য করবে, নির্মাণ করবে, চাষাবাদ করবে, চাকুরি করবে, আন্‌জাম দিবে মানবিক ও নাগরিক জীবন সম্পর্কীয় আরও বহু কাজ।

জীবনের দ্বিতীয় দিক হল মানুষ কিছু আকিদার উপর ঈমান রাখবে। বিশেষ দাওয়াত ও পয়গামের ধারক-বাহক হবে। এটি শুধু মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য। এদিক দিয়ে মুসলমানরা অন্যান্য জাতি থেকে এক স্বতন্ত্র অবস্থানে রয়েছে। এতেই রয়েছে তাদের শক্তি-সামর্থ্য। আল্লাহর দরবারে তাদের কবুলিয়তের রহস্য এইখানেই লুক্কায়িত। নবীগণ জীবনের প্রথম দিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও দাওয়াত দেওয়ার জন্য আসেননি। তারা এই দিকের সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য আসেননি। বরং তারা এসেছেন দ্বিতীয় দিকের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার জন্য। এই দিকটি সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য। তাই মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা এই দ্বিতীয় দিকে নিবদ্ধ থাকা উচিত। একে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত।

মুসলমান নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে

মুসলমান নিজেদের উপর সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা দ্বিতীয় দিক থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে প্রথম দিকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং এর প্রতিনিধিত্ব করছে। এর মধ্যে নিজেদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছে, যার অনিবার্য ফল হল মানুষ আজ মুসলমানকে হেয় ও হীন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। আল্লাহর দরবারেও তাদের মর্যাদা কমে গেছে।

আমি তাদের সামনে সরকারি কর্মকর্তাদের একটি উপমা তুলে ধরি। একজন চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারি। তার বেতন কম। কিন্তু তার

সম্পর্ক সরকারের সঙ্গে। তার গায়ে সরকারি পোশাক। এদদ্বারা বোঝা যাচ্ছে সে সরকারি লোক। এখন কেউ যদি এই লোকটিকে অপমান করে বা তার উপর আঘাত করে, তা হলে ধরা হবে সে সরকারকে অপমান করেছে বা সরকারকে আঘাত করেছে। এই লোক সরকারের একজন সাধারণ কর্মচারি হওয়ার সুবাদে তার এই সম্মান অর্জিত হয়েছে, যা বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতির ভাগ্যে জোটেনি। যদি এসব ব্যবসায়ী শিল্পপতিকে কেউ মারধর করে তা হলে সরকার একে নিজের গায়ে টেনে নিবে না।

প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থাও এমন ছিল। তারা হুকুমতে এলাহির প্রতিনিধিত্ব করত। আল্লাহর দীনের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখত। তাদেরকে আল্লাহওয়ালা হিসাবে গণ্য করা হত। যার ফলে পৃথিবীর কোনো প্রান্তে যদি কোনো মুসলমানকে অপমান করা হত বা কেউ মুসলিমজাতির সঙ্গে মানহানিকর আচরণ করত, তা হলে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার প্রতিশোধ নিতেন। আজ আমরা সারা পৃথিবীতে অপমান ও জুলুম-নির্যাতনের শিকার। মরক্কোর কথাই ধরুন। সেখানে এখন বোম্বিং চলছে। মুসলমানকে অপমান করা হচ্ছে। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ইজ্জত-আবরু নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। কিন্তু এতে আমাদের কারো কানের পশমও নড়ছে না। প্রতিশোধের স্পৃহা জাগছে না। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য আমাদেরকে জীবনের ওই দ্বিতীয় দিকের প্রতি পুনরায় ফিরে যেতে হবে। বিগত দিনে এটা ছিল আমাদের বৈশিষ্ট্য। আমাদের ইজ্জত-সম্মানের প্রতীক। ঈমান-আকিদা, রুহানিয়াত ও পয়গামে রিসালাতের বাহু। যদি আমরা এই দিকটি গ্রহণ করতে পারি, তা হলে আবারও আমরা পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব। আবারো সেই সম্মান-মর্যাদা আমাদের পদচুম্বন করবে।

নামাজ এবং আলোচনার পর আমরা বাসায় ফিরে আসি। শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর সঙ্গে দেখা করতে 'শাবিনুল কওম' এলাকার কয়েকজন মেহমান আসেন। মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের এক্সে বিশেষজ্ঞ জনাব আবদুস সামি মাহরোস সালেহ ও কৃষিগবেষক জনাব আলি জাকি লুতফী তাদের মধ্যে ছিলেন। মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা আলোচনা শুরু করি। প্রথমে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হই। তারা আমাকে ভারতীয় মুসলমানদের

দীনী ইলম ও মুআশারাত [পারস্পারিক সম্পর্ক] বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। আমি তাদেরকে এসব বিষয় বিস্তারিত অবহিত করি।

একটা বিষয় আলোচনা থেকে ছুটে গেছে। সেটি হল মসজিদে থাকা অবস্থায় আমার সঙ্গে শায়খ আবদুদ দায়িমের সঙ্গেও দেখা হয়। তিনি আমার পুরনো বন্ধু। তার সঙ্গে হজের মৌসুমে দেখা হয়েছিল। তখন তিনি হেরেম শরিফের 'মুসল্লায়ে মালিকি'তে নিয়মিত দরস দিতেন। জামইয়্যা শারইয়্যারও তিনি একজন কর্মকর্তা। আমাকে তিনি একবার 'মাকামে মালিকি'তে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করেন। সেখানে উপস্থিতিদের অধিকাংশই মিসরীয় হওয়ার সুবাদে জামইয়্যা শারইয়্যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। আমি তাকে এবং তার সাথী-সঙ্গীদের মক্কা মোকাররমায় আমার অবস্থানস্থলে দীনী দাওয়াতের উপর আলোচনা করতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। এভাবেই তার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা বাড়তে থাকে। আমরা উভয়ে আজ একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করে দারুণ আনন্দিত হই। আমাদের কায়রোর ট্রেনে ওঠার পূর্ব-পর্যন্ত আমাদের বন্ধু জনাব মাহমুদ আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

আজহারে ইখওয়ানি ছাত্রদের উদ্দেশে বয়ান

৩ মার্চ ১৯৫১

বাসায় আজ পড়াশোনায় লিপ্ত ছিলাম। মাগরিবের পর মুহম্মদ দামিরদাশী এসে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যান। রাতে সেখানে ইখওয়ানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত এবং তাদের সঙ্গে রাত্রিযাপনের পূর্ব সিদ্ধান্ত ছিল। বাসায় এসে দেখি আজহারের ছাত্রদের বিশেষ এক জামাত আগে থেকেই উপস্থিত রয়েছেন। তাদের অধিকাংশই উসুলুদ্দীন অনুষদের ছাত্র।

দীনী আমানতের হেফাজত

আজ রাতে আমার আলোচ্যবিষয় ছিল সেই পয়গাম ও জিম্মাদারি সম্পর্কে, যা রাসুল সা. রেখে গেছেন, যা মুসলমানদেরকেও তাদের পূর্বপুরুষেরা দিয়ে গেছেন। এখন এই জিম্মাদারি একজন আলেমে দীনের। এই জিম্মাদারি পুরোপুরিভাবে আদায় করা হলে প্রথম জামানার মতো ইসলামি আকিদা ও শরিয়তের হেফাজত ও সংরক্ষণ সম্ভব হবে। আমাদের দেখার বিষয় হল বর্তমান তরুণ আলেমসমাজ এবং ইসলামি

চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী লেখক-কলামিস্টরা এই দায়িত্ব অনুপুঙ্খ পালন করছে কি না? দেখার বিষয় তারা দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা বাতিলদের ফেতনাবাজি এবং জাহেলদের মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মুখোশ উন্মোচন করছে কি না?

দীনের আরকান, ফারায়েজ ও ওয়াজিবাতের সংরক্ষণও এই জিম্মাদারির অন্তর্ভুক্ত। এক মুহূর্তের জন্য হলেও সে গাফেল ও উদাসীন হয়ে কোনো কাজ করতে পারে না। একজন আলেম এসব আরকানের যে পরিমাণ পাবন্দি করবে, জাহের ও বাতেনের প্রতি যতটুকু লক্ষ্য রাখবে, সাধারণ মানুষও সে পরিমাণ গুরুত্ব দিবে। আর আলেমদের মধ্যে যদি গাফলত ও অলসতা চলে আসে তা হলে সাধারণ মানুষ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না।

পাশাপাশি দীনী রুহ ও প্রাণশক্তি এবং অন্তরের বিভিন্ন কায়ফিয়ত ও ধরন ইসলাম এবং ওয়ারাসাতে নববীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইখলাস ও একনিষ্ঠতা, আল্লাহর জাতের উপর ভরসা, দু'হাত তুলে রোনাজারি করা এবং নামাজে খুশুখুজু- এসবকিছু অন্তরের কায়ফিয়তের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এসব বিষয়ে মুসলমানদের প্রথম প্রজন্ম ও সাহাবায়ে কেরাম শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। শত্রুর উপর তাদের বিজয় লাভ করার এটাই সবচেয়ে বড় কারণ ছিল। একব্যক্তি মুসলমানদের হাতে কিছুদিন বন্দি হয়ে ছিল। সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাকে জিজ্ঞাসা করেন, মুসলমানদের অবস্থা তুমি কেমন দেখলে? তখন সে বলে, 'আপনার নিকট আমি তাদের অবস্থা এমনভাবে তুলে ধরব যেন আপনি তা নিজ চোখে দেখছেন। তারা দিনের বেলায় থাকে ঘোড়সওয়ার। আর রাত কাটায় ইবাদতে। মূল্য দেওয়া ব্যতীত জিম্মিদের মাল কখনো গ্রহণ করে না। কারো নিকট আসা-যাওয়া করলে প্রথমে সালাম দেয়। শত্রুর বিরুদ্ধে এমনভাবে লড়াই করে যে, তাকে পরাস্ত করা ব্যতীত ক্ষান্ত হয় না।'

তার বর্ণনা শুনে হেরাক্লিয়াস বলে ওঠেন, যদি তাদের অবস্থা বাস্তবে এমনই হয় তা হলে জেনে রাখো, তারা একদিন না একদিন আমাদের এই মসনদও দখল করবে। অন্য এক বন্দি মুসলমানদের অবস্থা তার নিকট এভাবে বর্ণনা করে যে, তারা রাতে ইবাদত করে। আর দিন অতিবাহিত করে ঘোড়ার পিঠে। আপনি যদি তাদের কারো সঙ্গে কথা বলতে চান সে জিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজে আপনার কথা বোঝতে পারবে না।

ওলামায়ে কেরাম ও দীনের কর্ণধারদের জন্য সুন্নতের উপর আমল করা জরুরি। মৃতপ্রায় সুন্নতকে পুনরায় জিন্দা করা এবং সমাজে এর বাস্তবায়ন করা তাদের দায়িত্ব। আলেমদেরকে হাদিসের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চালাতে হবে। তাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং এই দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত- ফারায়েজের বাস্তবায়ন করা। দীন এবং তার আরকানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِيْنَ ان مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاٰتَوُا الزَّكَاةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰه عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ.

'তাদেরকে যদি আমি জমিনের মধ্যে নেতৃত্ব দান করি, তা হলে তারা নামাজ আদায় করবে, জাকাত দিবে, সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। প্রতিটি বিষয়ের শেষ ফল আল্লাহর হাতে।' [সুরা হজ, ৪১ আয়াত]

আজকের রাত্রিটি ওয়াদা অনুযায়ী এখানেই তাদের সঙ্গে মেহমান হিসেবে কাটিয়ে দিই।

জেনারেল হরব পাশার সঙ্গে আলোচনা

৪ মার্চ ১৯৫১

সাইয়েদ আবু নসর হোসাইনী ভূপালী আজ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ইতঃপূর্বে তার বাসায় আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। মিসরে আসার পূর্বে তিনি লখনৌতে আমাদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। আজ 'রিসালাহ' পত্রিকায় আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখার শিরোনাম ছিল 'শোন হে মিসর'। ইচ্ছা ছিল লেখাটি একটি ভিন্ন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করব। মুসলিমদেশ মিসরের প্রতি আমাদের ভালবাসার আশীর্বাদ এবং সেদেশের ব্যাপারে কিছু আশা ও আশংকা নিয়ে লেখাটি তৈরি করেছিলাম।

সাড়ে নটায় আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাই। সংস্থার প্রধান জেনারেল মুহম্মদ সালেহ হরব পাশার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি আমাকে জানান যে, 'সংঘাতের মুখে পৃথিবী' বিষয়বস্তুর উপর

আমার বক্তৃতা ইলমিমহলে ও শিক্ষিতসমাজে ব্যাপকভাবে আদৃত হয়েছে। তাদের মাঝে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে তিনি যেভাবে কথা বললেন এতে ফুটে ওঠে তার ঈমানি অনুপ্রেরণা, সুস্থ চিন্তা, বিচক্ষণতা ও ধর্মীয় জজবা। আমি তাকে একজন সাবেক সেনাকর্মকর্তা এবং মিসরের সুশীলসমাজের একজন সদস্য মনে করতাম। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলে বোঝতে পারলাম, তার অধ্যয়ন অনেক গভীর। তিনি এমন কিছু তথ্য ও তত্ত্ব জানেন, যা কখনো কখনো আলেমদের জন্য দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। তার আলোচনা অনেক প্রভাব সৃষ্টিকারী। তিনি ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব-অবহেলা এবং শুব্বানুল মুসলিমিনের ত্রুটির ব্যাপারে ওজর-অপারগতা পেশ করেন। তারপর বলেন, নীল উপত্যকার ঐক্যের বিষয়টি আমাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজরা আমাদেরকে পেঁচিয়ে রেখেছে।

মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্ব

তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বের উপর আলোচনা করেন। সেখানকার কৃষিজাত পণ্য ও উৎপাদিত খাদ্যের আধিক্য, এগুলোকে পরিশোধন করে ব্যবহার উপযোগী করার জায়গা এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিকের উপস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। আসওয়ান অঞ্চলের খনিজসম্পদের মধ্যে লোহা ও লৌহজাত পণ্যসামগ্রীর দায়িত্ব মিসরের গ্রহণ করার বিষয়টিও তুলে ধরেন। এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ খনিসমূহের একটি। তারপর মিসর এবং আসওয়ান থেকে তিনি তার পৃথক হওয়ার ব্যাপারে ইংরেজদের হাত রয়েছে বলে জানান।

তিনি বলেন, কেউ কেউ মনে করে থাকে যে, মধ্যপ্রাচ্য ও মিসরে ইংরেজদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ার কারণ সুয়েজবন্দর। বিষয়টি আসলে এমন না। বরং এর মূল কারণ দুটি। প্রথম কারণ- ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইচ্ছা ছিল যদি যুদ্ধ বেঁধে যায় তা হলে রুশদের উপর আক্রমণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যকে সেনাঘাটি বানাবে। যাতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা থেকে ইউরোপ বেঁচে থাকতে পারে।

দ্বিতীয় কারণ- যখন তাদের প্রাচ্য ও ভারতবর্ষ থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হল এবং সেখানে তাদের দখলদারিত্বের অবসান ঘটল তখন তারা

পরিকল্পনা করল, আফ্রিকার মসনদ দখল করে এর ক্ষতিপূরণ করার। এ কাজের জন্য সুদান এবং তার আশপাশের অঞ্চলগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এসব অঞ্চলে রয়েছে অনেক খনিজসম্পদ। প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু। অসংখ্য লড়াকু সৈনিক। তাদের মধ্যে এখনও রয়েছে স্বভাবজাত সরলতা। আত্মপ্রচার বিমুখতা। তাই এসব জমিন অন্যায় কাজে ব্যবহারের জন্য অনেক নিরাপদ। তা ছাড়া খ্রিস্টবাদ ও পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রচারের জন্যও এই অঞ্চলটা উপযোগী। আর যখন মিসর সুদানের সঙ্গে একজোট হয়ে যাবে তখন তাদের এই ঐক্য আফ্রিকা সাম্রাজ্যের জন্য শাণিত কৃপাণের রূপ ধারণ করবে।

আধ্যাত্মিক শক্তির গুরুত্ব

তারপর তিনি মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে আলোচনা করেন। তুরস্কের উচ্চপদস্থ সেনা-কর্মকর্তা জেনারেল কাজেম কুররাহজির বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমরা যখন ইস্তাম্বুলের সামরিক ট্রেনিং কলেজে পড়াশোনা করতাম তখন জেনারেল কাজেম এক বক্তৃতায় আমাদেরকে বলেন, যুদ্ধের সময় তুরস্ককে এমন কতক অভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যা মোকাবেলা করা বড় দেশগুলোর পক্ষেও সম্ভব ছিল না। এসব সমস্যায় তারা নিজেদের অস্তিত্বও টিকিয়ে রাখতে পারত না। ইউরোপের সকল দেশ তুরস্কের উপর একযোগে আক্রমণ করে বসে। এরপর তুরস্ক এসব শক্তির মোকাবেলা করেছে। নিজের সম্মান ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। তুরস্কের এ বিজয় অর্জিত হয়েছে সেসব বীর সৈনিকের আত্মদানের বদৌলতে, যারা রুহানি শক্তিতে মহীয়ান ছিলেন। আধ্যাত্মিকতার বলে বলীয়ান ছিলেন। তাদের অত্যাধুনিক কোনো প্রশিক্ষণ ছিল না। সমরাস্ত্র ছিল না। জেনারেল কাজেম আরও বলেন, যারা এই রুহ শেষ করে দিতে চায়, আধ্যাত্মিক শক্তি মিটিয়ে দিতে চায় তারা তুরস্কের দুশমন।

জেনারেল সালেহ হরবের দৃষ্টিতে জাতির রোগ

জেনারেল সালেহ হরব বলেন, মুসলমান এবং মিসরীদের সবচেয়ে বড় রোগ হল আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতা। এটা আমাদের উচ্চাভিলাষ ও

বীরত্বকে খুইয়ে দিয়েছে। উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়টি আপনি মাথায় রাখবেন। এ বিষয়ে কলম ধরবেন।

তিনি এর জন্য জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দেওয়ার কথা বলেন। আমি বলি, এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাকে একটু বেশি সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। তিনি আগামী বুধবার সাড়ে ন'টায় আলোচনার সময় ধার্য করেন। তারপর এ সম্পর্কে একটি খসড়া তৈরি করবেন বলে আমাদের সঙ্গে ওয়াদা করেন। এই খসড়া অনুযায়ী আমি আলোচনা করব।

আসরের পর আমরা আবদুল খালেক পাকিস্তানীর নিকট যাই। তিনি তার কিছু সাথী-সঙ্গী এবং উসুলুদ্দীনসহ বিভিন্ন অনুষদের ছাত্রদের দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন। তাদের মধ্যে একজন 'শোন হে মিসর' প্রবন্ধটি পড়ে শোনাল। তারপর আমি আলোচনা শুরু করি। গ্রামাঞ্চলে দাওয়াতের কাজের পদ্ধতি এবং আজহারের ছাত্রদের এতে অংশগ্রহণ কী ফল পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে কথা বলি। দাওয়াতের কাজে তাদের আত্মনিবেদনের দ্বারা ভবিষ্যতের উপর কী প্রভাব প্রতিফলিত হবে আলোচনায় তা ফুটিয়ে তুলি। মাওলানা ওবায়দুল্লাহও কথা বলেন। আমাদের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কিছু লোক দাওয়াতের কাজ নিয়ে আগামী শুক্রবার গ্রামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

ভারতবর্ষে ইলমে হাদিসের চর্চা

আজ রাতে 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামিয়া'য় 'ভারতবর্ষে ইলমে হাদিসের চর্চা' বিষয়ের উপর আমার আলোচনা করার কথা। উপস্থিতির সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। কিন্তু এই মজলিসে কিছু আহলে ইলম এবং আজহারের বহু আলেম ছিলেন। যেমন, শায়খ আহমদ শিরবাসী, শায়খ মাহমুদ হাসান রবি, শায়খ আবদুল মুনয়িম নমর, ফিলিস্তিনের 'মাজলিসে ইসলামিয়া'র ধর্মবিষয়ক সম্পাদক এবং সেখানকার কেন্দ্রীয় ওলামা পরিষদের দপ্তরসম্পাদক শায়খ মুহম্মদ সবরী আবেদিনসহ অনেকে। মজলিসের সভাপতি প্রফেসর শাহিন হামজা আমাকে তাদের সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আমি আলোচনা শুরু করি।

দরসে হাদিসের বিভিন্ন যুগ, বড় বড় মুহাদ্দিস এবং তাদের কর্মগাথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলি, ভারতবর্ষে কে সর্বপ্রথম ইলমে হাদিস

এনেছেন। কে এর প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। এই সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে মিসরের। হিজরি দশম শতকে মিসরের কতক আলেমের ভারত গমনের কথা তুলে ধরি। গুজরাটের আলেমদের আলোচনা করি। যেমন- শায়েখ তাহের পাটনি এবং তার মহাগ্রন্থ مجمع بحار الانوار [মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার]। শায়খ আবদুল হক বোখারী দেহলবী এবং ভারতবর্ষে ইলমে হাদিস প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে তার অবদানের উপর আলোকপাত করি। তার সন্তান-সন্ততি ও নাতিদের কীর্তি ও অবদানের বর্ণনা দিই।

হিজরি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রাজ্ঞ আলেম হাকিমুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর আলোচনা করি, যিনি নিজের সন্তান, ছাত্র ও খলিফাদের মাধ্যমে ইলমে হাদিসের প্রসার ঘটিয়েছেন। দরস-তাদরিস ও লেখালেখির মাধ্যমে এই মোবারক ইলমের খেদমত করেছেন। হাদিস বুঝা, ব্যাখ্যা করা, ফিকহ ও হাদিসের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং সহিহ হাদিসকে ফিকহী যেকোনো ইমামের মাজহাবের উপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করি। তিনি কঠিন প্রকৃতির ফুকাহা ও মুনকিরিনে ফিকহের মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং আসবাবে ইখতিলাফ বর্ণনার ক্ষেত্রে সঠিক বুঝের পরিচয় দিয়েছেন। দীনের তত্ত্ব ও রহস্য এবং ইসলামি শরিয়তের মূলনীতিসমূহকে স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

তারপর ইলমে হাদিসের সর্বশেষ প্রাণপুরুষ মাওলানা শাহ মুহম্মদ ইসহাক রহ. এবং তার প্রসিদ্ধ ছাত্রদের আলোচনা করি। যেমন, মাওলানা শাহ আবদুল গনি মুহাজিরে মদিনা রহ.। তারপর তার ছাত্র এবং তার ছাত্রদের ছাত্র মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. থেকে নিয়ে মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ[১]. ও মাওলানা খলিল আহমদ সাহারানপুরী

---

[১] শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. ছিলেন ভারত উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় বিপ্লবী রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, বুজুর্গ আলেম। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র। ইতিহাসখ্যাত রেশমি রুমাল আন্দোলনের বিপ্লবী নেতা। ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কারণে মাল্টা দ্বীপে ৩ বছর কারা নির্বাসন ভোগ করেন। তাঁর অনূদিত কুরআনের উর্দু তরজমা ও টীকা উপমহাদেশের সর্বত্র সমাদৃত। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ ভারতের বেরিলা শহরে তার জন্ম। ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে তিনি ইনতেকাল করেন।

রহ.[২]। তারপর এই উভয় হযরতের ছাত্র মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.[৩]। মাওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী রহ. ও মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.[৪] পর্যন্ত আলোচনা করি। এসব ব্যক্তিত্বশীল আলেমের প্রাণকেন্দ্র দারুল উলুম দেওবন্দ। শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহম্মদ জাকারিয়া কান্দলবী রহ.[৫]। মাওলানা শাহ আবদুল গনির অন্যান্য ছাত্র, বোখারী শরিফের প্রখ্যাত টীকাকার মাওলানা আহমদ আলি রহ. এবং হাদিসের জগতে তার খেদমত, কারী আবদুর রহমান পানিপথী রহ., মাওলানা আলম আলি মুরাদাবাদী রহ. এবং তার প্রসিদ্ধ ছাত্র মাওলানা

---

[২] খলিল আহমদ সাহারানপুরী রহ. ছিলেন উপমহাদেশের জ্ঞানপিয়াসী বুজুর্গ আলেম। দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতিসন্তান। তাঁর রচিত আবু দাউদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ বাযলুল মাজহুদ পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত হাদিসের ভাষ্যগ্রন্থ। তিনি মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহীর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন এবং হাজি ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. হতে লিখিত খেলাফতপ্রাপ্ত হন। শেষ বয়সে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। ১৩৪৫ হিজরিতে সেখানে ইনতেকাল করেন।

[৩] আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.। দারুল উলুম দেওবন্দের কৃতিসন্তান আল্লামা শাহ কাশ্মিরী রহ. ছিলেন শতাব্দীর বিখ্যাত হাদিসবিশারদ। তাঁকে খাতামুল মুহাদ্দিসীন অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ছিলেন একজন জীবন্ত লাইব্রেরি। তিনি যা অধ্যয়ন করতেন তা কখনো ভুলতেন না। কথিত আছে 'নুরুল ইজাহ' নামক কিতাবটি মিসরের কোনো লাইব্রেরিতে একবার পাঠ করেই দেশে এসে তা হুবহু লিখে ফেলেন। হযরত থানবী রহ. বলেন, ইসলামের কোন ধরনের বিচ্যুতি থাকলে তার মতো জ্ঞানী মুসলমান থাকতেন না। ১২৯২ হিজরি সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩৩৫ হিজরি সনে তিনি ইনতেকাল করেন।

[৪] শাইখুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.। নবী করিম সা. এর বংশধর, ভারত স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাপুরুষ। ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী নেতা। অখণ্ড ভারতের প্রবক্তা। জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের চেয়ারম্যান। বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিস। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কারণে তার শায়খ শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দীর সাথে মাল্টায় তিন বছর নির্বাসিত ছিলেন। তিনি ছিলেন এমন এক মহান ব্যক্তি, যার মাঝে ইলম, আমল, আধ্যাত্মিকতা, রাজনীতি সবকিছুর সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি হেরেমে নববীতে সুদীর্ঘ আঠারো বছর হাদিসের অধ্যাপনা করেন। কলকাতা আলিয়ার হেড মাওলানা হিসেবেও দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। ১৩৩৮ হিজরি থেকে ১৩৪৬ হিজরি পর্যন্ত প্রায় ৮ বছর সিলেট জামিয়া ইসলামিয়ার শায়খুল হাদিস হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তারপর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেন। ১৩৭৭ হিজরি ১৩ জুমাদাল উলা বৃহস্পতিবার জোহরের পর তিনি ইনতেকাল করেন।

[৫] শায়খ মুহাম্মদ জাকারিয়া রহ.। শায়খুল হাদিস জাকারিয়া রহ. হিজরি চতুর্দশ শতাব্দির মুসলিমবিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাদিসবিশারদ, শীর্ষ পর্যায়ের লেখক, গবেষক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচিত 'ফাযায়েলে আমাল' সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ ও শত ভাষায় অনূদিত। তাবলিগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলিয়াস রহ. তাঁর চাচা। ১৩১৫ হিজরির ১১ রমজানে তিনি ভারতের কান্দালায় জন্মগ্রহণ করেন। ২৫ মে ১৯৮২ সনে মদিনায় তিনি ইনতেকাল করেন।

নজির হোসাইন দেহলবী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিত্বের আলোচনা করি। মাওলানা নজির হোসাইন দেহলবীর দরসের পরিধি, দীর্ঘদিন ধরে তার হাদিসের খেদমতে লিপ্ত থাকা এবং এই বিষয়ে যোগ্য ছাত্র গড়ার পিছনে তার অবিরাম প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরি। غاية المقصود [গায়াতুল মাকসুদ] কিতাবের লেখক মাওলানা শামসুল হক দিয়ানবী রহ., মাওলানা আবদুল মান্নান ওজিরাবাদী রহ., হাফেজ আবদুল্লাহ গাজিপুরী রহ. ও মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী রহ. তারই ছাত্র। ভারতে শায়খ হোসাইন বিন মুহসিন আনসারী কর্তৃক আনীত ইয়ামানী সিলসিলারও আলোচনা করি। নবাব সাইয়েদ সিদ্দিক হাসান খান রহ. এবং তার খেদমতেরও বর্ণনা দিই।

পরিশেষে ভারতবর্ষে দরসে হাদিসের বৈশিষ্ট্য, এই বিষয়ে আলেমদের বিশেষত্ব, এ নিয়ে তাদের ব্যস্ততা, হাদিসের মূল রুহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, রাসুল সা. এর অনুসরণ এবং সুন্নতের উপর আমলের একটি চিত্র সামনে নিয়ে আসি। ভারতবর্ষের বড় বড় মাদরাসায় হাদিস পড়ানোর দৃশ্যও পেশ করি।

আমার এই বয়ানের উপাত্ত এবং রিজালের স্তরসমূহ সংগ্রহ করেছি আমার আব্বাজানের 'ভারতবর্ষে মুসলিম সভ্যতার বিকাশ' কিতাব থেকে। কিতাবটিকে একটি বড় গ্রন্থাগার বললেও অত্যুক্তি হবে না। এতে এই বিষয়ের তথ্যে ভরপুর। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আখিরাতে তার মর্যাদা সমুন্নত করুন।

হাদিসের ময়দানে ভারতীয় খেদমতের প্রশংসা

শায়খ মুহম্মদ সবরী আবেদিন আমার আলোচনার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। হাদিসের ময়দানে ভারতবর্ষের খেদমতের প্রশংসা করেন। এ বিষয়ে ভারতে যেসব অতুলনীয় কিতাব ছাপা হয়েছে তার আলোচনা করেন। যেমন- বায়হাকীর السنن الكبرى [আসসুনান আলকুবরা] এবং আবু দাউদ তায়ালাসীর মুসনাদ। এ ছাড়া রয়েছে দায়িরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ থেকে ছাপানো বিভিন্ন কিতাবাদি।

ভারতীয় মুসলমানদের দীনী সম্ভ্রমবোধের দিকে ইঙ্গিত করতে গিয়ে তিনি বলেন, দীনী দাওয়াতের উদ্দেশ্যে ইসলামের মারকাজ হেজাজে এক

জামাত ভারতীয় মুসলমান নিয়মিত অবস্থান করছেন। তারপর প্রফেসর আবদুল মুনয়িম স্টেজে আসেন। তিনি এসে ভারতবর্ষের এসব দীনী খেদমতের কথা স্বীকার করেন। পাক-ভারতের বড় বড় ব্যক্তিত্বের কিছু কিছু কথা উদ্ধৃত করেন। ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে ভারতীয়দের কিছু কর্মগাথা উল্লেখ করে পূর্বের বিষয়টি মজবুত করেন। পরিশেষে মজলিসের সভাপতি উঠে দাঁড়ান। আলোচকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে অলঙ্কারপূর্ণ এক ভাষণ দেন।

জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের প্রতিবাদ সভা

৫ মার্চ ১৯৫১

সন্ধ্যা পাঁচটায় আমরা মাসবিরো রোডে অবস্থিত দারুল মাআরিফে যাই। শায়খ মুহম্মদ আহমদ শাকেরের সঙ্গে সাক্ষাত করি। দারুল মাআরিফ থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'আলকিতাব'র প্রধান সম্পাদক আদিল গাজবানের নিকট কিছুক্ষণ বসি। দারুল মা'আরিফের স্বত্বাধিকারী জনাব মাত্রির সঙ্গে দেখা করি। প্রেসের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখি। তার কাজের ক্ষমতা, মুদ্রণ, অক্ষর বিন্যাস, বাইন্ডিং ইত্যাদি মেশিন দেখি। মেশিনগুলো আধুনিক। প্রেসের স্বত্বাধিকারী আমাদেরকে এক কপি 'আলগুফরান' হাদিয়া দেন। যার তাখরিজ, তাসহিহ এবং তাহকিকের কাজ করেছেন ডক্টর বিনতে শাতেয়ী। সুফী আবদুল্লাহর কিতাব النساء المحاربات। [আন নিসাউল মুহারাবাত-সংগ্রামী নারী] এর এক কপি দেন। 'আলকিতাব' পত্রিকার চলতি সংখ্যাটিও হাদিয়া দেন।

দারুল মাআরিফ থেকে শায়খ আহমদ শাকেরের সঙ্গে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের উদ্দেশে রওনা হই। সেখানে মরক্কোর উপর ফ্রান্সের জুলুম-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হবে। সকল ইসলামি দল এবং সংস্থাকে সভায় দাওয়াত করা হয়েছে। এর নেতৃত্বও এসব দল ও সংস্থাই দিচ্ছে।

আমরা সভাপতির কক্ষে প্রবেশ করলাম। সেখানে কায়রোর বড় বড় আলেম, প্রসিদ্ধ নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে মিসরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফ[১],

---

[১] আজহারের বিখ্যাত আলেমদের একজন। ১৮৯০ সালে কায়রোতে তার জন্ম। আল আজহার

শায়খ আবদুল লতিফ দাররাজ, ন্যাশনাল পার্টির সেক্রেটারি ফাতহি রিজওয়ান, সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা প্রফেসর আহমদ হোসাইন এবং প্রফেসর মাহমুদ মুহম্মদ শাকের উল্লেখযোগ্য। এদের ছাড়া অনেকেই আহূত ছিলেন। কিছু প্রস্তাব ও পয়েন্ট লিখে প্রতিবাদসভার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

বিশেষ এই বৈঠকের কয়েকটি দৃশ্য অবতারণার ফলে আমার মনে বড় ব্যথা লেগেছে। কিছু লোক আসা-যাওয়া করছে। কিছু লোক একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বের গল্প জুড়ে দিয়েছে। লাফিয়ে লাফিয়ে একে অপরের সঙ্গে দেখা করছে। অথচ এই সভার উদ্দেশ্য মরক্কোবাসীর ব্যথায় ব্যথিত হওয়া। গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করা। সাম্রাজ্যবাদের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো। দাবি হল দুঃখ, ব্যথা প্রকাশ করা, বেদনা ও মলিনতা দেখানো। সবার মধ্যে গাম্ভীর্য থাকাও এর দাবি। কিন্তু এ দৃশ্য দেখে যেকেউ মনে করবে এটা নিছক আনন্দ-উল্লাসের সভা। এখানে কাউকে মোবারকবাদ জানানো হবে কিংবা কাউকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। শুধু জেনারেল সালেহ হরবকেই মলিন ও পেরেশান দেখি।

আমি শায়খ হাসানাইন মাখলুফের হাত ধরে সভার দিকে এগিয়ে যাই। একজন কারীর সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কারীর তেলাওয়াত করা আয়াতের নির্বাচন স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী সুন্দর হয়েছে। আয়াতগুলো সুরা হজের।

اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ.

'আল্লাহ রক্ষা করেন মুমিনদেরকে, তিনি কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল। কারণ তারা নিপীড়িত। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম'। [সুরা হজ, ৩৮, ৩৯ আয়াত]

ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করে সেখানেই তিনি অধ্যাপনা করেন। ১৯১৬ সালে শরিয়াহ আদালতের বিচারক নিযুক্ত হন। দীর্ঘ দিন আজহারের ফতোয়া বিভাগের প্রধানও ছিলেন। ১৯৮৩ সালে বর্ণাঢ্য দীনী খেদমতের জন্য বাদশা ফয়সাল তাকে পুরস্কৃত করেন। ১৯৯০ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

তেলাওয়াতের সময় পুরো মজলিস নিশ্চুপ হয়ে যায়। তারপর কর্নেল মাহমুদ লাবিব সামনে এসে বলেন, আমাদের আশা আপনারা ইখওয়ানদের শ্লোগান 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' লাগাবেন না। কারণ এই সভা শুধু ইখওয়ানদের না। এতে ইসলামি সকল দল অংশগ্রহণ করেছে। আমি চাই ফ্রান্সের এ কথা বলার সুযোগ না থাকুক যে, এটা তো কেবল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সভা।

এর কিছুক্ষণ পর ইখওয়ান সদস্যরা 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' শ্লোগান লাগাতে থাকে। ফলে অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তখন জেনারেল মুহম্মদ সালেহ হরব উঠে আবেগের সঙ্গে কিছু কথা বলেন। কথা বলার সময় দুঃখ ও ব্যথায় তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে থাকে। অনুষ্ঠানের সম্মান ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তিনি ইখওয়ান সদস্যদের প্রশংসা করেন। তারপর বলেন, আমি নিজে এই শ্লোগান পছন্দ করি। কিন্তু তা এখন না বলাই কল্যাণকর। কারণ এতে অনুষ্ঠানটির উপর ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লেবেল লেগে যাবে। জেনারেল সালেহ হরবের পর সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান প্রফেসর আহমদ হোসাইন বক্তব্য দেন। তারপর সাইয়েদ কুতুব এসে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের সাহিত্যমানসমৃদ্ধ। এ দেশে ঘাপটি মেরে থাকা ফ্রান্সের সমর্থক নেতাদেরকে সম্বোধন করেন তিনি। উন্মোচন করেন তাদের মুখোশ। এসব লোক দিবারাত্রি ফ্রান্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে।

এদের অন্তরে গেথে আছে ফ্রান্সের বড়ত্ব ও মহত্ব। সেদেশকে তারা মনে করে নির্দোষ নিরপরাধ। সর্বদা বুলি আওড়াতে থাকে সেদেশের প্রেম ও ভালবাসার। তারপর তিনি পাঠ্যসূচি থেকে সেসব বই বাদ দেওয়ার প্রস্তাব পেশ করেন যেগুলোতে ফ্রান্সের বিপ্লব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেসব বইয়ে ফ্রান্সের চিন্তা, স্বাধীনতা ও সাম্যবাদের প্রভাব পড়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এর পরিবর্তে সেখানে এমন কিছু বই অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন যাতে ফ্রান্সের আগ্রাসনের তারিখ উল্লেখ থাকবে। উল্লেখ থাকবে ফরাশি উপনিবেশবাদের কথা। তার বক্তব্যের মাঝেমধ্যে শ্লোগানের ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। জোরেশোরে তালি বাজতে থাকে। ফলে সাইয়েদ কুতুবের আওয়াজও মাঝেমধ্যে থেমে যায়। কিছুক্ষণ তারা এই শ্লোগানও দেয়, 'নির্লজ্জ জালেম ফ্রান্স মুরদাবাদ মুরদাবাদ'।

সাইয়েদ কুতুবের পর প্রফেসর ফাতহি রিজওয়ান আলোচনা করেন। তিনি মিসরের বড় বড় আইনজীবী ও বিখ্যাত বক্তাদের একজন। তারপর শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী আলোচনা করেন। তিনি ইখওয়ান সদস্যদেরকে শ্লোগান লাগাতে নিষেধ করেন। তারপর বলেন, আমরা এখন জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে রয়েছি। আর হাদিসে এসেছে, অন্য কারো ঘরে বা এরিয়ায় নেতৃত্ব করা ঠিক না। এ কথা শুনে ইখওয়ান সদস্যরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। শায়খের মেধার প্রখরতা, স্থান-কাল-পাত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলার যোগ্যতা এবং ইখওয়ানদের তার কথা অনুসরণের জজবা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। জেনারেল মুহম্মদ সালেহ হরব কয়েকবার উঠে অত্যন্ত আবেগ নিয়ে কথা বলেন। তার কথার বিরাট প্রভাব পড়েছে। তিনি প্রাচ্যের মুসলমান এবং ইসলামি উম্মাহর অনভিজ্ঞতা ও দুর্বল দিকগুলো আলোচনায় আনেন। তাদের ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ ও নিশ্চিন্ততার উপর আফসোস প্রকাশ করেন, যা মুসলমানদেরকে আপদ-বিপদে ধৈর্যধারণ করা এবং নিজেদের মান-সম্মান ও স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে বাধাগ্রস্ত করবে। তাদেরকে ঠেলে দিবে সমূহ হুমকির মুখে। তারপর তিনি তুর্কি সেনাদের আবেগ-স্পৃহা, বীরত্ব ও বাহাদুরিকে উপমা হিসেবে তুলে ধরেন।

জেনারেল সালেহ হরবের পর প্রফেসর মাহমুদ শাকের[১] প্রস্তাবনা পড়ে শোনান। যখন তিনি 'জাতিসংঘে'র নাম উচ্চারণ করেন তখন লোকজন উত্তেজিত হয়ে ওঠে। জাতিসংঘ সম্পর্কে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। এই পরিস্থিতি দেখে জেনারেল সালেহ হরব উঠে দাঁড়ান। এই শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আসলে বিষয়টি শুধু মরক্কোবাসিই নয় বরং এটা সমস্ত আরব ও মুসলিমজাতির বিষয়। এ কথা শুনে সকলে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কর্মসূচির মধ্যে এটাও ছিল যে, ফ্রান্স এবং সাম্রাজ্যবাদের অনুগত সরকারসমূহের সেনাবাহিনীতে চাকুরি করা সম্পর্কে বড় বড় আলেমের কাছ থেকে হারামের ফাতওয়া নেওয়া হবে। এই প্রস্তাবে সবাই খুশি হয়। আত্মপ্রশান্তি লাভ করে। প্রস্তাবটি আনা হয়েছে এমন

---

[১] মিসরি সাহিত্যিক। তাঁর বংশধারা হযরত হোসাইন রা. পর্যন্ত পৌঁছে। ১৯০৯ সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় তার জন্ম। মৃত্যু ১৯৯৭ সালে।

এক দুশমনের বিরুদ্ধে, যার ভরসা করতে হয় প্রতি বস্তুর উপর, যে শুধু রাজনৈতিক সাফল্য, ব্যর্থতা ও আশংকার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

আরববিশ্বে এজাতীয় সভা আমি এ-ই প্রথম দেখি। এটি আমার সেসব সভা-সমিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যা ভারতের খেলাফত ও স্বাধীনতা আন্দোলনের যৌবনে সংঘটিত হত। আরবের এই সভা আমার শিরাতন্ত্রীতে আলোড়ন ও আন্দোলন সৃষ্টি করে। অনুভূতিকে আলোড়িত করে। যখন আমি ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ এবং মুসলমানদের উপর তাদের জুলুম-নির্যাতনের সংবাদ শুনি তখন ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে আমার শরীরের পশম দাঁড়িয়ে যায়। এর কারণ আমার বেড়ে ওঠা হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যৌবনে, দীনী জজবা ও অনুপ্রেরণার মাঝে।

৬ মার্চ ১৯৫১

আজ সারাদিন একটি বিষয়ের উপর লেখালেখিতে ব্যস্ত ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল বিষয়টি ইখওয়ানদের সামনে পেশ করব। আমার মতামত তাদের সামনে তুলে ধরব। আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যথা ও জ্বালা প্রকাশ করব। তারপর এমন কতকগুলো বিষয়ের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা সবার জন্যই অত্যন্ত জরুরি, এই বিষয়গুলোর উপর ইখওয়ানদেরও গুরুত্ব দেওয়া উচিত। প্রবন্ধটি আজ আমাকে এবং আমার চিন্তাকে ব্যস্ত রেখেছে। এর থেকে বের হয়ে অন্য কোনো কাজ করার সুযোগ দেয়নি।

মুহম্মদ রাশাদ আবদুল মুত্তালিব আমাদের নিকট কিছুক্ষণ বসে ছিলেন। সন্ধ্যার সময় তার বাসায় আমাদেরকে দাওয়াত দেন। আমরা তার বাসায় যাওয়ার ওয়াদা দিই। তার কাছ থেকে ঠিকানাও নিয়ে রাখি। রাতেও লেখালেখি ও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকি।

জেনারেল সালেহ্ হরবের সঙ্গে আলোচনা

৭ মার্চ ২০১১

গত রবিবার নির্ধারণ করা কর্মসূচি অনুযায়ী আজ সকাল সাড়ে নটায় আমরা জেনারেল মুহম্মদ সালেহ্ হরব পাশার নিকট যাই। মিসরের ইলমি ও দীনী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তার সঙ্গে ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়। তিনি মিসরি আলেমদের দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ততার, ইলম ও দীনের খেদমতের প্রতি

তাদের নিরুৎসাহতার এবং আল্লাহ ও তার দীনের ব্যাপারে কারো সঙ্গে রাগ করার মানসিকতা না থাকার কারণে তাদের সমালোচনা করেন। আমি ভারত-বিভক্ত হওয়ার পর সেখানকার মুসলমানদের গণহত্যা ও নিরাশা নিয়ে আলোচনা করি। দীনের ব্যাপারে তাদের অধোগতি এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের কথা জানাই। তারপর দীনের সেসব দায়ীর বর্ণনা দিই, যারা বিভিন্ন ধরনের খেদমত আন্জাম দিয়েছেন। সঠিক ইসলামি দাওয়াতের ময়দানে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে একনিষ্ঠতার সঙ্গে কাজ করেছেন। দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার যেভাবে মোকাবেলা করেছেন এবং যেভাবে মুসলমানদেরকে আশ্বস্ত করেছেন, সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক করার ক্ষেত্রে যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন তারও বর্ণনা দিই। তাদের এই প্রয়াসে মুসলমানদের হৃদয়ে ও চরিত্রে যে অভাবনীয় প্রভাব পড়েছে তা ভালো করে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করি।

আমার এই আলোচনা জেনারেল পাশার দারুণ পছন্দ হয়েছে। তিনি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, হায়! এ ধরনের উদ্দীপনা যদি মিসরের আলেমসমাজ ও আজহারের লোকদের মাঝে পাওয়া যেত! আমি তাকে বললাম, আমার অভিপ্রায় আপনি আজহারের বড় বড় আলেম, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ অথবা আপনি যাদের মধ্যে উন্নত চিন্তা-চেতনা ও কর্মোদ্দীপনা রয়েছে বলে মনে করেন, তাদের একত্র করবেন। বর্তমান যুগে দীন ও ইলম যেসব আশঙ্কার সম্মুখীন আমি তা তাদের সামনে তুলে ধরব। আমার নিকট এর জন্য যেই সমাধান আছে তা পেশ করব। এসব শঙ্কা দূর করার এবং নতুন দীনী আন্দোলন পরিচালনার পদ্ধতি বর্ণনা করব। তিনি আমার এই চিন্তার সঙ্গে একমত পোষণ করেন। এর প্রশংসাও করেন। জনাব হরব পাশা শায়খ হাসানাইন মাখলুফের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তিনি সন্ধ্যায় আসার ওয়াদা করেছেন।

এই মজলিসেই 'শুব্বানুল মুসলিমিন' পত্রিকার সম্পাদক, জমিয়তের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর ইয়াহয়া আহমদ দারদিরীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি তার লেখা কয়েকটি বই আমাদের উপহার দেন। জোহরের সময় জনাব সবরী আবেদিন আমাদের নিকট আসেন। একেবারে সাধারণ ও সাদাসিধে খাবারে অংশগ্রহণ করে তিনি আমাদেরকে ধন্য করেন। তিনি এমন কিছু ঘটনা শোনান যেগুলো দ্বারা আজহারের পুরনো চিত্র আমাদের

সামনে এসে যায়। তখনকার আলেমগণের দুনিয়াবিমুখতা, আত্মসম্মানবোধ, অল্পতুষ্টি, প্রবৃত্তিপূজা থেকে দূরে থাকা, তাদের আমানতদারি, গাম্ভীর্য, উৎকর্ষ লাভের নকশা আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে।

জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের ভবনে

মাগরিবের পর আমরা 'জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের' ভবনে উপস্থিত হই। জেনারেল সালেহ হরব পাশার নিকট তখন শায়খ আবদুল লতিফ দাররাজ, মাহমুদ শাকেরসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রধান প্রফেসর আহমদ হোসাইন, শায়খ মুহম্মদ মাখলুফ, শায়খ আহমদ শিরবাসীও আসেন। মিটিঙে সিদ্ধান্তকৃত প্রস্তাবসমূহকে বাস্তবায়ন করার জন্য তারা কমিটি গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তারপর জেনারেল সালেহ হরব আমার প্রতি মনোনিবেশ করেন। আমরা উভয়ে পৃথক হয়ে আলোচনা করি। জেনারেল সালেহ আমাকে জানান যে, তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের একটি লিস্ট তৈরি করেছেন। লিস্টে আজহারের বড় বড় আলেমগণও রয়েছেন। তাদেরকে আমার সম্মানার্থে জমিয়তের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত চা-চক্রে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এই সম্মানের কারণে আমি তার শোকরিয়া আদায় করি।

প্রফেসর মাহমুদ শাকেরের সঙ্গে

প্রফেসর মাহমুদ মুহম্মদ শাকেরের অধ্যয়ন ও গবেষণা সম্পর্কে আগে থেকেই আমার মোটামুটি জানাশোনা ছিল। সে হিসেবে আমার আগ্রহ ছিল তার সঙ্গে দেখা করার। আমার লেখা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি তাকে দিই। আল্লাহ তায়ালা আমার আশা পূর্ণ করেছেন। জমিয়তের এই ভবনেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তিনি উদার মনে আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। অত্যন্ত আন্তরিকতা নিয়ে আমার সাথে মিশেন। জনাব শাকের জানান যে, 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' আগেই পড়েছেন। বইটির 'বর্বর যুগ' পরিচ্ছেদটি তার খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমি ভিন্ন একটি গ্রন্থ রচনা করব।

আমার তুরস্ক সফরের ইচ্ছা জানতে পেরে তিনি আমাকে মিসর দূতাবাসের হাইকমিশনার প্রফেসর ইয়াহয়া হাক্কীর সঙ্গে সাক্ষাতের

দাওয়াত দেন। ইয়াহয়া হাক্কী তখন তার মেহমান ছিলেন। মাহমুদ শাকের বলেন, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে আপনাকে ফোনে জানাব। জনাব মাহমুদ শাকেরের মধ্যে পুরোপুরি দীনী রঙ, ইলমের ব্যাপকতা ও প্রখর মেধা দেখতে পাই। তার সঙ্গে দেখা করতে পারায় আমি দারুণ আনন্দিত হই।

শায়খ হাসানাইন মাখলুফ

এমনিভাবে শায়খ হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফের সঙ্গেও হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। আমরা জুমার দিন হোলওয়ানে তার সঙ্গে সাক্ষাত এবং খানা খাওয়ার প্রোগ্রাম করেছিলাম। কিন্তু এই দিন আরও কিছু প্রোগ্রামের ব্যস্ত তা ছিল। তাই হোলওয়ানের প্রোগ্রামের তারিখ পরিবর্তন হয়ে যায়। এই জন্য তার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করি। তবে তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে যে আমার আগ্রহ রয়েছে সে কথা প্রকাশ করতে ভুল করিনি। আসলে তিনি আমার পছন্দসই ব্যক্তিদের একজন। তার ইলমি যোগ্যতা, গাম্ভীর্য ও সুন্দর আচার-ব্যবহার আমার দৃষ্টি কেড়েছে। তার কাছে আমি আরজ করেছি যে, সাক্ষাতের জন্য আপনিই একটা সময় নির্ধারণ করে দিন। নিকটবর্তী দিনগুলোতে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আগে থেকেই নির্ধারিত থাকার দরুন আমরা কোনো সময় বের করতে পারিনি। তবে অচিরেই তার সঙ্গে দেখা করার একটা সময় নির্ধারণ করে নিব, ইনশাআল্লাহ।

বাসায় এসে দেখি আবদুল ওহ্হাব বান্না ও প্রফেসর আলি আদলি মুরশিদী আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। উভয় হযরতই কিছুক্ষণ বসেন। আমরা দাওয়াত এবং তার কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি। তারা উভয়ে শুক্রবার সকালে এখানে এসে নাশতা করার ওয়াদা করেন।

৮ মার্চ ২০১১

সারাদিন সেই প্রবন্ধটি তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকি, যা ইখওয়ান নেতা-কর্মীদের পড়ে শোনানোর কথা ছিল। চিন্তা তো করি খুব দ্রুত। কিন্তু কলম চলে একেবারে ধীরে। তাই রচনা সম্পন্ন করতে অনেক সময় লেগে যায়। এখনো প্রবন্ধটি চূড়ান্ত করতে পারিনি।

সন্ধ্যা পাঁচটায় বন্ধুবর মুহম্মদ রাশাদ আবদুল মুত্তালিবের বাসায় যাই। মাগরিবের পর পর্যন্ত তার নিকটেই থাকি। তার লাইব্রেরিতে 'সিরাতে

ইবনে হিশাম', 'তারিখে তাবারী' দেখি। যে প্রবন্ধটি আমি তৈরি করছি তার জন্য কিতাব দুটো থেকে কিছু জরুরি বিষয় সংগ্রহ করি।

৯ মার্চ ১৯৫১

মসজিদে মুয়াইয়িদে জুমার নামাজ আদায় করি। মসজিদটি আমাদের বাসার একেবারে কাছে। এমন এক মসজিদে আমার নামাজ আদায় করার ইচ্ছা ছিল, যার পরিবেশ হবে খুব শান্ত। হৈ-হুল্লোড়মুক্ত। এই মসজিদে উচ্চ আওয়াজে সুরেলা কণ্ঠে সুরা কাহফের তেলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো অপছন্দনীয় বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। সুরা কাহফের তেলাওয়াত ইখওয়ানের মসজিদসমূহ ছাড়া মিসরের অন্যান্য মসজিদে এটা একটা প্রথা হিসেবে চলে আসছে। মুয়াজ্জিনকে ইমাম থেকে অল্প দূরত্বে কাঠের একটি ছোট্ট চৌকিতে বসে থাকতে দেখি। তিনি দুই খুতবার মাঝে কী এক ওয়াজিফা পড়লেন। আমাদের বুঝে আসেনি।

জমিয়তে মাকারিমুল আখলাক

আমরা হাজি জালাল হোসাইনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য জমিয়তে মাকারিমুল আখলাকের অফিসে যাই। তিনি তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব এবং বিভিন্ন ইসলামি দলের কর্মকর্তাদেরকে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য দাওয়াত দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আমি তাদের সামনে পাক-ভারতের দীনী দাওয়াতের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

চা বিরতির পর আমার আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার শিরোনাম ছিল 'বর্তমান যুগে মুসলমানদের পয়গাম'[১]।

ওলামায়ে কেরাম এবং বিভিন্ন দীনী সংস্থার প্রধানদের সঙ্গে

এই অনুষ্ঠানে 'শাবাব সাইয়েদিনা মুহম্মদ'র সেক্রেটারি প্রফেসর হোসাইন ইউসুফ এবং তার সঙ্গী প্রফেসর আবদুল ওহ্হাব, 'আশিরায়ে মুহম্মদিয়া'র প্রধান প্রফেসর জাকি ইবরাহিম, 'জমিয়তে শুব্বানুল

---

[১] رسالة المسلمين في هذا العصر

মুসলিমিনে'র মহাপরিচালক জেনারেল মুহম্মদ সালেহ্ হরব পাশা, শায়খ আহমদ শিরবাসী, উপস্থিত কবিতা বলতে সক্ষম কবি সাবি শা'লান, বোখারার প্রবীণ আলেম ও নেতা সাইয়েদ মুবাশশির তারাজীসহ 'জমিয়তে মাকারিমুল আখলাক'র বহু নেতাকর্মীই অংশগ্রহণ করেছেন। কবি সাবি শা'লান ভারত উপমহাদেশের আলেমদের গুণগান ও ইলমি বিভিন্ন কীর্তি ও অবদান আলোচনা করতে থাকেন। ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল, সাইয়েদ সুলায়মান নদবী ও আল্লামা শিবলী নোমানীর কথা বারবার উল্লেখ করেন। এসব ব্যক্তিত্বের কিতাব অধ্যয়নে যে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় তা প্রকাশ করেন। তাদের ব্যাপারে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখা ও প্রবন্ধ সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

শায়খ জালাল হোসাইন অনুষ্ঠান শুরু করতে গিয়ে উপস্থিতিদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর পাক-ভারতের তাবলিগ জামাতের আলোচনা করেন। আমাদের এই কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার দরুন একে মিসরে الدعوة الندوية [দাওয়াতে নদবী] বলা হয়। কারণ আমাদের নামে নদবী শব্দ যুক্ত থাকে, যা 'নদওয়াতুল ওলামা'র সঙ্গে সম্পৃক্ততাকে প্রকাশ করে। তিনি এই দাওয়াতের সঙ্গে নিজের গভীর সম্পর্ক এবং পাক-ভারতের কিছু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাতের কথা তুলে ধরেন। তার আলোচনার পর আমরা চা-চক্রে অংশগ্রহণ করি। চা-বিরতির পর আমি আলোচনা শুরু করি। প্রথমে বলি, পাক-ভারত আরববিশ্বকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার এই উঁচু স্তরে কখনোই ছিল না। এখনো নেই। বিশেষ করে মিসরকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার। তার কারণ এ দেশে ইলম ও দীনী আন্দোলন এখন ভর যৌবন অতিক্রম করছে। কিন্তু এই শেষ যুগে কিছু অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাক-ভারতের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে। এসব অবস্থা ও ঘটনা পাক-ভারতের দীনী আন্দোলন এই দ্বিতীয় প্রজন্মের মধ্যে এক নতুন চিন্তার দিগন্ত খুলেছে। যার ফলে পাক-ভারত অনেক লাভবান হয়েছে। সে দেশের মানুষের এক নতুন নেজাম ও পদ্ধতি গ্রহণের তাওফিক হয়েছে। এই পদ্ধতিটি যেকোনো মুসলিদেশে কার্যকর করার উপযুক্ত।

পাক-ভারত ও আরব দেশগুলোর উপমা

পাক-ভারত ও আরবদেশগুলোর উপমা এমন দুই শিশুর ন্যায়, যাদের একজন পিতা-মাতার ছত্রচ্ছায়া ও স্নেহ-ভালবাসায় লালিত-পালিত হয়। আরাম-আয়েশ ও নাজ-নেয়ামতের মধ্যেই যৌবনে পদার্পণ করে। জীবনে থাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা। অতিরিক্ত কোনো চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন পড়ে না। প্রশান্ত হৃদয়ে সে বেড়ে ওঠে। এটি সেসব দেশের উদাহরণ যেগুলোতে স্বাধীন সরকার রয়েছে।

দ্বিতীয় শিশু, যে একেবারে নিঃস্ব, যার কোনো সহায়-সম্বল নেই। নেই পিতা-মাতার রেখে যাওয়া কোনো সম্পদ। স্বভাবগতভাবেই সে বাধ্য হয় বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলার জন্য এমনভাবে চেষ্টা-তদবির করতে এবং নিজের ইচ্ছা শক্তির বলে জীবনের এই ময়দানে নতুন কোনো পথ সৃষ্টি করতে, যা ধনিকশ্রেণীর লোকজন ও রাজা-বাদশাদের সন্তানদের করতে হয় না। এই দৃষ্টান্ত পাক-ভারতের। এখন যদি ভারতবর্ষে দীনের উন্নতি সাধন ও ইসলামি আন্দোলন গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে এমন কোনো জিনিস পরিলক্ষিত হয়, যা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যা সম্মান ও অনুসরণের যোগ্যতা রাখে তা হলে তার কারণ এটাই। তারপর আমি সেসব কারণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি, যা হিন্দুস্তানকে দীনী দাওয়াত সম্পর্কে ফিকির করতে বাধ্য করেছে, যেসব কারণ পাক-ভারতকে দিয়েছে নতুন মাত্রা ও অভিজ্ঞতা।

কিছু ভিন্ন ও অভিন্ন বিষয়

তারপর আমি এই দীনী দাওয়াতের উৎকর্ষের মূল ভিত্তি ও প্রাথমিক জিনিসগুলো আলোচনা করি। মুসলিম ও আরববিশ্বের ইসলাহি দাওয়াত এবং দাওয়াতের মধ্যে যেসব বিষয় অভিন্ন অথবা যেসব বিষয়ে উভয় দাওয়াতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করি। যেসব বিষয় উভয় দাওয়াতের মধ্যে সমানভাবে রয়েছে তাও বিস্তারিত আলোচনা করি।

মোটকথা যেসব দিক দিয়ে পাক-ভারতের দীনী দাওয়াত অনন্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর রাখে তা তাদের সামনে তুলে ধরি। যেমন মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা, অন্যান্য কাজের পূর্বে এই দাওয়াতের ফিকিরকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং কারো জন্য অপেক্ষা ও

বিলম্ব করা ব্যতীত নিজেই সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইসলামের প্রথম যুগের দায়ীদের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দেওয়া।

আলোচনা চলাকালীন মাগরিবের নামাজের আজান-ধ্বনি ভেসে আসে। এ সময়ও আমি আলোচনা অব্যাহত রাখি। বয়ানের বাকি অংশ আগামী মঙ্গলবার 'জমিয়তে শুব্বানু মুসলিমিনে' বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের কর্মকর্তাদের সামনে পেশ করার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর আমরা নামাজের জন্য উঠে যাই।

বর্তমান যুগে মুসলমানদের পয়গাম

মাগরিবের পর কবি সাবি শালান বললেন, ৯ মার্চ মিসরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই দিন মিসরের তিন ব্যক্তি ইংরেজদেরকে এ দেশ থেকে বিতাড়ন এবং মিসরের স্বাধীনতা অর্জনের দাবি তোলেন। এটি মিসরের জাতীয় দিবস। কিন্তু এই ঐতিহাসিক দিবসের কথা মানুষ বেমালুম ভুলে গেছে। এটি একটি অনুল্লেখযোগ্য দিনে পরিণত হয়েছে। তবে আমরা এ কারণে আনন্দিত যে, মাকারিমুল আখলাক সংস্থার কার্যক্রম এবং তার নয়া যুগের সূচনা আমরা এই মোবারক দিন থেকে করতে যাচ্ছি। আমাদের মনোবাসনা যে, আজকের এই মোবারক দিনে আমাদের কার্যক্রম আপনার প্রবন্ধের মাধ্যমে শুরু করব। তারপর তিনি দীনী দাওয়াত, পাকিস্তানের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক, সেখানকার কর্মতৎপরতা এবং এর ফলাফল নিয়ে আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। আমাকে আলোচনা শুরু করতে আবেদন জানানো হয়। আমি যে আলোচনা করি তার সারমর্ম হল, মানুষের জীবনের দুটি দিক রয়েছে। একটি তার স্বভাবজাত ও জন্মগত দিক। এ দিক প্রতিটি মানুষেরই রয়েছে। এর দাবি ও চাহিদা হল খাওয়া, পান করা, অর্থোপার্জন করা, রোগ হলে চিকিৎসা করা। এ ছাড়া মানুষের স্বভাবের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও বিভিন্ন বিষয় রয়েছে।

দ্বিতীয় হল ঈমানের দিক। এ দিকের দাবি ও পয়গাম হল মানুষ তার স্রষ্টা থেকে আহকাম নিবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে। মানুষ জানবে, কোনটি হালাল, কোনটি হারাম এবং কোথা থেকে সে রুজি-রোজগার করবে। সে জানবে, উপার্জন এবং সম্পদ জমা করার শরিয়াহ বিধান কী? সেই পদ্ধতিগুলি কী যা গ্রহণ করা নিষেধ? এই জীবনের উদ্দেশ্য কী?

পৃথিবীর শেষ পরিণাম কী হবে? কোন কাজে আল্লাহ তায়ালা খুশি হন আর কোন কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হন? নবী-রাসুলগণ জীবনের প্রথম দিক বর্ণনা করার জন্য প্রেরিত হননি। এসবকিছু মানুষ তার স্বভাবজাত যোগ্যতা বলে জেনে নেয়। তবে পশু-পাখি এর ব্যতিক্রম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاَوْحىٰ رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا

'আপনার প্রভু মৌমাছিকে বুঝিয়েছেন যে, তুমি পাহাড়-পর্বতে ঘর বানিয়ে নাও।' [সুরা নাহল, ৬৮ আয়াত]

নবীগণ স্বভাবজাত বিষয়ে মানুষকে তৎপর এবং এর প্রতি তাদেরকে মনোযোগী করার জন্য আসেননি। পৃথিবী ঈমানের উপর স্বভাবগত বিষয়ের প্রাধান্য লাভকে বরাবর সহ্য করে আসছে। স্বভাবগত বিষয়াবলি উত্তরোত্তর ব্যাপকতা লাভ করছে। এই দিকটির প্রবৃদ্ধির কারণে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি। তাদেরকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে অনেক বালা-মসিবতের। এ কারণেই পৃথিবীতে বড় বড় ভূমিকম্প ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন দ্বিতীয় দিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষ করার জন্য। প্রেরিত হয়েছেন এই উভয় দিকের মাঝে সঠিক সমতা বিধান করার জন্য।

আপনারা যদি মুসলমানদের পয়গাম সম্পর্কে জানতে চান, তা হলে সেই জামানার উপর দৃষ্টি ফেরান, তার একটি হিসাব নিন, যে জামানায় রাসুল সা. কে প্রেরণ করা হয়েছে। তারপর সে সময়ের মানুষের জীবনাচার সম্পর্কে অবহিত হোন। যদি আপনাদের যোগ-বিয়োগে এ কথা বেরিয়ে আসে যে, তখনকার মানুষের জীবন চলায় প্রথম দিকটি পরিপূর্ণরূপে ছিল, এমনকি এটি ঈমানের উপর ছেয়ে গিয়েছিল, একপর্যায়ে ঈমানি দিকের সমাপ্তি ঘটিয়ে মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, তারপর রাসুল সা. এসে এই ঈমানি দিকটি নতুনভাবে সংস্কার করেছেন, একে প্রাণবন্ত ও সজীব করে তুলেছেন, এদিকে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন; যার ফলে এক নতুন জেনারেশনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, যারা মানুষকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করে, এদিকের প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে তাদের মনোযোগ, তা হলে জেনে নিন এটিই মুসলমানদের সর্বকালীন পয়গাম। এযুগেরও পয়গাম। বদরযুদ্ধের সময় রাসুল সা. মুসলমানদের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া ও

সুপারিশ করতে গিয়ে এইদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। اللهم ان تهلك هذه العصابة لم تعبد হে আল্লাহ, এই ছোট্ট জামাতকে যদি আপনি ধ্বংস করে দেন, তা হলে আর কখনো আপনার ইবাদত হবে না। এই দোয়ায় তিনি সেই মাকসাদ বর্ণনা করে দিয়েছেন, যার জন্য মুসলিমজাতি অস্তিত্বে এসেছে, যা তাদের আত্মদানের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

ওলামায়ে হিন্দের মর্যাদার স্বীকৃতি

এই আলোচনা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে। অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, পুরো দুই ঘণ্টা পর্যন্ত আলোচনা হয়। কিন্তু এত সময় কোন দিক দিয়ে যে গেছে তা আমি ঘূণাক্ষরেও টের পাইনি। আমার পর কবি সাবি শালান মঞ্চে আসেন। আমার বয়ানের তিনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। পাক-ভারতের প্রশংসা করেন। ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল ও সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর গুণ-কীর্তন করেন। তারপর বলেন, সাইয়েদ সাহেবের 'সিরাতুন নবী' মুসলিমবিশ্বে এ যাবৎকালে লেখা সিরাতের সবচেয়ে বড় কিতাব। এরপর তিনি আগামী দিনের পরিণাম সম্পর্কে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেন। তবে তার কবিতায় অসাধারণ কোনো কিছু ছিল না। তারপর প্রফেসর আহমদ শিরবাসী আসেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থার উপর জোরালো বক্তব্য দেন। তার বক্তব্যে সাহিত্যের মান ও মাত্রা বেশি ছিল। তারপর আমাদের বন্ধু আহমদ উসমানের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রফেসর আবদুল আজিজের সঙ্গে

১০ মার্চ ১৯৫১

সকাল নয়টায় আমাদের বন্ধু আবদুল্লাহ আকিলের সঙ্গে প্রফেসর আবদুল আজিজ কামেলের সাক্ষাত লাভের উদ্দেশ্যে শিবরা যাই। তার সঙ্গে দেখা করার আমার খুব আগ্রহ ছিল। তার সম্পর্কে আমি বারবার তথ্য নিতে থাকি। একবার শোনলাম তিনি সুদান চলে গেছেন। আরেকবার সংবাদ পেলাম তিনি 'শাবিনুল কওম' এলাকায় 'শিক্ষক প্রশিক্ষণ স্কুলে' পড়াচ্ছেন। এভাবে তার ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের খবর পেতে থাকি। একপর্যায়ে আবদুল্লাহ আকিল তার সঙ্গে দেখা করার জন্য আজকের এ সময় নির্ধারণ করে ফেলেন। আমরা বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে

দেখা করি। দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলতে থাকে। আলোচনায় ভারতের দাওয়াতি নেজাম ও তরবিয়তও স্থান পায়। এমন কিছু গ্রন্থ রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও কথা হয়, যা হবে ইসলামি চিন্তা-চেতনার দিশারী। হবে ইসলামি জীবনব্যবস্থার মুখপত্র। পাক-ভারতের ইসলামি চিন্তাবিদ এবং মিসরের আলেমদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়। তখন ইসলামি তাহজিব-তামাদ্দুন ও ইলমি বিভিন্ন বিষয়ে এই দুই দেশের মাঝে মতবিনিময়ের কথাও ওঠে।

ড. ইকবালের ব্যক্তিত্ব, তার ইসলামি চেতনাবোধ এবং কাব্য সমগ্রের মাঝে তিনি যে পয়গাম রেখে গেছেন, সে সম্পর্কে মিসরিদের অজ্ঞতার কারণে আফসোস করেন। আমি বললাম, ইকবালের পয়গাম এবং তার কবিতা সম্পর্কে দারুল উলুমের সাহিত্য অনুষদে আমি আলোচনা করতে প্রস্তুত। তিনি আমার এই বক্তব্যের জন্য দারুল উলুমকে প্রাধান্য দিলেন। তারপর আমার বই 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বইটি ইখওয়ানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই গ্রন্থে যেভাবে ইউরোপের চারিত্রিক ইতিহাস ও তার উন্নতির কথা এবং গ্রিক ও রোমানদের চারিত্রিক প্রভাবের কথা বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি একমত পোষণ করেন। এরপর বলেন, বইটি ইউরোপের বর্তমান অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে।

আমাদের এই বৈঠকটি দীর্ঘ সময় অব্যাহত ছিল। আলোচনাও কোনো এক বিষয়ে সীমাবদ্ধ ছিল না। আলোচনায় বোঝতে পারলাম জনাব আবদুল আজিজ একজন উচ্চ শিক্ষিত ঈমানদার লোক। গাম্ভীর্যসহ, স্বভাবজাত বহু যোগ্যতা তার মাঝে পরিপূর্ণরূপে রয়েছে। যেসব শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছি তাদের মধ্যে তাকেই শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে। আধুনিক ইউনিভার্সিটিগুলো যেসব ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছে সর্বদিক মিলিয়ে তাদের মধ্যে তিনিই সবার উপরে। এখন তিনি শাবিনুল কওম এলাকার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। পাশাপাশি ভূগোলে পিএইচ,ডি করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাকে ইখওয়ানদের প্রশিক্ষক মনে করা হয়। আমরা তার কাছে বিদায় চাইলাম। তিনি আমাদেরকে তার বাসায় মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করা ছাড়া আসতে দিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। আমরা তার মনোরঞ্জনের জন্য থেকে যাই।

তিনি আমাদেরকে তার অধ্যয়ন ও লেখালেখির বিশেষ রুমে নিয়ে যান। আমরা সেখানে পড়াশোনা আর লেখালেখির মধ্য দিয়ে বাকি সময়টা অতিবাহিত করি। জোহরের পর খাবারে অংশগ্রহণ করি। তারপর আমরা আমাদের বাসার উদ্দেশে রওনা হই। তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুদূর আসেন। তারপর তিনি অন্য দিকে চলে যান। সম্ভবত অন্য কারো সঙ্গে তার দেখা করার কথা ছিল। আমাদের ফেরার পথে বন্ধুবর আলি মাহমুদ শরিফের দোকান পড়ে। আমরা তার সঙ্গে দেখা করি। তারপর বাসায় চলে আসি।

সন্ধ্যা ৭টায় আমরা ইয়াসিন শরিফের সঙ্গে আজহারের উসুলুদ্দীন অনুষদে দর্শনের প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ মুসার সাক্ষাত লাভের আশায় জিজাস্থ বাদশা মুজাফ্‌ফর রোডে যাই। ড. ইউসুফ মুসা সেসব ব্যক্তিত্বের একজন, যারা আমার বই 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' পড়েছেন এবং বইটিকে পছন্দ করেছেন। আমার ইচ্ছা ছিল তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে কিছু আহরণ করব। এই উদ্দেশ্যেই তার সঙ্গে আমার এই সাক্ষাত। তিনি আমাদের সাথে অত্যন্ত খোলামনে ও হাঁসিমুখে কথা বলেন।

ড. ইউসুফ মুসার সঙ্গে আলোচনা

ডক্টর মুসা আমাকে বললেন, তিনি আমার পুস্তিকা 'শোন হে মিসর' পড়েছেন। পুস্তিকাটির প্রতি তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' সম্পর্কে তিনি বলেন, যেদিন বইটি বাজারে এসেছে সেদিন সকালেই আমি ক্রয় করি। তারপর রাতে ঘুমোনোর পূর্বেই একবার পড়ে শেষ করি। এই জন্য বইটির শুরুর দিকে আমি লিখে রেখেছি, সকালবেলা ক্রয় করেছি, রাতে ঘুমোনোর পূর্বেই পড়ে শেষ করেছি।

তারপর মিসরের শিক্ষানীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, মিসরে দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা সমান্তরালে চলছে। আধুনিক শিক্ষা ও দীনী শিক্ষা। দুই ধারার শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের জন্য অনেক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আমি এই শিক্ষাব্যবস্থার বিপক্ষে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটি 'আলইহরাম' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কিন্তু আজহারের ক্যাম্পাসে

আমার এই লেখাটিকে অসন্তোষ ও বিরোধিতার চোখে দেখা হয়েছে। তবে এখনও আমি আমার সেই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। শিক্ষাব্যবস্থা একমুখী হওয়া উচিত। আর তা হবে ইসলামি সংস্কৃতির মজবুত ভিত্তির উপর। তারপর ডক্টর মুসা এই খেয়ালও পেশ করেন যে, আজহারের বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন আনার সাথে সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ন্যায় সংশোধন করা উচিত। কারণ ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ডও আজহারের মতো ধর্মাশ্রিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আজহারের ন্যায় সেখানেও ছাত্রাবাসের ব্যবস্থাপনা রয়েছে।

আজহারের জন্য ড. মুসার প্রস্তাব

আজহারের উচিত ছিল আধুনিক শিক্ষাকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা। তখন এই সিলেবাসই হত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মূল উৎস। তা হলে আরবদেশে এমন দুই শ্রেণীর লোক তৈরি হত না, যাদের এক শ্রেণীর সঙ্গে অপর শ্রেণীর কোনো যোগাযোগ নেই। কারণ আজহার থেকে যারা দীনী ইলম অর্জন করে বের হয় তাদের মধ্যে রাষ্ট্রপরিচালনার যোগ্যতা থাকে না। অপর দিকে কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকে যারা বের হচ্ছে তারা রাষ্ট্রপরিচালনা করছে ঠিক কিন্তু তাদের মধ্যে দীনের বুঝ নেই। তারপর আমাদের আলোচনা হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আরবি করা যায় কি না সে সম্পর্কে। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে তাও আলোচনায় আসে। ডক্টর মুসা সম্পর্কে জানতে পারলাম। তিনি শিক্ষামন্ত্রণালয়ে চাকুরি করেন। ইতোমধ্যেই শায়খ মুহম্মদ তহা সাকিত আসেন। কিছুক্ষণ পর আমরা তার থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসি।

সোমবার অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে পড়ার জন্য একটি প্রবন্ধ লেখার কথা স্মরণ হয়। প্রবন্ধের বিষয় হবে 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ'। অনুষ্ঠানের এই সুবর্ণ সুযোগে আজহারের ওলামায়ে কেরাম এবং যারা দাওয়াতের কাজে লাব্বায়িক বলেছে তাদের সামনে আমার এই পয়গামটি পেশ করার চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মধ্য রাত পর্যন্ত প্রবন্ধ লেখার কাজে ব্যস্ত থাকি। শরীরে ক্লান্তি আসার পূর্ব পর্যন্ত শুইনি।

আহমদ শিরবাসীর জিজ্ঞাসা

১১ মার্চ ১৯৫১

বেলা নটায় শায়খ আহমদ শিরবাসী এলেন এবং আমার শিক্ষার স্তর, বেড়ে ওঠা এবং জীবনের বিভিন্ন অবস্থা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি এতে সম্মত হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গে নোটও নিচ্ছিলেন। একের পর এক বহুপ্রশ্ন করেন। এমনকি খেলাধুলা, আমার প্রিয়-অপ্রিয় বিষয় ও খাবার, জীবনের কোনো স্মৃতি, যে অসুস্থতা আমার মধ্যে আছে, যেসব ব্যক্তিত্বের দ্বারা আমি প্রভাবিত, যে কিতাবগুলো আমার বেশি পছন্দ এবং মিসরের ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয় জানতে চান। মোটকথা কোনো বিষয় আর বাদ রাখেননি। তখন আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে বলে উঠি–

مَا لِهٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا.

‘এটা কেমন দস্তাবেজ! যাতে সবকিছুরই উল্লেখ আছে। ছোট-বড় কোনোটাকেই ছাড়েনি।’ [সুরা কাহফ, ৩৯ আয়াত]

আমি তার উদ্দেশ্য বুঝিনি। এ জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব তথ্য নিয়ে কী করবেন? তিনি বললেন, কখনও আপনার সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে বা আলোচনা করতে হলে এ তথ্যগুলো আমার সহযোগী হবে। যতক্ষণ বসে ছিলাম তিনি নিজের বাকপটুত্ব, মিষ্ট ও কৌতুকময় **কথা** দিয়ে আমাদেরকে বারবার হাসাতে থাকেন। তিনি এই তথ্য দ্বারা পরবর্তী সময়ে ‘মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো’র ভূমিকায় আমাকে পরিচয় করাতে গিয়ে সাহায্য নিয়েছিলেন।

সাইয়েদ আহমদ লুতফীর সঙ্গে আলোচনা

১২ মার্চ ১৯৫১

শায়খ আহমদ শিরবাসী এসেছেন। আমি একটি প্রবন্ধ তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। প্রবন্ধটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে পাঠ করার জন্য লিখছিলাম। ৩টায় আমরা নয়া মিসরে বাদশা আবদুল আজিজ রোডের উদ্দেশে বের হই। সেখানে মাহমুদ শাকেরের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। জায়গাটা আমাদের থাকার জায়গা থেকে অনেক দূরে। দেখা করার নির্ধারিত সময় ছিল ৪টা।

আমরা সায়িদ রোডগামী ট্রামে উঠে বসি। গন্তব্যস্থলে ৪টার পর গিয়ে পৌঁছুই। তার বন্ধু ইয়াহয়া হাক্কীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বর্তমানে তুরস্কে মিরসীয় দূতাবাসের অ্যাডভাইজার। ঘটনাক্রমে আবদুর রহমান বাদাবীর সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়। তিনি 'ইবরাহিম ইউনিভার্সিটি'র দর্শনের প্রফেসর। আলোচনা করে বোঝতে পারলাম আল্লামা ইকবালের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে তার জানাশোনা আছে। এ ছাড়া তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ এবং এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, যা দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকা লোকদের মধ্যে সাধারণত পাওয়া যায় না। কারণ এর উদ্দেশ্য হল মানুষের রুহ নিয়ে গবেষণা করা এবং দেহ ও জড়বস্তু তার থেকে পৃথক থাকা সম্পর্কে আলোচনা করা। সাধারণত এটা হিন্দু সাধক, বৌদ্ধ সন্ন্যাস ও যোগীদের লেখা ও অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায়। দর্শনের ছাত্ররা ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ এবং আমলি শিক্ষার তুলনায় এসব জিনিস দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই রুহানি ফালসাফার উপর ভারতীয় মুসলমানদের কি কোনো লেখা পাওয়া যায়? অমুক অমুকের মতো এ বিষয়ে তাদের অধ্যয়নও কি ব্যাপক? তিনি এমন কতক ব্যক্তির নাম বললেন যারা ইউরোপে রুহানিয়াতের উপর গ্রন্থ রচনা করেছে। আমি তাকে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনায়রী রহ.[১] ও ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদে আলফেসানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর মাকতুবাত অধ্যয়নের পরামর্শ দিই। তিনি আমার কাছে এই আগ্রহ প্রকাশ করেন, যাতে আমি তাদের লেখা মাকতুবাত সংকলনগুলো সংগ্রহ করে দিই। আমি বললাম, কার্যক্ষেত্রে দর্শনের অবস্থান হল কোনো দেশে অন্য দেশের দূতাবাসের ন্যায়, যা দেশের মানুষের জীবনাচারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে না। সমাজের মানুষের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। দর্শন শুধু একটি চিন্তাগত বিষয়, যা খেয়ালিপনার রাজ্যে বিচরণ করে।

---

[১] আলোকোজ্জ্বল আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব। ৬৬১ হিজরিতে বিহারের মুনায়রে তাঁর জন্ম। আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ দিল্লি থেকে সোনারগাঁও আসার পথে বিহারের মুনায়রে কয়েকদিন অবস্থান করেন। তখন তাঁর ইলমী গভীরতা,ও তাকওয়া দেখে শায়খ শরফুদ্দীন ইয়াহয়া মুনায়রী প্রভাবিত হন। ছাত্রত্ব গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে সোনারগাঁও চলে আসেন। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ রহ. তাঁর নিকট স্বীয় কন্যা বিবাহ দিয়ে তাকে জামাতারূপে গ্রহণ করেন। ৬৯০ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

এর ব্যতিক্রম হল নবুওয়াত, যা মানুষের জীবনধারাকে পাল্টিয়ে দেয়। ইতিহাসের প্রবল গতি পরিবর্তন করে দেয়। জীবনাচারের প্রাণে গিয়ে ছায়া বিস্তার করে। এ কারণেই দর্শন কোনো সংশোধনী কাজ করতে পারে না। কোনো বিপ্লব ঘটাতে পারে না। সে শুধু ধারণা ও খেয়ালের জগতে থাকে।

ডক্টর ইকবাল বলেন, 'যে দর্শন কলিজার রক্ত দিয়ে লেখা হয় না তা নির্জীব। তাতে কোনো প্রাণ নেই।' মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে আমি তাকে অনুরোধ করি, আপনি কুরআন শরিফকে এমন কিতাব হিসেবে পাঠ করবেন যেন এর সঙ্গে আপনার কোনো পূর্ব-পরিচয় ছিল না। এটি বরং একটি নতুন কিতাব, যা আজ অবতীর্ণ হয়েছে। সেই কিতাব নয়, যা শিশু-কিশোরদেরকে মকতবে পড়ানো হয়, যা প্রতিদিন তেলাওয়াত করা হয়। এটি একটি ভিন্ন কিতাব, যা আজই প্রথম আপনি খুলেছেন।

আল্লাহ তায়ালার কাছে আমার আশা, যেব্যক্তি সবকিছু থেকে নিজের মাথাকে মুক্ত করে গভীরভাবে এই কুরআন পড়বে, তা হলে এটি তার মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। অন্তরের অতল গহ্বরে গেথে থাকবে। তখন অন্য কোনো জিনিস তার হৃদয়ে স্থান পাবে না। দর্শন তার নিকট মরীচিকার মতো মনে হবে। বড় বড় দার্শনিককে মনে হবে ছোট্ট শিশু, যে মণি-মুক্তা নিয়ে উত্তাল সমুদ্রের তীরে ঝিনুক নিয়ে খেলছে।

আমরা মাহমুদ শাকেরের ওখান থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। রাতে প্রবন্ধ তৈরীর কাজে ব্যস্ত থাকি। ১০টায় আমরা বর্তমান প্রজন্মের প্রফেসর এবং ফুয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবিভাষা বিভাগের প্রধান সাইয়েদ আহমদ লুতফীর সঙ্গে দেখা করতে যাই। আমরা তার সঙ্গে তার অ্যাকাডেমিক অফিসে সাক্ষাত করি। একটি মুসলিমদেশে থাকা সত্ত্বেও তাকে আমরা ইউরোপের শিক্ষা-দীক্ষায় বেড়ে ওঠা একজন বুজুর্গ হিসেবে দেখি। ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনা এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব তিনি করেন। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি সেই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছুর প্রতিরোধ করেন। আকারে-প্রকারে তাকে সেসব ব্যক্তিত্বের মতো মনে হল, যারা স্যার সাইয়েদ আহমদ খানের প্রতিষ্ঠান আলিগড় থেকে প্রথম যুগে শিক্ষা নিয়ে বের হয়েছেন।

নৈতিকতার অতীত-বর্তমান

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইউনির্ভার্সিটির শিক্ষা থেকে ছাত্রদের চরিত্রগঠন এবং এর যে ফলাফল তার প্রতি কি আপনার আস্থা আছে? তিনি বললেন, অবশ্যই এর উপর আমার আস্থা আছে এবং আমি পুরোপুরি আশাবাদীও। অতীতের তুলনায় চরিত্র এখন দিনদিন উন্নততর হচ্ছে। আরও ভালো হচ্ছে। হ্যাঁ, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অতীতের বাহ্যিক চরিত্র, চাল-চলন খুব ভালো ছিল। তবে এসব তখন হত ভয়-ভীতির পরিবেশে। আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল, যে জিনিস ভয়-ভীতির প্রভাবে হয় তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।

হাজার বছর বরং এর চেয়েও বেশি সময় পর দেশের উপর থেকে ভিনদেশিদের রাজত্ব শেষ হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এ কারণে চরিত্র অনেক উন্নত ও পরিশীলিত হয়েছে। হ্যাঁ, কিছু ভোগ-বিলাসিতাও এখন চলে এসেছে। স্বাধীনতাকেও ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা হচ্ছে। তবে এসব হল স্বভাবজাত বিষয়, যা যথাসময়ে এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে।

একজন ছাত্রের দৃষ্টান্ত হল খাঁচার ওই চড়ুই পাখির ন্যায়, যে ছাড়া পাওয়ার পর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। নিজের গোপন শক্তিকে পুনরায় জাগিয়ে তোলে। আমি স্বাধীনতাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করলেও পরাধীনতার উপর একে অবশ্যই প্রাধান্য দিই। চারিত্রিক অধঃপতনের ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যর্থতা এবং একটি ভালো প্রজন্ম তৈরীর সিদ্ধান্ত সময়ের দাবি।

তিনি বলেন, আমার অভিমত হল শিশুদের চরিত্রগঠন প্রথমে বাবা-মায়ের কোলে হবে। আজকের শিশু যখন আগামী দিনের পিতা হবে তখন তার দীক্ষায় যে প্রজন্ম বেড়ে উঠবে তারা পূর্বের প্রজন্ম থেকে আরও পরিশীলিত হবে।

আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা আপনার আশা পূর্ণ করুক। এসব যুবকের দ্বারা আপনার চোখ শীতল করুক। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, অবস্থা ধীরে ধীরে ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে। কারণ যারা ভার্সিটি থেকে বের হচ্ছে তারা লাগামহীন ও বেপরোয়া হয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে সংশোধন ও তরবিয়ত বলতে কিছু নেই। এরপরও আমরা কীভাবে এই আশা করতে পারি যে,

বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ আরও ভালো হবে? আরও উন্নত হবে? তিনি বললেন, আমি যেটা বুঝি তা হল যখন জ্ঞানের প্রচার-প্রসার হবে তখন পরিবেশ এমনিতেই ঠিক হয়ে যাবে। আমি মানুষের স্বভাব সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করি না। আমি মনে করি যখন অসৎ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটবে তখন তা এমনিতেই সঠিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

চরিত্রগঠনে ইউনিভার্সিটিগুলির শিথিলতা প্রদর্শন

আমি বললাম, এটি ইসলামেরও দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু ইউনিভার্সিটিগুলি ছাত্রদের চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে ভীষণ রকম শিথিল। তিনি বললেন, আমি ছাত্রদেরকে তালকিন দেওয়ার এবং পথপ্রদর্শন করার পক্ষে নই। বড় কোনো ব্যক্তিত্ব ও ভালো আমলি নমুনাই এর জন্য যথেষ্ট।

আমি বললাম, ইউনিভার্সিটিগুলোর শিথিলতা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য দরস ও তালকিনের ক্ষেত্রে শিথিলতা না। কারণ চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে এসবের প্রভাব বিস্তারের উপর আমার বিশ্বাস নেই। এই ব্যাপারে আমিও আপনার সহমত পোষণ করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল ইউনিভার্সিটিগুলো ভালো শিক্ষক নিয়োগ, আমলি নমুনা ও অনুসৃত চরিত্র পেশ করতে চরমভাবে ব্যর্থ। এসব বিষয় আমাকে ইউনিভার্সিটিগুলোর ভবিষ্যৎ চারিত্রিক দিক সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছে। তিনি বললেন, মিসরে ইউনিভার্সিটি স্তরের লেখাপড়া ৩৩ বছর যাবৎ চলছে। এই অল্প সময়ের ভিতরে এর ব্যর্থতার সিদ্ধান্তটা যথাসময়ের পূর্বে হয়ে যাচ্ছে। আমাদেরকে আরও অপেক্ষা করতে হবে। আরও দেখতে হবে। আমি বললাম, ভারতবর্ষে ইউনিভার্সিটি লেবেলের শিক্ষা মিসরের চেয়ে অল্প পুরনো। কিন্তু মিসরি ইউনিভার্সিটির শিক্ষা থেকে তার তেমন পার্থক্য নেই।

ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা

এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের সামনে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, শিক্ষাব্যবস্থায় পর্যাপ্ত ত্রুটি রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এই ত্রুটি দূর না হবে শিক্ষা তার আপন ফল দিয়েই যাবে। এই ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে মূলত তত্ত্ব-উপাত্ত ও আখলাকের সাথে সমতা না থাকার কারণে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানীর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন? তার কাছে কি পড়েছেন? তিনি

বললেন, কনস্টান্টিনোপলে আমি তার কাছে এক মাস পড়েছি। তার এই দরস ব্যাপক ছিল। আমার বেশ উপকার হয়েছে। চিন্তার জগতেও প্রশস্ততা এসেছে।

আহমদ লুতফী পাশার এখানে আইন অনুষদের দীনিয়াতের প্রফেসর আবদুল ওহ্হাব খাল্লাফ ও মানসুর পাশার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। জনাব আহমদ লুতফী অ্যাকাডেমির ছাপানো কিছু বই আমাকে উপহার দেন। তারপর আমরা তার শোকরিয়া আদায় করে ফিরে আসি।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

পৌনে পাঁচটায় আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে পৌঁছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত মেহমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমির আবদুল করিম খাত্তাবী, তার ভাই আমির মুহম্মদ আবদুল করিম খাত্তাবী, মিসরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি শায়খ হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফ, শায়খ মুহম্মদ শিরবিনী, শায়খ মুবাশশির তারাজী, কিবারুল ওলামার সদস্য ডক্টর মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ দাররাজ, শরিয়াহ্ অনুষদের প্রফেসর শায়খ আহমদ ফাহ্মী, ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ মুসা, দারুল উলুম কায়রোর শিক্ষক আবদুল মুনয়িম নমর, প্রফেসর আহমদ শিরবাসী, আজহারের ওয়াজ ও ইরশাদের অন্যতম পরিচালক প্রফেসর মুহম্মদ আবদুত তাওয়াব, প্রফেসর আবদুল কাদির মুখতার, প্রফেসর আবদুল মুনয়িম খাল্লাফ, শায়খ সায়িদ শিরবাসী, আজহারের ওয়াজ ও ইরশাদের পরিচালক শায়খ আলি রেফায়ী ও জেনারেল সালেহ হরব পাশা। জেনারেল সালেহ হরব পাশাই এই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন।

আমরা চায়ের টেবিলে বসি। টেবিলটি অনেক লম্বা। নানান রকম ফুল দিয়ে সাজানো। জেনারেল সালেহ হরব পাশা উঠে দাঁড়ান। এই অধমের জন্য কিছু সম্মানসূচক শব্দ উচ্চারণ করেন। নিজের এবং মেহমানদের পক্ষ থেকে জানান খোশ আমদেদ। তারপর প্রফেসর আহমদ শিরবাসীর নাম ঘোষণা করেন। তিনিও উঠে সংক্ষিপ্তভাবে জেনারেল হরব পাশার কথার সমর্থনে কিছু আলোচনা করেন। আলোচনায় তিনি এ কথাও বলেন যে, শায়খ আবুল হাসান আজকের অনুষ্ঠানের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধের বিষয় 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ'।

অনুষ্ঠানে আমার প্রবন্ধ পাঠ

তারপর আমি উঠে দাঁড়াই। প্রথমে জেনারেল সালেহ হরবের এই ভালবাসা ও মেহমানের তা'জিমের জন্য শোকরিয়া আদায় করি। তারপর উপস্থিত মেহমানদেরকে সম্বোধন করে বলি, হযরত ওলামায়ে কেরাম, আপনারা উপস্থিত হয়ে আজকের অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। আপনাদের সময় বড় মূল্যবান এক আমানত। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমার মতো ব্যক্তির সম্মানপ্রদর্শন করতে গিয়ে না জানি আপনাদের এই মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে আজকের অনুষ্ঠানের জন্য আমি একটি প্রবন্ধ তৈরি করেছি। আশা করি প্রবন্ধটি ক্ষতি পূরণ করবে। জিম্মাদারির যে ভারী বোঝা আমি অনুভব করছি তা হালকা করবে।

তারপর আমি আমার প্রবন্ধে বলি, আজকের এই অনুষ্ঠান জেনারেল সালেহ হরব এই সংকল্পের উপর আয়োজন করেছেন যে, এখানে এমন একজন মুসলমানকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে, যিনি এক ইসলামি কওমের সদস্য, যে কওম ইলম ও দীনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্ক রাখে।

মূলত এই সংবর্ধনা-সম্মান সহজাতির একজনমাত্র সদস্যের নয়। বরং এ সম্মান ইলমের, ভারতবর্ষের পুরো মুসলিমজাতির, যে জাতির সঙ্গে রয়েছে আমার সম্পর্কের মর্যাদা। আমার অভিপ্রায় যে, জেনারেল হরব ও তার এই সম্মানিত মেহমানদের প্রতি রহমত ও সালাম পাঠাবো, যারা ইলম এবং এক সম্মানিত জাতির সঙ্গে সম্পর্ক সুবাদে আমাকে এখানে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন। তাদের এই সম্মান ও আতিথেয়তার শোকরিয়া আদায় করা এবং নেয়ামত স্বীকার করা আমার জন্য জরুরি।

সম্মানিত সুধি, আমি অনেক ভেবেছি যে, আপনাদের খেদমতে কী উপহার পেশ করব। আমার আজকের আলোচনা কী হবে। যদি আমি আপনাদের সামনে সাধারণ কোনো ইলমি ও দীনী বিষয়ে আলোচনা করি তা হলে তা হবে সূর্যকে বাতি দেখানোর মতো। তখন আমার মনে পড়ল একটি চিরাচরিত নিয়মের কথা। নিয়মটি আদিকাল থেকে চলে আসছে। এখনো আছে। তা হল কোনো মুসাফির তার নিজ দেশে যে জিনিস সবচেয়ে ভালো ও উত্তম মনে করে তা-ই সে উপহার হিসেবে পেশ করে। যদিও তা খুব সামান্য ও নগণ্য হয় এবং সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হয়। সে যে শহরে সফর করেছে সেখান থেকে কোনো কিছু ক্রয় করে সেখানকার

বাসিন্দাদেরকে উপহার দেয় না। হোক না সে জিনিসের মূল্যমান অনেক বেশি।

এই মূলনীতি ও অভ্যাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে গবেষণা করে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, আমার আজকের আলোচনার বিষয় হবে 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ'। আজ আমি এই দাওয়াতের ইতিহাস, এর উপর বয়ে যাওয়া যুগসমূহ, এই দাওয়াতের পদ্ধতি, এতে যেসব পরিবর্তন-পরিবর্ধন এসেছে এবং যেই নতুন আঙ্গিকে এখন এই কাজ আন্‌জাম দেওয়া হচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

এখন মূল আলোচনা শুরু করব। শুরুতে ভারতের প্রথম দিককার ইসলামি দাওয়াতের কথা উল্লেখ করি, দীনের একনিষ্ঠ দায়ী ও সুফিগণ এদেশে যার প্রচার-প্রসার ঘটিয়েছেন। তারপর বর্ণনা করি মোগল সাম্রাজ্যের গতি ইসলাম থেকে কুফুর ও নাস্তিকতার দিকে কীভাবে ফিরে গেল। এই গতিধারা রুখে দিতে এবং দীনকে পুনরুজ্জীবিত করতে কীভাবে শায়খ আহমদ সিরহিন্দীকে দাঁড় করানো হল। কীভাবে তার সমাজ সংস্কার এবং তার সন্তানদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আকবরের সিংহাসনে আওরঙ্গজেব আলমগির রহ. সমাসীন হয়েছেন। তারপর হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী রহ. মানুষের মগজ ধোলাই করে ইলমে দীনের ভিত্তির উপর সঠিক ইসলামি বিপ্লবের জন্য যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছেন তা উল্লেখ করি। ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ. ও মাওলানা ইসমাইল শহিদ রহ. এর আপ্রাণ চেষ্টা ও জিহাদের কথা তুলে ধরি। ওলামায়ে কেরাম তখন যে কারণে দীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছেন তাও বর্ণনা করি। তারপর সেসব কারণও বলি, যা 'নদওয়াতুল ওলামা' প্রতিষ্ঠা করার পিছনে কাজ করেছিল। পরিশেষে কী প্রয়োজনে তাবলিগ জামাত প্রতিষ্ঠা করা হল, যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা মুহম্মদ ইলিয়াস রহ., তা উল্লেখ করি। তার উদ্দেশ্য ছিল দীনী দাওয়াতের প্রচার-প্রসার করা, সাধারণ মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করা, তাদেরকে দীনের প্রশিক্ষণ দেওয়া। ইত্যাদি। এই বিষয়গুলোও আলোচনায় উল্লেখ করি। প্রবন্ধটি অনেক দীর্ঘ ছিল। তারপরও উপস্থিত মেহমানগণ খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছেন। তারা প্রবন্ধটি ছাপানোর প্রস্তাব পেশ করেন। অবশেষে এর উপরই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আরববিশ্বে আল্লামা ইকবালের চিন্তাধারা প্রচারের ক্ষেত্রে শিথিলতাপ্রদর্শন

১৩ মার্চ ১৯৫১

কবি সাবি শা'লান আসেন। তিনি আল্লামা ইকবালের কবিতার আরবি অনুবাদ আমাকে শোনাতে থাকেন। তারপর আমাকে একটি বই উপহার দেন। বইটি তিনি এবং জনাব মুহম্মদ হাসান আজমী যৌথভাবে লিখেছেন। বইটির নাম 'পাক-ভারতে ইসলামি সংস্কৃতি ও ইকবাল দর্শন'[১]। বইটির শেষে আরেকটি বই যুক্ত রয়েছে, যা আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. এবং তার মহান গ্রন্থ 'সিরাতুন্ নবী' থেকে নেওয়া কিছু প্রবন্ধের সমষ্টি। এতে মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদবীরও কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ রয়েছে। ভারতবর্ষের উলুম ও ফুনুরের প্রতি জনাব সাবি শা'লান খুব আকৃষ্ট। তিনি ফারসিও জানেন।

পাক-ভারত ও মিসরীয় আলেমদের ইলমি সম্পর্ক

শায়খ আহমদ শিরবাসী এমন একটি সংস্থা করার প্রস্তাব পেশ করেন, যেই সংস্থা পাক-ভারত ও মিসরের আলেমদের মাঝে বিভিন্ন কিতাব, বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, বিজ্ঞাপন, লেখনী, বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পর্ক সৃষ্টি করবে। প্রফেসর আবদুল মুনয়িম নমর তার এই প্রস্তাবের সমর্থন করে বলেন, আমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে তিনি ভারতবর্ষের দীনী শিক্ষা ও আন্দোলন সম্পর্কে একেবারে বেখবর ছিলেন। 'ভারতবর্ষে ইলমে হাদিস' বিষয়ের উপর 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামিয়া' পত্রিকায় আমার লেখা প্রবন্ধে সেসব ব্যক্তিত্বের আলোচনা করেছি, যাদের নামও তিনি এর আগে কখনোই শোনেননি।

শায়খ আহমদ শিরবাসী এই প্রস্তাবও পেশ করেন যে, আজহারের ছাত্র এবং অন্যান্য মুসলিমদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মাঝে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হওয়া উচিত। এতে ইউরোপের ছাত্রদের পরিবর্তে মুসলমান নওজোয়ানদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব হবে। ইসলামি কাফেলার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক জোরদার হবে।

---

[১] فلسفة اقبال والثقافة الاسلامية فى الهند والباكستان

তিনি জানান যে, কলেজ-ভার্সিটির অধিকাংশ ছাত্র এখন ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলির ছাত্রদের সঙ্গে নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। মিসরের কলেজ-ভার্সিটির অধিকাংশ ছাত্রের বন্ধু আছে ইউরোপে। তাদের শিক্ষকেরা তাদেরকে এ ব্যাপারে রীতিমত উৎসাহিত করে। বিষয়টি এখন এমন একপর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মহিলা কলেজের শিক্ষিকারাও ছাত্রীদেরকে ইউরোপের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছে।

আমরা এ কথার উপর একমত হই যে, শায়খ আহমদ শিরবাসী আজহারের সেসব ছাত্রের নাম-ঠিকানা সংগ্র করবেন এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী সম্পর্কেও ধারণা নিবেন, যারা চিঠিপত্রের আদান-প্রদান করতে চায়। আর আমি পাক-ভারতের মুসলমান ছাত্রদের নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করার দায়িত্ব আন্জাম দিব।

প্রফেসর আবদুল মুনয়িম নমর মুওয়াত্তা মালিকের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আওজাযুল মাসালিক'র অংশবিশেষ প্রকাশকদেরকে দেখানোর জন্য সাথে নিয়ে নেন। হয়তো কোনো প্রকাশক এটি দেখে ছাপানোর জন্য রাজি হবেন। কিতাবটির লেখক শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহম্মদ জাকারিয়া কান্দলবী রহ.। আসরের পর আমরা 'অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশনা পরিষদে' যাই। উদ্দেশ্য ছিল লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুল মুতআল আফেন্দীর সঙ্গে দেখা করব। কিন্তু তিনি তখন 'দারুল কিতাব আল আরাবি'র প্রেসে জনাব আলহাজ হিলমী মিনিয়াবীর নিকট ছিলেন। তিনি আমাদের কায়রো আসার সংবাদ শোনেন। অতিসত্বর ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করি। কিন্তু তিনি আর আসেননি। পরিশেষে আমরা বাহি আল খাওলীর সঙ্গে দেখা করার জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী মুহম্মদ আলি কেল্লায় যাই। আমরা তার নিকট মাগরিব থেকে নিয়ে রাত নটার পর পর্যন্ত অবস্থান করি। এর মধ্যে প্রফেসর মুনির বে ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সচিব আহমদ আতিয়াহ আসেন। আমি এই উভয় হযরতের সঙ্গে পরিচিত হই।

আমি প্রফেসর বাহি আল খাওলীর 'তাওহিদের ছায়াতলে' শিরোনামের একটি লেখা পড়েছি। লেখাটি 'দাওয়াহ' পত্রিকার শেষ দিককার কোনো এক সংখ্যায় ছাপানো হয়েছিল। প্রবন্ধটি খুব চমৎকার ছিল। আয়াতের

ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন তত্ত্ব তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমি তার মধ্যে ইবনুল কাইয়ুমের ঝলক পেয়েছি। এটি তার মধ্যে ইবনুল কাইয়ুমের কিতাবের প্রতি আন্তরিকতা এবং তার চিন্তাধারার আলোকে গবেষণা করার ফলে এসেছে। শায়খ কিছু আয়াতের ব্যাখ্যা আমাদেরকে শোনান। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কুরআনের حياة [হায়াত-জীবন] শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেন। তার আলোচনা অত্যন্ত তথ্যনির্ভর। এতে দিল-দেমাগের জন্য ছিল প্রচুর খোরাক।

মাগরিবের পর অল্প সময়ের জন্য জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের অফিসে যাই। উদ্দেশ্য ছিল শায়খ আহমদ শিরবাসীর আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থনা করা। তার আলোচনার বিষয় ছিল 'ইতিহাসের আলোকে দৃষ্টিহীন আলেমদের শ্রেষ্ঠত্ব'।

১৪ মার্চ ১৯৫১

আমি বিশ্রাম নেওয়া এবং জনাব বাহি আল খাওলীর আলোচনা শোনাকে প্রাধান্য দিই। জনাব ইয়াসিনের সঙ্গে রাত নটার পর ফিরে আসি। শায়খ আহমদ আবুল আযায়িমের বাসায় নিয়ে যেতে শায়খ আবদুল মুনয়িম নমর জোহরের সময় আমার নিকট আসেন। যাতে আমরা জনাব আহমদ আবুল আযায়িম'র সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করতে পারি। আমরা আবুল আযায়িম'র গাড়িতে চড়ে তার বাসায় যাই। তার সঙ্গে দুপুরের খাবার খাই। সেখানে প্রফেসর মাহমুদ জিরও উপস্থিত ছিলেন। তাকে 'আহলুল বায়ত'র কবি বলা হয়। শায়খ আহমদ আবুল আযায়িম তার পিতার লেখা কয়টি কাব্যগ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দেন। আমরা তার পিতার কবর জিয়ারত করি। কবরের উপর একটি শিলালিপি ছিল। তাতে লেখা ছিল 'হে আবুল আযায়িম, তোমার সাহায্য '। লেখাটা আমাদের মোটেই পছন্দ হয়নি। আমি বললাম, এটা কোনোভাবেই জায়েজ হতে পারে না। এই কথা খালেস তাওহিদের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যশীল না। সুরা ফাতিহায় اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ [আমরা আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি] এর মাধ্যমে আমাদেরকে যে হুকুম দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে এটা সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। অথচ আমরা নামাজের মধ্যে বারবার এটি তেলাওয়াত করি। আমরা তার

মধ্যে সেই অপছন্দ ও ঘৃণা ভাব দেখিনি, যা এ ধরনের ক্ষেত্রে রেজবী ও বাদাইয়ুদের মধ্যে পাওয়া যায়।

শায়খ খাল্লাফের সঙ্গে কথাবার্তা

আসরের পর আমরা আইন অনুষদের ইসলামি শরিয়াহ্র প্রফেসর শায়খ আবদুল ওহ্হাব খাল্লাফের সঙ্গে দেখা করার জন্য তার বাসার উদ্দেশে শিবরা যাই। তার সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ইলমি বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, সাইয়েদ আহমদ লুতফীর সঙ্গে আপনার আলোচনার ধরনটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। আমি অনুভব করছিলাম- আপনার এবং তার আলোচনার মাপকাঠি এক নয়। আপনার নিকট আখলাকের মাপকাঠি হল কুরআন। এর মধ্যে যা ভালো ও উত্তম তা আপনার নিকটও উত্তম। কিন্তু তার মাপকাঠি ও দৃষ্টিভঙ্গি অন্যটা।

মিসরে চারিত্রিক অবক্ষয়ের কারণ

এ দেশে চারিত্রিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হল ফ্রান্স থেকে ফিরে আসা লোকজন। আমার দৃষ্টিতে ইংরেজ সভ্যতা-সংস্কৃতি গাম্ভীর্য ও গভীরতার দিক দিয়ে ফরাসি সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে উন্নততর। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শায়খ মুহম্মদ আবদুহুর নিকট পড়েছেন? তিনি বললেন, আমি আজহারের আব্বাসী হলে তার সুরা নিসার দরসে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেসময় ‘حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ’ [সুরা নিসার ২৩ নং] আয়াতের তাফসির চলছিল। সেদিনকার তাফসিরে আয়াতের ধারাবাহিকতা لَا خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ [সুরা নিসার ১৪৪ নং আযাত] পর্যন্ত চলে। এরই মাঝে তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে ইহকাল ত্যাগ করেন।

শায়খ আবদুহুর দরসের পদ্ধতি

শায়খ খাল্লাফ শায়খ মুহম্মদ আবদুহুর দরসের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, শায়খ বড় কমনীয় চেহারা ও ঘন দাড়ির অধিকারী ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল শ্রুতিমধুর। ছাত্র ও মজলিসে উপস্থিত লোকজন কখনো তার আলোচনায় বিব্রত হত না। মনোলোভা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কথার মাধ্যমে তিনি শ্রোতাদের বরাবর হাসাতে থাকতেন।

এতে তাদের ক্লান্তিও দূর হয়ে যেত। তিনি ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন না। তিনি কুরআনকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতেন যে, এটি তার নিকট হেদায়েতের উৎস। তিনি তার দাবির পক্ষে কুরআনের এই আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করতেন, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনও সন্দেহ নেই। এটি হেদায়েত ও পথনির্দেশ মুত্তাকিদের জন্য। [সুরা বাকারা, ২ আয়াত]। আর তিনি বলতেন আল্লাহ তায়ালা কুরআনের এই গুণ বর্ণনা করেননি যে, এই কুরআন নাহু অথবা বালাগাতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। বরং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন একে হেদায়েত ও পথপ্রদর্শনের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে।

যেসব শিক্ষক শায়খ খাল্লাফকে প্রভাবিত করেছে

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আজহারের কোন শিক্ষক আপনাকে বেশি প্রভাবিত করেছেন? তিনি বলেন, শায়খ মুহম্মদ আবদুহু ছাড়া আরও দুজন রয়েছেন। তাদের প্রথমজন শায়খ আবদুল্লাহ দাররাজ। তিনি আজহারের সামনের মসজিদে মানতিক [তর্কশাস্ত্র] পড়াতেন। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। কথাও বলতেন খুব শুদ্ধভাষায়। দ্বিতীয়জন ছিলেন শায়খ ইবরাহিম জাবালী। কয়েকদিন আগে তার ইনতেকাল হয়েছে। তারপর মাদরাসাতুল কাজা আশ শারইয়্যাহর কার্যক্রম শুরু হয়। আমি সেখানে গিয়ে ভর্তি হই। মাদরাসাটির শিক্ষকদের মধ্যে আজহারী আলেমও ছিলেন। আবার আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকও ছিলেন। ফলে আমার শিক্ষাও হয়েছে দুই ভিন্ন-ভিন্ন চিন্তাধারার সমন্বয়ে। আর এটা আমার জন্য উপকারই হয়েছে।

ইমাম লাইসের মাজহাব স্থায়ী না হওয়ার কারণ

আমি বললাম, আপনি জানেন ইমাম লাইস ইবন সাআদ অত্যন্ত বড় মাপের ফকিহ ছিলেন। অনেকে তাকে ইমাম মালেক রহ.[১] এর উপরও

---

[১] **ইমাম** মালেক রহ.। হাদিস ও ফিকাহ উভয় ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জনকারী বিখ্যাত তাবেয়ী। **মাতৃগর্ভে** অস্বাভাবিকভাবে ২ কি ৩ বছর অস্বাভাবিকভাবে বেশি সময় থেকে ৯৩ হিজরি সনে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা [মালেক ইবন আবু আমের রাদি.] ছিলেন রাসুল রা. এর

প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এরপরও তার মাজহাবের স্থায়িত্ব কেন হয়নি? তা নিঃশেষ হয়ে গেল কেন? তার কোনো অনুসারী অবশিষ্ট নেই। তিনি বললেন, দুই কারণে মাজহাবের প্রচার-প্রসার ও স্থায়িত্ব লাভ করে। প্রথম কারণ মাজহাবের কোনো অনুসারী যখন স্বীয় মাজহাবকে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করবেন। দ্বিতীয় কারণ কোনো সরকার এই মাজহাবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এর প্রচার-প্রসার ঘটাবে। হানাফী মাজহাবে এই উভয় কারণ পাওয়া যায়। ইমাম মুহম্মদ ইবন হাসান শায়বানী রহ.[২] একে সংকলন ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এই মাজহাব কাজি ইমাম আবু ইউসুফেরও। আর তখন বিচারপতির দায়িত্ব হানাফী মাজহাবের অনুসারীকে দেওয়া হত। কিন্তু ইমাম লাইস ইবন সাআদ রহ. এর পর তার মাজহাবের সংকলন ও প্রচার-প্রসার কেউ করেনি।

মিসরে ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাজহাব

একসময় সারা মিসরে শুধু হানাফী মাজহাবই প্রচলিত ছিল। সকলেই এই মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তখন একবার ইমাম শাফেয়ী রহ. মিসরে আগমন করেন। তিনি অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। মিসরে এসে তিনি রাজবংশের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। তারপর এখান থেকেই তার মাজহাব পুরো মিসরে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন ফাতেমী রাজবংশ মিসরের ক্ষমতায় আসে তখন তারা 'মসজিদে যিরার'র ন্যায় মসজিদে আজহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি মিসরের চতুর্থ মসজিদ। তখন ইমাম শাফেয়ী রহ. ফুসতাত মসজিদে দরস দিতেন। ফাতেমি খলিফা শাফেয়ী মাজহাবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। এই জন্য তিনি ফিকহে জা'ফরীর পঠন-পাঠনের সঙ্গে ফিকহে শাফেয়ীর পাঠদানকে

সাহাবী। ইমাম মালেক রহ. পরিপাটি পোশাক ও আতর-সুরমা ব্যবহার করে খুব জাকজমকের সাথে হাদিসের দরস দিতেন। সারা জীবন তিনি মদিনায় কাটান। ১৭৯ হিজরি সনের ১১/১৪ রবিউল আউয়াল ইনতেকাল করেন। জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়।

[২] ইমাম মুহম্মদ রহ.। পুরো নাম মুহম্মদ ইবন হাসান শায়বানী। ১৩১/১৩২ হিজরি সনে ইরাকে ওয়াসিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কুফায় লালিত-পালিত হন। ১৪ বছর বয়সে ইমাম আবু হানিফা রহ. এর দরসে উপস্থিত হন। হানাফী মাজহাবের ভিত্তিমূল অধিকাংশ কিতাব তার সুগভীর অধ্যয়ন ও গবেষণার ফসল। ফিকাহ ও হাদিস উভয় ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। ১৮৯ হিজরিতে ৫৮ বছর বয়সে রায় শহরে তিনি ইনতেকাল করেন।

অন্তর্ভুক্ত করেন। জা'ফরী ফিকহে পাঠদান খলিফা নিজেই করতেন। তারপর মিসরে আইয়ুবী হুকুমত প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা ফিকহে শাফেয়ীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। যার ফলে তারা ফিকহে শাফেয়ীর পক্ষে সাহস ও শক্তির যোগান দেন। পরিশেষে ফিকহে শাফেয়ীই পুরো মিসরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলেমদের ব্যাধি

শায়খ আবদুল ওহ্হাবের বাসা থেকে আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে যাই। সেখানে বড় বড় আলেম ও আজহারী শায়খদের এক ভারী জামাত উপস্থিত ছিলেন। তারা এমন একটি কমিটি করার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন যে কমিটি ইসলামের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণে বিভিন্ন গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করবে। কিন্তু তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেননি। তাদের এই আলোচনায় আমি ইখলাসের মধ্যে কিছুটা ঘাটতি অনুভব করি। এ কারণেই মুসলিম দেশগুলোর দীনী ব্যাপারে আমার বড় আশঙ্কা হয়। মানুষের মধ্যে চঞ্চলতা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি এবং তড়িৎ আমাদের পারিপার্শ্বিক দুনিয়ার পরিবর্তনের দাবি হল নিঃসঙ্কোচে সত্য বলা। দৃঢ় মনোবল প্রকাশ করা। কিন্তু এটি এখন দীনী জামাত ও ইসলামের রক্ষকদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে এ কথা বলেছি যে, বর্তমানে মুসলিম জাতি, বিশেষ করে দীনী ও ইলমি জামাতসমূহ সামাজিক শক্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতার যোগ্যতা খুইয়ে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে বড় ধরনের কোনো কাজ সম্ভব নয়। তবে মুষ্টিমেয় লোক, যাদের জজবা ও অনুভূতিতে দাওয়াতের কাজ প্রাধান্য পেয়েছে, তারা কারো অপেক্ষা করা ছাড়া নিজেদের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য দাঁড়িয়ে গেছে।

কৃষি-জাদুঘর ভ্রমণ

১৫ মার্চ ১৯৫১

আমাদের সফরসূচি অনুযায়ী আজ কৃষি-জাদুঘর ভ্রমণের দিন। আনসারুস সুন্নাহর অফিসে আমরা সমবেত হলাম। সেখান থেকে জনাব আবদুল ওহ্হাব বান্না, আলি আদলি মুরশিদী ও অন্য সাথীদের নিয়ে জাদুঘরের উদ্দেশে বের হলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর জানতে পারলাম, আজ সাপ্তাহিক ছুটি। জাদুঘর বন্ধ। জনাব বান্না বললেন, আজ তা হলে

চিড়িয়াখানায় যাওয়া যাক। আমরা সবাই একমত হলাম। তারপর গেলাম চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানার আবহাওয়া অত্যন্ত সুন্দর ও মনোলোভা ছিল। সেখানে আমরা নানান প্রজাতির পশু-প্রাণী ও চিত্তাকর্ষক অদ্ভুত পাখ-পাখালির মধ্য দিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। সবচেয়ে বিস্ময়কর যে জিনিসগুলো মনে হয়েছে তা হল সামুদ্রিক প্রাণী ও বনমানুষ। এই হিংস্র প্রাণী ও পশুদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে আল্লাহ তায়ালার চিরন্তণ বাণী স্মৃতিপটে ভেসে উঠল। তিনি ইরশাদ করেছেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا.

'নিশ্চয় আমি আদমসন্তানকে সম্মানিত করেছি, জল ও স্থলে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি, উত্তম জীবনোপকরণের ব্যবস্থা করেছি। এবং তাদেরকে আমার অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' [সুরা বনি ইসরাইল, ৭০ আয়াত]

কুরআনের আরেকটি আয়াতও আমার বার-বার স্মরণ হচ্ছিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

'নিশ্চয় আমি মানুষকে উত্তম গঠনপ্রণালী দিয়ে সৃষ্টি করেছি।'

[সুরা তীন, ৪ আয়াত]

প্রফেসর আবদুল ওহ্হাব বান্না রকমারি খানা নিয়ে এসেছিলেন, যা সফরসঙ্গী সবার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমরা জোহর নামাজ আদায় করে চিড়িয়াখানার লেনে বসে খানা খেয়ে নিই। প্রকৃতির মনোলোভা সৌন্দর্য ও সুনির্মল হাওয়ার সাথে এই খানার স্বাদ, সব মিলিয়ে আমাদের আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। খানা-পর্ব শেষ করে এই আপ্যায়ন ও ভ্রমণের ব্যবস্থা করার জন্য তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পরিশেষে আমার এই বন্ধু-বন্ধব ও প্রিয়জনদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

আসর নামাজ শেষ করে আমরা হালিমিয়া জাদিদায় জনাব আবদুল খালেকের বাসায় গেলাম। সেখানে জামিয়া আজহারের এক ছাত্রকাফেলার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের সাথে গাঁও-গ্রামে দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ

এবং সাপ্তাহিক সফরের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হয়। সফরের জন্য তারা 'কালয়ুব'কে নির্বাচন করল।

মাগরিবের পর আমরা জনাব রাশাদের ঘরে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর অ্যাদারায়ে সাকাফিয়ার 'অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশনা পরিষদে' উপস্থিত হয়ে ডক্টর আহমদ আমিনের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি সাপ্তাহিক সভায় ছিলেন। সেখানে জনাব তাওফিকুল হাকিম ও "المواقف الحاسمة في تاريخ الإسلام" গ্রন্থের লেখক আবদুল্লাহ আনানের সাথে পরিচয় হয়। আমরা তাদের ইলমি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করি, যা আত্মিক রোগ ও তার নিদর্শন সম্পর্কে হচ্ছিল। তারপর ডক্টর আমিন আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে মুসলিমদেশ মরক্কোর উপর ফ্রান্সের জুলুম-অত্যাচারের আলোচনা করতে লাগলেন। তিনি প্রশ্নের ভঙ্গিতে বললেন, এই জুলুম-অত্যাচার যদি কোনো মুসলিমদেশের পক্ষ হতে ইউরোপের কোনো এলাকায় হত, তা হলে ইউরোপ কেমন ব্যবস্থা নিত? তারপর জনাব আবদুল্লাহ আনান বললেন, তুর্কিদের পক্ষ হতে যদি আরমেনীয় কোনো খ্রিস্টান-জনপদ কিংবা ইউরোপের কোনো শহরে যদি সামান্যতম আঁচড় পড়ত, তা হলে ইউরোপ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠত। জমিয়তের সকল সদস্য এর উপর একমত হয়েছে যে, ইউরোপে ক্রুসেড এখনো জীবন্ত ও শক্তিশালী অবস্থানে আছে। তাওফিকুল হাকিমকে ফ্রান্স থেকে যে 'সম্মানপত্র' দেওয়া হয়েছে সে ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করল। কারণ ফ্রান্স এখন আমাদের মরক্কোর ভাইদের উপর অত্যাচারের স্টিমরুলার চালাচ্ছে। এরপর কথার মোড় ভারত-পাকিস্তানের দিকে ঘুরে যায়। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ উপমহাদেশে আরবিভাষা ও দীনচর্চা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলো। আমি আমার অভিজ্ঞতা তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম। আবদুল্লাহ আনান উপস্থিত লোকদের সম্মুখে কাশ্মিরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়েও আলোকপাত করলেন। তার আলোচনা শুনে মনে হল তিনি পাক-ভারত এবং এই উভয় দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও রাজনৈতিক সমস্যাবলির ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ।

কোয়েসনায় আমার ভাষণ

১৬ মার্চ ১৯৫১

আজ আমরা শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর সাথে কোয়েসনার উদ্দেশে রওনা হলাম। মিসর থেকে বানহাগামী ট্রেনে চড়ে বসলাম। বানহায় পৌঁছে মটরযানে কোয়েসনায় পৌঁছে গেলাম। কিছু সময় আমাদের মেজবান জনাব আহমদ সুলায়মান ইশমাবীর নিকট অবস্থান করি। আমাদের চারপাশ বানহার বহু যুবক ঘিরে রেখেছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ মুহম্মদ হাসানও ছিল। হেজাজে তার সাথে আমার পরিচয় হয়। সেখানে সে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পরিচয় ও সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সারাক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিয়েছিল। হজের মৌসুমে যত বন্ধু-বান্ধব এসেছে, তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ মুহম্মদ হাসান সবচেয়ে বেশি কর্মঠ, উদ্যমী ও চঞ্চল ছিল। আমি সারাক্ষণ তার সন্ধ্যানে ছিলাম। তার অবস্থান জানতে অধীর আগ্রহী ছিলাম। কারণ আমি তার ঠিকানা ভুলে গিয়েছিলাম। তবে আমাদের বন্ধু আবদুল্লাহ সায়েম তাকে আগে থেকেই আমাদের কোয়েসনায় আগমনের তথ্য প্রদান করেন। তাই 'আজিজিয়া' থেকে সে আমাদের সাক্ষাতে আসে। এই সাক্ষাতে আমরা উভয়ে দারুণ আনন্দিত হলাম।

ইশমাবীর নিকট থেকে আমরা মসজিদে এলাম। জুমার দিন। শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী খুতবা প্রদান করেন। নামাজ শেষে আমার বক্তৃতার পালা। আমি সুরা আসরের তাফসির করার ইচ্ছা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে খুতবায় জনাব গাজালী এর তাফসির করেন। তখন নামাজে গাজালীর তেলাওয়াত করা একটি আয়াতের তাফসির করি। তেলাওয়াতকৃত আয়াতটি হচ্ছে,

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُــوَات
الشَّيْطَان اِنَّه. لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ.

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' [সুরা বাকারা, ২০৮ আয়াত]।

আমি বিশ্লেষণ করি যে, মানুষ কীভাবে তার প্রভুর বিরোধী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়? আমি তাদেরকে সতর্ক করলাম, যেন তারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত

না হয়। আরও বললাম, অধিকাংশ সময় মুসলমান মসজিদে থাকা অবস্থায় প্রভুর সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে। এবং বের হতেই আল্লাহর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তাঁর মসজিদে থাকাকালীন স্বল্প সময়ের সম্পর্ক মসজিদের বাইরের অধিক সময়ের তুলনায় খুবই কম। সুতরাং প্রত্যেকের ভেবে দেখা দরকার তার জীবনে আল্লাহর সাথে শত্রুতার সম্পর্ক কতটুকু। সকলের উচিত শত্রুতার পথ পরিহার করে সন্ধির সুন্দর পথ বেছে নেওয়া। একজন মুসলমান আল্লাহ তায়ালার সাথে পরিপূর্ণভাবে সন্ধিভাব না জমালে তার নুসরতের উপযুক্ত পাত্র হতে পরে না। তাঁর রহমত অর্জন করতে আরে না।

আমার পর শায়খ আহমদ সুলায়মান ইশমাবী এক আবেগপূর্ণ ও বাগ্‌বিদগ্ধ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আত্মত্যাগ ও কষ্টবরণের পরীক্ষা তাদের ঈমান, উদ্দীপনা, শক্তি, সাহস, আন্দোলনের কর্মতৎপরতা, প্রচার-প্রসারেরও প্রভাব শতগুণ বৃদ্ধি করেছে। আমরা তার আলোচনায় জানতে পারলাম, বন্দিখানায় তাদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে এবং সেখানে এখনও তাদেরকে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে।

আমরা বিশ্রামাগারে ফিরে আসি। আমাদের চারপাশে যুবকদের জটলা ছিল। তারা গভীর মনোযোগসহকারে জনাব গাজালীর আলোচনা শুনছিল। মুহম্মদ আলগাজালী এই সুযোগকে গনিমত ভেবে যুবকদেরকে ইসলামের নব জাগরণ, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন ও যুবক শ্রেণীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। শায়খ গাজালীর ইলমি গভীরতা, স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণা ও আবেগমতায় আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্রোতা ও সাক্ষাতপ্রার্থীদের অধিকাংশ ছিল উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র। সকলের দৃষ্টি গাজালীর প্রতি নিবদ্ধ। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তারা আলোচনা শুনছিল। তাদের চেহারায় এর প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। তারপর খানার পর্ব। উপস্থিতির সিংহভাগ খানায় অংশ নিলো। মেজবান অত্যন্ত সন্তুষ্ট। খানার পর্ব শেষ করে শায়খ গাজালী পুনরায় আলোচনা শুরু করেন। নব উদ্যমে উপস্থিত ছাত্র, কোয়েসরা ও অন্যান্য এলাকার লোকজন মনোযোগসহকারে তার আলোচনা শোনতে থাকে। এরই মাঝে আসরের আজান ভেসে এলো। আমরা আসরের নামাজ আদায় করি। তারপর মেজবানের কাছ থেকে বিদায় নিই। মাগরিবের পর আমরা কায়রো ফিরে আসি।

১৭ মার্চ ১৯৯১

ভোর বেলা। কবি সাবি শানাল আগমন করলেন। তিনি যখনই আসেন, আমাদের মহান কবি আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ ইকবালের স্মৃতি ভেসে ওঠে। ভারতের ইসলামি ঘরানার এমন একজন ব্যক্তিত্বের হৃদয় আকাশ জ্বলজ্বল করতে থাকে, যার সঙ্গে রয়েছে ঈমানের খোশবু ও সুগন্ধি। মহব্বত ও ভালবাসা। সাবি শালান আমাদেরকে মাওলানা রোমির একটি কবিতা শোনাতে লাগলেন। একজন রোমীয় দূত আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে খেলাফতের প্রাসাদ সম্পর্কে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করেন। তারপর হযরত ওমর রা. এর নিকট গিয়ে দেখেন আধা জাহানের বাদশা একটি খেজুর গাছের ছায়ায় সাদাসিধেভাবে বসে আছেন। অবাককরা এই দৃশ্য তাকে এতটাই প্রভাবিত করল যে, সে মনে মনেই এই প্রভাবের কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি ফারসি কবিতার আরবি রূপ দিয়ে আমাদের শোনালেন। তারপর আমার লেখা গ্রন্থ 'বিশ্বের পক্ষ থেকে আরব উপদ্বীপের কাছে বার্তা' এবং 'আরব উপদ্বীপের পক্ষ হতে বিশ্বের কাছে বার্তা' পুস্তিকা দুটো আরবি কবিতায় রূপান্তর করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। আমি তাকে 'শোন হে মিসর' গ্রন্থের একটি কপি হাদিয়া দিই। এটিও তিনি আরবি কবিতায় রূপান্তর করতে রাজি হয়ে গেলেন। পরবর্তী মঙ্গলবার তিনি আমার নিকট আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন তিনি আমার জন্য ইকবালের কিছু কবিতার আরবি অনুবাদ নিয়ে আসবেন।

শায়খ মাখলুফের বাড়িতে

দুপুর ১২টা বাজে। আমরা হোলওয়ানের উদ্দেশে রওনা করলাম। মিসরের সাবেক গ্রান্ড মুফতি 'কিবারুল ওলামা সংস্থা'র সদস্য শায়খ হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফের বাড়ি হোলওয়ানে। দুপুরের খানার দাওয়াত তার বাসভবনে। গাড়ি তীর বেগে ছুটে চলছে। দুধারে সবুজের সমারোহ। দূরে জনবসতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। গ্রামের চমৎকার দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম শায়খের বাড়ি। শায়খ মাখলুফ আমাদের অপেক্ষায় ছিলেন। আমাদেরকে তিনি হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। বোঝা গেল আমাদের আগমনে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমাকে বললেন, ইবরাহিম আমেরকেও ভোজে দাওয়াত করা হয়েছে। হঠাৎ এই সংবাদে

আমি সীমাহীন আনন্দিত হলাম। কারণ ইবরাহিম আমের দিল্লির 'আকাশবাণী' রেডিওতে কাজ করতেন। তার সাথে আমার লখনৌতে প্রথম সাক্ষাত হয়। 'ভারতবর্ষে আরবিভাষা ও সাহিত্যচর্চা' বিষয়ে তিনি আমার একটি সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন। পরবর্তীসময়ে আমার কণ্ঠেই তা আকাশবাণী থেকে প্রচার করেন। তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায়ও এসেছিলেন। সেখানে ছাত্রদের 'আরবি আনজুমানে'ও অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীসময়ে 'আলমারসি' পত্রিকায় তা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেন। আমি দিল্লি রেডিও স্টেশনেও তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। কায়রো এসে তার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঠিকানা জানা ছিল না। মুফতি সাহেব তার ঘরে আমাদেরকে অকল্পনীয়ভাবে সাক্ষাত করিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর আহমদ উসমানও এলেন। তাকেও দাওয়াত করা হয়েছিল। তার পর এলেন ইবরাহিম। ইবরাহিম আমেরের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। তিনিও খুব খুশি হলেন। এ সময় আমাদের উভয়ের ভারতের সাক্ষাতসহ বহুস্মৃতি তাজা হয়ে উঠল। আমরা খাবারের জন্য উঠলাম। মুফতি হাসানাইন আমাদের সাক্ষাতে আনন্দিত ছিলেন। খাবার-পর্ব শেষ হল। এবার চা-পর্ব। তারপর আলোচনা শুরু হয়। রাজ্যের আলোচনা।

সোমবার ইবরাহিম আমেরের সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের দিনক্ষণ ধার্য হল। জনাব আমের বললেন, জনাব মানসুর ফাহমী পাশা আমার সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছেন। 'ভাষা ইনস্টিটিউটে' সাইয়েদ আহমদ লুতফী পাশার অফিসে ঘটনাক্রমে আমাদের সাক্ষাত হয়ে গেল। আমি তাকে স্বাগত জানালাম। মঙ্গলবার আবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হল। বিদায়ের জন্য আমরা হাসানাইন মাখলুফের নিকট অনুমতি চাইলাম। তিনি তার লেখা কিছু গ্রন্থ আমাদের হাদিয়া পেশ করলেন। তার পিতার লেখা কিছু বইও দিলেন।

অন্ধ অনুকরণ এক ধরনের পাগলামী

আহমদ উসমানের সাথে হোওয়ানের প্রসিদ্ধ উদ্যান দেখতে বের হলাম। উদ্যানে বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতিকৃতি দেখে আমি বিস্ময়ে 'থ' বনে গেলাম। এ ছাড়াও প্রতিকৃতির এক বড় সারি ছিল। আমি আমার বন্ধু আহমদ উসমানকে বললাম, একটি মুসলিমদেশ, যাকে আল্লাহ তায়ালা

মূর্তি ও দেব-দেবী হতে পবিত্র করেছেন, সেখানে এই মূর্তিগুলো স্থাপনের কী উদ্দেশ্য? আপনারা কি উত্তম বস্তু পরিহার করে নিকৃষ্ট বস্তু অবলম্বন করতে চাচ্ছেন?

তিনি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বললেন, উদ্যানটি জাপানিজ স্টাইলে তৈরি করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে এটা যেন সবদিক থেকে জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এ জন্য মূর্তিগুলোও তৈরি করা হয়েছে পুরোপুরি জাপানিজ স্টাইলে। মিসরবাসী এই মূর্তি নির্মাণে হাজার হাজার পাউন্ড ব্যয় করেছে। আমি বললাম, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অন্য জাতির অনুকরণ করতে গিয়ে মানুষ এতটা জ্ঞানশূন্য হতে পারে?

কায়রো পৌঁছে 'আদদাওয়াহ'র অফিসে গেলাম। সেখানে সালেহ ইশমাবী ও সা'দুদ্দীন অলিলীর সাথে সাক্ষাত হল। আমরা অফিসেই বসে ছিলাম। এরিমধ্যে আবদুল খালেক ফরিদ আগমন করলেন। তার সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতে আনন্দিত হলাম। কিছুক্ষণ পর বিদায় নিয়ে আমরা আমাদের বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় এসে একটি প্রবন্ধের শেষ লাইনগুলো লিখতে শুরু করলাম। প্রবন্ধটি ইখওয়ান বন্ধুদের সামনে পাঠ করার ইচ্ছা আছে।

১৮ মার্চ ১৯৫১

এগারোটার পর পর্যন্ত কিছু চিঠির জবাব লেখা এবং সেই রচনাটি সাজানোর কাজে ব্যস্ত রইলাম, যা জনাব ইশমাবীকে দেখাতে চাচ্ছিলাম। বারোটা বাজে 'আদ-দাওয়াহ'র অফিসে ইশমাবীর সাথে সাক্ষাত করি। সেখানে ওইসব ইখওয়ানি সাথীর সঙ্গেও সাক্ষাত হয়, যারা জেল হতে সদ্য মুক্তি পেয়েছেন। আদালত তাদের বেকসুর খালাস দিয়েছে। আমি ইশমাবীকে আমার রচনাটি দেখালাম। তিনি পছন্দ করলেন। সিদ্ধান্ত হল প্রথমে এটি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বিশেষ মজলিসে আমি পড়ব। তার পর 'আদ-দাওয়াহ'য় প্রকাশ করা হবে। তারপর আমরা আমাদের বাসায় ফিরে আসি। আসরের পর আশিরায়ে মুহম্মদিয়ার আফিসে গেলাম। সংস্থার প্রাণপুরুষ জাকি ইবরাহিমের সাথে সাক্ষাত হয়। মাগরিব নামাজ তার সাথেই আদায় করি। সেখানে মিসরের কতিপয় আধ্যাত্মিক মাশায়েখ সম্পর্কে জানতে পারলাম। এসব মাশায়েখ এবং তাদের পথিকৃৎ আহমদ সাবির সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করি। রবিবারের পর জাকি ইবরাহিম

আমাদেরকে দুপুরের খাবারের দাওয়াত করলেন। ফেরার পথে একটি পাকিস্তানি সংগঠনের অফিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। সেখানে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মুহম্মদ আবদুস সাত্তার শেঠের সাথে সালাম ও দোয়া বিনিময়ের পর বাসায় ফিরে এলাম।

শায়খ সাদেক মুজাদ্দেদীর সাথে কিছুক্ষণ

১৯ মার্চ ১৯৫১

ভোরেই জনাব সাদুদ্দীন অলিলীর সাক্ষাত পেয়ে যাই। এর পর-পরই আগমন হয় জনাব ইশমাবীর। উভয় হযরত আমার সাথেই নাশতায় অংশগ্রহণ করেন। এরপর দ্বিধা-সংকোচ ও লৌকিকতা ত্যাগ করে পরস্পর নানা আলোচনায় মেতে থাকি। কিছু সময় পর তারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমরা ইবরাহিম আমেরের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলাম। কিন্তু তিনি এলেন না। সম্ভবত অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। এর পর আমরা 'দারুল কিতাব আলআরাবি'তে গেলাম। সেখান থেকে 'শোন হে মিসর'র পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রেস-মালিক জনাব হিলমীর শরণাপন্ন হলাম। পুস্তিকাটি প্রকাশের অনুরোধ জানালে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। আমরা কাগজের মূল্য বহন করতে চাইলেও তিনি রাজি হলেন না।

আসর নামাজের পর আবদুল্লাহ কাবেলী আমাদের নিকট এলেন। আমরা তাঁর সাথে আফগান-রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহম্মদ সাদেক মুজাদ্দেদীর সাক্ষাতে বের হই। 'জামালিকে' অবস্থিত আফগান-দূতাবাসে তার সাক্ষাত লাভ করি। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সাথে কথাবার্তা হয়। তার ইমামতিতেই আমরা মাগরিব-নামাজ আদায় করি। তার দুই ছেলের সাথেও পরিচয় হয়। এই সাক্ষাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। জনাব মুজাদ্দেদী কেবল আফগান-সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না, বরং ওই মহান খান্দানেরও প্রতিনিধিত্ব করেন, ভারতবর্ষের প্রতিটি মুসলমানের উপর যার অবদান রয়েছে।

তার সাথে আমাদের প্রাচীন দীনী ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষ সাইয়েদ শাহ ইলমুল্লাহ নকশবন্দী, সাইয়েদ আদম বিননুরীর খলিফা ছিলেন। আর তিনি খলিফা ছিলেন তরিকায়ে মুজাদ্দেদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ইমামে রব্বানি শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর।

প্রফেসর মুসতফা মুমিনের সাক্ষাত

২০ মার্চ ১৯৫১

সকাল দশটা। আমরা শায়খ মুসতফা মুমিনের নিকট যাই। ১৯৪৭ খ্রিস্ট সনে দিল্লিতে তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিনিধি হয়ে সেবার তিনি এশিয়ার কয়েকটি কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন। সুহৃদ বন্ধু মাওলানা ইমরান খান নদবী আজহারীসহ তাঁর সাথে কয়েকবার সাক্ষাত করেছিলাম। আমরা একে অপরকে খুব ভালভাবেই জানতাম। এখানে এসে জানলাম তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। এখন 'আয্‌যামান' পত্রিকায় লেখালেখি করে সময় কাটান। কিন্তু আমার এই বিশেষ সাক্ষাতের পথে শুধু এই বিষয়টি প্রতিবন্ধক হয়নি। কেননা আমি তাকে একজন জবরদস্ত আলেম ও বহু স্বভাবজাত গুণের আধার হিসেবেই জানি। মানুষের জীবন বড়ই জঞ্জালপূর্ণ। বিপরীতমুখী বিভিন্ন উপাদানের সমষ্টি। সে অনায়াসে অন্যের সমস্যা বোঝতে পারে না। অন্যের চিন্তার গতি ও প্রকৃতি ধরতে পারে না। যাই হোক, আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করি। পরস্পরকে চিনতে আমাদের কষ্ট হয়নি। দীর্ঘদিন পর অতীতের স্মৃতি সজীব হয়ে উঠল। আমি তাকে কোনো লৌকিকতা না করে বললাম, আমি আপনার সাথে সেই মুসতফা মুমিন হিসেবে সাক্ষাত করছি, যিনি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিনিধিরূপে আমাদের ভারত এসেছিলেন। 'আয্‌যামান' পত্রিকার লেখক বা সাহিত্যিক হিসেবে আপনার সাথে দেখা করতে আসিনি।

দিল্লিতে স্বল্প সময় অবস্থানের কথা তিনি বারবার স্মরণ করতে থাকেন। সে সময়ের ঘটনাবলি ও সেসব অনুষ্ঠানের আলোচনা করতে থাকেন যেখানে আমরা পরস্পরে পরিচিত হই। আয্‌যামানে প্রকাশের জন্য আমার নিকট তিনি লেখা আবেদন করলেন। আমি তাকে কথা দিলাম। তিনি তার গাড়িতে করে আমাদের বাসা পর্যন্ত এলেন।

ছটা তিরিশ মিনিট। কমার্সের ছাত্র ইবরাহিম হাসান ইবরাহিম এসে কতকগুলো প্রশ্ন হাতে ধরিয়ে দিল, উত্তর দেওয়ার জন্য। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

শরিয়াহ্ অনুষদে

২১ মার্চ ১৯৫১

সকাল নটায় আমরা আজহারের শরিয়াহ্ অনুষদ দেখতে বেরুলাম। পথিমধ্যে অধ্যাপক ঈসা মানুনের অফিসে কিছুক্ষণ বসলাম। বোঝতে পারলাম তিনি একজন সজাগ, বুদ্ধিমান ও যোগ্য পরিচালক। ইয়াসিন শরিফ আমাকে জানালেন যে, তিনি ফিলিস্তিনের অধিবাসী। ফাতাওয়া বোর্ড ও কিবারুল ওলামা সংঘেরও একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য। তিনি তার ব্যক্তিত্ব-বলে এবং ছাত্রদের উপর প্রভাব বিস্তারের দরুন তার কলেজে সেসময়ও ক্লাস চালু থাকে যখন অন্য সব কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্ট্রাইক করে ক্লাস বন্ধ রাখে। তারপর আমরা 'উসুলে'র ক্লাসে অংশগ্রহণ করলাম। শায়খ আবদুল্লাহ মুসা আসনবীর গ্রন্থ 'মিনহাজুল উসুল ফি ইলমিল উসুল'[১] পড়াচ্ছিলেন। তিনি নিজেই কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং কোনো কিতাবের সহায়তা ছাড়াই তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেন। নিঃসন্দেহে তিনি এই আলোচনায় নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতার বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছিলেন। আজহারের শিক্ষাপদ্ধতি দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। আজহারের দীনী মাকাম ও অবস্থান দেখে আমরা প্রভাবান্বিত হতে পারলাম না। সেখানে এমন কোনো দীনী পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুভব করতে পারলাম না, যা আমাদের পূর্বসূরিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে এবং ওলামায়ে কেরামের জীবনচরিত, ঐতিহ্য ও কৃতিত্বের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে। মনে হল আমরা পশ্চিমাদের মডার্ন যুগের একটি আধুনিক ইউনিভার্সিটির কোনো বিভাগ প্রত্যক্ষ করছি, যেখানে পশ্চিমা ধাচের কোনো বিদ্যার তালিম হচ্ছে, যে বিদ্যায় নেই কোনো রুহানিয়াত, নেই ইলমে দীনের প্রশান্তি এবং এমন কোনো প্রাণশক্তিও নেই, যা ভারতবর্ষের মাদরাসাগুলোতে কেউ ভর্তি হয়েই অনুভব করতে পারে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যেমন- দাড়ি। আমাদের আজহারী আলেমগণ যেন দাড়ি রাখার অপ্রজনীয়তার উপর ইজমা বা একমত হয়ে গেছেন। যাই হোক, আমরা যা দেখেছি তার চেয়ে

---

[১] منهاج الوصول في علم الاصول

বেশি অনুশোচনা ও বিষণ্ন মন নিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসি। আজহার কি পারবে এই যুগে নিজের দর্শন ও পয়গাম ছড়াতে? সে কি পারবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে?

আমি মাওলানা ওবায়দুল্লাহর সঙ্গে ভারতীয় তথ্যকেন্দ্রে যাই। উদ্দেশ্য ছিল ইবরাহিম আমেরের সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং তার সোমবারের ওয়াদা অনুযায়ী না আসার কারণ অবহিত হওয়া। আমরা তথ্যকেন্দ্রে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি এলেন। সোমবার আসতে না পারার কারণে ওজর পেশ করে বললেন, আজ আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাউকে পাইনি।

তারপর আমরা ভারতীয় দূতাবাসের মিস্টার মালহব হৈত্র এবং প্রেস সচিবের সঙ্গে দেখা করি। উর্দু দৈনিক 'কওমী আওয়াজ'র সম্পাদক হায়াতুল্লাহ আনসারী ভারতের একটি সাংবাদিক টিমের সদস্য হয়ে মিসর এসেছেন। তিনি তার কয়েকজন বন্ধুকে বলেছেন, আমাকে আলি মিয়াঁ নদবীর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিন।

আমি তার সঙ্গে সাক্ষাত করি। আমার মিসর সফর, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাত এবং মিসরীয় জনগণের যেই আবেগপ্রবণতা ও ইকরামের জজবা অবলোকন করি তা তার কাছে বর্ণনা করি। আমাদের আবেদন আরববিশ্বের নিকট পৌঁছাতে আরবিভাষা কত বড় উপকার করেছে, যা আমি শিখেছি ভারতের একটি মাদরাসায়, তাও তাকে বলি। অথচ সরকারের নিকট এই মাদরাসার পরিচালকদের কোনো স্থান নেই। আমাদের দেশের শাসকদের উচিত এসব মাদরাসার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। ছাত্রদেরকে আরবি শিখার প্রতি উৎসাহিত করা। অনেক বলা ও বুঝানোর পর আরবদের এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, ভারতবর্ষের মানুষ আরবিভাষা শিখে লিখতে ও বলতে সক্ষম।

মিসরীয়দের বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, আমি আজহারে মোটেই পড়াশোনা করিনি। এবং ইতঃপূর্বে কোনো আরবদেশেও আমার সফরের সুযোগ হয়নি।

আমার আরবি শিক্ষা সম্পূর্ণ ভারতের মাটিতে হয়েছে। আর মিসরে এ-ই প্রথম এসেছি। আমি তার নিকট বিভিন্ন বিষয় এভাবে তুলে ধরার কারণ হল যাতে তিনি এ বিষয়ে কলম ধরেন। সরকারকে বিষয়গুলো অবহিত

করেন। এর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হয়ত তার এ পদক্ষেপ এই মাদরাসাগুলোর ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবে। তাদের অবজ্ঞা ভাবের পরিবর্তন ঘটবে। সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনবে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে। হয়ত এর পর আল্লাহ তায়ালা কোনো উত্তম পথ খুলে দিবেন।

বিকেল তিনটায় বহু ছাত্র আমাদের নিকট এলো। কিছু উসুলুদ্দীন অনুষদের। কিছু সাহিত্য বিভাগের আর কিছু ছিল আরবিভাষা বিভাগের ছাত্র। তারা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশ্ন করতে থাকে। আমিও সানন্দে উত্তর দিয়ে যাই।

আমরা 'মসজিদে সাইয়েদিনা হোসাইনে' মাগরিবের নামাজ আদায় করি। প্রসিদ্ধ কারী আবদুল্লাহ সায়ফীর সাথে এখানে আমাদের সাক্ষাত হয়। তার সাথে কিছু সময় জনাব আহমদ আরাফার রুমে অতিবাহিত করি। কারী সাহেব হা-মীম সাজদার কিছু আয়াত তেলাওয়াত করে আমাদেরকে কৃতার্থ করেন। আমরা কথা বলছিলাম। ইতোমধ্যে জনাব জালাল বে হোসাইন আগমন করলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে আশিরায়ে মুহম্মদিয়ায় গেলেন। এই বৈঠকে তিনি এশার নামাজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমি অনুভব করলাম অনেক দীনদার ব্যক্তির অন্তরে শহরের প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান রয়েছে। তারা এমনভাবে চেহারা দেখে কথা বলে, যা তোষামোদ ও চাটুকারিতা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

আশিরায়ে মুহম্মদিয়ায়

আমরা আশিরায়ে মুহম্মদিয়ার অফিসে যাই। জনাব জালাল বের আগমন আকস্মিক ছিল। তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন জনাব জাকি ইবরাহিম। আমরা আশিরার পরিচালকের অফিস হতে বেরিয়ে 'বক্তৃতা হলে' প্রবেশ করি। সেখানে জাকি ইবরাহিম আশিরায়ে মুহম্মদিয়ার লক্ষ-উদ্দেশ্য ও আহলে সুফ্ফার আদলে এর প্রতিষ্ঠা এবং এই শহরের মানুষের এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি অমনোযোগিতা সম্পর্কে বাগ্‌বিদগ্ধ বক্তৃতা দিলেন। তারপর জনাব জালাল বে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। তারপর প্রত্যাবর্তনের অনুমতি নেন।

জনাব জালাল বের পর আমার আলোচনার পালা। আমি আমার বক্তৃতায় উপস্থিত লোকজনকে জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্ক গড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি তাদেরকে মিসরীয় পল্লীগ্রামের দিকে সাপ্তাহিক জামাত নিয়ে বের হওয়ার নিয়ম চালু করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি। আমার পর প্রফেসর আবদুল আলিম বক্তৃতার মঞ্চে এলেন। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের মতো করে বক্তৃতা উপস্থাপন করেন, যা সাধারণত জনসাধারণের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করার লক্ষে করা হয়। তারপর জাকি ইবরাহিম উঠে তার বক্তৃতার সমর্থন করেন। আসলে এ ধরনের আলোচনা দ্বারা কারো কোনো উপকার হয় না। বক্তারও না, শ্রোতারও না। শ্রোতা এ ধরনের বক্তব্য শুনে কিছু নিয়ে ফিরতে পারে না। কারণ খোদ বক্তার মধ্যেই কোনো নুর নেই।

'বক্তার প্রতিটি নসিহত যথোপযুক্ত, আলোচনা হৃদয়গ্রাহী তবে চোখে এশকের আভা নেই, চেহারায় বিশ্বাসের জ্যোতি নেই।'

তারা এমন জ্বালাময়ী বক্তৃতায় অভ্যস্ত হয়েছে, যার একশ ভাগের এক ভাগ প্রথম যুগে যদি উপস্থাপন করা হত, তা হলে মানুষের জীবনের ধাচ সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হয়ে যেত। কিন্তু এখন জনসাধারণ এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তাদের আগুনঝরা ভাষণ শুনে বাহ বাহ বলবে। চিৎকার দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর জামা-কাপড় ঝেড়ে সেখান থেকে চলে যাবে। আমি প্রফেসর আবদুল আলিমকে বললাম, আমাদের এখন কোনো কাজ করার আগে তার ফলাফল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। যে কাজ কোনো সুফল বয়ে আনবে না তা থেকে বিরত থাকাই ভাল।

আমি তাদের অন্তর প্রভাবান্বিত দেখি। এই মুহূর্তে যেকোনো কথার উপর তাদের প্রস্তুত হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়টি বিবেচনা করে কর্তৃপক্ষ উপস্থিত সুধিমণ্ডলীর মাঝে তাশকিল শুরু করলেন। আগামী জুমায় গ্রামে দাওয়াতের কাজ নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কাছে সময় চাইলেন। সিংহভাগ উপস্থিতি সেই জামাতের সাথে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মাশোয়ারার মাধ্যমে 'আমিরা'য় যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল।

২২ মার্চ ১৯৫১

সকাল ১০ ঘটিকায় প্রফেসর বাহি আল খাওলী এসে প্রায় এক ঘণ্টা আমাদের সাথে ছিলেন। তাকে আমার রচনা 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত

ও তার ক্রমবিকাশ' পড়ে শোনালাম। তিনি তার "تذكرة الدعوة" [তাযকিরাতুদ-দাওয়াহ] গ্রন্থটি তরজমা করার জন্য আবেদন করলেন। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম।

আজহারী ছাত্রদের সাথে

আসরের পর আবদুল খালেক পাকিস্তানীর বাসায় গেলাম। আমার পৌঁছার পূর্বেই সেখানে আজহারের বিভিন্ন অনুষদের কিছু ছাত্র এসে জমায়েত হয়েছে। আমি তাদের সম্মুখে আলোচনা করলাম। প্রথমে বললাম ঈমানের খাদ্য পৌঁছানোর জন্য ঈমানি জজবা লালন করা প্রয়োজন। শহুরে পরিবেশ এর জন্য উপযোগী না। আমি তাদেরকে আরও বললাম, তরবিয়তের এই দিকে আমাদের কোনো দৃষ্টি নেই। অথচ জনসাধারণের চাইতে এর প্রতি আমাদের প্রয়োজনটা এতটুকু কম না। আমি তাদের সম্মুখে এই তরবিয়তের কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করলাম। এর মধ্যে রয়েছে ইতিহাসগ্রন্থ অধ্যয়ন, সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত ও ঘটনা পাঠ করা, শহরের এই দূষিত পরিবেশ থেকে ছাত্রদেরকে কোনো খোলামেলা জায়গায় কিংবা কোনো শহরতলীতে নিয়ে যাওয়া এবং দীনের দাওয়াতে সময় ব্যয় করা।

তাদেরকে আরও বললাম, আমরা আগামীকাল 'কানাতিরে খায়রিয়া' যাচ্ছি। তোমরা সঙ্গ দিলে দারুণ খুশি হব। সবাই যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল।

জেনারেল মুহম্মদ সালেহ হরবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবদুল খালেকের বাসা থেকে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি উপস্থিত ছিলেন না। কিছুক্ষণ আবদুল কাদের মুখতারের নিকট বসে থেকে বাসায় ফিরে এলাম।

কানাতিরে খায়রিয়া ভ্রমণ

২৩ মার্চ ১৯৫১

সকাল সাতটায় কায়রোর প্রধান স্টেশনে পৌঁছুলাম। স্টেশনটি বাবুল হাদিদে অবস্থিত। পূর্বের রুটিন মোতাবেক জনাব মুহম্মদ আবদুল ওহ্হাব বান্না ও আলি আদলি মুরশিদীর সঙ্গে কানাতিরে খায়রিয়া ভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমরা নির্দিষ্ট সময়ের পর পৌঁছায় ট্রেন ফেল করলাম। ফলে

বাধ্য হয়ে 'শিবরা' ফিরে এলাম। আমরা মাইক্রোতে চড়ে কানাতির পৌঁছুলাম। সেখানে ভারতীয় বোর্ডিং ও ছাত্রাবাসের পরিচালক মাওলানা লোকমান নদবীর সাথে সাক্ষাত হল। আমরা কানাতিরের বাগ-বাগিচায় ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। পার্কের বৃক্ষরাজি ও পুষ্প-কাননের মধ্য দিয়ে পায়চারী করতে লাগলাম। আমরা বাঁধের সুন্দর শৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করলাম, যদ্দ্বারা মিসরবাসী নীলনদ হতে প্রভূত উপকৃত হচ্ছে। তারা তাদের ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচায় পানি সিঞ্চন করছে এইখান থেকে। এই পদ্ধতির আবিষ্কারকগণ নীল-দরিয়ার পানি থেকে বাস্তবেই বড় উপকৃত হচ্ছে। অধিকন্তু এর কারণে পুরো এলাকা সবুজ কাননে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে প্রবেশ করামাত্রই কাশ্মিরের শালিমারবাগ, নাসিমবাগ এবং নাশাতবাগের কথা স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। সন্দেহ নেই- এখানকার কিছু উদ্যান সৌন্দর্য ও নান্দনিকতায় এবং সবুজ-শ্যামলতার ক্ষেত্রে কাশ্মিরের বাগানগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। তবে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, কাশ্মিরের বাগানগুলো ভিন্ন ভিন্ন প্লটে। আর প্রতিটি প্লটই নতুন আঙ্গিকে সাজানো। আমাদের সফরটি সত্যিই আনন্দময় ছিল। মূলত এ সফর ছিল প্রফেসর বান্না ও প্রফেসর মুরশিদীর ভালবাসার ফল। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক।

গতকালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছাত্রদের এক জামাতও এসে পৌঁছুল। রাস্তা হতে কালয়ুবের কিছু লোক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা স্টেশন-লাগোয়া একটি মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। মসজিদের খতিব সাহেব জামইয়্যা শারইয়্যার সাথে সম্পর্ক রাখতেন। নামাজের পূর্বে তাওহিদের উপর তিনি চমৎকার আলোচনা করলেন। জুমার পর মসজিদে সকল মুসল্লি একত্র হয়ে গেল। আমি নামাজের পর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। তারপর প্রফেসর আবদুল ওহ্হাব আমাদের জামাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারপর বলেন, এ জামাতের আলোচ্যবিষয় তাওহিদের উপর দৃঢ়তা, শিরক ও গায়রুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা এবং একমাত্র আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া ও সাহায্য চাওয়ার দাওয়াত দেওয়া। তার আলোচনার দারুণ প্রভাব লক্ষ্য করলাম।

নাকলায়

নামাজের পর আমরা নাকলা গেলাম। আমাদের পূর্বেই মাওলানা মুয়িনুল্লাহ নদবী ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে আমরা একত্রে খানা খেলাম। গ্রামের বসতভিটা চার হাজারের মতো হবে। আনসারুস্ সুন্নাহর সাথে সম্পর্ক রাখে এমন বহু লোক সেখানে আছে। সংস্থার একটি শাখাও সেখানে আছে। সেমিনারের জন্য রয়েছে ভিন্ন হল। সেখানে গিয়ে আমরা প্রথমে আমাদের ভাইদের সাথে সাক্ষাত করি। তারা আমাদের প্রতি অত্যন্ত সম্মানপ্রর্দশন করে। আমাদের চারপাশে তারা জমায়েত হয়। আমি তাদের মধ্যে প্রতিভার জ্যোতি অনুভব করলাম। আসর নামাজের পর আমি তাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা বান্দার প্রতি যত অনুগ্রহ ও দয়া করেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত ও অনুগ্রহ হল তাওহিদের দৌলত। এমন বহু লোক এই নেয়ামত হতে বঞ্চিত হয়েছে, যাদের চেয়ে বেশি নবীদের নিকটবর্তী কেউ ছিল না। এই নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে দান করেন। এটা এমন নেয়ামত যার উপর সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা আদায় করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতা আদায়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি হল মানুষের মাঝে দীনের দাওয়াত ও তার প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা।

মাগরিবের পূর্বেই আমরা ট্রেনে চড়ে বসি। জনাব সালেহ ইশমাবীর সাথে ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম সাড়ে ছ'টায় 'আদ-দাওয়াহ'র অফিসে যাব। তারপর সেখান থেকে এক বন্ধুর সঙ্গে মাকতাবুল ইরশাদের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে অন্য এক জায়গায় যাব।

'আদদাওয়াহ'র অফিসে পৌঁছুতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল। সেখানে আবদুল হাফিজ সায়ফী আমার প্রতিক্ষায় প্রহর গুনছিলেন। তার সঙ্গে জাস্টিস মুনির দাল্লাহর বাসভবনে যাওয়ার জন্য জিজার পথ অবলম্বন করি। সেখানে ইখওয়ানের বন্ধু-বান্ধব, বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও পদস্থ কর্মকর্তাদের একটি বিশেষ সভা ছিল। তাদের মধ্যে সালেহ ইশমাবী, আবদুল হাকিম আবেদিন, ফরিদ আবদুল খালেক, আহমদ হাসান বাকুরি উপস্থিত ছিলেন। আহমদ হাসান পরবর্তিতে ইখওয়ান হতে বেরিয়ে গিয়ে জামাল আবদুন নাসেরের যুগে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ওয়াক্ফ-

বিষয়ক মন্ত্রী হয়েছিলেন। মুনিয়ার দীনী ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল কর্নেল মাহমুদ লাবিব, জাস্টিস মুনির দাল্লাহ এবং আবদুল হাফিজ সায়ফীর মত ব্যক্তিত্বও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সালেহ ইশমাবী উপস্থিত সভ্যদের সামনে আমার পরিচয় তুলে ধরে বললেন, 'এই সমাবেশ উপলক্ষে তিনি একটি প্রবন্ধ প্রস্তুত করেছেন'। আশা করি উপস্থিত সভ্যগণ তা সাদরে গ্রহণ করবেন। তারপর আমি আমার প্রবন্ধ পাঠ করে শোনাই। প্রবন্ধের বিষয় ছিল- 'ইখওয়ান সম্পর্কে কিছু কথা'। উপস্থিত সকলে রচনাটি দারুণ আগ্রহ ও মনোযোগসহকারে শ্রবণ করে। তাদের চেহারায় তার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আমার রচনাপাঠ সমাপ্ত হলে জনাব আবদুল হাকিম বক্তৃতা দেন। তিনি ইখওয়ানের প্রসিদ্ধ খতিব এবং ইমাম শহিদের আপন ভগ্নিপতিও। এ ছাড়া তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইখওয়ানের সেক্রেটারি জেনারেল পদে নিয়োজিত ছিলেন। খুব সূক্ষ্মভাবে তিনি আমার প্রবন্ধের প্রতি সমর্থন জানান। তিনি বলেন, আমি এবং আমার সঙ্গীরা এই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ নির্দেশনায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আপনার এই দিকনির্দেশনার প্রতি আমরা সম্মান জানাচ্ছি। তিনি এই রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতে চাইলে আমি হাসিমুখে তা গ্রহণ করি।

২৪ মার্চ ১৯৫১

আল্লামা ইকবালের কিছু কবিতা সাবি শা'লানকে শুনিয়েছিলাম। তিনি তার সুন্দর তরজমা করে নিয়ে আসেন। আমি তাকে 'জাবেদনামা'র কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাই, যা আগামী বুধবার দারুল উলুমের অনুষ্ঠানে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করার ইচ্ছা করেছি।

তিনি এই কবিতাগুলো একটি কাগজে টাইপ করে নেন। আমি এক অবাক করা দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম। তিনি অন্ধ ছিলেন। অথচ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মত টাইপ করছিলেন। মেশিন যথাযথ কাজ করছিল। কিছুক্ষণ পরই কাগজের উপর কিছু বিচ্ছিন্ন নকশা প্রত্যক্ষ করলাম। একটির উপর আরেকটি ফুলস্টপের মত দেখতে। যেন কিছু বিন্দু পৃষ্ঠার মাঝে ছিল। সাবি শা'লান লেখাগুলো এমনভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন যেন লিখিত পত্রপাঠ করছেন। যেই ফারসি কবিতা আমি তাকে শুনিয়েছি; তা সুর দিয়ে টেনে টেনে পড়ে শোনালেন। বারোটায় আমরা শায়খ বাহি আলখাওলীর নিকট

'মুহম্মদ আলি কেল্লা'য় গেলাম। সেখানে ঘটনাক্রমে জনাব সায়িদ রমজানের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আমরা পরস্পরে মিলিত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। দীর্ঘ সময় কথা-বার্তা হল। তিনি পাকিস্তান-সরকারের পক্ষ হতে মরক্কো যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তিনি সেখানকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। এই সফরে তিনি ফ্রান্স, স্পেন এবং ইংল্যান্ডেও যাবেন। এক ঘণ্টা পর বাড়ির মালিক বাহি আলখাওলীও এসে গেলেন। ইতোমধ্যে তার মেহমানরাও উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে আবদুল খালেক, মুনির দাল্লাহ, আবুল মাজদ আবদুল মাজিদ, বানহার আবদুল হালিম ঈসা প্রমুখ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আমরা খেতে বসলাম। মনে হল বাহি আলখাওলী কিছুটা কৃত্রিমতা অবলম্বন করেছেন। আসর নামাজ সেখানে আদায় করে আমরা আমাদের বাসায় ফিরে আসি।

২৫ মার্চ ১৯৫১

আল্লামা ইকবাল সম্পর্কে একটি রচনা তৈরীর কাজে লিপ্ত ছিলাম। রচনাটি দারুল উলুমের মজলিসে পাঠ করব। সময় খুবই সামান্য, কাজ অনেক বেশি। প্রয়োজনীয় কিতাবাদি নাগালের বাইরে। বহু খোঁজাখুঁজির পর শুধু তার 'বাঙ্গেদারা' কবিতা সংকলন এবং দুটি রচনা 'হেকমতে ইকবাল' ও 'প্রাচ্যের কবি' সংগ্রহ হয়, যা প্রফেসর আনোয়ার বেগ ইংরেজিতে রূপান্তর করেছেন। সুতরাং নিজের অভিজ্ঞতা এবং এই কিতাবগুলোর উপর ভরসা করে আল্লাহ তায়ালার নামে লেখা শুরু করলাম। আল্লাহ তায়ালা সাহায্য করলেন।

যুব মাশায়েখের সাথে

জোহর নামাজের পর আমরা আশিরায়ে মুহম্মদিয়ার অফিসে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম শায়খ ইবরাহিমের বাসায়। তার বাড়িটি মিসরের এক কর্নারে অবস্থিত, যাকে নীরব শহর ও কোলাহলপূর্ণ শহরের মাঝে 'বরযখ' বলা যেতে পারে। সেখানে কিছু মেহমান পেলাম, যাদের অধিকাংশ শায়খ ও সম্মানিত ব্যক্তি। বিভিন্ন সিলসিলার শায়খ ও খলিফাদের একটি নির্বাচিত জামাত জনাব জাকি ইবরাহিম একত্র করেছিলেন। যদিও তাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল নওজোয়ান ও যুবক। তবে তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত ও আরবি সাহিত্যিক ছিলেন।

ইউনিভার্সিটি থেকে সবেমাত্র ফারেগ হয়েছেন এমন ব্যক্তিরাও ছিলেন। যেমন শায়খ তাফতাজানী। এ যুবক আজহার ও ফুয়াদ উভয় ইউনিভার্সিটি থেকে সাহিত্য বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এখন পিএইচ,ডির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত আছেন। তিনি তাফতাজানিয়া সিলসিলার শায়খ। তাকে দেখে পাঞ্জাবের 'মডার্ন শায়খে'র কথা স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠল, যিনি কোনো রকম চেষ্টা-তদবির ছাড়াই ওয়ারিশ হিসেবে শায়খের পদ অর্জন করেছেন। না তার আধ্যাত্মিক তরবিয়ত ছিল, না হয়েছিল তার ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি।

খানার পর্ব শেষে আমরা সবাই বসলাম। তখন মাশায়েখদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আমি কিছু কথা উত্থাপন করলাম। আমি তাদের উদ্দেশে বললাম, মাশায়েখদের মূল শক্তি হল রিপুর চাহিদার বিপরীত কাজ করা। খাহেশাতে নফসের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করা। বস্তুপূজারী শক্তির উপর বিজয় লাভ করা। আর এসব কিছু মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষিতা অর্জন ছাড়া সম্ভব না। শুধু এর মাধ্যমেই আজকাল বস্তুবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়া এবং তার দাবিদারদের পরাজিত করা যেতে পারে। দীনী ও আধ্যাত্মিক ফরায়েজ পালন করার ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিকতায় বিশ্বাসী লোকদের অনুসরণ-অনুকরণ করে তাদের সঙ্গে একাকার হয়ে আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসিয়ে যারা এর সুফল থেকে বঞ্চিত তারা কিছুই করতে পারবে না। দাওয়াত ও আন্দোলনে আবেগ-উদ্দীপনার প্রয়োজন নতুবা এমনভাবে আধুনিক সভ্যতা তাকে গ্রাস করে ফেলবে যেমন আজ বহু আলেম ও মাশায়েখকে গ্রাস করে ফেলেছে।

জাকি ইবরাহিমের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করি। কারণ তিনি আমাদেরকে সম্মানিত ও আপ্যায়িত করেছেন। এবং একদল শায়খের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন।

আমার ভীষণ ক্লান্তি ও জ্বর অনুভূত হচ্ছিল। তাই বাকি সময় বাসায় পড়ে থাকলাম। কিন্তু বক্তৃতা প্রস্তুত করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। তাই কিছু লিখলামও। কিন্তু অত্যধিক ক্লান্তির কারণে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। রচনা প্রস্তুত করতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এদিকে বিষয়বস্তু আমার মানোজগতকে ব্যস্ত করে রেখেছে। পুরো সময় তার জন্য কোরবান হয়ে আছে। আমার একটি অভ্যাস হল কোনো কাজ শুরু করলে তা

'কোনো রকমে' সমাপ্ত করতে পারি না। যেমনটা অনেক লেখক-সাংবাদিক করে থাকেন। আমি এর উপর সন্তুষ্ট থাকতে পারি না যে, সহজভাবে কাজ যতটুকু হয় করে নিব। বরং আমি আলোচ্যবিষয় একত্র করি। তারপর ওই কাজকে উত্তম ছাঁচে ঢেলে সাজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করি। পুরো শক্তি এর মধ্যে ব্যয় করি। এটা আমার এমন অবস্থা যে, এর বিপরীত করতে মোটেই পারি না। বক্তৃতার প্রস্তুতি আমাকে ক্লান্ত করে দিয়েছে। তবে এদ্দ্বারা অনেক উপকৃতও হয়েছি আমি।

জনাব রাশাদ আবদুল মুত্তালিব নকশবন্দী একটি খানকায় মিলাদ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমাকে নিতে এলেন। আমি অপারগতা প্রকাশ করি।

২৬ মার্চ ১৯৫১

জোহর পর্যন্ত আমি বক্তৃতা প্রস্তুতিতে মগ্ন থাকি। জোহরের সময় জনাব আবদুল্লাহ আকিল এলেন। আমাদের সাথেই জোহর নামাজ আদায় করলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি এবং তার সাথী ইয়াকুব আবদুল ওহ্হাব মিলে সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করেছিলেন। আমাদের ভারতীয় খাবারের সাথে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা তৃপ্তিসহকারে খেলাম। এই দুই বন্ধুর ইখলাস ও অকৃত্রিম ভালবাসা খানার মান ও স্বাদ দ্বিগুণ করে তুলেছে। খানা-পর্বে আমরা ছাড়াও ওই দুই ইরাকি ভাইয়ের সাথে আহমদ আসসালও ছিলেন। খানার পর আমরা কিছুক্ষণ বসি। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আমার লেখা 'ইখওয়ান সম্পর্কে কিছু কথা' পড়ে শোনালেন। তারপর আসর নামাজ পড়ে আমরা বাসায় ফিরে এলাম। বাসায় একটি বয়ান তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম।

২৭ মার্চ ১৯৫১

জোহরের পূর্বে রচনা প্রস্তুতি সম্পন্ন হল। এখন দারুণ লাগছে। খুব হাল্কা অনুভূত হচ্ছে। আসরের পর উসুলুদ্দীন, আরবি সাহিত্য ও আরবি ভাষা শিক্ষা বিভাগের তিনজন ছাত্র এলো। আমার বন্ধু মাহমুদ হাফিজ আগমন করলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত আমার সঙ্গে রইলেন। তিনি মক্কা শরিফের সরকারের প্রেসসচিব। মাগরিব নামাজের ইমামতি করলেন তিনি। তার কেরাত শোনা এবং তার পিছনে নামাজ পড়ার ব্যাপারে আমি

খুব আগ্রহী ছিলাম। তার পিছনে নামাজ পড়ে মক্কা মুকাররমায় নামাজ পড়ার রুহানিয়াত অনুভব করলাম। নামাজের পর 'জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিন' গেলাম। সেখানে মিসরের স্বনামধন্য আরবি সাহিত্যিক সাইয়েদ কুতুবের সাথে সাক্ষাত হল। প্রথম সাক্ষাতের পর তার সঙ্গে আর সাক্ষাত না করার কারণে তিনি অভিযোগ করলেন। তারপর বললেন, আমি আপনার পুস্তিকা 'শোন হে মিসর' পড়েছি। আমার বিশ্বাস মিসর অবশ্যই শুনবে।

আমি বললাম, যদি আপনি শুনে থাকেন তা হলে পুরো মিসর শোনছে। আজ সাইয়েদ কুতুবের 'আলকুরআনের শিল্প-সৌন্দর্য' গ্রন্থের উপর শায়খ আহমদ শিরবাসীর প্রবন্ধ পাঠের দিন ধার্য ছিল। তিনি চমৎকার ভঙ্গিমায় কিতাবের বিশ্লেষণ করলেন। তার সংক্ষিপ্ত ও উপকারী রচনার দ্বারা আমরা সকলেই উপকৃত হলাম। আমি সাইয়েদ কুতুবকে মঙ্গলবার প্রবন্ধপাঠের সংবাদ দিলে তিনি আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এরপর আমরা বাসায় ফিরে এলাম।

ড. ইকবাল সম্পর্কে আমার রচনা

২৮ মার্চ ১৯৫১

জোহর পর্যন্ত বক্তৃতার জন্য ইকবালের কয়েকটি কবিতার তরজমা সংযোজনে ব্যস্ত রইলাম, যা আমি দারুল উলুমের জন্য প্রস্তুত করেছি। আসরের পর দারুল উলুমের ছাত্র আহমদ আলি আবদ ও ইয়াসিন শরিফের সাথে দারুল উলুমের উদ্দেশে রওনা হই। পাঁচটার কিছু আগেই সেখানে পৌঁছে যাই। কিছুক্ষণ অফিসে বসি। দারুল উলুমের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর মুহম্মদ মাবরুকের সাথে সাক্ষাত হয়। দারুল উলুমের ইতিহাস, মিসরে তার গুরুত্ব ও কর্তৃত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করতে লাগলেন। আমাদের দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামা এবং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সেবাদান সম্পর্কেও আলোচনা হল। তারপর 'আলি পাশা মোবারক হলে' আমরা প্রবেশ করি। হলটি ছাত্র ও শ্রোতামণ্ডলী দ্বারা কানায় কানায় ভরা ছিল। প্রফেসর মাবরুক আমার পরিচয় দিলে আমি আমার রচনাপাঠ শুরু করি। ইখওয়ানদের তাকবির ধ্বনি ও আবেগময় তালির গুঞ্জরণে বক্তৃতা বার-বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। সভাটি অনেকটা ইখওয়ানি স্টাইলে ছিল। তাদেরই বিভিন্ন উপাদান ছিল অনেক বেশি।

মনে হচ্ছিল, ইকবালের কথা ও তার উপর আলোকপাত শ্রোতাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি এবং অনুভূতির অনুবাদ করছে। রচনা তাদের দীনী আবেগ-অনুভূতি উথলিয়ে দিল। এর মাধ্যমে তারা মনে দারুণ প্রশান্তি লাভ করল। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আবেগ নিয়ে তারা রচনার বিষয়বস্তুকে সাধুবাদ জানাল। রচনা সমাপ্ত হলে প্রফেসর মাবরুক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিলেন। তারপর একজন ছাত্র কসিদা পড়ল। কসিদার পর ফরিদ আবদুল খালেক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। এরপর আমরা অফিসে এসে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর 'ইকবাল, নতুন প্রজন্ম এবং মুসলিমবিশ্ব' সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এই আলোচনায় উসুলুদ্দীন অনুষদের দর্শনের শিক্ষক ড. মুহম্মদ ইউসুফ মুসাও অংশগ্রহণ করলেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সেক্রেটারি প্রফেসর আবদুল হাকিম আবেদিন, দারুল উলুমের সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর ওমর দাসুকি এবং জনাব আবদুল খালেকও এতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রফেসর ওমর দাসুকি সেইসব লোকের একজন, যারা আমার রচনা বড় বেশি পছন্দ করেন। তিনি আল্লামা ইকবালের ব্যক্তিত্বে প্রভাবান্বিত ছিলেন। তিনি রচনার মূল আত্মা ও ভিত্তি উপলব্ধি করেছেন। তিনি বললেন, ইকবালকে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে জিনিস ফুটিয়ে তোলে তা হল তার পয়গাম। তিনি তাঁর পয়গাম ও হৃদয়ের ব্যথা উম্মাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কবিতাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ ও ব্যবহার করেছেন। তবে অনুতাপের বিষয় হল আমাদের বর্তমান কবিদের নিকট সেই পয়গাম একেবারে অনুপস্থিত। তারপর তিনি বললেন, আমি আরবি কাব্যের উপর নতুন একটি বই লিখেছি।

প্রফেসর দাসুকি আমার জীবনের অন্যতম প্রিয় ও সেরা ওস্তাদ ড. তকিউদ্দীন হেলালীর শিষ্য। তিনি জার্মানির বোন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছেন। বন্ধুবর মাওলানা মাসউদ আলিম নদবী সম্পর্কে তার জানাশোনা রয়েছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'আলফাতাহ'র নিয়মিত প্রবন্ধ লেখক ছিলেন। তারপর দারুল উলুম থেকে আমরা কাদিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল ইখওয়ানের একটি তরবিয়তী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা। এশার নামাজের পর প্রোগ্রামে অংশ নিই। বাহি আলখাওলী আসতে দেরি করায় ইখওয়ানি বন্ধুগণ আমাকে বক্তৃতা

দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। আমি 'ঈমানের তরবিয়ত ও তার খোরাক পৌঁছে দেওয়া'র বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। এরপর বাহি আলখাওলী এসে দরস শুরু করলেন। কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেন। তার বক্তৃতায় ইলমের গভীরতা ছিল। আজ আমাদের বাসায় ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যায়।

কী ছিল আজহারের পয়গাম

২৯ মার্চ ১৯৫১

চারটা বাজে। আমরা জনাব আবদুল খালেকের বাসভবনে গেলাম। আজ সন্ধ্যা পাঁচটায় 'ওলামায়ে আজহার সংঘে'র সদস্যদের সাথে আমাদের সাক্ষাতের দিনক্ষণ পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। তাই অপরাগতাবশত ছাত্রদের সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপচারিতার সুযোগ হয়নি। আমরা 'ওলামায়ে আজহার সংঘে'র উদ্দেশে বের হলাম। সেখানে পৌঁছে আজহারের প্রবীণ আলেমদের একটি জামাত অপেক্ষমাণ পেলাম। শায়খ আহমদ শিরবাসী অগ্রসর হয়ে প্রস্তাব রাখলেন ভারতের সাথে যেন এই কমিটির সাথে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এবং আজহার ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন দীনী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের মাঝে পরস্পর পত্রবিনিময় হয়। দাওয়াতি সফরের ব্যবস্থা হয়। পল্লী-গাঁয়ে দীনী কার্যক্রম শুরু করা হয়।

তারপর আমি উঠে তার প্রস্তাবের যথাযথ উত্তর দিই। আজহারের বাইরে দীনী কাজের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মুসলিম উম্মাহকে দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করার এবং তাদেরকে দীনী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করি।

আমি আরও বললাম, কারো কারো ধারণা মাদরাসার শিকড় মাদরাসার ভিতরেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমি মনে করি তা মাদরাসার বাইরেও প্রসারিত। জনসাধারণের হৃদয়ের গভীরে প্রথিত। উম্মাহ যখন প্রাণবন্ত হয় তখন মাদরাসা তার খাদ্য পানীয় ওই সজীবতা থেকে গ্রহণ ও অর্জন করে। এতে মাদরাসা সবুজ ও শ্যামল হয়ে ওঠে। তরতাজা ও সমৃদ্ধশীল হয়। আর যখন তার মধ্যে খাদ্য-পানীয় পৌঁছানের যোগ্যতা ও প্রাণশক্তি অবশিষ্ট না থাকে, তখন মাদরাসার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, নিরুদ্যমভাব জেঁকে বসে। সব কিছু নিস্তেজ হয়ে পড়ে। একসময় সে তার প্রাণচাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলে। তখন কৃত্রিম পদ্ধতিতেও তাকে তরতাজা ও সবুজ-শ্যামল রাখা সম্ভব হয়

না। জাতির মাঝে যখন দীনী চেতনা ও আগ্রহ জাগ্রত হবে এবং ইলমের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হবে, তখন স্বভাবতই মাদরাসার প্রতি মানুষের ঝোঁক ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আর উম্মাহ যখন দীন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে এবং তার থেকে উদাসীন হয়ে পড়বে, তখন এর ফলে অবশ্যই সে মাদরাসা থেকেও সম্পর্কহীন হয়ে পড়বে। তাই জনসাধারণের মাঝে দীনী জাগরণ এবং ইলমের প্রয়োজনীয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করা অত্যধিক জরুরি বিষয়। যদি এই বিষয়টি পাওয়া যায়, আপনি বিশ্বাস রাখুন, তা হলে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ থেকে জাতিকে কোনো শক্তি বিরত রাখতে পরবে না। তাদের পক্ষ হতে মাদরাসায় সবদিক থেকে সাহায্য-সহযোগিতা আসবে, উৎসাহ-উদ্দীপনা পাওয়া যাবে। তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ থাকবে। যদি এমনটি না হয় তবে মাদরাসাসমূহ উম্মাহর সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হবে। জনগণ তার সঙ্গে বিদ্রোহ করবে এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করিয়ে দিবে। সাহায্য-সহাযোগিতা দূরের কথা তার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় কথা হল বিভিন্ন মুসলিমদেশ হতে আগত ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আজহারের নৈতিক দায়িত্ব। তাদেরকে ইসলামি ছাঁচে ঢেলে সাজানো, দীনী ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণ দেওয়া, আত্মশুদ্ধির প্রতি খেয়াল রাখা আজহারেরই জিম্মাদারি। মুসলিম ও অমুসলিম দেশের ছাত্রদের আজহারের প্রতি ধাবিত হওয়ার কারণ এই যে, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 'আজহার শরিফ' পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়। সবচেয়ে বড় দীনী মারকাজ। এখানে পড়াশোনা করলে সবদিক দিয়ে শক্তি অর্জন হবে। আত্মগঠন হবে। সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে। কিন্তু তাদের আশার বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় না।

অধুনা বিশ্বে আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, আরববিশ্ব ও ইসলামি দুনিয়ার যুবসমাজ স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্যহীন জীবন অতিবাহিত করছে। কোনো মুরুব্বি ও পথপ্রদর্শকের আশ্রয় তারা পাচ্ছে না। এটা দীনের জন্য অত্যন্ত মর্মন্তুদ ট্রাজেডি। আজহারের উপর একটি কলঙ্কের দাগ। আজহার যদি তার এই নওজোয়ান সন্তানদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং এই সুযোগকে গনিমত ভাবে তা হলে এটা হবে তার জন্য অনেক বড় অর্জন ও প্রাপ্তি।

কমিটির অধিকাংশ সদস্য বক্তৃতার বিষয়বস্তুর সমর্থন করল। এই খেয়াল ও চিন্তা-চেতনার সাথে একমত পোষণ করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, জুমার দিন এই বৈঠকের পরবর্তি সভায় আমার দেওয়া এসব প্রস্তাব, খেয়াল ও মতামতের উপর ভালভাবে গবেষণা করা হবে। দীনের হেফাজত করা, নাস্তিকদের অশুভ উদ্দেশ্যকে বানচাল করা এবং কুরআন রক্ষার ক্ষেত্রে 'ওলামায়ে আজহার সঙ্ঘ' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আন্‌জাম দিয়ে যাচ্ছে। তার কর্মতৎপরতার অনুমান করা যায় গ্রন্থের সমালোচনা দ্বারা। নারীদের স্বাধীনতা ও বেহায়াপনার বিরোধিতা দ্বারা, এ জাতীয় বিভিন্ন কাজের মাধ্যমেই তার পরিচয় স্পষ্ট বোঝা যায়।

এই অনুষ্ঠানে ওলামায়ে আজহার সংঘের প্রধান ছাড়াও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে 'কিবারুল ওলামা'র সদস্য শায়খ মুহম্মদ শিরবিনী, উলুমুদ্দীন অনুষদের প্রফেসর ইবরাহিম নাজ্জার, দারুল উলুমের সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক আহমদ শায়েব, শায়খ ইউসুফ শালবীর খলিফা শায়খ মাহমুদ, ড. মুহম্মদ ইউসুফ মুসা, জনাব আহমদ আলি, সালেহ বাকের, শায়খ আবদুল আজিম বারাকাতসহ আরও দু'জন বড় মাপের গবেষক সাহিত্যিক ছিলেন।

আজিজিয়ায়

৩০ মার্চ ১৯৫১

অতি প্রত্যুষে আমরা কামরা থেকে বেরিয়ে গেলাম। শায়খ মুহম্মদ আলগাজালীর সাথে বানহার উদ্দেশে রওনা করলাম। আলহাজ আবদুল্লাহ নিবরাবীর বাড়ি আমাদের গন্তব্য। আমরা তার বাসায় হঠাৎ পৌঁছাই। আমাদের এই ঝটিকা আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন। এমনভাবে আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন যেমন কোনো সম্মানিত ব্যক্তি ছোটদেরকে স্বাগত জানিয়ে বরণ করে নেন। তিনি এত আনন্দিত ছিলেন, যেন আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান হাদিয়া নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। এই ঝটিকা সাক্ষাতের আনন্দ তিনি লুকাতে পারলেন না। আমাদের নাশতা মেহমানদারির জন্য তিনি ঘরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন। তার এই অমায়িক ব্যবহার পিতৃসুলভ। আরব মেহমাননাওয়াজি স্মরণ করিয়ে দেয়।

বানহা থেকে আমরা আজিজিয়ার ট্রেনে চড়ে বসলাম। সেখানে গিয়ে দেখি ইখওয়ানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য আমার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। আমরা শোভাযাত্রার মত করে আলহাজ আবদুল্লাহ আমেরের ফার্মে গেলাম। সেখানে কিছুক্ষণ বসলাম। কাছের গ্রাম ও বসতি হতে দলে দলে লোকজন আসতে লাগল। মনে হচ্ছিল কোনো আনন্দঘন মুহূর্ত সমাসন্ন। নতুন নতুন সম্ভাষণ-শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে। এটা আজিজিয়ায় আমার স্মরণীয় দিন। তারপর আমরা বন্ধু-বান্ধবদের একটি বড় জামাতের সঙ্গে বের হলাম। আমাদের চারপাশে ছিল বড় বড় জটলা। শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী নামাজের ইমামতি করলেন। নামাজের পর তিনিই প্রথমে ভাষণ প্রদান করলেন। এরপর আমি আলোচনা করি। মসজিদ হতে বের হয়ে আবদুল্লাহ আমেরের বাসায় গেলাম। ইতোমধ্যে খাবার চলে এলো। বন্ধু-বান্ধবদের এক বড় জামাতের সঙ্গে আমরা আবদুল্লাহ আমেরের দস্তরখানে বসে খানা খেলাম। খানা-পর্ব শেষ করে বন্ধুরা আমার লেখা 'শোন হে মিসর' সংগ্রহের জন্য ঝাপিয়ে পড়ল। পুস্তক বিতরণ শেষ হলে সাক্ষাত-কার্ড গ্রহণের জন্য ভিড় লেগে গেল। অনেকেই আমাকে অটোগ্রাফ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাস দেখে আমি দস্তখত করতে লাগলাম। এখান থেকে বের হয়ে আমি জনাব গাজালীকে ছেড়ে এক ইখওয়ানি বন্ধুর নিকট অবস্থান করলাম। অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছিলাম। সেখানে মাগরিব পর্যন্ত থাকি। সেখান থেকে বের হলে আমার চারপাশে বন্ধুদের ভিড় লেগে গেল। তাদের মধ্যে আলহাজ আবদুল্লাহ মুহম্মদ মুহসিন, আলহাজ আবদুদ দায়েম শামুনী, আলহাজ আবদুল্লাহ আমেরও ছিলেন। তারা বার-বার আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে থাকেন। আর কিছুক্ষণ পর-পর নিজেদের মহব্বত ও ভালবাসার কথা প্রকাশ করছিলেন। তাকবির ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল। এভাবেই আমরা আবদুল্লাহ আমেরের ফার্মে পৌঁছুলাম। পাশের একটি মসজিদে মাগরিব নামাজ আদায় করি। সাইয়েদ রাজি তার ব্যথাভরা কণ্ঠে নামাজ পড়ালেন। এরপর আমরা আলহাজ আবদুল্লাহ আমেরের ঘরে গেলাম। আবারও সাক্ষাত-কার্ড নেওয়া শুরু হয়। কোনো কোনো বন্ধু কার্ডগুলো হেফাজতে রেখেছিল। তারা কার্ডে দস্তখত এবং আরও কিছু লিখতে অনুরোধ জানাল। আমি তাদের আকাঙ্ক্ষা পুরা করার চেষ্টা করি। কোনো কোনো বন্ধু ভারত

সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর প্রদান করি। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর আমরা স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলে সাথে বন্ধুদের এক বড় জামাত ছিল। ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত তারা আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন। যেই উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাস নিয়ে তারা আমাদের সাথে মিলিত হন তা ভারতের খেলাফত আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইখলাস ও অকৃত্রিম ভালবাসার যেই নজরানা তারা পেশ করল, তা কখনো স্মৃতি বিস্মৃত হবে না।

সাইয়েদ কুতুবের সাথে

৩১ মার্চ ১৯৫১

সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমরা হোলওয়ান গেলাম। নির্ধারিত সময়ের কিছু পর সেখানে পৌঁছুলাম। চারটা ছিল নির্ধারিত সময়। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমার লেখা 'ইসলামের কবি মুহম্মদ ইকবাল'র কথা উল্লেখ করে বললেন, 'এই রচনা পড়ে আমি দারুণ আনন্দিত হয়েছি। ইকবালের চিন্তা, দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি আমার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে গিয়েছে। এই সমতা বিষয়বস্তু ও ধ্যান-ধারণা অতিক্রম করে শব্দ, বর্ণনাভঙ্গি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। বিশেষ করে ওইসব বিষয়, যা আত্মা ও হৃদয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ইকবাল ও তার রচনাসমগ্র পড়ার ইচ্ছা আছে আমার। তাই আমার 'মহান ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ' সংকলনটি স্থগিত রেখেছি। আমার বিশ্বাস ইকবালকে নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থাবলি ও তার উক্তিমালা আপনি সংগ্রহ করবেন। আমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। তিনি আশা ব্যক্ত করলেন যে, আমি মিসর ত্যাগ করা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে তার উপর বিভিন্ন রচনা পড়ব।

তারপর সংকলনরত তার নতুন গ্রন্থ 'শান্তির ধর্ম ইসলাম'[১]র আলোচনা এলো। তিনি কিছু পাতা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তা পড়ে শোনালেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার পাক-ভারত সফর করার আদৌ তামান্না আছে কি না? তিনি বললেন, কেন নয়? অবশ্যই। দুটি কারণে আমি পাক-ভারত সফর করব। এক দীনী আর এক হল স্বভাবজাত ও প্রকৃতিগত। দীনী কারণ এই জন্য যে, সেই মহান মুসলিমজাতিকে কাছে

---

[১] الاسلام دين السلام।

থেকে দেখার আমার অশেষ তামান্না। আর স্বভাবজাত কারণ এই যে, আমার ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষের বাড়ি ছিল ভারত উপমহাদেশে। আমাদের বংশে ভারতীয় রঙ ও ঢং পূর্বপুরুষ হতেই লেগে আছে। আমরা তার কথায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ফলে জোর দিয়ে বললাম, আপনি অবশ্যই সফর করবেন। তার বাকি গ্রন্থগুলো আমাকে হাদিয়া দেন। যেমন 'সাহিত্য সমালোচনার মূলনীতি ও পদ্ধতি', 'গ্রন্থ ও ব্যক্তিত্ব'[১], 'গ্রামের ছেলে'[২]। আর আমার সাথিদেরকে হাদিয়া দিলেন 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' ও 'আলকুরআনে মহাপ্রলয়ের দৃশ্য'।

এই গ্রন্থগুলো তিনি আমাকে প্রথম সাক্ষাতে দিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিশ্ব কী হারালো' পড়ার সময়-সুযোগ কি আপনার হবে? তিনি বললেন, আমি বইটি পড়া শুরু করেছিলাম। এর প্রাথমিক অধ্যায়গুলো পড়েছিও। এতে ইসলামপূর্ব বিভিন্ন ধর্ম এবং তৎকালীন দর্শন ও নৈতিকতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। লেখাগুলো চিন্তার জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। একদিন 'নদওয়ায়ে ইলমিয়া'র এক সদস্য বইটি আমার কাছ থেকে নিয়েছে। তখন থেকে আর পড়তে পারিনি। সে এর উপর একটি প্রবন্ধ লিখবে বলে জানিয়েছে। আগামী জুমায় তার প্রোগ্রাম। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি।

তুর্কি ছাত্রদের সাথে আলাপন

১ এপ্রিল ১৯৫১

আমার বন্ধু আলি আফেন্দী মাদানীর ভাই জিয়াউদ্দীন উলুবীকে আবেদন করেছিলাম আজহারে অধ্যয়নরত তুর্কি ছাত্রদেরকে নিয়ে একটি জলসা করার জন্য, যেখানে আমি তাদের সাথে কথা বলার ও পরিচিত হবার যথেষ্ট সুযোগ পাব। তিনি 'বাগদাদ হোটেলে' মাগরিবের পর জলসার আয়োজন করেন। সেখানে তুর্কি ছাত্রদের এক বড় জামাত একত্র হয়েছে। তাদের সাক্ষাত ও পরিচয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

---

[১] كتب وشخصيات

[২] طفل من القرية

তাদের মাঝে উদ্দীপনা ও কর্মদক্ষতার নিদর্শন দেখে অন্তরে বক্তৃতা করার প্রেরণা জাগ্রত হল। তাদের উজ্জ্বল ইতিহাস, সুন্দর অতীত ও পূর্বপুরুষদের কীর্তিগাথা ও স্মরণীয় ইসলামি নিদর্শনসমূহ স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল। আমি অনুভব করলাম সেই মহান জাতির এসব নওজোয়ান মিসরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। এখানে তাদেরকে সাহস যোগানোর উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়ার কেউ নেই। ইলমের ময়দানে সহায়তা করার মতও কেউ নেই। এবং দীনী চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করার ব্যাপারেও কাউকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। তারা ওই সবুজ-শ্যামল, সুজলা-সুফলা তরতাজা শস্য ক্ষেতের ন্যায়, যার সেচ কাজ করার মত কেউ নেই। দেখাশোনার ও হেফাজত করার কেউ নেই। জীবজন্তু যেখানে অবাধে বিচরণ করে সব নিঃশেষ করে দিচ্ছে।

আমি বক্তৃতা শুরু করলাম। তুর্কিদের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরলাম। খেলাফত আন্দোলনের সময় তুর্কিদের স্বার্থে তারা যেই কষ্ট-ক্লেশ ও মসিবত মাথা পেতে নিয়েছেন তার প্রতি আলোকপাত করলাম। ইসলামের ইতিহাসে তুর্কিরা যে বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে তার উল্লেখ করলাম।

তারপর বললাম, বন্ধুরা, আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক এবং গুরুত্বপূর্ণ। অন্য মুসলিম ছাত্রদের কর্তব্য ততটুকু হতে পারে, যতটুকু আপনাদের আছে। আপনারা যখন আপনাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবেন, আপনাদের চলার পথ এত কণ্টকাকীর্ণ ও দুর্গম হবে এবং আপনারা এমন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, যা অন্যান্য মুসলিমদেশের ছাত্রদের সম্মুখীন হতে হয় না। মিসরেও আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। মিসরে থাকার এবং এখান থেকে দীনী জ্ঞান অর্জন করার সুবর্ণ সুযোগ আপনাদের হয়েছে। ইসলাহ ও ইসলামকে জানতে এরচেয়ে উত্তম সুযোগ আপনাদের আর হবে না। সাথে সাথে আপনাদের এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, এখানে আপনাদের সাহায্য করার কেউ নেই। আপনার কর্তব্যের অনুভূতি এবং নিজের আবেগ-উচ্ছ্বাস আপনাকে এখানে সাহায্য করতে পারে। তাই আপনাকে পুরোপুরি মুখলিস হতে হবে। অফাদার হতে হবে। আপনি মনে করবেন, প্রত্যেকটি মুহূর্ত, যা আপনি এখানে অতিবাহিত করছেন, তার মালিক আপনার দেশ ও জাতি। তা শুধু আপনার জাতির কল্যাণেই ব্যয়

করতে পারেন। এবং অবশ্যই তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে আপনি সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় দিবেন, যা আপনাকে অনর্থক ধ্বংস ও নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাবে। খুব বুঝে-শুনে খরচ করবেন।

আপনি ওই জাতির ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবেন- যারা আপনার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেছে। আশার প্রদীপ জ্বেলে আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। ফুলের মালা দিয়ে আপনাকে বরণ করতে অপেক্ষা করছে।

তারপর আমি তাদেরকে বললাম, তারা যেন এই সুবর্ণ সুযোগকে গনিমত ভাবে। এদ্‌দ্বারা উপকৃত হয়। আমি তাদেরকে কিছু পরামর্শ ও উপদেশ দিলাম। তাদের উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে একটি কথা এও ছিল, আপনাদের সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল আপনি ইসলামকে বোঝবেন ও জানবেন। এর পদ্ধতি হল, আপনি কুরআন, হাদিস ও নবী মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন। আমি তাদের সামনে কুরআন তেলাওয়াত করলাম এবং তাতে চিন্তা গবেষণার পদ্ধতি বর্ণনা করে বললাম, কুরআন এভাবে তেলাওয়াত করুন যেন তা এখনি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। এই তেলাওয়াতের পদ্ধতি দ্বারা আপনি কুরআন পাকের সঠিক উদ্দেশ্য ও দিকনির্দেশনা অনুধাবন করতে পারবেন। কুরআনের সঠিক স্বাদও অনুভব করতে সক্ষম হবেন।

আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক তরবিয়তের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। ফরজের পাবন্দি করবেন। চরিত্রের স্বাধীনতা থেকে বেঁচে থাকবেন। সাথে সাথে সময় নষ্ট করা থেকেও বিরত থাকবেন। অনর্থক গল্পগুজবে সময়ের অপচয় করবেন না। সর্বদা আপনার ধ্যান-ধারণা ও খেয়াল থাকা প্রয়োজন যে, আপনি যখন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করবেন, তখন দীনী খেদমত কীভাবে আন্‌জাম দিবেন, এখন থেকেই আপনি তার প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এই প্রস্তুতির ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন মুসলিম দেশের দীনী আন্দোলন, মুজাদ্দিদগণের ইতিহাস ও তাদের শিক্ষার ধরন এবং দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন করবেন। এখানে অবস্থান করেই তার চর্চা করা প্রয়োজন। পরবর্তী কোনো সভায় কয়েকটি মুসলিমদেশের কিছু আন্দোলনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার প্রয়াস রাখব, ইনশাআল্লাহ।

এরপর আমি তাদেরকে এমন কিছু কিতাব অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিলাম, যা ইসলামি চিন্তা-চেতনার বিশ্লেষণ করে এবং দীনের প্রাণশক্তিকে সুদৃঢ় করে; ইসলামিক গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন এবং সেসব সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে, যা এখন প্রতীয়মান হচ্ছে। অনেক ছাত্র সেসব কিতাবের নাম নোট করে নিল এবং যেসকল গ্রন্থের পরামর্শ দিয়েছি সেগুলো পড়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করল।

তারপর আলি আরসালান নামের এক তুর্কি ছাত্র আমার বক্তৃতা তার ভাষায় আলোকপাত করল। তার চেহারা থেকে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার দীপ্তি ঠিকরে পড়ছিল। এই সভায় উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আহা এমন জলসার ধারা যদি চালু থাকত! সুদান, মরক্কো, ফিলিস্তিনসহ বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা এমন সভার আয়োজন করত! আমার দৃষ্টিভঙ্গি হল শুধু ইলম ও জ্ঞানচর্চা কখনোই যথেষ্ট নয়, যদি তার সাথে না থাকে কোনো পয়গাম, চিন্তাধারা ও উদ্দেশ্য। আর এগুলো ওই সকল অনানুষ্ঠানিক সভা-সমাবেশ এবং সেসব ব্যক্তিত্বের অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্ভব না, যারা শুধু ফি সাবিলিল্লাহ [আল্লাহর ওয়াস্তে] এই খেদমত আন্‌জাম দেন।

২ এপ্রিল ১৯৫১

বন্ধুবর শায়খ আলি মাহমুদ শরিফ শিবরায় তার ঘরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছেন। তিনি তার বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদেরকে নিয়ে সেখানে উঠেছেন। সেই নতুন ঘরে আমাদেরকে খাবারের দাওয়াত করলেন। আমরা তার দাওয়াত সানন্দে গ্রহণ করলাম। তার অন্য বন্ধু-বান্ধবদেরকেও দাওয়াত করা হয়েছে। জোহরের পর পর্যন্ত আমরা সেখানেই অবস্থান করি। এরপর অন্য কোথাও না গিয়ে বাসায় চলে আসি। আজ আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। গতরাতে খুব সামান্য ঘুম হয়েছে। আজ আর কোথাও যাইনি।

আবদুর রহমান আজ্জামের সঙ্গে সাক্ষাত

৩ এপ্রিল ১৯৫১

প্রত্যুষে মুহম্মদ রাশাদ আবদুল মুত্তালিব আমাদের এখান দিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে, ১২টার সময় জনাব আবদুর রহমান আজ্জামের

সাথে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা আরব লিগের অফিসে গেলাম। অফিসে আমার আগমনের সংবাদ তাকে কেউ দেয়নি। নির্দিষ্ট সময় শেষ হওয়ার প্রাক্কালে এক কর্মচারী তাকে সংবাদ দিল। সাথে সাথে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, আপনার আগমনের কথা কেউ আমাকে জানায়নি। এখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সালাহুদ্দীনের সাথে সাক্ষাতের সময়। সুতরাং অন্য কোনো দিন আমাদের সাক্ষাত হবে ইনশাআল্লাহ। তখন দীর্ঘ সময় নিয়ে আলোচনা করব। আমিও সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিলাম। তাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি ও অন্য কয়েকটি গ্রন্থ হাদিয়া দিলাম। সাথে মাহমুদ শাবিল মক্কীর চিঠিও তার খেদমতে পেশ করলাম। তিনি এত আগ্রহ ব্যক্ত করলেন যে, পরবর্তী সাক্ষাতের পূর্বেই বইয়ের শেষ অধ্যায়টিও সমাপ্ত করবেন।

আসরের পর শায়খ আহমদ শাকেরের নিকট গেলাম। নয়া মিসরে অবস্থিত তার বাসায় তার সাথে সাক্ষাত করলাম। মাগরিব পর্যন্ত তার ওখানেই ছিলাম। তিনি আশা ব্যক্ত করলেন, যেদিন আমরা উপযুক্ত মনে করব তার বাসায় দুপুরের খানায় অংশ নেব। সেদিন আমাদের বন্ধু সৌদি-সরকারের শিক্ষাসচিব উপস্থিত থাকবেন। শায়খ মুহম্মদ বিন মানের ছেলে আহমদও উপস্থিত থাকবেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে তার সাথে কথা বলে সময় নির্ধারণ করবেন। আমি আমার আব্বাজানের লেখা معارف العوارف। [মাআরিফুল আওয়ারিফ–বিশ্বকোষ] গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলি। প্রকাশনার একটি বড় অংশ আগেই সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে দারুল মাআরিফ গ্রন্থটি ছাপতে অনীহা প্রকাশ করে। সেখান থেকে আমরা বাসায় ফিরে আসি।

ফিলিস্তিনি ছাত্রদের সভায়

৪ এপ্রিল ১৯৫১

ফিলিস্তিনি ছাত্রদের একটি সভা আয়োজন করতে জনাব ইয়াসিন শরিফকে কয়েকদিন পূবে আবেদন করেছিলাম। তিনি তাদের সংস্থার সাপ্তাহিক সেমিনারে সুযোগ বুঝে আমাকে আহ্বান করলেন। আমি সেই মজলিসে উপস্থিত হয়ে কিছু কথাও বলি। ক্লান্ত থাকার কারণে বক্তৃতায় তেমন মন বসছিল না। তবু সুযোগ হাতছাড়া করতে মন চাচ্ছিল না।

তাদের সম্মুখে যেসব আলোচনা করি তার মধ্যে একটি কথা এও ছিল যে, আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আসার কিছু সহায়ক কারণও আছে, যা কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তার মধ্যে একটি হল ঈমান ও ইখলাসের সাথে এলায়ে কালিমাতুল্লাহর [আল্লাহর কালিমা বুলন্দ] জন্য নিজের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করা। ولينصرن الله من ينصره আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন যে আল্লাহ তায়ালাকে সাহায্য করবে। [সুরা হজ, ৪০ আয়াত]। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা ব্যয় করে। জিহাদ ও আন্দোলনের জন্য ঈমান ও ইখলাসের প্রয়োজন অত্যধিক, যার উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং তার বিধানের উপর আমল করা।

মুসলিম নেতাদের সমালোচনা

অনুতাপের বিষয় হল, আমাদের অধিকাংশ নেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও দলের নীতিনির্ধারকগণ এই চিন্তা-চেতনা হতে মুক্ত। তারা নিজস্ব স্বার্থ, দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা বা জাতীয়তাবাদের আবেগে নিমজ্জিত। তারা ইউরোপের রাজনৈতিক আন্দোলন এবং বিপ্লবের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছে। মুসলিম দেশেও তা বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা আঁটছে। জিহাদের ময়দানেও তা প্রয়োগ করার সর্বাত্মক চেষ্টা-তদবির চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সুন্দর সুযোগ দিয়েছিলেন। তারা এর সদ্ব্যবহার করেনি। তাই তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। এখন পুনরায় দীনী চেতনা সজীব করতে হবে। এর ফজিলত ও সাওয়াবকে সামনে উপস্থিত রেখে কাজ করতে হবে। যাতে আমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও তাওফিকের হকদার হতে পারি।

কিভাবে ফিলিস্তিন মুক্ত করব

আমি তাদেরকে বললাম, আপনারা এ কথায় পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন যে, কোনো সরকার বা জাতি আপনাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। কিন্তু আপনাদের অন্তরে যখন সততা আসবে, যখন আপনাদের হৃদয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ও সংকল্প থাকবে এবং ফিলিস্তিন-সঙ্কট আপনাদের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও চাওয়া-পাওয়ার উপর ছেয়ে যাবে, তখন নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করতে সক্ষম হবেন। আপনাদের এবং অন্যসব দেশ ও জাতির

উদাহরণ সেই কুকুর ও হরিণের ন্যায়। কুকুর হরিণকে বলল, আমি তোমাকে কেন ধরতে পারি না অথচ আমি অনেক দ্রুত দৌড়াই? হরিণ উত্তরে বলল, তার কারণ হল তুমি দৌড়াও তোমার মুনিবের জন্য আর আমি দৌড়াই নিজের জন্য।

এসব সরকার ফিলিস্তিন সমস্যা এত গভীরভাবে দেখবে না যতটুকু আপনারা দেখবেন। সুতরাং আপনাদেরকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে। নিজেদের মাতৃভূমিকে শত্রুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনার আগ পর্যন্ত এ দায়িত্ব আপনাদেরকেই আন্‌জাম দিতে হবে।

আরবিভাষা বিভাগের ছাত্র ফাতহি বিলআবী এই বক্তৃতার উপর পর্যালোচনা করল। সে অত্যন্ত সাহিত্যপূর্ণ ও আবেগময় ভাষায় আলোচনা করল। ভবিষ্যতে সে একজন উঁচু মাপের বক্তা হয়ে যদি শুধু বক্তৃতার মাধ্যমেই এই মহা সঙ্কটের সমাধান দিতে পারত! কিন্তু বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো।

তুর্কি ছাত্রদের সাথে আরেক সন্ধ্যা

৫ এপ্রিল ১৯৫১

আজ জনাব বাহি আলখাওলী, শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী ও আলহাজ হিলমি মিনাবীর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছি। আমাদের সাথেই তারা নাশতায় অংশগ্রহণ করেছেন। অত্যন্ত আনন্দদায়ক সাক্ষাত। আমি সারাদিন আজহারের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থাপন করার জন্য আল্লামা ইকবালের উপর রচনা তৈরীতে মগ্ন ছিলাম। জানি না কেন যেন রচনায় একদম মন বসছে না। লেখা খুব কঠিন ও মুশকিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আমি আমার চিন্তা-চেতনার সাথে এমনভাবে অবিরাম লড়ে যাচ্ছি যেমন গভীর কূপ হতে পানি উত্তোলনকারীকে এবং পাথুরে জমিন খননকারীকে লড়তে হয়। এদিকে রচনা প্রস্তুত করাও জরুরি। কারণ রচনাপাঠের প্রতিশ্রুতি আমি দিয়ে দিয়েছি। ভার্সিটির ছাত্রদের সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ার এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাচ্ছিলাম না। আল্লাহই সাহায্য করবেন।

আসরের পর আবদুল খালেক পাকিস্তানীর নিকট গেলাম। তিনি কিছু ছাত্রকে দাওয়াত করেছিলেন। কিন্তু সময় না থাকার কারণে তাদের সঙ্গে

বসতে অক্ষমতা প্রকাশ করি। পাঁচটায় ওলামায়ে আজহার সঙ্গে যাওয়ার বিষয়টি আগেই নির্ধারিত ছিল। আমরা সেখানকার উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে আজহারের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। মাগরিব পর্যন্ত তাদের সাথে অতিবাহিত করি। আগামী শুক্রবার অনুষ্ঠিত তাদের একটি সভায় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসি।

সন্ধ্যা সাতটার সময় আমরা বাগদাদ হোটেলে যাই। এখানে তুর্কি ছাত্রদের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। সমস্ত ছাত্র উপস্থিত হলে বক্তৃতা শুরু করি। দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তারা দাওয়াতের কাজ কোন পদ্ধতিতে করবে সে সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করি। তাদেরকে উপদেশ দিই যে, দেশে গিয়ে জীবনের নানামুখী ব্যস্ততায় প্রথমেই আবদ্ধ হবে না। অন্য কারো দাওয়াতের সহজ শিকার হবে না। অন্য কোনো কাজে জড়াবে না। এসবের পূর্বে সর্বপ্রথম দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে মনোনিবেশ করবে। আমি তাদেরকে আরও বললাম, দাওয়াত ও তাবলিগের মাধ্যমে জাতি ও জনসাধারণের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্ক অত্যন্ত জরুরি।

সাধারণ শিক্ষিতদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করা

তাদের সামনে আমি ভারতবর্ষে চালু হওয়া দীনী দাওয়াত, তার কর্মপদ্ধতি, শহর ও গ্রামে সাপ্তাহিক ও মাসিক সফরের নেজাম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ইউনিভার্সিটি ও কলেজের ছাত্র, বিশেষ করে শিক্ষিতসমাজের সাথে বিশেষ সাক্ষাতের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ইলমি মজলিস ও সাহিত্য আসরের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টির উপকারিতা আলোচনা করি। এমন কিছু দীনী গ্রন্থও রচনার কথা বলি, যা তাদের মাঝে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক হবে এবং তাদের মেধাকে দীনের দিকে আকৃষ্ট করবে। আমি তাদের সম্মুখে শিক্ষিত ও যুবসমাজের প্রতি উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা এবং তাদেরকে ইসলামি শিক্ষা ও তরবিয়ত না দেওয়ার কারণে দেশ ও জাতির উপর যেসব মসিবত ও পরীক্ষা নেমে এসেছে তার প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করি। তাদের হৃদয় ও দেমাগে প্রভাব বিস্তারের পদ্ধতি বর্ণনা করি। তারপর এই কাজের জন্য যে যোগ্যতা, জ্ঞান ও অধ্যয়ন, কৃষ্টি ও সভ্যতার

প্রয়োজন তা চিহ্নিত করি। এই উভয় শ্রেণীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির প্রতি জোড় তাগিদ দিয়ে বলি, এ জন্য নিজেকে সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও কোরবানি স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। যাতে আপনরা আপনাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে সেসকল মসিবত থেকে রক্ষা করতে পারেন, যা অতীতে দীন থেকে রাজনীতিকে পৃথক করার জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। তারা দীনদার ও নতুন প্রজন্মের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে ধর্মভীরু শ্রেণীকে জীবনের ময়দান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার জন্য সরকারকে বদদীনের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

আলহামদু লিল্লাহ, আমার এই বক্তৃতা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

জনাব জিয়াউদ্দীন আমার ভাষণের বিশেষ বিশেষ অংশ নোট করে নিয়েছেন এবং তুর্কি তার ভাষায় তরজমা করে পরবর্তী সেমিনারে পড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জনাব আলি আরসালান তুর্কিভাষায় বক্তৃতার কিছু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেন। অন্য ছাত্রগণ অত্যন্ত আনন্দ ও সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণও করল।

পল্লী ভ্রমণ

৬ এপ্রিল ১৯৫১

প্রত্যুষে আমরা আশিরায়ে মুহম্মদিয়ার কার্যালয়ে গেলাম। সেখানে জনাব জাকি ইবরাহিম ও তার সাথীদের সঙ্গে সাক্ষাত করি। আমরা 'আমিরা'র উদ্দেশে 'হামুল' সফর করি। সবুজ-শ্যামল ক্ষেত-খামারের মধ্য দিয়ে আমরা পথ অতিক্রম করি। পরিবেশ ছিল চমৎকার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মৃদমন্দ হাওয়া তো আছেই। অত্যন্ত আনন্দদায়ক ছিল এই ভ্রমণ। মনে হচ্ছিল আমরা ভারতের কোনো সুন্দর মনোরম গ্রামে আছি। আমরা একটি মসজিদে গেলাম। জাকি ইবরাহিম নামাজ পড়ালেন। নামাজের পর আমি বক্তৃতা করি। পরে জনাব আবুল মাওয়াহিব মুহম্মদ ওহাবী বক্তৃতার বিশ্লেষণ করেন। জনাব মাহমুদ জিসার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আহলে বাইতের শানে একটি কাসিদা আবৃত্তি করেন। তারপর আমরা জনাব আহমদ মুসতফা ফকী'র বাসায় যাই। তিনি তার এলাকার মোড়ল। দুপুরের খানা তার ওখানেই হয়। খানা সাদাসিধে কিন্তু সুস্বাদু ছিল। তারপর শিবরা বালুলায় অবস্থিত মানুফিয়া জেলার

প্রখ্যাত বক্তা জনাব সাবের ফকীর বাড়িতে তার শুশ্রূষার জন্য যাই। আমাদের আগমনে তিনি দারুণ আনন্দিত হন। অত্যন্ত হৃদ্যতার পরিচয় দেন। তারা এখানেই রাত কাটাতে ও বক্তৃতা প্রদানের অনুরোধ করেন। আমি অক্ষমতা প্রকাশ করে হামুলের স্টেশনের দিকে রওনা হই। আমাদের সাথে শিবরা বালুলার বহু লোক স্টেশন পর্যন্ত আসে। আমরা ট্রেনে চড়ে বসলাম। মাগরিব ও এশার মাঝামাঝি সময়ে কায়রোয় পৌঁছাই।

ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়নের অফিসে

৭ এপ্রিল ১৯৫১

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসী জনাব জুলকিফল মুহম্মদের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়ন ভবনে ইন্দোনেশিয়ানদের একটি সেমিনার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেখানে ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রদের উদ্দেশে শুধু আমি ভাষণ দেব। জনাব জুলকিফল ইতঃপূর্বে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' পড়েছেন। এর বিষয়বস্তুর সাথেও তিনি একমত পোষণ করেন। ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়নে আমাদেরকে স্বাগত জানানো হয়। লাজুগোলি ময়দানে অবস্থিত ইউনিয়ন অফিসের উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে জুলকিফল ও তার সাথীরা আমাদেরকে লালগালিচা সংবর্ধনা জানালেন। ইন্দোনেশিয়ান ভাইদের আবেগ-উচ্ছ্বাস ও মেধার ব্যাপারে আমি আগে থেকেই প্রভাবান্বিত ছিলাম। এখানকার কিছু ছাত্র নদওয়াতুল ওলামায় পড়াশোনা করেছে। তারা নিজেদের মেহনত, প্রতিভা, ভাব-গাম্ভীর্য ও চেষ্টা-প্রচেষ্টায় অনেকের চাইতে অগ্রগামী ছিল। সুমাত্রার মেধাবী ছাত্র মাওলানা মুহম্মদ আদনান নদবীর কথা আমার বার বার স্মরণ হয়। মাওলানা আদনান সেসব কীর্তিমান ছাত্রের একজন, যারা দারুল উলুম থেকে উপকৃত হয়েছে। ভারতে থেকে উর্দু পড়েছে। ইকবালের রচনা অধ্যয়ন করেছে। এমনকি সে 'ভারতবর্ষে ইসলামি সভ্যতা' শিরোনামে উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেছে।

মুসলিমদেশের পথপ্রদর্শনে যুবসমাজের অবদান

আমরা অল্প সময় ইউনিয়নের অফিসে বিশ্রাম নিই। উপস্থিত লোকজনের সাথে পরিচিত হই। তাদের অধিকাংশ আজহারের ছাত্র। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে লেকচার হলে প্রবেশ করি। ফুআদ আল

আউয়াল ইউনিভার্সিটির 'আইন অনুষদে'র এক ইন্দোনেশিয়ান ছাত্র আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। তার জন্ম কায়রোতে। তার ভাষা আরবি এবং সাবলীল সাহিত্যময়। তারপর আমি উঠে আলোচনা শুরু করি।

আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলি, এই মুহূর্তে মুসলমানদের দৃষ্টি ইন্দোনেশিয়ার নতুন সরকারের প্রতি নিবদ্ধ। দেশটি নিজের ভাবমর্যাদা ও ইসলামি প্রেরণায় পাকিস্তানের অনুরূপ। যদি এই দেশ দুটি উঠে দাঁড়ায়, তা হলে মুসলমানদের বড় একটা শক্তি হবে। ইতিহাসের পাতায় নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারবে। চলমান সময়ে ইসলামি পয়গামের হক আদায় করতে পারবে। কিন্তু এইসব বিষয় উভয় দেশের শিক্ষাকে ইসলামি ছাঁচে ঢেলে সাজানো ব্যতীত সম্ভব হবে না। সরকার ও আদালতের লোকদের মধ্যেও ইসলামি পয়গামের উপর পূর্ণ বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা থাকতে হবে। তার মূল আত্মা সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। এ জন্য সরকারের যাবতীয় মাধ্যম এবং জাতীয় শক্তিকে ইসলামি জীবনবিধানের দিকে ধাবিত করতে হবে।

হে ইন্দোনেশিয়ান বন্ধুগণ, এই দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার তোমাদের উপর সবচেয়ে বেশি। যদি তোমরা ইসলামি শিক্ষাকে নিজেদের জন্য আপন করে নাও এবং নিজেদের দেশে তার উত্তম নমুনা পেশ কর; যদি সরকার ও দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনাকারী ও শিক্ষিতসমাজের সাথে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোল; এবং এভাবে যদি তাদের দিল-দেমাগে ভাল প্রভাব সৃষ্টি করতে পার, তা হলে তোমরা তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, কৃষ্টি-কালচার ও সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে। যখন তোমরা এ সকল বিষয় ও ব্যক্তিকে ইসলামি পয়গামের অনুসারী করে নিবে, একে ইসলামি চিন্তা-চেতনা ও তরবিয়তের মাধ্যম বানাবে এবং যখন তোমরা নিজেদের মেধা, যোগ্যতা, ইলমি প্রভাব ও সুন্দর শিষ্টাচারের মাধ্যমে দেশের চিন্তা-চেতনা, শিষ্টাচার ও সভ্যতার মাঠে কর্তৃত্ব সৃষ্টি করবে তখন তোমাদের মাধ্যমে এ বিশাল সাম্রাজ্য ইসলামি ধ্যান-ধারণাকে আপন করে নিবে। ইসলামের অনেক বড় খেদমত তোমরা আন্‌জাম দিতে পারবে। কিন্তু যদি তোমরা ইলমি ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি এবং স্বীয় পয়গামের হক আদায়ে অলসতা কর, দেশ ও জাতি, সরকার ও শিক্ষিতসমাজের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে না পার তা হলে তাদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সেই সরকারের দ্বারা ইসলামের কোনো উপকার আশা করা যায় না। সফল রাষ্ট্র

তো সেটা যার ভিত্তি হবে ইসলাম, যা পরিচালিত হবে দীনের সঠিক নমুনায়, যার আদর্শ হবে খিলাফত আলা মিনহাজিন নাবুওয়াহ্।

শুরুতে যিনি আমার পরিচয় তুলে ধরেন তিনি বক্তৃতার উপর চুলচেড়া বিশ্লেষণ করেন। তারপর তিনি আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন। আমি তার উত্তর দিই।

সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রুমে চলে আসি। তখন জনাব জাকি ইবরাহিম ও তার বন্ধু মিসরের তিজানিয়া তরিকার শায়খ হাফেজ আহমদ তিজানী আসেন। মরক্কোয় হাফেজ তিজানীর মুরিদ হাজারের বেশি। তিনি আমার আগমনের সংবাদ শুনেছেন। তার সঙ্গে মক্কায় সাইয়েদ আব্বাস মালিকীর বাসায় আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের মুসিকীর বাসায় গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে, আমরা ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়নে এসেছি। সাথে সাথে তিনি সেখান থেকে এখানে চলে আসেন। আমরা কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। তারপর ইন্দোনেশিয়ান ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে আসি। শায়খ তিজানীও আমাদের সঙ্গে বাসায় আসেন। কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকেন। মঙ্গলবার এখানে আসার ওয়াদা করে তিনি চলে যান।

মহল্লায়ে কুবরা ভ্রমণ

৮ এপ্রিল ১৯৫১

শায়খ আহমদ উসমান ও শায়খ আবদুর রহমান আলি জানুর সাথে মহল্লায়ে কুবরা ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেখানে দুইদিন অবস্থান করব। কায়রোর বাবুল জাদিদে অবস্থিত স্টেশন মসজিদে আমাদের একত্র হবার কথা ছিল। আমরা নির্ধারিত সময়ে সেখানে পৌঁছে যাই। যথাসময়ে আহমদ উসমানও এলেন। অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু করণে কায়রো যাওয়া এ মূহূর্তে তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এ সফরের ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তার এই পরিস্থিতির কারণে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও বেদনাহত হলাম। আমরা আশা করেছিলাম আমাদের এই সফর তাবলিগ জামাতের একটি নমুনা হবে। এতে আমরা ভ্রমণ, দাওয়াত ও তাবলিগের মাঝে সমন্বয় সাধন করব। এখানে আমরা দাওয়াত ও জনসাধারণের সাথে মিলিত হওয়ার উপমা পেশ করব।

বাধ্য হয়ে আমরা তার আপত্তি গ্রহণ করে নিলাম। আবদুর রহমান জানু আমাদের সঙ্গ দিলেন। তিনি তার বন্ধু ডাক্তার মুহম্মদ সায়িদকে টেলিফোনে আমাদের সফরের বৃত্তান্ত অবগত করলেন। তিনি দন্ত্যরোগ বিশেষজ্ঞ এবং জামইয়্যা শারইয়্যার সদস্য। মহল্লায়ে কুবরা শাখার প্রধান। টেলিফোনে আমাদের আসার কথা তাকে জানানো হয়েছে। ডাক্তার সায়িদ সবান্ধবে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা জামইয়্যা শরইয়্যার মসজিদে মাগরিব নামাজ আদায় করে তার বাসভবনে গেলাম। সেখানেই ডিনার হয়। জনাব জানু একটু পরই মিসর চলে আসেন। আমরা আমাদের মেজবান ও জামইয়্যার মহল্লায়ে কুবরা শাখার প্রধান ডাক্তার সায়িদের সঙ্গে জামইয়্যার মসজিদে এশার নামাজ আদায় করি। আমার জীবনের সবচেয়ে দীর্ঘ নামাজ ছিল এটি। নামাজের পর আমি বক্তৃতা পেশ করি। বক্তৃতায় পাক-ভারতে চালু হওয়া দাওয়াত ও তাবলিগের যে মহান কাজ আমরা আন্জাম দিচ্ছি এবং তার যে ফলাফল সামনে আসছে তার বিস্তারিত আলোচনা করি। উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ মহল্লায় দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ চালাতে এবং গ্রামাঞ্চলে জামাত নিয়ে বের হতে উৎসাহিত করি। আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানিতে বক্তৃতার ভাল প্রভাব পড়েছে। মনে হচ্ছিল মহল্লায়ে কুবরার জামইয়্যা শারইয়্যার বন্ধুগণ কোনো কর্মময় দাওয়াত ও আন্দোলনের জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন। ডা. সায়িদ এই দাওয়াতকে স্বাগত জানালেন এবং এই কাজের জন্য নিজেকে সোপর্দ করলেন।

এই মজলিসে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, যা একটি সুন্দর পরিবেশকে সম্পূর্ণ পঙ্কিল করে দেয়। সেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কিছু সাথীও ছিলেন। আমার বক্তৃতার মাঝে কিছু কথায় অধিক প্রভাবান্বিত হয়ে তারা ইখওয়ানের প্রসিদ্ধ তাকবির 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ'র ধ্বনি তুলল। ফলে ডা. সায়িদ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, যারা এই তাকবির ধ্বনি দিতে ইচ্ছুক তারা মসজিদ হতে বেরিয়ে যান। জনাব ইউসুফ কারজাবী আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। ইখওয়ানি বন্ধুদের সাথে তিনিও উক্ত ঘোষণায় মসজিদ হতে বেরিয়ে যান। এই ঘটনায় আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এই ব্যাপারে জনাব সায়িদ আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে আমি বললাম, 'শান্তিপূর্ণভাবেও

বিষয়টি সমাধান করা যেত।' এখন তার রাগ প্রশমিত হল। তিনি লজ্জিত হলেন। অনুতপ্ত হয়ে বললেন, আমি অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। তার অকপট স্বীকারোক্তি ও ইখলাসের জজবায় আমার খুশি লাগল। এরপর আমরা বাসায় চলে এলাম। রাত মোটামুটি আরামেই কাটে।

৯ এপ্রিল ১৯৫১

ফজর নামাজ জামইয়্যার মসজিদে আদায় করলাম। নামাজের পর ডাক্তার সায়িদ আমাকে বললেন, দরস দিন। আমি আদেশ পালন করলাম। দরসের পর এশরাকের দুরাকাত নামাজ উপস্থিত সকলেই আদায় করলাম। তারপর মসজিদে কিছুক্ষণ কুরআনের মশক চলল। বোঝতে পারলাম ডাক্তার সায়িদ আপন কাজে খুবই তৎপর এবং মিসরে জামইয়্যা শারইয়্যার শাখাগুলোর মধ্যে মহল্লায়ে কুবরাই সবচেয়ে বেশি কর্মতৎপর। তার কোরবানি ও আত্মত্যাগের বদৌলতে শাখাটি আজ উন্নতির মহাসড়কে চলতে শিখেছে। সাধারণত কোনো সংস্থার অগ্রগতি তার প্রধান পরিচালকের আত্মত্যাগ ও কর্ম-উদ্দীপনার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। যখন কোনো জামাতে বিচক্ষণ ও কর্মতৎপর আমির থাকেন তখন অন্য সাথীদের মধ্যেও এর ভাল প্রভাব পড়ে। আর যদি আমির এর উল্টো হয়, তখন ফলাফলও এর বিপরীত হয়।

আগামীকাল যেই প্রবন্ধটি পাঠ করব তার রচনা ও পরিপূর্ণতায় মগ্ন রইলাম। জামইয়্যার মসজিদে জোহর নামাজ আদায় করলাম। ইউসুফ কারজাবীও এসেছেন। ডাক্তার সায়িদ তার সাথে অত্যন্ত আবেগ ও আক্ষেপের সাথে সাক্ষাত করে মুসাফাহা করলেন। আসরের পর আমি মহিলাদের একটি সমাবেশে বক্তৃতা করি। আমার মেজাজ মহিলাদের সমাবেশে ভাল বক্তৃতা করার উপযোগী না। আলোচনার মাঝে মাঝে ফিস ফিস আওয়াজ, মহিলাদের কথার ও বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ আসতে থাকে। এটা মহিলাদের সভার আবশ্যিক বৈশিষ্ট্য। মহিলাদের কোনো সভা-সমাবেশ এথেকে মুক্ত নয়। মাগরিব নামাজ জামইয়্যার মসজিদে পড়ে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করি। এতে কাজ শুরু করা, দাওয়াতের মৌলিক পদ্ধতি এবং ভারতীয় দায়ীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা করি। যারা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছে তারা আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

তারপর আমরা স্টেশনে যাই। জামইয়্যার বহু সদস্য এবং শহরের লোকজনের একটি জামাত আমাদের সাথে স্টেশন পর্যন্ত আসে। তারা অত্যন্ত ইখলাস ও ভালবাসার সাথে আমাদেরকে বিদায় জানায়। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম পরিণাম দান করুন।

সাহিত্য বিভাগে আমার প্রবন্ধপাঠ

১০ এপ্রিল ১৯৫১

কায়রো ইউনিভার্সিটির আরবিসাহিত্য বিভাগে আজ আমার বক্তৃতার দিন। সভার সময় ১২টা। সভা পরিচালনা কমিটি উক্ত সময় সম্ভবত এ জন্য নির্ধারণ করেছেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রগণও তাদের ক্লাস শেষ করে সভায় অংশগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এটা ক্লাসের একঘেয়েমি ও ক্লান্তির সময়। খানার সময়ও এটা।

'মুসতফা আবদুর রাজ্জাক মিলনায়তনে' আমরা প্রবেশ করি। এটা অত্যন্ত প্রশস্ত একটি হলরুম। এখানে ছাত্র-জনতার বড় একটি জামাত দৃষ্টিগোচর হল। আজকের বক্তাদের সঙ্গে আমি স্টেজে আসন গ্রহণ করলাম। বক্তাদের মধ্যে সাহিত্য বিভাগের প্রফেসর উসমান আমিন, ড. মুহম্মদ মাহমুদ সাইয়াদ ও আবদুল মুনয়িম কারিমীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। জনাব উলুবা পাশা, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব আবদুস সাত্তার শেঠ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব অন্য শ্রোতাদের সাথে উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রীও শ্রোতাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। ড. উসমান আমিন অগ্রসর হয়ে ইকবাল সম্পর্কীয় তার অনবদ্য রচনা পড়ে শোনান। তারপর ড. মাহমুদ সাইয়াদ অগ্রসর হয়ে বক্তৃতা করেন। তার ভাষণে বার-বার তাকবির ধ্বনি উচ্চারিত হতে লাগল।

বক্তৃতার প্রতি ছাত্রদের অমনোযোগিতা

তার বক্তৃতার পর প্রফেসর আবদুল মুনয়িম কারিমী দাঁড়ালেন। সবার মাঝে ক্লান্তি ও অবসাদ চলে এসেছে। খিদের আধিক্য ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই তিনি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করলেন। প্রফেসর কারিমীর পর আমার পালা। আমার পজিশন আরও নাজুক। ছাত্রদের ধৈর্যের সীমা বহু আগেই অতিক্রম করে গেছে।

আমি অপরিচিত, পরদেশি। তারা আমাকে চিনত না। জানত না। আমার বাহ্যিক অবয়বও তাদের মেজাজ ও রুচির সাথে মিলছিল না। আমার এই দেহ-অবয়বও তাদের মাঝে ইকরাম ও তাজিমের জজবা সৃষ্টি করতে পারেনি। আর যে ব্যক্তি আমার পরিচয় বর্ণনা করল আমার পুরো নামটাও বলল না। এ কথাও বলল না যে, আমি সুদূর ভারত থেকে এসেছি। সুতরাং, তোমরা মেহমানের আলোচনা গুরুত্বসহকারে শোন। অবহেলা ও অমনোযোগিতার কারণ হিসাবে এতটুকুইবা কম কী? এটাই কি কম কারণ ছিল? এর উপর আরও বৃদ্ধি করল আমার বক্তৃতার পর পাকিস্তান সরকার বিষয়ক ফিল্ম প্রচার করার ঘোষণা। আমি তাদের ফিল্ম দেখার স্বাদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালাম।

আমি বক্তৃতার জন্য উঠে আল্লামা ইকবালের ইতিহাস থেকে আমার রচনা শুরু করলাম। ড. উসমান বললেন, এই আলোচনা স্থগিত রেখে মূল বিষয়বস্তুর উপর কথা বলুন। অত্যন্ত কষ্ট নিয়ে সামনে পড়লাম। কিছু পড়ার পর তার পক্ষ হতে ইংগিত পেলাম সংক্ষিপ্ত করার। তিনি ছাত্রদের চেহারায় ক্লান্তি ও অবসাদ অনুভব করছিলেন। তাদের কানাকানিও দেখছিলেন। তাই বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত সমাপ্ত করতে বলছেন। আমি তার কথায় কর্ণপাত করলাম না। শ্রোতা রচনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে ভেবে রচনা পড়তে লাগলাম। রচনাটি তথ্যবহুল ছিল। বিষয়বস্তুও ছিল উচ্চাঙ্গের। আমার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল যে, আলোচনা শ্রোতাদেরকে তার দিকে মনোযোগী করে তুলবে। আমি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললাম, আমি আপনাদের মেহমান, আপনাদের আহ্বানে এসেছি। আমার আশা আপনারা আমাকে কিছু সময় দেবেন। যাতে আমি আমার রচনা পেশ করতে পারি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম আমার কোনো কথাই মনোযোগসহকারে শোনা হচ্ছে না। আমার পাশেই সভার সভাপতি বসে ছিলেন। তিনি আমাকে রচনা সমাপ্ত করতে ইঙ্গিত দিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি এসে আমাকে বললেন, পাকিস্তানের 'দৈনিক ডন' পত্রিকার সম্পাদক জনাব আলতাফ হোসাইন আগমন করেছেন। তিনি এখন বক্তৃতা করবেন। এরপর আমার সহ্য ক্ষমতা বিলকুল লোপ পেল। আমি ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বসে পড়লাম। অবহেলা ও অমনোযোগিতার এমন সম্মুখীন জীবনে আর হইনি। আজকের সভার জন্য আমি এমন রচনা

প্রস্তুত করেছিলাম, যা আমাকে ক্লান্ত করে ফেলেছিল। অথচ তা শোনার মত কাউকে পেলাম না। ফিল্ম পেশ করার পূর্বেই আমি আমার সাথীদের সাথে বাইরে চলে আসি। প্রফেসর আবদুল হাকিম আবেদিনও আমার সঙ্গে পিছে পিছে এলেন। শায়খ আবদুল ওহ্হাব খাল্লাফ এসে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। বিষয়টিকে সাধারণভাবে মেনে নেওয়ার ভাব প্রকাশ করলাম। আমি শুধু বললাম, 'কোনো সমস্যা নেই'।

পরবর্তী সময়ে আমি লোকজনকে বলতে শুনেছি, এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য খ্রিস্টান ছাত্ররা দায়ী ছিল। কেননা রচনার মধ্যে সরাসরি মুসলমানদের মান-মর্যাদা বাড়ানো হয়েছিল। তাতে এমন কিছু বাক্যও ছিল, যা অমুসলিমদের গায়ে শূল বিদ্ধ হওয়ার মত লাগছিল। যেমন আল্লামা ইকবালের উক্তি 'হে মুসলমান, তোমাদের অস্তিত্বই বাস্তবসম্মত। তোমাদের ছাড়া অন্য সবকিছু জাল টাকার মত। তা শুধু ধোঁকায় ফেলার উজ্জ্বল মরীচিকা।' আরও কিছু বাক্য এমন ছিল, যা এ পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য স্বাভাবিকভাবে দায়ী। এর সাথে ভুল সময় নির্ধারণ এবং রচনার উপর ইলমি রঙের প্রাবল্যও দায়ী। নওজোয়ানদের কাছে চিন্তা-গবেষণা ও দাওয়াতি মেহনতের কথা অপছন্দ লাগবে, এটাই স্বাভাবিক।

যাই হোক, এই নাটকের অবাসন হল। এদ্দ্বারা আমি একটি অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম, যদিও সেটি কিছুটা তিক্ত ছিল। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যেন তিক্ত থেকেই তিনি আমাকে উপকৃত করেন। জনাব আবদুল হাকিম আবেদিন আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেখানেই হল। তিনি আমাকে অনবরত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন এবং আমার প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করলেন। তারপর আমরা বাসায় ফিরে আসি। মাগরিবের পর আমরা শায়খ তিজানীর নিকট গেলাম। জনাব জাকি ইবরাহিম আগেই এসে ছিলেন। খাবার শেষ করে মুখলিস ও সাহেবে নিসবত বান্দাদের বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি।

দারুল মানার ও তার মালিক

১১ এপ্রিল ১৯৫১

বন্ধুবর শায়খ আহমদ শিরবাসীর সাথে আল-হেলালের অফিসে যাওয়ার এবং তার বাসায় খাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মসজিদে সাইয়েদা জায়নাবে আমরা একত্র হলাম। সেখান থেকে আল-হেলালের অফিসের উদ্দেশে

রওনা করলাম। পথেই আল-মানারের কার্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটি দেখে তার মহান প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা রশিদ রেজার স্মৃতি জেগে উঠল। আমি তার কাছাকাছি গিয়ে থেমে গেলাম। শায়খ আহমদ শিরবাসীকে সম্বোধন করে আবু তামামের একটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করলাম,

কী ক্ষতি হবে তোমার এইখানে এতটুকু বিরতি দিলে

এবং এইখানে মিশে যাওয়া প্রিয় নিদর্শনের হক আদায় করলেন?

আল-মানারের অফিসে প্রবেশ করলাম। সময় নিয়ে এর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ দেখতে লাগলাম।

দারুল হেলাল পরিদর্শন

জনাব আবদুস সাম্মান পথেই আমাদের সঙ্গ নিলেন। আমরা দারুল হেলালের অফিসে প্রবেশ করলাম। প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আহমদ শিরবাসী একটি প্রতিবেদন লিখেছেন। পাঠকের খেদমতে সেটি তুলে ধরা হল।

'দারুল হেলালে প্রফেসর জারজিস খলিল ও তার সহকর্মীগণ আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তারা পুরো প্রতিষ্ঠানটি আমাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। আমরা আল-হেলালের পূর্বের আলীশান ভবনের বিশাল হলরুমে কিছুক্ষণ বসলাম। বিক্রয়কেন্দ্র ও গ্রন্থনা বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের মত এখানেও অনুসন্ধান কক্ষ, পরিদর্শকদের জন্য বিশ্রামাগার রয়েছে।

আমরা দারুল হেলালের কম্পোজ বিভাগ থেকে পরিদর্শন শুরু করি। সেখানে দু'ধরনের কম্পোজ পদ্ধতি দেখলাম। প্রথম পদ্ধতি হল বিভিন্ন ছক হতে অক্ষর নিয়ে প্রথমে বাক্য তৈরি করা হয়। তারপর সেগুলো দিয়ে লাইন সেট করা। এটি পুরাতন ও সাধারণ নিয়ম। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল একটি বড় স্বয়ংক্রিয় মেশিন। এতে ছোট ছোট বিভিন্ন অংশ রয়েছে। মেশিনটি গলিত শিশার সাহায্যে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে অক্ষর ঢালে। এর জন্য নির্দিষ্ট বাটনে কম্পোজিটরের একটি চাপই যথেষ্ট। তারপর উক্ত মেশিন ধারাবাহিকভাবে অক্ষর ঢেলে যায়। মেশিনের ছোট ছোট অংশগুলো নিজে নিজেই বাঁকা লাইন তৈরি করে। একের পর এক সেগুলো নিজেই অক্ষর বিন্যাস করছে। এই মেশিনকে এন্টার-টাইপ মেশিন বলা হয়। এরপর আমরা প্রুফরিডিং রুমে প্রবেশ করি। সেখানে কম্পোজ করা বিষয়গুলোর লাইন ও অক্ষরগুলোকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হয়। প্রুফ

দেখারও দুটি পদ্ধতি লক্ষ্য করলাম আমরা। প্রথম পদ্ধতি হল, সংবাদপত্রের উপর প্রুফ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করা। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পাতলা কাগজে প্রুফ নেওয়া হয়। এটা পিতলের প্লেটের মাধ্যমে করা হয়। এর উপর বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে কাগজের উপর অক্ষরের প্রতিচ্ছায়া পড়ে। তারপর সেই প্লেটের উপর কাগজের সিট ঘুরানো হয়। তখন প্লেটের অক্ষরগুলো কাগজের উপর এসে যায়।

'এরপর আমরা ফটো বিভাগে গেলাম। এখানে বিভিন্ন সাইজের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ছবি তোলা হয়। প্রত্যেকটি ছবি তার উপযোগী জায়গায় সেট করা হয়। এরপর এগুলোকে সুন্দর ও ঠিকঠাক করতে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানকার কাজ হল ছবির ত্রুটিগুলো ঠিক করে আরও সুন্দর ও উজ্জ্বল করার জন্য অতিরিক্ত কিছু লাগানো। কখনো কখনো এমন প্রাকৃতিক রঙ লাগানো হয়, যা হুবহু মূল ছবির মত দেখায়। ছবি ওঠানোর কিছু নিয়ম আছে। ধোলাই করারও বিশেষ পদ্ধতি আছে। এমন কিছু বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে, যদ্দ্বারা ছবি ধোলাই করার সময় রঙের প্রলেপ দেওয়া যায়। আমরা সেখানে পিতলের প্লেটও প্রত্যক্ষ করি, যা মেশিনে ওঠানোর জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। এর উপর লাইন তৈরি করা হয়েছে। পৃষ্ঠা নম্বর বসানো হয়েছে। মুদ্রণকাজ শেষ হওয়ার পরও প্লেটগুলো দেখি। দ্বিতীয়বার ব্যবহারের জন্য এগুলোকে বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করা হয়। আমরা সেখানে ছাপানোর অবাক করা মেশিন প্রত্যক্ষ করি, যাকে ডরোগ্রাফার বলে। এটা খুবই ভারী ও বৃহদাকার। এখানে এমন যন্ত্র ফিট করা আছে, যা পত্রিকা ছেপে ও প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসে। এটা এভাবে যে, তার একদিকে কাগজের দুটি বান্ডিল লাগানো হয়। অপর প্রান্ত থেকে বাহারি রঙের পত্রিকা ছেপে বের হয়। এই মেশিন ঘণ্টায় আট হাজার কপি ছাপাতে সক্ষম।

'তারপর আমরা বাইন্ডিং, সেলাই ও কাটিং বিভাগ প্রত্যক্ষ করলাম। যে বিভাগে পত্রিকা প্যাকেটিং করে এজেন্ট, গ্রাহক ও হকারদের ঠিকানায় পাঠানো হয় তাও অবলোকন করি। এখানে এসে আমরা জানতে পারলাম দারুল-হেলাল আরবিভাষায় 'আলইসনাইন', 'আলমুসাব্বির', 'আলহেলাল'; এই তিনটে পত্রিকা বের করে। ফ্র্যান্স ভাষায়ও 'ইম্যাজ' নামের একটি পত্রিকা বের করে। চলচ্চিত্রজগতের নানা বিষয়-আশয় নিয়ে

'আলকাওয়াকিব' নামে একটি পত্রিকা বের করে।'

অবশেষে মসজিদে জায়নাবে এসে জোহর নামাজ আদায় করি। তারপর বন্ধুবর আহমদ শিরবাসীর ঘরে গেলাম। ড. ইউসুফ মুসাও এলেন। দুপুরের খানা আমরা সম্মিলিতভাবে এখানেই গ্রহণ করলাম। জনাব আহমদ শিরবাসীর মধুময় চরিত্র, ঘরবাসীদের ইখলাস, সর্বোপরি ড. ইউসুফ মুসার উপস্থিতি স্বাদ ও আনন্দকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলল। খানার পর কিছুক্ষণ অবস্থান করে দীনী ও ইলমি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। মিসর অবস্থানের আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যে এটি একটি বিশেষ দিন ছিল।

১২ এপ্রিল ১৯৫১

গতকাল আহমদ শিরবাসীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, শায়খ হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফ কদিন ধরে অসুস্থ। এ কারণে তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না। তাই ক্ষমা চেয়ে লোক পাঠিয়েছেন। তার অসুস্থতার সংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। কারণ শায়খ সেসব ব্যক্তিত্বের অন্যতম, যার উপস্থিতিতে আমরা অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করি। শায়খের শুশ্রূষার জন্য আমি হোলওয়ানে গেলাম। গিয়ে দেখি আহমদ শিরবাসী আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে হাজির। আমরা শায়খের নিকট এক ঘণ্টা অবস্থান করি। তিনি বাতের ব্যথায় ভুগছিলেন। এ সময় তার এত কষ্ট হচ্ছিল যে, বিছানা থেকে কোথাও যেতে পারতেন না। বিছানায় টেক লাগানো ছাড়া নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এরপরও তিনি দীনী ও ফিকহি আলোচনা থেকে বিরত থাকেননি।

হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম রহ.[১] 'জাদুল মাআদ' কিতাবে মহিলাদের ঘাম সম্পর্কে যা লিখেছেন শায়খ মাখলুফ তা আমাদেরকে পড়ে শোনান। সেসব চিকিৎসার কথাও আলোচনা করেন, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাতলে দিয়েছেন। শরিয়তে এর অবস্থান কী তাও আলোচনায়

---

[১] অষ্টম হিজরি শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম। ১২৯২ সালে দামেশকে তার জন্ম। ইবনে তাইমিয়া থেকে তিনি ফিকহ ও উসুলের জ্ঞান অর্জন করেন। হাফেজ ইবনে কাসির তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্র। তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় একশ। ১৩৪৯ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

আনেন।

মৃত্যুর বাস্তবতা ও ধৈর্য নিয়ে তার সাথে আলোচনা হয়। তার কথাবার্তা ছিল একজন পরিপূর্ণ মুমিনের ন্যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর তার তবিয়তের দিকে খেয়াল করে আমরা বিদায় নিই। কারণ এখানে দীর্ঘক্ষণ থাকলে তার কষ্ট হতে পারে। তারপর শায়খ আহমদ শিরবাসীর সঙ্গে ফিরে আসি। তার সাথে যেকোনো সফর ছিল আনন্দময়। এ সফরে আমরা আজহারের সাবেক শায়খুল আজহার শায়খ মুসতফা আবদুর রাজ্জাকের অবস্থা এবং ছাত্রদের সঙ্গে তার সুন্দর আচরণ নিয়ে কথা বলি। শায়খ মুসতফা মুরাগীর আত্মসম্মানবোধ, উদারতা এবং তার প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আলোচনা করি। সাইয়েদা জায়নাব স্টেশন থেকে আমরা পৃথক হয়ে যাই। শায়খ শিরবাসী এখানেই অবতরণ করেন। আর আমরা বাবুল লুক স্টেশনে অবতরণ করি। সেখানে ইবরাহিম পাশা রোডে প্রফেসর ওয়াহবার সঙ্গে তার লাইব্রেরিতে গিয়ে সাক্ষাত করি। তার সঙ্গে আমি আমার কয়েকটি পুস্তিকা মুদ্রণের ব্যাপারে লেনদেন করেছিলাম।

সাংবাদিক ছাত্রদের সামনে আমার ভাষণ

আমার একান্ত ইচ্ছায় আজহারে অধ্যয়নরত সাংবাদিক ছাত্রদেরকে দারুল উলুম কায়রোতে একত্র করা হল। আমি সেই মজলিসে উপস্থিত হই। উপস্থিত ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই। তাদের সাথে কথা বলতে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আমার মনে হয় তারা জীবনকাফেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যখন ইসলামের পয়গাম সিনায় গেথে দীনী দাওয়াতে লেগে যাবে এবং এদ্দ্বারা যখন তার ঈমান মজবুত হবে তখন সেই সোনালি যুগ আবার ফিরে আসবে। এই বিষয়বস্তুর উপরই বক্তৃতা করলাম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিস দ্বারা বক্তৃতা শুরু করি-

انَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَّيَضَعُ اٰخَرِيْنَ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এই কিতাবের মাধ্যমে বহু জাতিকে সুউচ্চ স্থান দান করেন; আর অনেককে সর্বনিম্ন স্থানে নামিয়ে দেন।'

ইবনে মাজাহ ইতিহাসের আলোকে তার উপমা উপস্থাপন করি। ছাত্ররা এই ভাষণ অত্যন্ত মনোযোগসহকারে শ্রবণ করে। একে অভিবাদন

জানায়। আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। তারা কিছুক্ষণ পর পর পাকিস্তানের ঐ প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানায়, যা পাকিস্তান সরকার তাদের একটি বিষয় জাতিসংঘে উত্থাপনের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একজন ছাত্র আমাকে জানাল যে, তারা 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র কয়েক কপি খরিদ করে দেশে প্রেরণ করেছে।

তুর্কি ছাত্রদের সঙ্গে

এখান থেকে আমরা বাগদাদ হোটেলে গেলাম। সেখানে তুরস্কের ছাত্রদের সাথে সাক্ষাত করি। জনাব জিয়াউদ্দীন উলুবী আমার বিগত দুটো বক্তৃতাই তুর্কিভাষায় তরজমা করে পড়ে শোনালেন। তার ইচ্ছা বক্তৃতা দুটো তিনি তুরস্কের কয়েকটি দীনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরণ করবেন।

আমি বক্তৃতা শুরু করি। পূর্বের আলোচ্যবিষয়কে পুনরুজ্জীবিত করার মানসে পূর্বের বক্তৃতা দুটির সারাংশ তুলে ধরি। জনাব আলি আরসালান আমার বক্তৃতার বিশ্লেষণ করেন। এরপর সান্ত্রিসের সংক্ষিপ্ত সফরে আমার সাথে যেতে তাদেরকে দাওয়াত করি। পরীক্ষা সন্নিকটে, তুর্কি ছাত্রদের আরবিভাষায় দুর্বলতা থাকার কারণে পরীক্ষায় খারাপ করার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। এর পরও তারা আমার আবেদন মন্‌জুর করে নিল। ছাত্রদের একটি দল বাসা পর্যন্ত আমাদের সাথে এলো। তারা আমাদের বাসা দেখে যায়। মুহম্মদ আমিন তুর্কি দীনী তা'লিমের এই পদ্ধতি অত্যন্ত পছন্দ করেন। তিনি বলেন, এই পদ্ধতি আমি তুরস্কের দু'জন ফাজেল জনাব আলি হায়দার ও মাহমুদ জুদাতের কাছ থেকে অর্জন করি। কিন্তু মিসরে এই আধ্যাত্মিক খোরাক ও চিন্তা-চেতনা খুঁজে পাইনি।

সান্ত্রিসে

১৩ এপ্রিল ১৯৫১

আবদুল গনী মাহজুব আমাদেরকে সান্ত্রিসে নিয়ে যেতে খুব সকালে এসেছেন। এই সফরে আমাদের সঙ্গে যেতে পাঁচজন তুর্কি ছাত্রও এসেছে। শিবরা হতে আমরা গাড়িতে চড়ে এলাম। সান্ত্রিস মানুফিয়া জেলার কানাতিরে খায়রিয়ার পর সুন্দর মনোরম একটি গ্রাম। তার প্রাণকেন্দ্র আশমুন, যা নীলনদের কিনারায় অবস্থিত। সেখানে উচ্চ পদস্থ একটি

আরবি উলুবী খান্দান বসবাস করে। আহলে সুন্নাহর একটি মসজিদে আমরা জুমার নামাজ আদায় করলাম। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য জনাব মুহম্মদ আলমাজী খুতবা প্রদান করেন। নামাজ পড়ানোর উদ্দেশ্যে তাকে মিসর হতে দাওয়াত করে আনা হয়েছে। নামাজের পর আমি বক্তৃতা করি। তাতে আরজ করি একটি সাপ্তাহিক দীনী দরসের ব্যবস্থা করতে। পাশাপাশি শহরের দীনী পরিস্থিতির উপর খেয়াল রাখতে বলি। আর যারা মসজিদে সচরাচর উপস্থিত হয় না অথবা যাদের মধ্যে দীনী ফারায়েজ আদায়ের ব্যাপারে অলসতা ও অমনোযোগিতা অনুমান করা যায় তাদের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং ভালবাসা ও শখ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে দীনদারি অবলম্বন করতে ও মসজিদে আসতে উৎসাহিত করতে বলি। লোকজন আমার প্রস্তাব মেনে নিল। তারা এই দরস ও আন্দোলনের আমির নির্বাচন করল জনাব আবদুল গনীর চাচা আলহাজ আবদুল আজিম মাহবুবকে। জুমার পর আমরা আলহাজ আবদুল আজিম মাহবুবের বাড়িতে যাই। দুপুরের খাবারে এই শরিফ ঘরের লোকেরা যা তৈরি করেছেন তা-ই খেয়ে নিই। তাদের বাড়িতে যাওয়ার পর পরিবারের লোকেরা আমাকে চন্দ্রের ন্যায় ঘিরে রাখে। তারা ইজ্জত ও ইকরামে এতটুকু কার্পণ্য দেখায়নি। এখান থেকে আমরা আসর নামাজের জন্য বের হই। অল্প সময়ের জন্য আবদুল গনীর আরেক চাচা জনাব আবদুস সামী ইউসুফ তাবুজীর নিকট বসি। তিনি সান্ত্রিসের মাদরাসায়ে আউলিয়ার পরিচালক। এরপর বাস-যোগে আমরা কায়রো ফিরে আসি। সফর খুব আরামদায়ক ও আনন্দময় ছিল। তুর্কি ভাইয়েরা এই সফরে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হল। তারা মিসরীয় পল্লী-গায়ের জীবনাচার ও সরল-সোজা মিসরীয় মুসলমানদের জীবনধারণের উত্তম নমুনা এ-ই প্রথম প্রত্যক্ষ করল।

ওলামায়ে আজহার সংঘ

ওলামায়ে আজহার সংঘের বিশেষ বৈঠক। সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর আমরা সেখানে পৌঁছুলাম। বিলম্বের কারণে আমাদের আসার ব্যাপারে তারা ইতোমধ্যে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। বৈঠকে মুসলিমদেশসমূহের পাঠানো ছাত্রদের ব্যাপারে আমিও তাদের সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করলাম। কথা হচ্ছিল ওলামা সংঘ ছাত্রদের মধ্যে দীনী আগ্রহ ও সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং তাদের সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতার দায়িত্ব

নিবে। তাদের জন্য একটি স্থান ঠিক করা হবে, যেখানে তারা সকলেই একত্র হবে। সংঘের প্রতিনিধি হিসেবে এক বা একাধিক শিক্ষক সেই সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের খোঁজ-খবর নিবেন। ড. ইউসুফ এই রায়ের সঙ্গে অত্যন্ত আবেগের সাথে ঐকমত্য পোষণ করলেন। এ সম্পর্কে একটি নকশাও তৈরি করলেন পরবর্তী সভায় এটা সংঘের সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করবেন বলে।

উক্ত সভায় 'দারুল উলুম কায়রো'র সাহিত্য বিভাগের শিক্ষক এবং ওলামায়ে আজহারের সদস্য প্রফেসর আহমদ শায়েবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাকে স্বাগত জানালেন। বললেন, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে আপনার লেখা কিছু বই আমাকে হাদিয়া দিবেন। আহমদ শিরবাসীর নিকট দিলে তিনি আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিবেন। আহমদ শিরবাসী তার নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন। সেখানে শায়খ মানসুর রজবের সঙ্গেও দেখা হয়। তিনি উসুলুদ্দীন বিভাগের 'নীতিশাস্ত্র ও মনোবিজ্ঞানে'র সহকারী অধ্যাপক। শুধু আমার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছেন। তিনি আতাবা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসেন। আমাদেরকে তার ঠিকানা যিয়ে যান।

ড. আমিনের সাথে আলোচনা

১৪ এপ্রিল ১৯৫১

মাওলানা মুয়িনুল্লাহর সাথে আজ আমরা জিজায় অবস্থিত 'এদারায়ে সাকাফিয়া'য় যাই। বহুদিন গত হল ড. আহমদ আমিনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে। আমরা তার সাথে তার কার্যালয়েই সাক্ষাত করি। মুসলমানদের নানান সমস্যা ও বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। তিনি বললেন, মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের বড় অভাব। আমি বললাম, শায়খ হাসানুল বান্না সম্পর্কে আপনার কী মত? তিনি বললেন, খুব শক্তিশালী নেতৃত্বের অধিকারী ছিলেন। স্বভাবজাত বহু যোগ্যতা তার মাঝে ছিল। আশ্চর্যের কথা হল ছাত্র বয়সে তিনি খুব লাজুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে তিনি কখনো খতিব ও বক্তা হতে পারবেন। 'মাদরাসাতুল কাজা'য় তিনি আমার ছাত্র ছিলেন। দেখতে দেখতে কিছু দিনের মধ্যে তিনি ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিঝরা বক্তৃতায় সারা দেশে সুখ্যাতি লাভ করেন। সব মহলে কথা বলার যোগ্যতা তার ছিল।

জনসাধারণের মুখোমুখি কথা বললে তার প্রভাব তাদের দিল-দেমাগে ছেয়ে যেত। শিক্ষিতসমাজের সম্মুখীন হলে এমন বক্তৃতা পেশ করতেন, যা তাদের মনঃপুত হত এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারত। এটাই প্রকৃত অবস্থা। যদি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লোকজন চরিত্র ও সামগ্রিক পরিশুদ্ধতায় লেগে থাকত তবে অনেক বড় কাজ হত।

ইখওয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, ইখওয়ান যদি শক্তিশালী কোনো ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করে এবং তার ইসলাহি ও দীনী দাওয়াত চালু থাকে তবে সে অবশ্যই সফলকাম হবে। তবে সে এমন ব্যক্তিত্ব পাবে বলে মনে হয় না। আর রাজনীতির বেড়াজালে ফেঁসে গেলে মুয়ামালা অন্য দিকে মোড় নিবে। আমি বললাম, আমার জানামতে জনাব সায়াদ ফাশা জগলুল সুউচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ড. আমিন বললেন, তিনি মানুষের জজবা ওঠাতে পারতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি সফল হতে পারেননি। তিনি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। আমি একবার তার সঙ্গে তার অফিসে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। একেবারে স্বাভাবিক কথা। সাধারণ কথা কিন্তু এতে আমার দিল উদ্দীপনা ও জজবায় ভরে গেল। শুধু তাই নয় জজবার সীমা এ পরিমাণ অতিক্রম করেছে যে, আমি কোনো মোটর গাড়িতে না চড়ে পায়ে হেঁটেই চলতে শুরু করেছি।

সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানীও অত্যন্ত প্রভাবশালী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ব্যক্তি ছিলেন। মানুষের হৃদয়ে প্রেরণা ও জজবা ঢেলে দিতে পারতেন। অথচ তার জবানে জড়তা ছিল।

শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কীয় আলোচনা

তারপর শিশুদের শিক্ষা এবং তাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন বিষয়ক কথাবার্তা হয়। তিনি বলেন, অনেক মাদরাসায় শিশুদেরকে এমন বিষয় পড়ানো হয়, যা তাদের জন্য প্রযোজ্য না এবং তাদের উপযোগীও না। তাদের বয়স ও মেধার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণও না। উদাহরণস্বরূপ, আমার এক ছেলে এক মাদরাসায় পড়াশোনা করে, সে জানাজা নামাজের দোয়া মুখস্থ করেছে অথচ সে এখনো এই মানজিল থেকে অনেক দূরে। তারপর তিনি ইংরেজদের শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা করে বলেন, তারা শিশুদের জন্য

সামঞ্জস্যপূর্ণ পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করে। তিনি আরও বললেন, আমি ছোটদের বিশ্বকোষ পড়েছি। এটা তাদের বয়স ও আকল-বুদ্ধি অনুযায়ীই লেখা। তাদের গল্প-কাহিনী অনেক মনোলোভা। আমি কামিল কিলানী[1]র কথা উল্লেখ করলে তিনি তার সমালোচনা করে বললেন, তিনি তার ঘটনাবলীর মধ্যে কখনো কখনো সাহিত্যপূর্ণ শব্দমালা ব্যবহার করেন। তারপর আমি তার নিকট 'কাসাসুন নাবিয়্যীন'র আলোচনা করলে তিনি বললেন, দারুল হেলাল আমাকে হারুনুর রশিদের ইতিহাস লেখার দায়িত্ব অর্পণ করে। ইউরোপে তার খুব আলোচনা হয়। এর উপর 'আলফ লায়লা ও লায়লা'র বড় প্রভাব রয়েছে। লেখক বইটিতে অনেক ঘটনার নায়ক নিজেকে বানিয়ে নিয়েছেন। সম্ভবত তিনি ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে ইবনে মুকাফ্ফার[2] ফলাফল দেখেছেন। ইবনে মুকাফ্ফা অনেক ঘটনা নিজে বানিয়েছেন। আর এসব ঘটনায় তিনি নিজেকে নায়কের ভূমিকায় পেশ করেছেন।

মহল্লায়ে কুবরা

আজ 'মহল্লায়ে কুবরা' সফরের দিন ধার্য ছিল। এটি আগের সফরেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। শায়খ আহমদ শিরবাসীকে এই সফরে আমরা আমাদের সঙ্গ দেবার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আবেদন মন্জুর করেছিলন। আমরা স্টেশন মসজিদে একত্র হলাম। ছয়টার ট্রেনে চড়ে মাগরিবের পর 'তানতা' পৌঁছুলাম। শহরে গিয়ে সেখানে 'মসজিদে সাইয়েদ আহমদ বাদাবী'তে এশার নামাজ আদায় করলাম। নামাজের পর মসজিদ ভালো করে দেখলাম। নৈশভোজ পথেই সেরে নিয়েছিলাম। ট্রেন আমাদেরকে নির্দিষ্ট মহল্লায় পৌঁছিয়ে দিল। অবশ্য সেখানে আমরা কিছুটা বিলম্বে পৌঁছুই। রাতে ডা. মুহম্মদ সায়িদ আহমদের মেহমান হই। আমার ও শায়খ আহমদ শিরবাসীর আগমনে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন।

---

[1] আরবি শিশুসাহিত্যের কিংবদন্তি পুরুষ। ১৮৯৭ সালে কায়রোতে তার জন্ম। তার রচিত ও অনূদিত শিশু কাহিনীর সংখ্যা ২৫০টি। 'আলাউদ্দীনের চেরাগ' ও 'আলফু লায়লাতিন' তাঁর সাড়াজাগানো গল্পগ্রন্থ। ১৯৫৯ সালে তার মৃত্যু।

[2] আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফ্ফা। পারস্যের খ্যাতিমান সাহিত্যিক। আরবি-ফারসি উভয় ভাষায় সমান উৎকর্ষ অর্জনকারী। তিনি বনু উমাইয়ার খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয় লেখক হিসেবে নিয়োগ পান। তার রচনার ভাষা ছিল সহজ সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। ১৩২ হিজরিতে খলিফা মানসুরের শাসনামলে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

নিবরোতে

১৫ এপ্রিল ১৯৫১

আহলে সুন্নতের মসজিদে আমরা ফজর নামাজ আদায় করি। নামাজের পর আমি বক্তৃতা প্রদান করি। তাদের নিকট আবেদন করি তারা যেন একটি দীনী দাওয়াতি সফরে আমাদের সঙ্গ দেন। সাথে সাথে বহু সাথী তৈয়ার হয়ে যান। সকল সাথীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল 'নিবরোর' দিকে। এলাকাটিও উপযুক্ত ছিল। তারা দ্রুত একটি পঞ্চাশ সিটবিশিষ্ট বাসের ব্যবস্থা করে। শায়খ আহমদ শিরবাসী সঙ্গ দিতে অপারগতা প্রকাশ করে কায়রো চলে যান। আমরা নিবরোতে পৌঁছুলে জামইয়্যা শারইয়্যার সদস্যবৃন্দ ও শহরের বহু মুখলিস ব্যক্তি আমাদের চারদিকে জমায়েত হন। আমরা মসজিদে গিয়ে উপস্থিত লোকজনকে এই সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আদব ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে ধারণা দিই। জোহরের পর লোকজন কয়েকটি জামাতে বিভক্ত হয়ে পার্শ্ববর্তী পল্লীতে যায়। উদ্দেশ্য হল সেখানকার মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাদেরকে দীনের দাওয়াত দেওয়া। তাদের সবাইকে নিবরোর সন্ধ্যাকালীন সভায় আসার দাওয়াত দেওয়া হল। আমাকে এবং আরেক ভারতীয় সাথীকে জামইয়্যা শারইয়্যার এক দয়ালু বন্ধু দুপুরের খানা খাওয়ার দাওয়াত দিলেন। ভদ্রলোক আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। আমরা দুপুরের খানা তার সেখানেই খাই। দাওয়াত কবুল করে তার ঘরে যাওয়ায় তিনি অনেক খুশি হয়েছেন। বার-বার তিনি আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। আসরের পর আমরা ডা. সায়িদকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় লোকজনের সাথে সাক্ষাত করে এবং বাজার ও দোকানে গিয়ে তাদেরকে রাত্রিকালীন জলসায় আসার দাওয়াত দিই। সবাই অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমাদেরকে স্বাগত জানান। কেউ কেউ আমাদেরকে কফি ও মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতে চাইলে আমরা অক্ষমতা প্রকাশ করতাম। আবার কোথাও গ্রহণও করতাম। মাগরিবের পূর্বেই আমরা মসজিদে ফিরে আসি। নিবরো ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন মসজিদে একত্র হলে আমি বয়ান শুরু করি। আজ রাত্রের বক্তাদের মধ্যে শায়খ ইউসুফও ছিলেন। তিনি মহল্লায়ে কুবরার একটি মসজিদের ইমাম। তিনি স্থান-উপযোগী অত্যন্ত সুন্দর বয়ান করলেন। কারো বিরোধিতামূলক কোনো কথা বলেননি। এরপর ডা.

মুহম্মদ সায়িদ আহমদ বক্তৃতার জন্য দাঁড়ালেন। আগের মত আবেগ ও জোশ এসে গেল। ফলে হট্টগোল বেঁধে যায়। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লোকজন চিল্লাচিল্লি করে তার বিরোধিতা করল। একটি বক্তৃতাতেই সভা পণ্ড হয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদেরকে লড়াই থেকে উদ্ধার করেছেন।

১৬ এপ্রিল ১৯৫১

সকালে ফজরের নামাজের পর আমি কিছু কথা রাখি। বন্ধুবর মাওলানা আবদুর রশিদ, মাওলানা মুয়িনুল্লাহ ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহও বক্তৃতা করেন। আমরা গতকালের মেজবানের বাসায় নাশতা খেয়ে নিবরোবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিই। তারা অনেকেই আমাদের সাথে এসেছিলেন। সবাই ইখলাস ও আবেগের সাথে বিদায়ী মুসাফাহা করতে লাগলেন। মহল্লায় কুবরায় আসার দাওয়াত দিলে তারা আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর আমরা মহল্লায় ফিরে আসি। সারাদিন এখানেই অতিবাহিত করি। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী মহিলাদের মজলিসে বক্তৃতা প্রদান করেন। এশার পর আমি বয়ান করি। নিবরোর প্রায় পঞ্চাশজন লোক এখানে ছিলেন। সভা সমাপ্তির পর তারা বাড়ি চলে যান। আমরা অনেক রাত্রে বিছানায় যাই।

কটন মিল্সে

১৭ এপ্রিল ১৯৫১

মিসরের একটি কটন মিলে গেলাম। সুতা কাটার ও কাপড় বুনন করার এটি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কারখানাগুলোর একটি। ডা. সায়িদ বললেন, তিনি মিলের ম্যানেজারের সাথে সাক্ষাত করে আমাদের পরিদর্শনের অনুমতি নিয়েছেন। জনাব তহার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি কারখানার একজন পদস্থ কর্মকর্তা। সকাল আটটায় ভ্রমণের সিদ্ধান্ত হল। আমরা জনাব তহার সাথে সাক্ষাত করলে ভদ্রলোক কোম্পানির টেকনিকেল ডাইরেক্টরের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তার বাড়ি ফ্রান্সে। আমরা অল্প সময় তার নিকট বসি। তার সঙ্গে আমরা ইংরেজিভাষায় মতবিনিময় করি। তারপর আমরা কারখানার বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনে বের হই [illegible] এটা মিসরের সর্ববৃহৎ এবং পৃথিবীর

অন্যতম বৃহৎ টেক্সটাইল মিল্‌স। মিসর একে নিয়ে গর্ব করে। মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের জন্য তৈরী পোশাক উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে এটি দৃষ্টান্তহীন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি মিসর ও মিসরবাসীকে অত্যন্ত উপকৃত করছে। উৎপাদন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটা মিসরের জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে। এসবের পিছনে যার মাথা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে তিনি প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মরহুম তলআত হৱব পাশা।

কারখানা না, আস্ত একটি শহর। পরিদর্শনের পুরো সময়জুড়ে জনাব তহা আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন। কারখানার বিভিন্ন অংশ, নতুন নতুন মেশিন ও তার কাজ সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন তিনি। এসবই ছিল আধুনিক। এগুলোর উপর যুদ্ধের বড় বড় ট্যাঙ্ক ও তোপের মত লোহার চাদর জড়ানো। সুতা বোনা, এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর, রং দেওয়া, ছাপানোর খাকা তৈরি করা, ইত্যাদি মেশিনের নিকট দিয়ে গেলাম। প্রত্যক্ষ করলাম তুলা এবং সুতা বিভিন্ন কঠিন ও দীর্ঘ মনজিল অতিক্রম করে, বহুপথ পারি দিয়ে শেষ ঘাটিতে কীভাবে পৌঁছয়। তারপর কাপড় হয়ে বের হয়। মানুষ কত সহজভাবে এই কাপড় বাজার হতে খরিদ করে। তার মনে বিন্দুমাত্র খেয়াল বা চিন্তা-ভাবনা জাগ্রত হয় না যে, এই কাপড় কত দীর্ঘ পথ সফর করে এ পর্যন্ত এসেছে। মানুষ পরিধান করে কিন্তু তার কঠিন বন্ধুর পথের সামান্য অনুভূতিও জাগে না তার মনে। অথচ এই কাপড় তার শরীর ঢেকে রাখে। তাকে সৌন্দর্য দান করে।

জানতে পারলাম প্রতিবছর কোম্পানি কয়েক কোটি কাপড় উৎপাদন করে। আমরা কারখানার একটি সুন্দর মসজিদের নিকট দিয়ে বেরিয়ে যাই। কোম্পানি নিজস্ব অর্থায়নে কারখানার কর্মকর্তাদের জন্য এটি তৈরি করেছেন। সুদৃশ্য বোর্ডিং ব্যবস্থা। এই বোর্ডিঙে খাবারের জন্য তিন হাজার আসন রয়েছে। আমরা পাকঘরে গেলাম। সেখানে পাকানোর শৃঙ্খলা পরিদর্শন করি। রান্নাঘর ও খাবারের জায়গাগুলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এখানে স্বাস্থ্যসম্মত ও জীবাণুনাশক সব ধরনের ব্যবস্থা সুচারুরূপে রাখা হয়েছে।

আমরা খেলাধুলা ও শরীরচর্চা বিভাগে গেলাম। এটা অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী। এই বিভাগের পরিচালক আমাদেরকে পুরো এলাকা ঘুরিয়ে দেখালেন। পরিচালক ইউরোপে লেখাপড়া করেছেন।

এরপর হাসপাতালে যাই। এটা পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার দিক দিয়ে বড় বড় হাসপাতালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে সব ধরনের রোগের

চিকিৎসার আলাদা আলাদা বিভাগ রয়েছে। নাক, কান, গলা, মুখ, চক্ষু ইত্যাদি প্রত্যেকটি রোগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ড রয়েছে। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের পৃথক রাস্তা রয়েছে। প্রত্যেকটি বিভাগের একটি করে আউট ডোর রয়েছে। সেখানে রোগীরা নিজ নিজ সিরিয়াল আসার অপেক্ষা করে। যাতে বিভিন্ন ধরনের রোগীর মিশ্রণের কারণে রোগ না ছড়ায়। কারখানার প্রত্যেক কর্মকর্তাকে মাসে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য যেতে হবে। প্রত্যেক কর্মকর্তার একটি করে রেজিস্টার এবং তাদের দস্তখত দেখলাম। হাসপাতালের সার্জিকেল ওয়ার্ডে উন্নত বেডের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা কয়েকটি কামরায় প্রবেশ করে রোগীদের খোঁজখবর নিলাম।

এখান থেকে আমরা বিশেষ গাড়িতে করে কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা পরিদর্শনে যাই। এলাকাটি কোম্পানি নিজ খরচে তৈরি করেছে। এতে ব্যয় হয়েছে বারো লক্ষ মিসরি পাউন্ড। প্রায় ৬৭ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই অত্যাধুনিক শহরটি। সেখানে এত সংখ্যক কোয়াটার করা হয়েছে যে, পাঁচশত পঞ্চাশজন বিবাহিত কর্মকর্তা সপরিবার এবং সতেরোশ অবিবাহিত কর্মচারী বসবাস করতে পারবে। শহরে একটি হাসপাতাল, একটি পার্ক ও কয়েকটি পাবলিক টয়লেট ও বাথরুম রয়েছে। ছেলে ও মেয়েদের আলাদা বিদ্যালয় রয়েছে। আছে একটি খেলার মাঠ, একটি বাজার। এখান থেকে কর্মকর্তাগণ তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করে থাকেন। আমরা কোম্পানির তৈরী করা শহর দেখেই ফিরে আসি। সেখানে যা কিছু শুনেছি, পরিদর্শন করেছি এবং যে সকল বিভাগ দেখেছি তার সবকিছুই আমাদের অন্তর ভরিয়ে দিয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আরও খুশি হয়েছি এ জন্য যে, কোম্পানিটি পরিচালনা করছে মুসলমানরা। তা ছাড়া এটি একটি দেশীয় কোম্পানি। আশাকরি যা শুনেছি বাস্তবতা তা-ই হবে। জোহরের সময় আমরা ট্রেনে চড়ে আসরের পূর্বেই কায়রো ফিরে আসি।

ড. মনসুর পাশার সাক্ষাত ও তার অতীত জীবন

১৯ এপ্রিল ১৯৫১

আসরের পর আমরা 'আনসারুস্ সুন্নাহর' অফিসে যাই। শায়খ মুহম্মদ হামেদ ফকী সম্পর্কে জানতে পারলাম তিনি রিয়াদ গিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় তিনি সেখানে অতিবাহিত করেছেন। তার অফিসেই তাকে পেয়ে গেলাম। তিনি আমাদেরকে তার সফরের কাহিনী শোনালেন।

ড. মসসুর ফাহমির সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমরা জিজায় মুহম্মদ আবদুল মুনয়িম রোডে যাই। আমরা যখনই তার সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করতাম কিংবা টেলিফোনে কথা বলার চেষ্টা করতাম তখন কোনো না কোনো সমস্যা হতই। ফলে না তার সাক্ষাত পেতাম, না টেলিফোনে লাইন পেতাম। এবার আমাদের ভাগ্য খুলেছে। ড. ফাহমি উপস্থিত এবং আমাদের জন্য অপেক্ষাও করছেন। আমরা তার কামরায় প্রবেশ করি। সুবিশাল কামরা। রাজকীয় ছাঁচে সাজানো সবকিছু। আমরা আলোচনা শুরু করলাম। আমার জিজ্ঞাসায় তিনি তার জীবনকাহিনী এবং এ পথে ফেরার কারণ বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, প্রথমে আমি ধর্মদ্রোহী ছিলাম। দীনের বিপক্ষে তর্ক জুড়ে দিতাম। এমনকি শক্তি প্রয়োগেও কুণ্ঠাবোধ করতাম না। একদিন শোনলাম আজহারের একজন সুদানি আলেম আমাকে কাফের ফতোয়া দিয়েছেন। আমার রক্ত উম্মতের জন্য জায়েজ করে দিয়েছেন। আমি ছিলাম শক্তিশালী ও সামর্থ্যবান । এক রেস্তোরাঁয় তার উপর চড়াও হতে গেলে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। আমার মনে যা কিছু এলো তাকে শুনিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

আলেমদের কাফের ফতোয়া আমাকে দীন থেকে আরও দূরে সরিয়ে দিয়েছে। তাদের বিরোধিতা আমার উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে আমি আজহারের শায়খ হাসুনার জ্ঞান-বুদ্ধির নিয়মিত প্রশংসা করতাম। একবার কোনো এক আলেম আমাকে শায়খের নিকট নিয়ে গেল। তার নিকট আমার চিন্তাধারা উল্লেখ করল, যা দীন ও রেসালাতের সম্পূর্ণ বিরোধী। শায়খ হাসুনা ড. ফাহমির সাথে অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিত আচরণ করে বললেন, মানুষ কখনো কখনো ভুল করে। তার পদস্খলন ঘটে। শায়খ আমাকে তিরস্কার করলেন না। উত্তম চরিত্রের নমুনা পেশ করলেন। এই ব্যবহার আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব ফেলেছে। আমার ধর্মদ্রোহিতার আগুনে শীতল বারি বর্ষণ করেছে।

দীনের আকর্ষণ সৃষ্টির কারণ

আমি ড. ফাহমিকে জিজ্ঞেস করি, কোন জিনিস আপনাকে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং আপনার চিন্তাধারার মোড় দীনের দিকে ঘুরিয়ে দেয়? তিনি বললেন, সেটি আসলে কুদরতিভাবেই হয়েছিল। পশ্চিমা সভ্যতার

ব্যর্থতা আমাকে ভীষণ প্রভাবান্বিত করেছে। বিশেষ করে পারিবারিক আইন ও বংশগত সম্পর্কের দুর্বলতা অনেক প্রভাব ফেলেছে আমার মধ্যে। আমি বললাম, শিষ্টাচার ও কৃষ্টি-কালচারের ব্যর্থতার প্রভাব সর্বপ্রথম পড়ে পারিবারিক জীবনে। এটা পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু সংগঠনের আকাঙ্ক্ষা হল প্রাচ্যও এসব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের অনুসরণ করুক। এসব সংগঠন চরিত্রহীন পশ্চিমা সভ্যতারই সৃষ্টি। সেই সভ্যতার সৃষ্টি না, যে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অস্তিত্বে এনেছে, সমাজকে শৃঙ্খলার বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তারপর বললেন, ভারতের তুলনায় মিসরের লোকজন পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে বেশি ধাবিত। ভারতে এমনও লোক আছে, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পর্যন্ত করে এবং কঠিন আন্দোলন গড়ে তোলে। মিসরে এমনটি দেখা যায় না। আমি ড. ফাহমিকে বললাম, আনুমানিক পনেরো বছর পূর্বে আমি আপনার একটি শক্তিশালী রচনা পড়েছিলাম। তার প্রভাব এখনো স্মৃতিপটে বিদ্যমান। তা ছিল 'বর্ষ বিদায় বর্ষবরণ' প্রসংগে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেকেই লেখাটির প্রশংসা করেছেন। সেই রচনার একটি পূর্ণ সংকলন আমি প্রকাশ করেছি। তারপর তিনি তার একটি কপি আমাকে হাদিয়া দিলেন। বললেন, এটা তারুণ্যের ধ্যান-ধারণা ও আবেগসংবলিত। এতে কোনো দীনী চিন্তাধারা তালাশ করবেন না। তবু বইটি পড়ুন। কেননা এটি ব্যথিত হৃদয়ে আর্তনাদের ধ্বনি ও তার বাস্তব ডায়েরি।

ড. ফাহমির সাহিত্যগাথা

জানতে পারলাম ড. ফাহমির সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অনেক উজ্জ্বল। তার মধ্যে এমন যোগ্যতাও ছিল, যদ্দ্বারা তিনি মিসরের শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিকদের মাঝে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরি করে নিতে পারতেন। কিন্তু লেখালেখিতে তার তেমন আগ্রহ ছিল না। শুধু অধ্যয়ন ও নির্জনতাকেই প্রধান্য দিয়ে থাকেন তিনি। তার লেখা গ্রন্থের তালিকা যদিও নগণ্য তবে মনকাড়া। সর্বসাধারণের পাঠ-উপযোগী। আরবি অলংকারশাস্ত্রে এবং উত্তম শব্দ নির্বাচনে মানফালুতীর চাইতেও তিনি অনেক অগ্রগামী। মূল্যবান কথোপকথন ও দীর্ঘ বৈঠকের পর আমরা তার থেকে বিদায় নিই।

২০ এপ্রিল ১৯৫১

আজ জুমার নামাজ দারুল আহকামে আদায় করলাম। সেখানে গিয়ে দেখি জনাব হোসাইন ইউসুফ দাঁড়িয়ে 'হযরত ওমর ইবন আবদুল আজিজ রহ. এর জীবন ও ইতিহাসে'র উপর ভাষণ দিচ্ছেন। নামাজান্তে আমাকে বক্তৃতা করার জন্য অনুরোধ করলে আমি তার বক্তৃতারই কিছু বিশ্লেষণ করি। আমরা কিছু সময় তার অফিসে বসলাম। উপস্থিত লোকদের সাথে পরিচিত হলাম। জনাব হোসাইন ইউসুফ মঙ্গলবার আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আসরের পর আমরা জিজায় জালাল হোসাইনের বাসায় গেলাম। তিনি পাকিস্তানী সাংবাদিকদেরকে বাসায় চায়ের দাওয়াত করেছিলেন। আমাকেও দাওয়াত দিয়েছেন। সেখানে কতক পুরাতন বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়। পাকিস্তান দূতাবাসের নতুন প্রেসসচিব জনাব শরিফ হাসানের সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। আমার লেখা আরবি-উর্দু বই পড়ে তিনি আমাকে চিনেছেন। আমার আব্বাজান সম্পর্কেও তার জানাশোনা ছিল। এর আগেও তিনি আমার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমি দেখা করতে পারিনি। আজ কোনোরূপ পূর্বসিদ্ধান্ত ছাড়াই সাক্ষাত হয়ে যায়। তারপর মাগরিব নামাজের পর আমরা ফিরে আসি।

ইকবাল দিবসের আলোচনাসভায়

২১ এপ্রিল ১৯৫১

খুব ভোরে এদারায়ে সাকাফিয়ায় গেলাম। সেখান থেকে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনে গিয়ে ড. ইয়াহয়া আহমদ দারদিরীর সাথে সাক্ষাত করি। জানতে পারলাম আমার রচনা 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ' জুন মাসের আগে প্রকাশ হবে না। অন্য জায়গা থেকে প্রকাশ করার অনুমতি তার কাছে চাইলে তিনি সম্মতি দেন। সেখান থেকে আমরা প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মুহিব্বুদ্দীন খতিবের সাথে সাক্ষাত করতে 'রওজা'র উদ্দেশে রওনা হই। তার সঙ্গে রচনাটি ভিন্ন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত হয়। সেখান থেকে হেজাজের গভর্নমেন্ট প্রেস ম্যানাজার জনাব সাইয়েদ মাহমুদ হাফিজের সাথে সাক্ষাত করতে যাই।

সেখানেই দুপুরের খাবার খাই। দীর্ঘক্ষণ এখানে অবস্থান করি। মাগরিবের নামাজ আদায় করি 'কালব প্রেসে'। তারপর 'ইকবাল দিবসে'র অনুষ্ঠানে উপস্থিত হই। সেখানে আব্বাস মাহমুদ আক্কাদকে এ-ই প্রথমবার

দেখি। তিনি মিসরের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং নন্দিত কথাশিল্পী। ইকবালের উপর তার আলোচনা শুনি। অন্যদের প্রবন্ধপাঠও শুনি। আমার আফসোস হল, তাদের কেউ ইকবালকে ভালো করে অধ্যয়ন করেননি। তার পয়গাম ও জজবা ভালো করে বোঝেননি। কারণ তারা ইকবালের ইংরেজি অনুবাদ পড়েছেনমাত্র। ফলে তারা তার পয়গাম ও আবেদন ফুটিয়ে তোলতে পারেননি। তার চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করতে পারেননি। এ অবস্থা দেখে ইকবালের উপর আমি যে প্রবন্ধ পাঠ করেছি তা ছেপে প্রকাশের দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি যদিও প্রবন্ধটির কলেবর ছোট। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর প্রফেসর আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ তার বাড়িতে বিশেষ সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমার প্রচণ্ড জ্বর অনুভব হচ্ছিল। এর কিছু আলামতও প্রকাশ পাচ্ছিল। পুরোপুরিভাবে জ্বর আসার আগেই বাসায় ফিরে যাওয়া ভালো মনে করলাম। তাই তার সঙ্গে সাক্ষাত না করেই চলে আসি।

২২ এপ্রিল ১৯৫১

জ্বরের কারণে সারাদিন অস্থির ছিলাম। উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি আজ। শুধু আবদুস সাত্তার শেঠের সঙ্গে 'পাকিস্তান ক্লাবে' সাক্ষাত করেছি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আমাকে জানালেন যে, আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন। কিন্তু তিনি আমার ঠিকানা জানতেন না। ইকবাল দিবসে ইউনিভার্সিটিতে ঘোরাঘুরি করেও তিনি ঠিকানা খুঁজে পাননি।

২৩ এপ্রিল ১৯৫১

আজ আমরা জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে যাই। জমিয়তের শাখাগুলোতে বিতরণ করার জন্য আমার লেখা 'শোন হে মিসর' ও 'হেরাগুহার দর্শন' পুস্তিকার কয়েকটি কপি দিই। 'অনুবাদ, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা পরিষদে'ও যাই। সেখানে আবদুল মুতআল আফেন্দীর সঙ্গে সাক্ষাত করি। 'আদদাওয়াহ' পত্রিকার অফিসেও যাই। সেখানে সবরী আবেদিনের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানান। তারপর তার নিকট থেকে ডাক্তার খলিল ইশমাবীর বাসায় যাই। আমাদের সঙ্গে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রধান, তার ভাই

সালেহ ইশমাবীও ছিলেন। ডাক্তার ইশমাবীর বাড়িতে দুপুরের খাবার খাই। তিনি আমাকে ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামীকাল আসতে বললেন।

২৪ এপ্রিল ১৯৫১

আজকের উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ মনে পড়ছে না।

২৫ এপ্রিল ১৯৫১

ডাক্তার খলিল ইশমাবীর নিকট যাই। আমাদের প্রত্যেককে তিনি চেকআপ করেন। ম্যালেরিয়া রক্তশূন্যতাসহ বিভিন্ন রোগের জন্য অনেক ওষুধ দেন। ওষুধ এবং ইন্‌জেকশন নিজেই পুশ করেন। ওষুধ খাওয়া এবং ইনজেকশন নেওয়ার জন্য একটা লম্বা সময় বেধে দেন। আমার সুস্থতার ব্যাপারে তিনি দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা প্রকাশ করেন। তিনি আমাকে আরও কদিন মিসরে থাকতে অনুরোধ করেন। যাতে ভালো করে তিনি আমার চিকিৎসা করতে পারেন। আমি বেশি দিন না থাকার জন্য ওজর পেশ করি। তবে ওষুধ নিয়মিত খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিই। দুপুরের খাবার আজও তার সঙ্গে খাই। পরিশেষে তার ইখলাস, সহমর্মিতা ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য শোকরিয়া আদায় করে ফিরে আসি।

শায়খ সবরী আবেদিনের বাসভবনে

২৬ এপ্রিল ১৯৫১

গতকাল থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধের প্রভাবে অত্যন্ত অস্থির লাগছে। সারাটা দিন এভাবেই কাটল। আজ শায়খ সবরী আবেদিনের বাসায় খানা খাওয়ার কথা ছিল। তাই সাথীদের সাথে নয়া মিসর গেলাম। পথেই আজহারের আলেম মুহম্মদ আবুল উয়ুনের দেখা পাই। খুব আনন্দের সাথে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তিনি শায়খ সবরীর ঘর পর্যন্ত আমাদের পথপ্রদর্শন করলেন। সারাটা পথ তিনি মিসরীয়দের চারিত্রিক অধঃপতন ও তাদের নির্লজ্জতার ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। আন্‌জুমানে তাহাফ্‌ফুজে কুরআন অনুষ্ঠানের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, সেখানে মহিলারা কী পরিমাণ বেপর্দা অবস্থায় ছিল। লাউডস্পিকারে মাগরিবের আজান হওয়া সত্ত্বেও তারা নামাজ অনেক বিলম্বে আদায় করে। আমার এ বিলম্ব মোটেই পছন্দ হয়নি। আমি উপস্থিত কিছু লোক নিয়ে ভিন্নভাবে নামাজ পড়ে নিই।

তিনি নিজের পকেট থেকে আমার লেখা 'শোন হে মিসর' পুস্তিকাটি বের করে বললেন, একে আমি সব সময় সাথে রাখি। ফেরার সময় আমাদেরকে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য জোরালো আবেদন জনান। আমরা তার হুকুম পালন করি।

এভাবেই একপর্যায়ে জনাব আবেদিনের বাসায় পৌঁছে যাই। প্রথমেই খাবারের পালা। একজন ফিলিস্তিনিও তার এখানে খাবার খান। বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঙ্গে পোলাওজাতীয় একটা আইটেম ছিল। তারপর শুরু হয় চা-পর্ব। চায়ের পর জনাব আবেদিনের ইয়ামান থেকে অতি সম্প্রতি তুলে আনা কিছু ছবি দেখতে দেখতে সময় কাটল। তিনি সেখানকার প্রাচীন স্থাপত্যের স্মারক ও নিদর্শন এমন বহু মসজিদ ও দৃশ্যের ছবি দেখান। তা ছাড়া শায়খ সবরী আবেদিনের মনমাতানো কথায় আমরা কিছুক্ষণ হারিয়ে যাই। এরপর জনাব আবেদিনের কৃতজ্ঞতা আদায় করে সেখান থেকে ফিরে আসি। পথেই শায়খ আবুল উয়ুনের ঘরে গিয়ে ঠাণ্ডা পানীয় জল পান করে আমাদের বাসায় চলে আসি।

২৭ এপ্রিল ১৯৫১

আজ সারাদিন অত্যন্ত পেরেশান ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে কাটল। বিগত বহুদিনে এত খারাপ সময় আর যায়নি। হৃদয়ে নানান চিন্তা-ভাবনা উঁকি মারতে লাগল। এগুলো দেমাগকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এটা হয়তো হৃৎকম্পন বেড়ে যাওয়ার কারণে হয়েছে। বেশি পাওয়ারি ওষুধ সেবন এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী টক ফল ও ঠাণ্ডা পানীয় ব্যবহার না করার পরিণাম। হঠাৎ বাইরে থেকে ঘুরে আসতে মন চাচ্ছে। তাই মাওলানা আবদুর রশিদ নদবীর সাথে 'আতাবা'য় গেলাম। সেখানে শায়খ মুহম্মদ মাজহার মক্কী নদবীর সাথে সাক্ষাত করলাম। তাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেল পার্লামেন্টে গিয়ে শায়খ ইসহাক আলি জান দেহলবী ও তার ভাই আলহাজ ইসমাইল দেহলবীর সাথে সাক্ষাত করলাম। পুরাতন বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাতে শরীর অনেকটা হাল্কা অনুভূত হল। অস্থিরতা ভাব অনেকটাই কেটে গেল। জুমআর নামাজ আজহারের মসজিদে আদায় করলাম। মাওলানা আবদুর রশিদের সাথে আজহারের সড়কে অনেকক্ষণ পায়চারী করলাম। আমি আমার মনের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলাম। কখনো আমি তার উপর বিজয় লাভ করছি, কখনো ও আমার উপর বিজয় লাভ করছে।

তারপর ভারতীয় ছাত্রাবাসে গেলাম। সেখানে ছাত্রাবাসের দায়িত্বশীল মাওলানা লোকমান নদবীর নিকট বসলাম। কামরায় ফিরে দেখি আমার সফরসঙ্গী মাওলানা ওবায়দুল্লাহর একই অবস্থা। তার অবস্থা বরং আমার চেয়েও নাজুক হয়ে দাঁড়াল। উভয়ে এখন একই নৌকার যাত্রী।

২৮ এপ্রিল ১৯৫১

আজ শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হওয়ার কারণে এবং অন্তরের অশান্তির দরুন ডায়েরি লিখতে পারিনি। মাওলানা ওবায়দুল্লাহর স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করে পরে লিখে নিই। শায়খ হামেদ ফকীর সাথে আজ তার অফিসে দেখা করলাম। শায়খ আবদুর রাজ্জাক হামজা– 'খতিবে হারাম মক্কী'র সাথে হঠাৎ সাক্ষাত হয়ে গেল। তিনি তার মাতৃভূমি মিসরে এসেছেন। আমরা দুজন এমনভাবে সাক্ষাত করি যেন আমাদের মাতৃভূমি এক এবং অনেকদিন পর আমাদের সাক্ষাত হল। পবিত্র হেজাজ আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আপন মাতৃভূমির মত মিশে আছে। আমি তাকে হেজাজ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করলাম। তিনি সেখানকার বহু নতুন ঘটনা আমাকে শোনালেন। সেখানে আলজেরিয়ার মুফতি ও সাবেক ওয়াক্ফ বিষয়ক মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত হল। আমি তাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি হাদিয়া পেশ করি। আগামীকাল শায়খ মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাকের সাথে দারুল উলুমের প্রিন্সিপ্যাল জনাব ইবরাহিম মুসতফার সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হল।

২৯ এপ্রিল ১৯৫১

আজ মাওলানা ওবায়দুল্লাহর সাথে রওজাস্থ মাতবাআতুস সালাফিয়্যায় যাই। সেখানে 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থের প্রুফ দেখলাম। সেখান থেকে জিজাস্থ এদারায়ে সাকাফিয়া গেলাম। ড. আহমদ আমিনের সাথে দেখা করে জানতে পারলাম আমার আব্বাজান মাওলানা আবদুল হাই রহ. এর গ্রন্থ جنة المشرق [জান্নাতুল মাশরিক][১] সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, প্রফেসর মুহম্মদ ফরিদ

---

[১] দায়িরাতুল মাআরিফ হায়দারাবাদ থেকে গ্রন্থটি الهند والعهد الاسلامی [ভরতবর্ষে মুসলিম শাসনকাল] নামে প্রকাশিত হয়েছে।

আবু হাদিদের সিদ্ধান্ত হল, কিতাব আসলেই চমৎকার বিষয়ে লেখা হয়েছে। কিন্তু ভারতে ইংরেজদের শাসনামলের পরের পরিপূর্ণ ইতিহাস অধ্যায় আকারে হওয়া দরকার। আপনি যদি তা সংকলন করতে পারেন তখন কিতাব প্রকাশে কোনো বাধা থাকবে না। আমি বললাম, 'আমি তার জন্য প্রস্তুত'। আমি সংস্থার অফিস থেকে কিতাব নিয়ে নিলাম। সেখান থেকে আমরা আনসারুস সুন্নাহর মারকাজে গেলাম। সেখানে শায়খ আবদুর রাজ্জাকের সাথে দেখা করি। সেখান থেকে দারুল উলুম যাই। সেখানে ইবরাহিম মুসতফাসহ দারুল উলুমের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে দেখা করি। জনাব ওমর দাসুকি 'আরবদের বীরত্ব ও সাহসিকতা'র একটি কপি আমাকে হাদিয়া দিলেন। দুপুরের খানা মাওলান লোকমান নদবীর নিকট হল। তিনি এক আফগানী বুজুর্গের সাহায্যে আফগানী খানা প্রস্তুত করিয়েছেন।

মাকতাবায়ে মাহফুজের স্বত্বাধীকারী জনাব মাহফুজ আফেন্দী আমাকে বললেন, আমি যেন অল্প কথায় 'আধুনিকতা থেকে ইসলামের প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদের সারাংশ শুরুতে লিখে দিই। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমার পক্ষে তা করে দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাছাড়া এ বিষয়ে আমার কলম ধরার উৎসাহও পাচ্ছিলাম না। তবে মনে মনে এর একটি যুৎসই সমাধান খুঁজছিলাম। খুব ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিলাম। শায়খ আহমদ শিরবাসীর শরণাপন্ন হব। তার পক্ষে এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া মোটেই কঠিন এবং দুশ্চিন্তার কারণ হবে না। আমি তার বাড়িতে গিয়ে সবিনয়ে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। তিনি কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া আমার প্রস্তাব কবুল করে নিলেন। এরপর পাকিস্তান ক্লাবে গিয়ে মিসরে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত জনাব আবদুস সাত্তার শেথের সঙ্গে সাক্ষাত করি। এরপর 'হোটেল পার্লামেন্টে' গিয়ে হাজী ইসহাক ও হাজী ইসমাইলের সাথে মিলতি হই। সেখানে তাদের সাথে ভারতীয় খানা খাই।

মিসরে শাম্মুন নাসিম উৎসব

৩০ এপ্রিল ১৯৫১

আজ 'শাম্মুন নাসিম' উৎসব। এটা মিসরের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় আনন্দমেলা। যেমন আমাদের ভারতে 'হোলি উৎসব'। ইরানে 'নওরোজ'। এদিন জাতি তার প্রকৃত রূপ থেকে বেরিয়ে সমস্ত আদব-আখলাক দুপায়ে দলে আনন্দে

উৎসবে মেতে থাকে। দেখলাম মানুষ দলে দলে নীলনদের দিকে ছুটে চলছে। ছেলেমেয়ে, যুবক-যুবতী সবাই পার্কের দিকে যাচ্ছে। এই উৎসবের দিনে তারা নিজেদের ভাবগাম্ভীর্য ও সম্ভ্রমবোধের চাদর খুলে ফেলে। স্বীয় কৃষ্টি-কালচারের ও তাহজিব-তামাদ্দুনের সাথে বিদ্রোহ করে বসে। জায়গায় জায়গায় মদের উৎকট গন্ধ পাওয়া যায়। আজ শায়খ হামেদ ফকী তার বাসায় আমাদের দাওয়াত করেছিলেন। ঘটনাক্রমে এদিনেই শাম্মুন নাসিম দিবস। অন্যান্য মেহমানের সাথে আমরাও দস্তরখানে বসলাম। রান্না আইটেমে বিভিন্ন ধরনের মাছ ছিল।

আলহাজ হিলমী মিনিয়াবীর প্রেসে গেলাম। সেখানে আমার 'ইসলামের কবি ড. মুহম্মদ ইকবাল' গ্রন্থের প্রুফ দেখলাম। বইটি ওহাবা হাসান ওহাবা নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশ করবেন। বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে গতকালই তার নিকট এ বিষয়ে দরখাস্ত করেছিলাম।

ইতোমধ্যে শায়খ আহমদ শিরবাসী আগমন করলেন। আমার বিশ্বাসই হচ্ছিল না যে, তিনি একদিনের মধ্যে গ্রন্থের প্রতিটি বিষয়ের সারসংক্ষেপ লিখে আনতে পারবেন। এটা দেখে আমি খুব খুশি হলাম। তার লেখা প্রতিটি সারমর্মই বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের সাথে মিলেছে। সাবলীল-প্রাঞ্জলও হয়েছে। সন্দেহ নেই, শায়খ শিরবাসী অল্প সময়েও দ্রুত চিন্তা করে অনেক সুন্দর লিখতে পারেন।

জামে' জহির বিবারস জাশনোগিরে

৪ মে ১৯৫১

গত [১,২,ও ৩ মে ১৯৫১] তিনদিন ডায়েরিতে উল্লেখ করার মত কোনো বিষয় সামনে আসেনি। আজ শায়খ সবরী আবেদিন আমাদের বাসায় এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তিনি দুবার আমাদেরকে তার সাক্ষাতে ধন্য করেছেন। আমরা তার সাথে জহির বিবারাস জামে মসজিদ গেলাম। পথে তিনি বিভিন্ন স্থাপত্যের ইতিহাস বর্ণনা করছিলেন। যেসব মসজিদ ও উঁচু দালানের কাছ দিয়ে যাই তিনি তার ইতিহাস বর্ণনা করেন। সেসবের মধ্যে সুলতান সালাহুদ্দীনের খানকাও ছিল। খানকার অনেক ওয়াকফকৃত সম্পদ রয়েছে। এর মুতাওয়াল্লি হওয়ার জন্য বড় বড় আলেমদের মাঝে দ্বন্দ্ব হত। আমরা বিবারাস মসজিদে পৌঁছে জুমার নামাজ আদায় করি। এটা সেই মসজিদ যার মুতাওয়াল্লি একসময় ইমাম

জালালুদ্দীন সুয়ুতী রহ. -ও ছিলেন। একবার তিনি ওয়াকফের আয় থেকে ওই সকল লোককে দিতে অস্বীকার করলেন, যারা ওয়াকফকারীদের শর্ত অনুযায়ী ইলম ও জিকিরে লিপ্ত থাকত না। অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করত। ফলে ওইসব লোক তার শত্রুতে পরিণত হল এবং তাকে মসজিদের পাশে অবস্থিত একটি গভীর কূপে ফেলে দিল। বহু কষ্টে তিনি সেখান থেকে মুক্তি পান।

নামাজের পর আমরা শায়খ তামাম নকশবন্দীর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি শায়খ মুহম্মদ আমিন বাগদাদীর খলিফা। মিসরে নকশবন্দিয়া মাশায়েখদের একজন তিনি। তার মাধ্যমেই মিসরে নকশবন্দিয়া সিলসিলা ছড়িয়েছে। এখানে বন্ধুবর মুহম্মদ রাশাদের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি অধিকাংশ সময় শায়খ নকশবন্দীর নিকট আসা-যাওয়া করেন।

মজার কথা হল শায়খ মুহম্মদ সবরী আবেদিন আমাদের নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, নয়ামিসরে কতক বন্ধুরা সাথে তার খানার দাওয়াত আছে। আমরাও তাকে বললাম, আমাদেরও এক স্থানে দাওয়াত আছে। আমি জনাব আবেদিনকে বিদায় দিয়ে আলহাজ হিলমীর নিকট গেলাম। তিনি এবং তার দুই বন্ধু জনাব গাজালী ও জনাব সাইয়েদ সাবেকের সঙ্গে দাওয়াতে যাব। আমরা যখন মেজবানের বাসায় গেলাম দেখি জনাব সবরী আবেদিনও সেখানে উপস্থিত। জনাব আমিন আল হোসাইনীও এসেছেন। তিনি কিছুদিন আগে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সফর করে ফিরেছেন। আফগান রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহম্মদ সাদেক মুজাদ্দেদী এবং গণ্যমান্য বহু লোকজন উপস্থিত ছিলেন। মুফতি আমিন আল হোসাইনী আমায় চিনে ফেললেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। তার পাশে বসিয়ে খুব মহব্বতের সাথে কথা বলতে লাগলেন। উপস্থিত লোকজনের নিকট মহব্বতের সাথে আমার আলোচনা করতে থাকেন। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিই, 'যখন আপনি মুহম্মদ আলি উলুবা পাশার সঙ্গে লখনৌ গিয়েছিলেন তখন আমি আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় আপনার সম্মানার্থে অনুষ্ঠান হয়েছিল। আজ থেকে ৩৩ কি ৩৪ বছর আগের কথা।' আমি বলার পর তার সেই স্মৃতি স্মরণ হয়। দস্তরখানেও তার পাশে আমাকে বসান। আমার প্রতি বরাবর খেয়াল রাখেন। খাবারের সময় তার মনোযোগ আমার দিকেই বেশি ছিল। সুন্দর

চরিত্র, রুহানিয়াত ও স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে তিনি অনেক উপরের স্তরের মানুষ। বর্তমান যুগের মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে তার মর্যাদা অনেক ঊর্ধ্বে।

৫ মে ১৯৫১

আমরা 'রওজা'য় গেলাম। 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থটি শেষবারের মত বানানসংশোধন করার জন্য সাথে নিয়ে এলাম। তারপর 'দারুল কিতাব আল আরাবি'র প্রেসে গেলাম। 'ইসলামের কবি ড. মুহম্মদ ইকবাল'র প্রুফ সংশোধন করলাম। তারপর জালাল হোসাইন বের অফিসে যাই। ভারত থেকে ডাকে আসা চিঠি গ্রহণ করি। জোহরের পর হোলওয়ান যাই। শায়খ হাসানাইন মুহম্মদ মাখলুফের শুশ্রূষা করি। এখানে আহমদ শিরবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। শায়খের বাসা থেকে আমরা সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যাই। অনেকদিন গত হল তার সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে। তার ঠিকানা ভুলে বাসায় রেখে এসেছি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার বাসার সন্ধ্যান পেলাম না। পরিশেষে কায়রো চলে আসি।

৬ মে ১৯৫১

দারুল কিতাব আল আরাবি গেলাম। সেখানে মুফতি আমিন আল-হোসাইনীর আমন্ত্রণপত্র পেলাম। তিনি আমাদেরকে মঙ্গলবার তার ঘরে খানার দাওয়াত দিয়েছেন। আজ বাদশা ফারুকের শুভ-পরিণয় দিবস। পুরো কায়রো নব-বধূর সাজে সজ্জিত। কায়রোর শাহিমহলের পার্শ্ববর্তী এলাকা ভ্রমণবিলাসী ও বিনোদনপিয়াসীদের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠেছে। বিজলিবাতির আলোয় পুরো শহর চমকাচ্ছিল। ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও মার্কেটে এত আলোকসজ্জা করা হয়েছে যদি তা পুরো মিসরে বণ্টন করে দেওয়া হয় তা হলে মিসর আলোকিত হয়ে উঠবে। তখন আর কোনো ঘর, কোনো ঝুপড়ি অন্ধকার থাকবে না। কোনো পথিকের রাতে চলতে কষ্ট হবে না। কোনো গলিতে অন্ধকার থাকবে না। আড়ম্বরতার পিছনে যেই সম্পদ খরচ করা হয়েছে যদি তার একশো ভাগের একভাগ সারা মিসরে বণ্টন করা হয় তবে দেশের কেউ অভুক্ত থাকবে না। বস্ত্রহীন থাকবে না। আল্লাহ তায়ালারই ইচ্ছা ছিল যে, মিসরে অবস্থানকালে এই আনন্দখেলা প্রত্যক্ষ করে শিক্ষা গ্রহণ করব। না হয়

কালকেই শায়খ শিরবাসীর সাথে 'ওলামায়ে আজহার সংঘ' পরিদর্শনে যাওয়ার কথা ছিল। এই অবস্থায় সামান্য পথ অতিক্রম করাও কষ্টকর হয়ে পড়ে। ভিড়ভাট্টা ও যানবাহনের জ্যাম শেষ হওয়ার নাম নেই।

যাই হোক, অনেক দুর্ভোগ পোহানোর পর আজহারের রোড অতিক্রম করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সড়কে পৌঁছাই। এই রোডেই ওলামা সংঘের অফিস। আমাদের পথ আবেদিন মহলের দিকে ছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আজ আমরা রাজকীয় বিবাহের আড়ম্বরতা অবলোকন করি।

বহু কষ্টে আমরা ওলামা সংঘের অফিসে পৌঁছি। ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ মুসার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তার সাক্ষাতই ছিল এই কষ্টকর সফরের বড় অর্জন। তিনি আমার প্রকাশিতব্য কিতাব 'আধুনিকতা থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থ নিয়ে কথা বলেন। তিনি বললেন, সম্ভবত যেসব প্রবন্ধ এই বইয়ে রয়েছে সব কটির সারমর্ম এ কথার দাবি রাখে যে, মুসলমানদের মাঝে দীন ও পয়গামের ব্যাপারে নতুন করে একিন ও বিশ্বাস সৃষ্টি করা হোক। আমি তার সঙ্গে একমত পোষণ করলাম। আমি ডক্টর মুসার সুস্থ চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দেখে প্রভাবান্বিত হই। সেখান থেকে বাসায় ফিরে আসি। আসার সময় আরও বেশি সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রচণ্ড ভিড়ে দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা। বাসায় এসে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ি।

৭ ও ৮ মে ১৯৫১

এই দুইদিন উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। তবে দারুল কিতাব আল আরাবি ও আশিরায়ে মুহম্মদিয়া গিয়েছিলাম। এ ছাড়া শায়খ আবদুল মুনয়িম নমরের সঙ্গে শিবরায় তার বাড়িতে সাক্ষাত করি। এরপর সৌদি আরবের শায়খ মুহম্মদ বিন মানে'র সাহেবজাদা ও তার ভাই শায়খ আবদুল আজিজের সাথে দারুল উলুমের পাশে ইডেন হোটেলে সাক্ষাত হয়।

মুফতি আমিন হোসাইনীর আতিথেয়তা

৯ মে ১৯৫১

আজ আমরা মুফতি আমিন আল-হোসাইনীর আতিথেয়তায় সাড়া দিয়ে নয়া মিসরস্থ 'মুহম্মদ আলি সড়কে'র পাশে তার বাসভবনে গেলাম। খানা অনেকটা ভারতীয় স্টাইলের। মুফতি হোসাইনীর আলোচনা তারই

চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মধুর ছিল। এটা আনন্দকে দ্বিগুণ করে দেয়। খানার পর মুফতি হোসাইনী রবিবার এগারোটায় ব্যক্তিগত ও গোপন কিছু কথাবার্তার জন্য তার অফিসে আমাকে দাওয়াত দিলেন। আমি তার দাওয়াত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলাম। কারণ এমন একটি সুযোগের সন্ধান আমি আগে থেকেই করছিলাম।

১০,১১ও ১২ মে ১৯৫১

এই তিনদিন উল্লেখযোগ কোনো বিষয় সামনে আসেনি, যা ডায়েরিবদ্ধ করব। তবে শহিদ হাসানুল বান্নার সম্মানিত পিতা শায়খ আহমদ আবদুর রহমান বান্নার সাক্ষাত অবশ্যই স্মরণযোগ। সোমবার ইউসুফ কারজাবী, শায়খ মুহম্মদ দামিরদাশী, শায়খ আবদুল্লাহ আকিল, শায়খ আহমদ শিরবাসী এবং ডাক্তার খলিল ইশমাবী আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে আমাদেরকে ধন্য করেন।

মুফতি হোসাইনীর সাথে কথোপকথন

১৩ মে ১৯৫১

মুফতি আমিন আল হোসাইনীর সাথে সাক্ষাতের জন্য নয়ামিসর গেলাম। মিসরে থাকাকালীন সবচেয়ে ভালো ও আনন্দদায়ক সাক্ষাত ছিল এটি। যদিও এই সাক্ষাত অন্তরকে ক্ষত ও বেদনাকে তাজা করে দিয়েছে। মুফতি হোসাইনী একটি বিশেষ বৈঠকে আমার সাথে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কথা বলেন। তিনি ফিলিস্তিন জিহাদের ইতিহাস, ইহুদিদের নাপাক চক্রান্ত, এমনকি মদিনা মুনাওয়ারাসহ ইহুদিদের পুরাতন আবাসভূমি খায়বার পর্যন্ত জবরদখল করার ইচ্ছার সরাসরি ঘোষণা; এর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণ, মুসলমানদের সাথে ইংরেজদের বেইমানি ও চক্রান্ত আলোচনা করলেন। আলোচনা করলেন তাদের পরিকল্পনা ও কথাবার্তা থেকে প্রমাণিত ক্রুসেডীয় উন্মাদনার কথা। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ.

'তাদের মুখ থেকেই আক্রোশ বের হয়ে গেছে। আর তাদের অন্তরে যা কিছু [বিদ্বেষ] গোপন আছে, তা আরও অনেক বেশি'। [সুরা আলে ইমরান, ১১৮ আয়াত]

এই সকল চক্রান্তের বিপক্ষে মুসলমানদের নমনীয়তা এবং তাদের চক্রান্তের জালে দ্রুত ফেঁসে যাওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। তারপর আরব সরকারগুলোর গাফলত, এর ভয়াবহ পরিণতি ও ইহুদিদের চক্রান্তের আশঙ্কার ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব ইত্যাদি নানান বিষয় আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, আরব বাদশারা নীরব ভূমিকা পালন করছে। অথচ ইহুদিরা তাদের অস্তিত্বের উপর বারবার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছে। তারা তাদের ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য পূরণে, সৌখিনতা ও বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ফিলিস্তিন ট্রাজেডির ব্যাপারে দায়িত্বশীল হওয়া সত্ত্বেও আরবলিগের নীরবতা এবং ফিলিস্তিনি মুজাহিদীনদের নিরস্ত্রীকরণ, আরব ভূখণ্ড ইহুদিদের নিকট হস্তান্তর, অকুতভয় ফিলিস্তিনি মুজাহিদদের জিহাদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ, তাদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা স্থগিতকরণ, সর্বোপরি মাতৃভূমি বেদখল হয়ে যাওয়ার বাস্তব চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন।

নিজে যেসব মসিবত ও কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেছেন তার বর্ণনা দেন। বলেন, একদল নামধারী মুসলমানকে ইংরেজরা হাতিয়ার বানিয়েছে। তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাদেরকে এমন একটি ভিন্ন ভূখণ্ডে বন্দি করে রেখেছে যাতে তারা ফিলিস্তিন দখলের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে। ইংরেজ-গোষ্ঠি তাদের হাত আটকে দিয়ে তাদের ও ফিলিস্তিনিদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে। এমনকি মিসর ও গাজার লোকদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছে। তিনি আরও বললেন, একদিন আমি গোপনে গাজায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমাকে মিসরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তারপর বিবরণ দিলেন গাজার আশ্রয়শিবিরে মুসলমানরা কীভাবে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতরাচ্ছে। কীভাবে তারা খ্রিস্টানদের মিশনারি তৎপরতা এবং কমিউনিস্ট প্রোপাগান্ডার শিকার হচ্ছে। কীভাবে তাকে আশ্রয়শিবিরে লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত করার এবং ইসলামি দাওয়াতের ফরিজা আন্‌জাম দেওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তার সম্বন্ধে উদ্ভট ভিত্তিহীন কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে তার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়, বদনাম হয়। এবং তার ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের অনাস্থা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এসব বাধা সত্ত্বেও আমরা জিহাদ জারি রাখার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

যেভাবেই হোক আমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইনি। শুধু কাফের-গোষ্ঠি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। জনাব হোসাইনীর কথা ছিল অত্যন্ত বেদনাভরা ও দরদমাখা। তিনি কাতর কণ্ঠে বলে যাচ্ছিলেন। আর বারবার দুচোখের অশ্রু লুকোচ্ছিলেন। অথচ তিনি তার সাহস ও সহনশীলতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তার কথায় আমি অনুধাবন করছিলাম যে, মুসলমানদের পতন, বাস্তব ঘটনার ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা, উদসীনতা এবং এমন ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কহীনতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আর ঔপনিবেশবাদের রাজনীতি কত সফল হয়েছে। চোখের উপর সে পর্দা টেনে দিয়েছে। মানুষের অন্তরকে ক্রয় করে নিয়েছে। আকল ও ফিকির নিয়ে খেলা করছে।

আমি ব্যথাতুর হৃদয়ে মুফতি আমিন আল হোসাইনীর কথা শুনছিলাম। তার কথায় আমি অনুমান করলাম অতীতের মুসলিম নেতা ও মুসলিহীনদের যেই পরিণতি বরণ করতে হয়েছে মুফতি হোসাইনীও তা থেকে মুক্তি পাবেন না। মুফতি সাহেব শায়খ হাসানুল বান্নার খুব প্রশংসা করলেন। ফিলিস্তিন সংকটে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রচেষ্টা, তাদের সাহস, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ঈমানি শক্তির আলোচনা করলেন। তারপর বললেন, কখনও কখনও একজন ইখওয়ান সদস্য দশটা ইহুদির মোকাবেলা করত।

অনেক বিলম্বে মুফতি আমিন আল হোসাইনীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বন্ধুবর আহমদ মাইমানীর বাসায় আমাদের দাওয়াত ছিল। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি অন্য মেহমানরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা বিলম্বের কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। জনাব ফারুকী এবং সাইয়েদ আবু নসর ভূপালীর কাছে বসে খানা খাই।

সুদানি প্রতিনিধি দলের স্বাগত জলসায়

১৪ মে ১৯৫১

আমরা শায়খ আহমদ শিরবাসীর সঙ্গে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের অফিস ও কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে গেলাম। তার প্রধান পরিচালক জনাব মুহম্মদ সালেহ হরব পাশার সাথে দেখা করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিলাম। তিনি দীর্ঘদিন পর আসওয়ান থেকে ফিরেছেন। আমরা যখন জমিয়তের কার্যালয়ে তার কক্ষে প্রবেশ করি তখন সেখানে আরও কতক সম্মানিত

মেহমানের সাথে সাক্ষাত হয়। তার মধ্যে একজন ছিলেন বাদশার ব্যক্তিগত সচিব। তাকে এই সভায় বাদশার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হয়েছে। জনাব উলুবা পাশাও ছিলেন।

জেনারেল সালেহ তার স্বভাবসুলভ প্রফুল্লতা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমার পরিচয় বাদশার ব্যক্তিগত সচিব ও উলুবা পাশার নিকট তুলে ধরলেন। উলুবা পাশা বললেন, আমি তাকে চিনি। আমি তাদেরকে আমার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ 'ইসলামের কবি'র এক কপি করে হাদিয়া দিই। গ্রন্থটি কয়েকদিন আগে বেরিয়েছে। ইতোমধ্যে মুফতি আমিন আল হোসাইনী তাশরিফ আনেন। আমার সঙ্গে অত্যন্ত ভালবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে দেখা করেন। তারপর জনাব উলুবা পাশার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, উনি সাইয়েদ আবুল হাসান। আমাদের সঙ্গে লখনৌর হোটেলে দেখা করেছিলেন। তারপর আমাদেরকে দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় নিয়ে গেছেন। উলুবা পাশা তার কথা সমর্থন করলেন এবং বললেন, হ্যাঁ, আমার মনে আছে। এরই মধ্যে আফগান রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ মুহম্মদ সাদেক মুজাদ্দেদী তাশরিফ রাখেন। আমি তাকে আমার লেখা গ্রন্থ 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ'র একটি কপি হাদিয়া দিই। এরপর জনাব সালেহ পাশা ওঠার ইঙ্গিত করলে আমরা সকলেই উঠি এবং জমিয়তের শরীরচর্চা কেন্দ্রের দিকে হাঁটতে শুরু করি। এতক্ষণে অন্য সব সুদানি মেহমানও এসে পৌঁছেছেন। আমরা বিভিন্ন খেলা ও ফৌজি প্যারেড উৎসাহের সঙ্গে পরিদর্শন করলাম। তার প্রভাব অন্তরের গভীরে রেখাপাত করল। আমার অবস্থা এই যে, নিজের শারীরিক দুর্বলতা ও ফৌজি কর্মকাণ্ডের বহু দূরে লালিত হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই প্রদর্শনী দেখে আমার ভিতরে আবেগ উথলে উঠল।

এসব দৃশ্য দেখে আমি বোঝতে পারলাম- পরিবেশ ও যুদ্ধের আবহাওয়া সৈনিকদের কীভাবে প্রভাবিত করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, যদি আমি এই পরিবেশে হতাম তা হলে তাদের আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দিতাম।

এরপর আমরা অনেক বড় ও প্রশস্ত একটি হলরুমেরর দিকে অগ্রসর হলাম। খাবারের রাজকীয় আয়োজন ছিল সেখানে। আমি আহমদ শিরবাসী এবং আজহারের ভাষাতত্ত্ব অনুষদের জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে

বসি। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ অন্য মেহমানদের সঙ্গে বসেছেন। খাবারের পর আমরা অন্য একটি হলরুমে যাই। সেখানে সঙ্গীত পরিবেশন এবং হযরত বেলাল রা. এর ঘটনাসংবলিত নাটক মঞ্চস্থ করার প্রস্তুতি চলছে। আমরা ক্ষমা চেয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে আসি।

১৫ মে ১৯৫১

গতরাতের সভায় কতক সুদানি মেহমানের সাথে সাক্ষাত হয়। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বিগত সুদান সফরে তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তারা আমাকে হোটেল আলজাজিরায় দাওয়াত করেছেন। আমরা ভোরেই সেখানে গিয়ে তাদের সাথে সাক্ষাত করি। সেখানে শায়খ মাজ্জুবের খলিফা জনাব আহমদ আদম এবং শায়খ হাশেমের সাথে দেখা করি। তাদের নিকট আবেদন করলাম, তারা যেন সুদানি বন্ধুদেরকে একত্র করেন। আমরা তাদের সাথে পরিচিত হব। এ উদ্দেশ্যে তিনি আমাদেরকে আগামীকাল দাওয়াত করলেন।

আজ আমাদের গরিবালয়ে আফগান-রাষ্ট্রদূত মাওলানা মুহম্মদ সাদেক তাশরিফ এনেছেন। আমরা তার সাক্ষাতলাভে ধন্য হলাম। কিছুক্ষণ আমাদের সাথে থেকে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি চলে গেলেন। তিনি আমাদের দেশের মহান মুজাদ্দেদ ইমামে রাব্বানি হযরত শায়খ আহমদ সিরহিন্দীর খান্দানের লোক। খায়রাত রোডে সাইয়েদ মুবাশশির তারাজীর সঙ্গেও আজ দেখা করি। এক ঘণ্টা পর্যন্ত তার ওখানে থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি।

১৬ মে ১৯৫১

হোটেল আলজাজিরায় সুদানি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি, যা আশা করেছিলাম। বোঝলাম এই প্রতিনিধি দল অনুকূল না। কেউ খানা খাচ্ছে। কেউ কায়লুলা[১] করছে। আমরা সুদানি দলের সভাপতি জনাব ইসমাইল বেগ আজহারীর সাথে দেখা করি। তার ব্যাপারে আমরা আগে থেকেই জেনেছি।

আলহাজ ইসহাক ও আলহাজ ইসমাইল দেহলবী মক্কীর সঙ্গে পার্লামেন্ট হোটেলে দেখা করি। বাগদাদ রেস্তরাঁয় কিছু তুর্কি ছাত্রের সঙ্গে সাক্ষাত

---

[১] দুপুরের খাদ্য গ্রহণের পর বিশ্রাম ও আরাম করাকে কায়লুলা বলা হয়।

করি। আজ আমাদের বন্ধু জনাব আবদুল গনী মাহবুব আসেন। আমাদের নিকট কিছুক্ষণ বসেন।

১৭ মে ১৯৫১

আমরা সুদানি প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাত করি। জানতে পারি জনাব হাশেম, যাকে আমি গতকাল আমার লেখা কয়েকটি বই পাঠিয়েছিলাম। তিনি সেগুলো সাইয়েদ আলি মির গনি পাশার নিকট পাঠিয়েছেন। তিনি অবশ্য কিতাবগুলো আবু আমিনার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন দিয়েছেন। আবু আমিনা গতকাল জাহাজ-যোগে সুদান চলে গেছেন।

আমরা সুদান সফরের সিদ্ধান্ত নিই। এ ব্যাপারে সালেহ হরব পাশার পরামর্শ চাই। তিনি এ সফরকে সমর্থন করেন। দীনের প্রতি সুদানিদের আগ্রহের প্রশংসা করেন। দায়ী ও দীনদার মানুষের সঙ্গে সেদেশের মানুষের ভালবাসার কথা তুলে ধরেন। সালেহ হরব সুদানের রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারি মুহম্মদ হাসানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। এ সফরে তাকে আমাদের পুরোপুরি সহযোগিতা করতে অনুরোধ জানান। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ঠিক করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে বলেন।

আজ আনসারুস সুন্নাহর চেয়ারম্যান শায়খ মুহম্মদ হামেদ ফকির সাথে সাক্ষাত করি। তাকে 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ'র একটি কপি হাদিয়া দিই। গ্রন্থে সুফি এবং ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াতে তাদের যেই কৃতিত্ব ও অবদান বর্ণনা করা হয়েছে তা তার পছন্দ হয়নি। তিনি এর কঠিন সমালোচনা করলেন। একে শিরিক ও মূর্তিপূজার শামিল বলে অভিহিত করলেন। আর বললেন, আমি আপনাকে আমার লেখা 'ইবাদতনামা'[২]র একটি কপি দিব। সেখান থেকে আপনি সুফিদের ব্যাপারে আমার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি অবগত হতে পারবেন। সুফিদের সম্পর্কে আমার উক্তি ইবনে তাইমিয়া[৩] থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জুনায়েদ

---

[২] رسالة العبودية

[৩] ইবনে তাইমিয়া রহ.। অষ্টম শতকের শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ও হাম্বলী মাযহাবের মুজতাহিদ ফকিহ। সতের বছর বয়স থেকে তিনি গ্রন্থ রচনা ও ফতোয়ার কাজ শুরু করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪৮০টি। তিনি শিয়া, মুতাজিলা, খারেজি প্রভৃতি বাতিল ও বেদআতি ফেরকার বিরুদ্ধে জবান ও কলমের জিহাদ চালিয়ে যান। ফলে শিয়া বাদশা কর্তৃক তিনি

বাগদাদীর মত লোকদেরকে পৃথক করেন। আর আমি কাউকে পৃথক করি না। তিনি আরও বললেন, আমি আপনার গ্রন্থ ও চিন্তা-চেতনাকেও পছন্দ করি না। এই জন্যই আপনার সাক্ষাতে আমার মন সায় দিচ্ছিল না। আমি আপনার গ্রন্থসমূহে সমাজতন্ত্রের গন্ধ অনুভব করেছি। কারণ আপনি সবসময় আপনার গ্রন্থে বস্তুবাদ ও জড়বাদকে অস্বীকার করেন। বৈরাগ্যের প্রতি বেশি জোর দেন। এটা সমাজতন্ত্রের নিদর্শন। আমি মনে করি সম্পদের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামও তা অস্বীকার করেনি। এর বিরোধিতা করার প্রতি দাওয়াতও দেয়নি। সম্পদ বৃদ্ধি করা ও অর্জন করা দোষের কিছু না। উন্নত জীবনযাপনে কোনো অন্যায় নেই। খেলাফতে উমাইয়ার সময়কাল এমন নয় যে, মানুষ তা অস্বীকার করতে পারে। বস্তুবাদ বিশেষ কোনো সমস্যার সৃষ্টি করে না। এটা এত বড় কোনো বিষয়ও না যে, দায়ীগণ তার ফিকির করবে। তার নিষেধ ও অস্বীকারের জন্য উঠেপড়ে লাগবে। দাওয়াতের বিষয় হল মানুষের ইসলাহি তরবিয়ত করা, তাকে উৎসাহ প্রদান করা, আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে খাজানা উৎপাদনের যে মাধ্যম দান করেছেন তার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। কুরআনও এ সম্পর্কে আলোচনা করেছে। মানুষকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছে। এর বিপরীতকে জুলুম আখ্যা দিয়েছে। তবে এ ছাড়াও যা কিছু কুরআনে আছে তা শাখাগত মাসয়ালা। যেমন কুরআনে জিনার খারাবি মাত্র কয়েক জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা এটা বস্তুত যৌনশক্তি অপাত্রে ব্যবহারের ফল। মূল কাজ হল সেই যোগ্যতাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা। চিন্তা ও গুরুত্বের বিষয় হল মানুষ নিজের তরবিয়ত করবে এবং এর শক্তি বৃদ্ধি করবে। স্বীয় চিন্তা-চেতনায় এত মজবুত হবে যে, সে রাসুলের ব্যক্তিত্ব শুধু অহির কারণে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করবে।

আমি শায়খকে বললাম, বস্তুবাদ সম্পর্কীয় আমার বিষয় নির্বাচন এবং তার বিরোধিতা এ কারণে যে, তা তার সীমানা থেকে অনেক বেড়ে গিয়েছে। মানুষ তার মধ্যে খুব বেশি নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং আমার সমালোচনা ও লেখালেখি শুধু এইসব বস্তুবাদের সৃষ্ট মানসিকতাকে

চারবার কারাবন্দি হন। কারাগারে তিনি আলবাদরুল মুহিত নামক বিখ্যাত তাফসির গ্রন্থ রচনা করেন। ৭২৮ হিজরির ২০ জিলকদ মাসে কারাগারে তিনি ইনতেকাল করেন।

দূর করার জন্য। আমি মনে করি একমাত্র তাওহিদ বা একত্ববাদই মূল উপাদান, যার উপর দাওয়াতের ভিত্তি হওয়া জরুরি। এই বিষয়ে আমি আমার মতামত জানান দেওয়ার জন্য আমার 'জাহিলিয়া থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থটি শায়খের খেদমতে পেশ করি। বইটি আনসারুস সুন্নাহর এক ভাই ছেপেছেন। শায়খ বললেন, এটাও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। আমি অত্যন্ত জোর দিয়ে শায়খকে বললাম, আমি প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও অনৈসলামিক মানসিকতা থেকে মুক্ত। এসবের সঙ্গে আমার আদৌ সম্পর্ক নেই। আমি সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম পড়েছি এবং বুঝেছিও। আমি এই উভয় মতবাদের ঘোর বিরোধী। এ দুটোই সঠিক ইসলামের সঙ্গে সাজ্ঘর্ষিক মনে করি। শায়খ বললেন, আমি জানি আপনি ভাল মানুষ। আপনার নিয়ত সঠিক ও খালেস। মিসরে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের খবর আমি রাখতাম। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে এই **সিদ্ধান্তেই** উপনীত হয়েছি যে, আপনি ভাল নিয়ত ও আশা পোষণ করেন।

১৮ মে ১৯৫১

আমরা সুদানি দূতাবাসে গেলাম। সুদান সফরের ব্যাপারে খোঁজখবর নিলাম। তারা চাচ্ছিল ভারতীয় দূতাবাস আমাদের সার্বিক দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করুক। এবং আমাদের মিসর ফেরার ব্যাপারে স্পষ্টভাষায় একটি প্রত্যয়নপত্র লিখে দিক। সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ওলামায়ে আজহার সংঘ-সংলগ্ন মসজিদে মিম্বারায় যাই। শায়খ আহমদ শিরবাসীর পেছনে জুমার নামাজ আদায় করি। তার প্রভাবসৃষ্টিকারী বয়ান ও খুতবা শুনলাম। আলোচনার বিষয় ছিল 'ইসলাম ইসলাহ ও সংশোধনের নাম; বিপ্লব ও বিদ্রোহ নয়'।

ইসলাম সবসময় মানুষের মাঝে ইসলাহ ও ইহসান, সংশোধন ও আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করে। ইসলাম কখনোই বিপ্লব-বিদ্রোহ প্রশ্রয় দেয় না। এরপর তিনি ফরাসি বিপ্লবের পরিণতি আলোচনা করেন। ইসলাম ও ইসলামি উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের উপমা ও নমুনা উল্লেখ করেন। ইসলামের নীতি-আদর্শ, ইনসাফ ও সমতা ইবাদতের ন্যায় সমুজ্জ্বল হওয়ার কথা পরিস্কার বুঝিয়ে দেন।

আজকে বিভিন্ন সময়ে ইখওয়ানের বেশ কজন নেতাকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাত করি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবদুল গনি মাহজুব, ইউসুফ

কারজাবী, আহমদ দামিরদাসী, আবদুল্লাহ আকিল, রিয়াজুদ্দীন ফারুকী, আলি আদলি মুরশিদী, মুহম্মদ আবদুল ওহহাব বান্না।

মাওলানা আজাদের সাথে সাক্ষাত

১৯ মে ১৯৫১

আজ সুদানের ভিসাপ্রাপ্তি ও প্রত্যাবর্তনের তারিখ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন অফিস ও অ্যাম্বাসিতে অতিবাহিত হল। এশার পর আমরা জনাব ফারুকী এবং এখানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের সাথে আলফারুক বিমান বন্দরে যাই। সেখানে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে স্বাগত জানাই। তিনি এখান দিয়ে লন্ডনে যাচ্ছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর প্রায়। মাওলানা খুব ক্লান্ত ছিলেন। তার উপর বার্ধক্য ও ক্লান্তির প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। সাংবাদিকগণ তাকে ঘিরে রেখেছিল। তারা তাকে ভারতীয় রাজনীতি, সেখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও লন্ডন ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। মাওলানা তাদেরকে কখনো ইংরেজিতে কখনো আরবিতে উত্তর দিতে লাগলেন। তিনি যেকোনো প্রশ্নর উপস্থিত জবাব দিয়ে এবং মেপে কথা বলে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। এ জন্য সাংবাদিকরা কোনোভাবেই লন্ডন সফরের রহস্য উদঘাটনে সক্ষম হয়নি। মাওলানার সকল উত্তর সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর অর্থবহ ছিল। কখনো কুরআনের আয়াত দ্বারাও উত্তর দিচ্ছিলেন। ফলে রিপোর্টাররা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আরবিতে কথা বলার সুযোগ না হওয়া সত্ত্বেও কুরআনুল কারিমের ভাষায় জবাব দিচ্ছিলেন। তার অসামান্য মেধা ও উপস্থিত জ্ঞানের প্রশংসা তার শত্রুরাও করে থাকে।

প্রবাদসম স্মৃতিশক্তি সত্ত্বেও বোঝলাম, তিনি আমাকে চিনতে পারছেন না। আমি তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলাম। প্রফেসর আবু নসর অগ্রসর হয়ে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তখন মাওলানা আমার প্রতি ফিরে কথা বলতে লাগলেন। এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করলেন, যদ্দ্বারা বোঝলাম তিনি আমাকে চিনতে ভুল করেননি। বললেন, আমার জানা ছিল আপনি আরবদেশ ভ্রমণে আছেন। জানতে চাইলেন কোন কোন দেশ দেখেছি? আরও কিছু কথা বললেন। আমার মরহুম পিতা নদওয়াতুল ওলামার সাবেক পরিচালক মাওলানা হাকিম সাইয়েদ আবদুল হাইয়ের কথাও

উল্লেখ করলেন। আমার বড় ভাই ডা. হাকিম সাইয়েদ আবদুল আলিকেও স্মরণ করলেন। আমার গ্রন্থ 'সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহিদ রহ.'[১] সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সে সম্পর্কে তার জানা কিছু পাণ্ডুলিপির আলোকপাত করলেন। বুঝা গেল জীবনের দীর্ঘ সফরও তাকে এ ধরনের গবেষণামূলক বিষয় থেকে গাফেল ও অমনোযোগী করেনি।

নতুন গ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর উক্তি

ইসলামের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাসংবলিত কিছু নতুন গ্রন্থ সম্পর্কে প্রফেসর আবু নসর মাওলানা আবুল কালাম আজাদকে প্রশ্ন করলেন। মাওলানা বললেন, এসব গ্রন্থের বড় ত্রুটি হল এগুলো ইসলামকে নতুন চিন্তা-ধারা ও নতুন দর্শনের সঙ্গে সমন্বয় করতে চায়। সে অনুযায়ী এতে ইসলামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তারা ইসলামকে বাইরের প্রভাব ও মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে বোঝার চেষ্টা করেনি। তিনি বললেন, এসব গ্রন্থের মধ্যে সবচাইতে আশ্চর্যজনক হল শায়খ জাওহিরী তানতাবীর 'জাওয়াহিরুল কুরআন'। আমি যখন এই গ্রন্থটি পড়ি তখন মনে হচ্ছিল এটি পদার্থ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচির একটি নির্ধারিত গ্রন্থ।

আমি বললাম, মানুষ তার পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন বিষয়, জামানার প্রভাব ও সমাজের বিভিন্ন চিন্তাধারা থেকে কীভাবে বাঁচবে? এটা কি সম্ভব? তিনি বললেন, একটা সীমা পর্যন্ত সম্ভব। তবে কঠিন অবশ্যই।

এসব ছিল ইলমি আলোচনা। ভারতের বিভিন্ন মজলিসেও তার সঙ্গে এ ধরনের আলোচনা আমার হয়েছে। এরই মধ্যে তাকে সংবাদ দেওয়া হল ফ্লাইটের সময় হয়ে এসেছে। তিনি হাসিখুশি মন নিয়ে উঠলেন। আমাদের বিদায় জানালেন। তারপর আমাদেরকে ছেড়ে উড়ে চলে গেলেন।

২০ মে ১৯৫১

আজ আমরা শায়খ মুহম্মদ নাসিফের সঙ্গে দেখা করি। তিনি হেজাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন। ইলম ও দীনদারির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি তিনি। বিদ্যা-বুদ্ধি ও সুন্দর চরিত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত। পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গেও দেখা করি। তাকে 'ইসলামের কবি'র এক কপি হাদিয়া দিই।

---

[১] এই নামেই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ ইফাবা ছেপেছে।

তারপর আলহাজ হিলমি মিনিয়াবীর প্রেসে আমার গ্রন্থ 'ইখওয়ানের সাথে কিছু কথা'[১]র প্রুফ ঠিক করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা

২১ মে ১৯৫১

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের পাসপোর্ট অফিসে গেলাম। এ সংক্রান্ত কাজ যদি অফিসিয়াল নিয়ম-কানুন অনুযায়ী কাজ হয় এবং প্রতিটি স্তর যদি সাধারণ ও স্বাভাবিক নিয়মে পার হওয়া যায় তা হলে কখনো কখনো এক সপ্তাহ বা তার চেয়েও বেশি সময় লেগে যায়। কিন্তু ভিসা অফিসার নিজেই অন্য একটি অফিসে গিয়ে সব কিছু পরিপূর্ণ করে তারপর ওই সকল লোকের নিকট নিয়ে গেলেন, যাদের সাথে এটা সম্পৃক্ত। যত দ্রুত সম্ভব ছিল কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করে দিলেন। আমি তাকে কিছু বই-পুস্তক হাদিয়া দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, আমি কসম খেয়েছি কারো কাছ থেকে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করব না। আমি বললাম, এটা তো কেবল হাদিয়া। কোনো খেদমতের নজরানা বা কোনো কাজের বিনিময় না। এটা শুধু ইলমি হাদিয়ামাত্র। তিনি বললেন, আমার বাসায় ব্যক্তিগত পাঠাগার রয়েছে। আমি গ্রন্থের প্রতি অনেক আগ্রহী। কিন্তু এ মুহূর্তে এই হাদিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অপারগ।

সরকারি বিভিন্ন বিভাগ ও অফিস-আদালতে এটা আমার ব্যতিক্রমধর্মী অভিজ্ঞতা। আমাদের ভারতে অফিস-আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে এ ধরনের আগ্রহ-উদ্দীপনাসহকারে অন্যের কাজ করে দেওয়ার মানসিকতা দেখিনি। যদি মিসরের প্রতিটি বিভাগ এমন হত এবং সবার সাথে এমন আচরণ করা হত তা হলে আজকের বিশ্বে মিসরের অবস্থান কয়েকগুণ উপরে থাকত এবং শৃঙ্খলা পরিচালনায় এদেশ পৃথিবীর মডেল হত।

আজ আমরা সুপ্রসিদ্ধ আলেম শায়খ মুহম্মদ জাহেদ কাউসারীর সঙ্গে সাক্ষাত করি। কিছুক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে বসি। তিনি আমাদেরকে তার লেখা

---

[১] اريد ان اتحدث الى الاخوان

কয়েকটি গ্রন্থ হাদিয়া দিলেন। এর আগেও একবার তার সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। তখনও তিনি বেশ কটি গ্রন্থ হাদিয়া দিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের সময় যেসব গ্রন্থ দেননি এবার সেগুলোর কয়েকটি দিলেন।

২২-২৩ ও ২৪ মে ১৯৫১

গত দুই দিনের বড় একটা অংশ কয়েকটি দূতাবাসে আসা-যাওয়ার মধ্যে কেটেছে। বাইশ তারিখে হোলওয়ানে সাইয়েদ কুতুবের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোনো কাজ হয়নি। সাইয়েদ কুতুব জানালেন, আগামী জুমায় নদওয়াতুল ইলমিয়ায় 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র উপর আলোচনা-পর্যালোচনা হবে। আমাকেও উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলেন। প্রতি শুক্রবারই তার বাড়িতে এ ধরনের জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

জেদ্দা থেকে বন্ধুবর ড. গোলাম মুসতফা এসেছেন। তার আগমনে আমি দারুণ আনন্দিত হয়েছি। নয়া মিসরের একটি হোটেলে তার সঙ্গে দেখা করি। প্রতিদিনই আমরা তার সঙ্গে এক-দু'বার সাক্ষাত করি।

২৫ মে ১৯৫১

ড. গোলাম মুসতফার মনজয়ীর লক্ষ্যে দ্বিতীয়বার আমরা কানাতিরে খায়রিয়্যা সফর করি। সেখানে শায়খ লোকমান নদবীর মেজবানিতে খানা খাই। তারপর হোলওয়ান যাই। সেখানে সাইয়েদ কুতুবের বাসায় আমার গ্রন্থ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র উপর আলোচনায় শরিক হই। উপস্থিত লোকদের অধিকাংশ ছিল দারুল উলুমের শিক্ষা সমাপণকারী। এই গ্রন্থের প্রতি তাদের আকর্ষণ ও আগ্রহ দেখে স্বভাবতই আমি আনন্দিত হই। নিজের মধ্যে একটু ইজ্জত অনুভব করি। যখন এই গ্রন্থের লেখকের উপস্থিতি সম্পর্কে তাদের ধারণা হল তখন অধিকাংশ প্রশ্নই লেখককে করে তার বিশ্লেষণের আবেদন করেন। আমি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিই। এরপর আমরা 'সঠিক ইসলামি দাওয়াত ও নতুন প্রজন্মের মাঝে কাজ করার পদ্ধতি' নিয়ে আলোচনা করি।

দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে সাইয়েদ কুতুবের উক্তি

এ ব্যাপারে সকলেই নিজ নিজ মতামত পেশ করলেন। আমিও আমার মত পেশ করি। সাইয়েদ কুতুব এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

তার কথার সারাংশ ছিল- মানুষ প্রথমে নিজের ইসলাহ ও সংশোধন করবে। ইসলামের দাওয়াত ও তার চাহিদা পুরা করার জন্য নিজেকে তৈরি করবে। তারপর অন্যকে দাওয়াত দিবে। অন্যের সংশোধন করবে। এতে একটি সঠিক ইসলামি দাওয়াত অস্তিত্বে আসবে।

তার অভিমত অনুযায়ী প্রথমে একটি নেককার জামাতের প্রয়োজন, যা পূর্বের যুগে ছিল। এই জামাত প্রথমে অল্প সংখ্যক লোক দিয়ে শুরু হবে। তারপর এদের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ জামাত প্রস্তুত হবে। তার ধারণা মতে এই কাজে সাফল্য ও কামিয়াবির জন্য বড়জোর পঁচিশ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তিনি বললেন, মানুষ এটাকে দীর্ঘ সময় মনে করবে। কিন্তু আমি একে স্বল্প সময় বলব।

তারপর এই বিষয়ে আলোচনা হল যে, প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই কাজের সার্বিক দিক পরিচালনা করবেন, কে হবেন। কতক ব্যক্তি সাইয়েদ কুতুবের প্রতি ইঙ্গিত করে তার স্তুতি গাইল। তাকে বলল- আপনি যেসব কিতাব লিখেছেন তা পরিশুদ্ধ অন্তর, দৃঢ় বিশ্বাস ও উত্তম চরিত্রের জন্য আয়নাস্বরূপ। এ ব্যাপারে সাইয়েদ কুতুব স্পষ্ট অথচ অকৃত্রিমতার সাথে বলে উঠলেন, 'আমি নিজেকে এই প্রশংসার যোগ্য মনে করি না। আপনারা যে আশা করছেন তারও আমি উপযুক্ত নই। কিতাব প্রকাশ এ কথার দলিল না যে, লেখক ইসলামি তরবিয়ত ও আত্মশুদ্ধির প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করেছে। আমি আমার মধ্যকার খারাবি, আরাম-আয়েশ, সৌখিনতা ও অমনোযোগিতা সম্পর্কে সম্যক অবগত। ঈমান ও জিহাদ যেই ত্যাগ ও কোরবানি, জুহুদ ও রুহানিয়াতের দাবি রাখে তার অস্তিত্ব কতটুকু আমার মধ্যে আছে সে ব্যাপারে আমি ভালভাবেই জানি। আমি মনে করি শেষ মঞ্জিল এখনো অনেক দূরে। প্রকৃত মাপকাঠি তো কুরআনই নির্ধারণ করবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَا ئُكُمْ وَاَبْنَا ئُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ

[সুরা তাওবা, ২৪ আয়াত]

যদি আমি ঝুপড়ি অট্টালিকা, চাকুরি ও বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও সম্পদশালিতার উপকরণকে সমান না জানি তা হলে মনে করতে হবে আমি প্রকৃত ঈমান ও ইসলামি তরবিয়ত হতে অনেক দূরে আছি। আমি প্রথমে নিজেকে তারপর অন্যকে ধোঁকা দিতে চাই না।' তার এই অকৃত্রিম

স্বীকারোক্তি আমার ভাল লেগেছে। অন্তরে তার মর্যাদা ও পূর্বের ভালবাসা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সাইয়েদ কুতুবের জীবনের চড়াই-উৎরাই

সাইয়েদ কুতুব তার জীবনের বিভিন্ন স্তর আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি কীভাবে ইসলাম ও ইসলামি আকিদা পর্যন্ত পৌঁছেছেন তার বর্ণনা দেন। তারপর বলেন, গ্রামে থেকে কীভাবে ইসলামি সভ্যতা এবং স্বীয় পরিবেশ অনুযায়ী লালিত-পালিত হয়েছেন। এরপর কায়রো পৌঁছে পূর্বের পরিবেশ হতে কীভাবে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। তার দুর্বল দীনী তরবিয়ত ও ইসলামি বিশ্বাস ধোঁয়ায় উড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি দীনী হাকায়েক ও বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহের স্তর থেকেও অনেক দূরে চলে যান। তারপর যখন তিনি সাহিত্যপাঠের অনুপ্রেরণায় কুরআন অধ্যয়ন শুরু করেন তখন কুরআন তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধীরে ধীরে তাকে ঈমানের দিকে টেনে আনে।

তার উপর ইতিহাসগ্রন্থ কীভাবে প্রভাব ফেলে তাও তুলে ধরেন। কুরআন ও ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তার বন্ধুদের উপদেশও তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি তাদের মূল্যবান কথায় মুগ্ধ ও উপকৃত হয়েছি।

আমি তার নিকট 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র জন্য একটি ভূমিকা লেখার আবেদন করি। এই খেয়াল অনেকদিন থেকে আমার স্মৃতিপটে ঘোরপাক খাচ্ছিল। আজ তা বাস্তবতার দেখা পেল। তিনি আমাকে মাহরুম করতে পারলেন না। সন্তুষ্টচিত্তে আমার আবেদন গ্রহণ করে নিলেন।

২৬ মে ১৯৫১

আজ ড. গোলাম মুসতফার নিকট অনেকক্ষণ ছিলাম। আগামীকাল তিনি বিমান-যোগে জেদ্দার উদ্দেশে রওনা করবেন। হোটেল পার্লামেন্টে শায়খ আবদুর রাজ্জাক হামজার সঙ্গেও দেখা হয়। আমরা প্রফেসর আবদুল হাকিম আবেদিনের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য তার বাড়ি 'দারবুল আহমার' যাই। তারপর বাহি আলখাওলীর বাসা 'কেল্লা' যাই। কারো সঙ্গেই সাক্ষাত হয়নি। অবশেষে আমরা বাসায় ফিরে আসি।

স্বাধীনতা উৎসবে আফগান-দূতাবাসে

২৭ মে ১৯৫১

আজহারের বিশাল কুতুবখানায় গেলাম। কুতুবখানার পরিচালকের নিকট থেকে সাহারানপুর[১] হতে প্রেরিত আওজাযুল মাসালিক, বাজলুল মাজহূদ ও আলকাওকাবুদ দুররীর মূল্য গ্রহণ করলাম। মাকতাবায়ে ইয়াহ্যুবিয়ার পরিচালক কিতাবগুলোর মূল্য আমাকে গ্রহণ করতে বলেছিলেন। আজহারের গেইটে হরমে মক্কীর শায়খ মুহম্মদ আলআরাবী আলমাগরিবী ও হেজাজের ভিজিটিং প্রফেসর জনাব মুহম্মদ কাহিলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমি এই উভয় হযরতকে আমার নতুন কিতাবসমূহের কয়েক কপি করে পেশ করি। আমার অন্যান্য বইয়ের জন্যও তারা আবেদন করেন। তারা তাদের বাসায় যেতে বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কুয়েতি বন্ধু খালেদ আহমদ জাস্সার এলেন। দীর্ঘ সময় আমাদের সাথে বসে থাকলেন। অনুশোচনা প্রকাশ করে বললেন, তার জানা ছিল না যে, আমাদের অবস্থান তার ঘরের পাশেই হবে এবং এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের থেকে দূরে থাকবেন। কুয়েতের বহু খবরাখবর তার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি। তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, আসরের পর ফরিদ আবদুল খালেক এখানে আসবেন। ফরিদ আবদুল খালেক ও আবদুল হাফিজ সায়ফী আমাদের নিকট এলেন। কিছুক্ষণ আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। তারপর আমরা আফগান-দূতাবাসে তাদের স্বাধীনতা উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উঠে যাই। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আফগান রাষ্ট্রদূত দাওয়াতনামা পাঠিয়েছিলেন।

আমরা দূতাবাসে প্রবেশ করি। দেখি মিষ্টি ও বিস্কুটে ভরপুর সারিবদ্ধ অনেক টেবিল। আমরা চা পান করি। স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত বক্তৃতা পেশ করলেন। বক্তৃতাটি তার দীনী আবেগ ও ইসলামি চিন্তা-চেতনার ইঙ্গিত বহন করে। 'আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয় তার আলোচনা।

---

[১] ভারতের উত্তরপ্রদেশের একটি জেলা।

এই সভার বৈশিষ্ট্য হল এখানে কোনো মহিলা অংশগ্রহণ করেনি। এক মহিলা সভায় আসতে চাইলে দারোয়ান গেট থেকেই তাকে ফিরিয়ে দেয়। মাগরিবের নামাজ শেষে শায়খুল আজহার আবদুল মজিদ সালিমের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল। আমি তার সাথে পরিচিত হই তিনি বললেন, আপনার কিতাব 'বিশ্ব কী হারালো' আমি অর্ধেক পড়েছি। আপনি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। আমি তার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তিনি মঙ্গলবার এগারোটা সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করলেন।

আফগানদূতাবাস থেকে আমি সালেহ ইশমাবী, সা'দুদ্দীন ওলিলী, জর্দানের পূর্বাঞ্চলের ইখওয়ান প্রধান আলহাজ শায়খ আবদুল লতিফ আবু কাওরার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. শাহরিয়ারের বিবাহ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে যাই। আমরা তার সঙ্গে মুসাফাহা করি। ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূতকে কয়েক কপি বই হাদিয়া দিই।

সেখানে আজহারী আলেম জনাব মাহমুদ হাসানের সঙ্গে দেখা হয়। এতদিন আমরা মিসরে ছিলাম শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন। তিনি মনে করেছিলেন আমরা চলে গেছি। তিনি আমাদেরকে হাত ধরে তার বাসা 'আব্বাসিয়া'য় নিয়ে গেলেন। চা-নাশতা দিয়ে আমাদের আপ্যায়িত করলেন। এটি ছিল আমাদের প্রতি অত্যধিক সম্মান ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

২৮ মে ১৯৫১

আজ দুপুরের খানা আহমদ জাস্‌সারের বাসায় খেলাম। কুয়েতি ছাঁচে রান্না করা চমৎকার খানা পরিবেশন করা হল। কুয়েতের প্রধান খাদ্য ভাত। সঙ্গে ছিল পেঁয়াজ ও বেগুনের সাথে পাকানো গোশত ও রুটি। তার পর ভাত খেলাম। খাওয়ার পর তরমুজ খাওয়ার আগ্রহ হল। কিন্তু ভারতীয় লোকজন ভাতের পর তরমুজ খাওয়া থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর উপর ভরসা করে খেয়েছি। আলহামদু লিল্লাহ, কোনো সমস্যা হয়নি। সন্ধ্যায় শিবরায় আবদুল আল নায়েল রোডে অবস্থিত আহমদ কাহিলের বাসায় খানা খেলাম

শায়খুল আজহারের কামরায় কিছুক্ষণ

২৯ মে ১৯৫১

শায়খুল আজহার আবদুল মজিদ সালিমের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হলাম। তিনি অনেক আবেগ ও ভালবাসা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। তার পাশে বসা একজন শিক্ষকের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমার কিতাব 'বিশ্ব কী হারালো'র ব্যাপারে আলোচনা করলেন। বললেন, বইটি আমি আমার অসুস্থতার সময় পড়েছি। এই শিক্ষক, যার সাথে এইমাত্র আমার পরিচয় হল, তিনি ইসলামি গবেষণা বিভাগের প্রধান শায়খ মাহমুদ শালতুত। মিসর এসেই আমি তার সাথে সাক্ষাত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাই সময় করতে পারেননি। আজ শায়খের অফিসেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন। এভাবে সাক্ষাত হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করলেন। তিনি আমার গ্রন্থ 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত' পড়েছেন।

আমি শায়খুল আজহারের সাথে বিভিন্ন মুসলিমদেশ থেকে আগত ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা ও ভবিষ্যৎ কর্মধারা নিয়ে কথা বলি। তারা যে তরবিয়ত ও তত্ত্বাবধান এবং নিরীক্ষণ ও নেগরানির মুখাপেক্ষী তার আলোচনা করি। তাদের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে শায়খের নিকট আরজ করি, তারা অত্যন্ত বড় সম্পদ। যদি তাদেরকে সঠিক পথের দিশা দেওয়া যায় তা হলে তাদের মাধ্যমে সেসব মুসলিমদেশে অনেক বড় কাজ হবে। এ ছাড়া যা কিছু আমার জেহেনে এসেছে শায়খুল আজহারের নিকট পেশ করেছি। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগসহকারে আমার কথা শোনলেন এবং বললেন তিনি এ ব্যাপারে একদম উদাসীন নন। এ ব্যাপারে তিনি তার কিছু কর্মপদ্ধতির কথা উল্লেখ করে বললেন, এই সকল প্রতিনিধি সম্পর্কে একটি বিশেষ খোলাচিঠি লিখুন, যাতে আপনার চিন্তা-চেতনা ও খেয়াল উল্লেখ করবেন। আর সেটি শায়খ মাহমুদ শালতুতের নিকট সোপর্দ করবেন। আমি তাকে পরশু পেশ করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। আমি ওলামায়ে আজহারের একটি প্রতিনিধিদল পাক-ভারতে পাঠানোর আবেদন করলাম। সেখানে গিয়ে তারা সেখানকার দীনী অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন। মুসলমানদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করবেন। ইসলামি আন্দোলন ও

ইসলাহি দাওয়াত সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন। তিনিও এই প্রস্তাব পেশ করার ব্যাপারে মত দিলেন।

আজ আমরা 'আদদাওয়াহ' পত্রিকার অফিসে যাই। সালেহ ইশমাবী ও সাদুদ্দীন অলিলীর সঙ্গে সাক্ষাত করি।

৩০ মে ১৯৫১

সকাল বেলা জনাব কাহিল এলেন। কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকলেন। তারপর আমরা জিজায় অবস্থিত সৌদি দূতাবাসে যাই। উদ্দেশ্য ছিল ভিসা নেওয়া। খুব সহজেই এই স্তর অতিক্রম করি। মধ্যাহ্নভোজ হয় মাওলানা আবদুল্লাহ কাবুলীর বাসায়। সেখানে কিছুক্ষণ আরাম করি। রাতে হোটেল বাগদাদে যাই। সেখানে কয়েকজন তুর্কি ছাত্র এলেন। তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়।

শায়খ মাহমুদ শালতুতের সাথে

৩১ মে ১৯৫১

আমরা শায়খ মাহমুদ শালতুতের অফিসে গেলাম। তাকে আমি বিদেশি ছাত্রদের উদ্দেশে লেখা 'খোলাচিঠি' পেশ করলাম। চিঠিটি পড়ার সময় তিনি কিছু কিছু জায়গায় থেমে যান। উদাহরণস্বরূপ এই বাক্য- 'মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তার কলিজার টুকরোদের আজহারে পাঠায়'। তিনি বললেন, চিঠি পড়ার পূর্বে আমি আপনার শিক্ষাপদ্ধতি ও জ্ঞান অর্জনের যেই স্ত রগুলো আপনি অতিক্রম করে এসেছেন তা শোনতে চাই। আমি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে নিয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হওয়া এরপর চাকুরি হতে অব্যাহতি নিয়ে দাওয়াতি কাজে আত্মনিয়োগ করা পর্যন্ত সকল অবস্থা তার নিকট বর্ণনা করি। আমার পড়াশোনার পদ্ধতি ছিল এমন, যখন কোনো বিষয় খুব ভালভাবে অধ্যয়ন করি তখন ওই বিষয় ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করি না। তিনি বললেন, শিক্ষার এটাই প্রকৃত পদ্ধতি। আমি তাফসিরের পূর্বে আরবিসাহিত্য, হাদিসের পূর্বে তাফসির এবং ফিকহার পূর্বে হাদিস অধ্যয়ন করাকে ভাল মনে করি।

তিনি ইলমে তাফসির সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তারপর আমার লেখা 'কুরআন-অধ্যয়নের মূলনীতি'[1] গ্রন্থখানি আরবিতে তরজমা

[1] এই নামে গ্রন্থটির বাংলায় তরজমা প্রকাশিত হয়েছে।

করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার তাফসির পড়ানোর পদ্ধতি পছন্দ করেন। সেখানে প্রথমে কুরআনের আয়াতের বিষয়বস্তুর উপর আলোচনা করা হয়। তারপর মুতাকাদ্দিমিন [পূর্বসূরি বরেণ্য] আলেমগণের কিতাবের তাফসির পেশ করা হয়।

তারপর তিনি লেখাটি পড়েন। পড়া শেষ হলে টাইপ করতে পাঠিয়ে দেন। আজহারে আগত ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে একটি লেখা লিখতে বললেন। আজহারের হোস্টেল ব্যবস্থাপনা আমি যা দেখেছি এবং সেগুলোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আর একটি লেখা লিখতে বললেন।

১ জুন ১৯৫১

জুমার নামাজ আমরা আজহারের মসজিদে আদায় করি। আসরের পর ইমাম শাফেয়ী রহ. এর মাজার জিয়ারতে বের হই। সেখানে প্রফেসর আবদুল হাকিম আবেদিনের বাসায় যাই। আজও তাকে পেলাম না। আমরা হোটেল পার্লামেন্টে আলহাজ ইসমাইল দেহলবীর সঙ্গে সাক্ষাত করি।

২ জুন ১৯৫১

জনাব মনসুর ফাহমি পাশার জন্য 'ইসলামের কবি'র একটি কপি পাঠিয়েছিলাম। তার একটি পোস্টকার্ড পেয়েছি। তাতে তিনি এই হাদিয়ার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। কিতাবটি ভালো লাগার অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন। আমরা আসরের পর তার রুমে যাই। সেখানে একটি মজলিশ হয়। আমি মিসরীয় জাদুঘর দেখার আগ্রহ ব্যক্ত করি। তিনি আমাদেরকে সকালে ফুয়াদ অ্যাকাডেমিতে যেতে বললেন, যাতে কাউকে আমাদের সাথে পাঠাতে পারেন। পাশাপাশি জাদুঘরের ইনচার্জকে আমাদের সম্পর্কে যা কিছু বলা দরকার বলে দিলেন।

তিনি বললেন, গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে আপনি যে বিষয়ে লেখার আবেদন করেছেন তার উপর কলম ধরার চেষ্টা করব। তিনি নিজের মোটরগাড়িতে আমাদেরকে আতাবাতুল খাদরা পৌঁছিয়ে দিলেন। আতাবা থেকে আমরা আমাদের পুরানো বন্ধু মিসরের প্রথম রাহবার শায়খ আহমদ উসমানের

নিকট যাই। শিবরায় তাকে তার নিজের বাড়িতে পাইনি। জানতে পারলাম তিনি নতুন মসজিদে আছেন। মসজিদটি নির্মাণের দেখভাল তিনি নিজেই করছেন। রাস্তায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আমরা মসজিদের ছাদের নিচে বসে কথা বলি। সেখানেই এশার নামাজ আদায় করি। তিনি মসজিদ নির্মাণের ব্যস্ততা এবং অন্যান্য কাজের কারণে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থাকার কারণে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। আমরা তাকে এ ব্যাপারে অপারগ মনে করি। অবশেষে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে আসি।

ড. ইউসুফ মুসার প্রস্তাব

৩ জুন ১৯৫১

আমরা ফুয়াদ আলআউয়াল অ্যাকাডেমিতে যাই। ড. মনসুর ফাহমি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে আমরা কিছুক্ষণ বসি। তিনি অ্যাকাডেমির একজন সদস্যকে আমাদের সঙ্গে পাঠান। ভদ্রলোক সেখানে অনুবাদের কাজ করেন। রাস্তায় হঠাৎ ড. ইউসুফ মুসার সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায়। তিনি খুব দ্রুত আমাদের পিছনে পিছনে আসছিলেন। অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাতে আমরা দারুণ আনন্দিত হই। তিনি বললেন, আমি অ্যাকাডেমি ভবনে ছিলাম। যখন শুনি আপনারা বের হয়ে গেছেন তখন আপনাদের ধরার জন্য দ্রুত পিছু নিই। 'ইসলামের কবি'র প্রতি তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, বইটিতে আমি আশ্চর্য ধরনের কিছু চিন্তাধারা ও বিষয় পেয়েছি। আপনার উপর ফরজ হল ইকবাল সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করা। এটা আপনার জিম্মাদারি। তার জোর তাগিদে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লেখার প্রতিশ্রুতি দিই। আমাদের ফেরার সময় তাকে অবহিত করতে বললেন। এর আগে একদিন তার বাসায় খেতে বলেন। তারপর তিনি 'বিশ্ব কী হারালো'র সংশোধিত কপি চাইলেন। কারণ তিনি ড. আহমদ আমিনের কাছ থেকে কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নিয়েছেন। খুব দ্রুত তিনি কিতাবটির উপর একটি ভূমিকা লিখবেন।

মিসরীয় প্রত্নতত্ত্ব জাদুঘরে

আমরা জাদুঘরে প্রবেশ করি। এখানে ঐতিহাসিক বিভিন্ন নিদর্শন রয়েছে। প্রফেসর মাহফুজ আফেন্দীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি মিসরের সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব গবেষক। তিনি প্রতিটি নিদর্শনের সামনে

তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। ফেরাউনদের বিভিন্ন স্মৃতি, তৎকালীন রীতি-নীতি ও আচার-অভ্যাস বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। আমরা দ্রুত যা পারি দেখে ফিরে আসি। তারপর সুদান সফরের প্রস্তুতি নিই।

কায়রো থেকে শাল্লালের পথে

আমাদের সফর এখন সুদান অভিমুখে। মাগরিবের আগেই আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। আমার সফরসঙ্গী হলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী। তিনি এর আগেও একবার সুদান গিয়েছিলেন। মাওলানা মুয়িনুল্লাহ নদবী ও মাওলানা আবদুর রশিদ নদবী যেহেতু পর্যটন ভিসায় মিসর এসেছিলেন তাই তাদের সুদান সফরে আইনগত বাধা ছিল। তাদের কায়রো থেকে হেজাজে যাওয়ার কথা। তাই তারা আমাদের সঙ্গ দিতে পারলেন না।

স্টেশনে সুদানি ছাত্রদের এক বড় জামাত উপস্থিত হয়েছে। মুসাফিরদের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসা লোকই বেশি। তাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে চিনে। কেউ কেউ এসেছিল আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে। তাদের কেউ বা আমাদের সাথে বাসায় সাক্ষাত করেছিল। সহযাত্রীদেরকে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করতে বলে তাদের দেশে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল। কারো কারো অনুতাপ হচ্ছিল আমাদের সাথে তাদের দেশে যেতে না পারায়। সেখানে আমাদের সহযোগিতা করতে না পারায়। কোনো কোনো ছাত্র পরীক্ষা সন্নিকটে হওয়ার কারণে আসতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। কেউ কেউ আমাদেরকে সেসব ব্যক্তিত্ব ও স্থানের নামে নোট লিখে দিচ্ছিলেন যেখানে যাওয়া এবং যাদের সঙ্গে সাক্ষাত করা আমাদের জন্য তারা উপযোগী মনে করছেন।

সেকেন্ড ক্লাসে ভাল জায়গা মিলে গেল। আমার প্রিয় মাওলানা মুয়িনুল্লাহ ও মাওলানা আবদুর রশিদ আমাদেরকে বিদায় দিলেন। তাদের বিরহ-ব্যথা অন্তরে বড় ধরনের প্রভাব ফেলল। কিন্তু এ ছাড়া কিছু করারও ছিল না। কেননা তারা মিসরে হজের ভিসায় এসেছেন। অন্য কোনো দেশ সফর করার আইনগত অনুমতি ছিল না। দু'ঘণ্টা পর বহু যাত্রী নেমে গেল। ফলে সিটে শুয়ে-বসে সময় কাটাবার সুযোগ পেলাম। মধ্যরাতে আমরা ইমাম সুয়ুতির শহর সুয়ুত অতিক্রম করি। কিন্তু আমি তখন ঘুমিয়ে ছিলাম।

ফেরাউনের রাজধানীতে

৪ জুন ১৯৫১

ফজরের নামাজ আদায় করলাম। ফেরাউনের রাজধানী পোর্ট সায়িদ শুরু হল। আমরা বসে বসে আশপাশ দেখছি। অবশ্যই একে কুরআনের অলৌকিকতা বলা যায়। আমি তখন কুরআনুল কারিমের পঁচিশতম পারার ওইসব সুরা তেলাওয়াত করছিলাম, যেখানে ফেরাউনের আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যখন ফেরাউনের প্রাচীন রাজধানী আকসারে পৌঁছুই তখন আমি কুরআনুল কারিমের এই আয়াত তেলাওয়াত করছি,

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِه. قَالَ يَا قَوْمِ اَلَيْس لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِه الْاَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ.

'ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, মিসরের রাজত্ব কি আমার নয়? নদীসমূহ আমার পায়ের নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তোমরা কি দেখ না'? [সুরা যুখরুফ, ৫১ আয়াত]

এই সুন্দর এলাকার উপর দিয়ে ট্রেন সবেগে ছুটে চলছে। আর আমার বারবার মনে পড়ছিল এই আয়াত–

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّات وَّعُيُوْن. وَزُرُوْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيْمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ. كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ.

'তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও ঝর্নাধারা, কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, ওতে তারা আনন্দ পেত! এইরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ ও পৃথিবী কেউই ওদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং ওদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি'। [সুরা দুখান, ২৫-২৯ আয়াত]

আল্লাহ তায়ালা সত্যই বলেছেন,

وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِ لُهَا بَيْنَ النَّاسِ.

'মানুষের মধ্যে আমি এই দিনগুলোর [সুদিন-দুর্দিন, বিজয়-পরাজয়] পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই'। [সুরা আলে ইমরান, ১৪০ আয়াত]

ট্রেনের সেবার নিয়ম ও মান খুব সুন্দর ছিল। পুরো সফরে বরফের পানি পাওয়া যেত। যাত্রীরা এটা নিকটবর্তী পানির লাইন থেকে সংগ্রহ করত। ট্রেনে সেবকও ছিল। তারা সিটে বসতেও সাহায্য করত। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ঠিক মতো রেখে দিত। এ বিষয়গুলো আমাদের দেশের রেলওয়ে বিভাগের গ্রহণ করা উচিত।

সূর্য ওঠার পর আমরা সুদানি ছাত্রদের নিকট যাই। তারা আমার বিভিন্ন পুস্তিকা অধ্যয়ন করছিল। আমি কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কথা বলি। তারা ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন অনুষদের ছাত্র। গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে দেশে যাচ্ছে।

এই লাইনগুলো লেখার সময় দেখি দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তি স্থান সংকীর্ণ হয়ে আসছে। মধ্যখান দিয়ে নীলনদের পানি প্রবাহিত হচ্ছে। কখনো উপত্যকা প্রশস্ত হয় আবার কখনো সংকীর্ণ। নীলনদের দূরত্ব কখনো কমে আসছে কখনো আবার বেড়ে যাচ্ছে। আমরা আসওয়ানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। কিন্তু সময় আমাদেরকে সেখানে ভ্রমণের সুযোগ দিল না। শাল্লাল পৌঁছার পর ট্রেনের সফর সমাপ্ত হল।

জাহাজে

আমরা ট্রেন হতে অবতরণ করি। তারপর নতুন সফর শুরু হয়। জাহাজের সফর। কিন্তু এই জাহাজ সমুদ্রে চলে না, চলে নীলনদে। তাই মাথা ঘোরানো কিংবা বমির ভয় ছিল না। কাস্টমস অফিসে পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখানোর পালা শেষ করে জাহাজে আসন গ্রহণ করি। আল্লাহর কী করুণা! আজহারের দু'জন তালেবে ইলমের বুকিং দেওয়া সিট আমরা পেয়ে গেলাম। তারা আজ আসবে না। কয়েকজন ছাত্র আমাদেরকে এটা আগেই জানিয়ে দিয়েছে। এমনকি ওই দুই ছাত্রের নামও নোট করিয়ে দিয়েছে। এ কারণে সেকেন্ড ক্লাসে সফর করার সুযোগ হয়ে যায়।

গরম ছিল প্রচণ্ড। জাহাজে আমাদের কেবিন ছিল সূর্যমুখী। দীর্ঘক্ষণ রোদের তাপে থাকার কারণে জাহাজ খুব গরম হয়ে যায়। যেন আমরা রান্নাঘরের চুলার পাশে বসে আছি। আজ শাবান মাসের ২৯ তারিখ। রমজানের চাঁদ ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু চাঁদ দেখা গেল না। আমরা সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রীদেরকে আমাদের কম্পার্টমেন্টে একত্র করলাম। তাদের মধ্যে অধিকাংশ দারুল উলুমের শিক্ষার্থী। কিছু ছিল আজহারের।

আমরা তাদের সাথে দীনী বিষয়ে আলোচনা করতে থাকি। তার আগে আমরা পরস্পর পরিচিত হই।

৫ জুন ১৯৫১

পঞ্জিকার তারিখ অনুযায়ী আজ কিছু মানুষ রোজা রেখেছে। আমরা যেহেতু চাঁদ দেখিনি তাই রোজাও রাখিনি। শাবানের ৩০ তারিখ দিনটি আমরা পূর্ণ করি। সারাদিন ডায়েরির বাদ পড়া কাজ পরিপূর্ণ করায় মগ্ন রইলাম। ৬ রজব থেকে ৮ শাবান [১২ এপ্রিল - ৫ জুন] পর্যন্ত সময়ের কাজ ডায়েরিবদ্ধ করতে পারিনি। সে কাজ লিখতে আল্লাহ সাহায্য করেছেন। আসরের আগে লেখা থেকে ফারেগ হই। তারপর তারাবিতে যতটুকু তেলাওয়াত করব তার প্রস্তুতি নিই। সন্ধ্যাবেলায় রমজানের চাঁদ দেখি। মাহে রমজানকে খোশ আমদেদ জানাই। চাঁদ অনেক সঁরু হয়ে উঠে ছিল। আমরা চাঁদ দেখে দোয়া পড়ি-

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ

'হে আল্লাহ, আপনি একে উদিত করুন, আমাদের জন্য ঈমান-ইসলাম, শান্তি ও নিরাপত্তা দিয়ে; আপনি যা ভালবাসেন ও পছন্দ করেন তার তাওফিক দিয়ে'।

আমরা যে কম্পার্টমেন্টে ছিলাম তার সম্মুখ দিয়ে কয়েক তলাবিশিষ্ট আরেকটি জাহাজ চলছে। জাহাজটিতে একটি বড় হোটেলও রয়েছে। তার সামনে আরেকটি ছোট জাহাজ চলছে। কারণ নদীতে পানি ছিল কম। রাত বারোটায় আমরা হেলফার পরিবর্তে ফেরাসে গিয়ে পৌঁছি। সারা রাত্র জাহাজে কাটাই।

৬ জুন ১৯৫১

আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমরা সহি-সালামতে তীরে পৌঁছে যাই। আমরা রোজাদার ছিলাম। কাস্টম ও পাসপোর্ট চেকিংপর্ব শেষ করে ট্রেনের সেকেন্ড ক্লাসে আমরা আমাদের রিজার্ভ সিটে উঠে বসলাম। ইতোমধ্যে সাইয়েদ আলি মির গনিকে আমাদের আগমন-সংবাদ দিয়ে তারবার্তা পাঠালাম। মরুভূমির বুক চিরে ট্রেন সম্মুখে এগিয়ে চলছে। মরুবাতাসে ধুলোবালি উড়ে আমাদের চেহারা ধূসরিত হচ্ছে। ট্রেনের বগিতে জনৈক সুদানির দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইফতারে শরিক হলাম।

খানার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সন্দেহমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর ট্রেনের ডাইনিংরুমে প্রবেশ করে খানায় শরিক হলাম। খাবার যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন এ জন্য অনুভব করলাম যে, সাধারণত সেকেন্ড ক্লাসে ইংরেজরাই আরোহণ করে। আর এই মুহূর্তে আমরা ইংরেজ শাসনাধীন এলাকায় সফর করছি।

৭ জুন ১৯৫১

ট্রেন 'খুরতুমে বাহরি'তে পৌঁছেছে। আসরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। সাড়ে চারটা বাজে ট্রেন হতে অবতরণ করি। আবহাওয়া ছিল প্রচণ্ড গরম। একটি গাড়ি ভাড়া করে সাইয়েদ মির গনির বাসার উদ্দেশে রওনা করলাম। আমাদের জানা ছিল না কোথায় থাকব। কোথায় আমাদের ঠিকানা হবে। এক জায়গায় থেমে গোসল সেরে আসরের নামাজ আদায় করলাম। জানতে পারলাম আমাদের আগমনবার্তা ইতোমধ্যে মির গনি পেয়ে গেছেন। তার লোকজন আমাদের ব্যাপারে তার নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। খানিক পর একজন এসে, যেখানে আমাদের থাকার বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে, সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠতে বললেন। আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। খুরতুমের এক ব্যবসায়ীর বাড়ির কাছে নামলাম। ব্যবসায়ীর নাম শায়খ তাইয়েব ইবরাহিম আবদুল মাকসুদ। তিনি সাইয়েদ মির গনির খলিফা ও প্রিয়ভাজনদের একজন।

রাহবার বললেন, ইনিই আপনার মেজবান। সাইয়েদ মির গনি তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি তাকে সাইয়েদ মির গনির সঙ্গে দেখা করার সময় জানতে চাইলাম। তারা বলল কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনি জানতে পারবেন। আমরা একটি প্রশস্ত রুমে গিয়ে বসলাম। আরও বহুলোক সেখানে বসে ছিলেন। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত ছিলাম। ইফতারের পর বিশ্রাম নিই। তারাবির নামাজের জন্য আমরা উঠে বসি। এরিমধ্যে খাবার চলে আসে। আমাদের দেশে ইফতারের পরপরই খাবার খাওয়ার রেওয়াজ। মাঝে শুধু মাগরিবের নামাজ। এখন খাবার খাওয়া নিয়ে খুব দ্বিধা-জড়তায় পড়ে যাই। কারণ আমরা ইফতারের সঙ্গে সঙ্গেই খাবারের প্রয়োজন পূর্ণ করে নিয়েছি। তবু মেজবানকে খুশি করার জন্য কিছু খাই।

৮ জুন ১৯৫১

ঘুম পুরা করার জন্য আমরা ফজরের পর পর শুয়ে পড়ি। রোদ ওঠার পর ঘুম থেকে জেগে উঠি। তারপর জুমার প্রস্তুতি নিই। বাজারের একটি মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করি। ইমাম সাহেব আমাকে আলোচনা করতে বললেন। আমি অপারগতা প্রকাশ করি। জুমার খুতবা রোজা, রমজানের নাওয়াফেল ও রাতের ফজিলত সম্পর্কিত ছিল। আমরা সারাদিন বাসায় কাটাই। সাইয়েদ মির গনির অনুমতি এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষায় থাকি। রাতে সাক্ষাতের সংবাদ পেয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনতে লাগলাম। রাত্রেই আবার সংবাদ পেলাম সাইয়েদ গনি আগামীকাল দশটায় আসবেন। এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। অপেক্ষার ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। ইফতারের পূর্বে মেজবান এবং তার অন্য ভাইয়েরা একত্র হয়। আমার মেজবান শায়খ তাইয়েব, তার দু'ভাই ও বাড়িওয়ালার ছেলে খুজালির কথাবার্তা খুব সুন্দর ও মনকাড়া ছিল। ভিনদেশি সরকার এবং তাদের কার্যক্রমের প্রতি তাদের রয়েছে প্রচণ্ড ঘৃণা ভাব। শায়খ তাইয়েব একজন ভারসাম্যপূর্ণ বুজুর্গ। আবদুর রহিম লজ্জাশীল ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আমাদের মেজবান শায়খ তাইয়েবের জ্ঞান-বুদ্ধি ও জানাশোনা অন্য যেকোনো ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশি।

সাইয়েদ আলি মির গনি পাশা

৯ জুন ১৯৫১

ঘুম থেকে উঠে দেখি চারদিকে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। সাইয়েদ গনির সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি নিই। শায়খ তাইয়েব ইবরাহিমের সঙ্গে রওনা হই। তখন হৃদয়ে এ কথা বারবার উঁকি দিয়ে উঠছিল যে, আমরা এখন এমন এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাত করব, যার ব্যাপারে এতদিন অনেক কিছু শুনে এসেছি।

সুদানে সাইয়েদ মির গনির অত্যন্ত প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। হাজার হাজার মানুষ তার অনুসারী। তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন। তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রভাব, শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং সুগভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির কারণে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক প্লাটফর্ম তৈরি করে নিয়েছেন। তিনি সুদানে 'ওয়াহদাতে ওয়াদিউন নীল আন্দোলনে'র সবচেয়ে বড় নেতা ও

আমির। আমার জানা মতে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও হুশিয়ার ব্যক্তি। দীনী আন্দোলন সম্পর্কে তার ভাল জানাশোনা আছে। জ্ঞানচর্চায় পাগলপারা, জাগ্রত মেধার অধিকারী, কর্মচঞ্চল, উদ্যমশীল লোক। তিনি হাজারো সুদানিকে এমন এক শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করেছেন, যা সংযম, জিকির, আত্মশুদ্ধি ও কর্মতৎপরতার সমন্বয়ে গঠিত। ধ্বংসাত্মক আন্দোলন ও চরিত্র বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড মোকাবেলা করা তার একমাত্র লক্ষ্য।

মোটকথা যুবসমাজের চারিত্রিক পরিশুদ্ধতায়, সুদানে দীনী দাওয়াতের প্রসারতায় সবচেয়ে বড় ভূমিকা তিনিই রেখে চলেছেন। তার এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমি ওই সকল লোকের কাছ থেকে শুনেছি, যারা মিসর ও সুদানে তার সাক্ষাত লাভ করেছেন। তবে তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যে জিনিসটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে এবং অন্তরে তার প্রতি সম্মানের আসন সৃষ্টি করেছে তা হল, তিনি বহিরাগত শক্তির জালে আটকাননি। বিদেশিরা তাকে ক্রয় করতে পারেনি। তারা তাকে চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করতে পারেনি। তিনি কারো প্ররোচনায় প্রতারিত হন না। অথচ অনেক মাশায়েখ এবং বড় বড় ব্যক্তিত্ব তাদের ফাঁদে আটকে গেছে।

সাইয়েদ মির গনির সাথে

আমরা সাইয়েদ মির গনির সাক্ষাত লাভ করলাম। সাজানো-গোছালো শান্ত ছিমছাম একটি রুমে বসলাম। সেখানে বৈদ্যুতিক পাখার নিচে চমৎকার সাজানো চেয়ার। চেয়ারগুলোর উপর ময়ূরের পরের তৈরী বালিশ লাগানো। এটি তার সুরুচির সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর সাইয়েদ সাহেব তাশরিফ আনলেন। সুদানি অবয়বে সত্তর বছর বয়সের এক ক্ষীণ দুর্বল বয়োবৃদ্ধের সাথে সাক্ষাত করলাম। তার চেহারায় চিন্তা, গাম্ভীর্য, গভীর অধ্যয়ন, দীর্ঘকাল যাবত রাত্রি জাগরণের নিদর্শন প্রতিভাত হচ্ছিল। চক্ষু অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিচ্ছিল। তার চওড়া ললাট উচ্চাভিলাষ ও আত্মঅহমিকার জন্য আয়নাস্বরূপ। তিনি আমাদের সাথে সন্তুষ্টচিত্তে খোলামনে কথা বলছিলেন। আলোচনা হচ্ছিল ভারতবর্ষ এবং তার ধর্ম ও ইতিহাস নিয়ে, সেখানকার ফেতনা-ফাসাদ, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নিয়ে, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের দীনী ও ইলমি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে। মসজিদ, প্রাচীন নিদর্শনাবলি ও কমিউনিজম সম্পর্কে কথা চলছিল। তিনি আমার সকল প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করে এবং

নিজের উক্তি পেশ করে যাচ্ছিলেন। এই আলোচনা তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বিভিন্ন বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের প্রমাণ বহন করে। বোঝা গেল, তিনি বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বেশ জানেন। ইউরোপে কী হচ্ছে সে সম্পর্কেও একেবারে বেখবর নন। বিভিন্ন দেশের নতুন নতুন সংবাদ সম্পর্কে তিনি নিয়মিত অবগত হন। তার কথায় এও জানা গেল যে, তিনি ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাশীল এবং উত্তম দৃষ্টিভঙ্গির এক সুচতুর ব্যক্তিত্ব। প্রশস্ত জ্ঞান ও জাগ্রত চিন্তা-চেতনায় তাকে মাওলানা আজাদের অনুরূপ মনে হল।

আমরা সাইয়েদ মির গনি পাশার কাছ থেকে ফিরে এলাম। তার সঙ্গে এটা ছিল আমাদের প্রথম সাক্ষাত। এ সাক্ষাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এ বৈঠক ও আলোচনায় আমি পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। এশা পর্যন্ত বাসায় থাকি। এশার নামাজ ও তারাবি খুরতুমের একটি মসজিদে আদায় করি। কিছু সময় আমাদের মেজবান শায়খ তাইয়েবের দোকানে কাটাই।

সাইয়েদ মির গনির গ্রহণযোগ্যতা

১০ জুন ১৯৫১

আমি সাইয়েদ মির গনির উদ্দেশে একটি চিঠি লিখি। চিঠিতে দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের আবেদন জানাই। আর লিখি আমি তার একজন মিসরীয় ভক্তের মাধ্যমে আমার লেখা কিছু বই পাঠিয়েছিলাম। আমার আশা বইগুলো পড়ার জন্য আপনি কিছু সময় বের করে নিবেন।

আজ প্রচণ্ড গরমের কারণে পরিশ্রান্ত ছিলাম। এই ক'দিনেই বোঝতে পারলাম এদেশের মানুষের মাঝে তার আশ্চর্য ধরনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। যে-ই শোনে আমরা সাইয়েদ মির গনির মেজবানিতে রয়েছি সে-ই খুশি হয়। এখন পর্যন্ত এমন কাউকে পাইনি যে তার গিবত বা দোষ বর্ণনা করেছে। তার সমালোচনা করেছে। তার ইখলাস, অকপটতা, আভিজাত্য ও সুগভীর জ্ঞানের প্রশংসা করে সকলেই।

ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা

আমি অনুভব করলাম, এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ ও ঘৃণা বিরাজ করছে। তাদের প্রতি কেউ সন্তুষ্ট না। ইংরেজ

সরকারের ‘পুলিশ ধর্মঘট’ এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। উঠতে বসতে মানুষের মুখে এরই আলোচনা শোনা যায়। এমন মজলিস বা আসর কমই পাওয়া যাবে যেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হয় না। এই আলোচনা করতে করতেই আমরা ইফতার করি। রাতেও এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সুদানের তিনটি প্রাচীন শহর

১১ জুন ১৯৫১

আজও অলস সময় কাটাই। বাসার বাইরে বার হইনি। কর্মহীনতা আমাকে ঘিরে ফেলেছে। আমরা সাইয়েদ গনির দ্বিতীয় সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি। ইফতার ও মাগরিব নামাজ থেকে ফারেগ হওয়ার পর মেজবানের ভাই শায়খ আবদুর রহিম আমাদেরকে তার গাড়িতে করে নিয়ে চললেন। আমরা তিনটি প্রাচীন শহর পরিদর্শন করলাম। অবশেষে তিনি আমাদেরকে উম্মে দারবান নিয়ে গেলেন। এ শহরটি সবচেয়ে বড় এবং সাদামাটা ধরনের। আমরা এখানকার একটি মসজিদের ইমাম শায়খ এওয়াজ ওমরের সাথে দেখা করি। তার ভাই তাজ ওমর আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন। কিছুক্ষণ তার সাথে কথা বলি। শায়খ এওয়াজ আমাদেরকে ইফতারের দাওয়াত দিলেন। আমরা তার দাওয়াত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মুলতবি রাখলাম।

মিসরের প্রতি অনুরাগ

লক্ষ করলাম সুদানবাসী মিসরকে দারুণ ভালবাসে। মিসরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জিনিসের প্রতিও তাদের অনেক আকর্ষণ লক্ষ করলাম। তারা সে দেশকে প্রকাশ্যে জান-প্রাণ দিয়ে সমর্থন করে। ইংরেজ জাতি এই আবেগ থেকে বিমুখ করতে পারে না।

প্রফেসর ইসমাইল আজহারীর সাথে কথোপকথন

১২ জুন ১৯৫১

আমাদের মেজবান ও তার ছোট ভাই আবদুর রহিম ‘হিজবুল আশিক্কা’র চেয়ারম্যান ইসমাইল আজহারীর[১] সাথে জোহরের পূর্বে

---

[১] ইসমাইল আজহারী সুদানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এর পর কিছুকাল তিনি সুদানের প্রেসিডেন্টও হয়েছিলেন।

আশিক্কার অফিসে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। এ উদ্দেশ্যে আমরা খুরতুমের দিকে যাই। আশিক্কার অফিসে তার সাথে সাক্ষাত করি। আফ্রিকা মহাদেশে ইসলামি দাওয়াতের সুযোগ ও সম্ভাবনা এবং এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়।

সরকারি আলেম সম্পর্কে তার উক্তি

প্রফেসর ইসমাইল আজহারী সরকারি চাকুরিজীবী আলেমদের সমালোচনা করে বলেন, তারা কলেজে ধর্মীয় বিভাগে ভর্তি হয়। আদৌ তারা দীনী পরিবেশের আলেম নয়। দীনী তরবিয়তও তারা অর্জন করেনি। অথচ সরকারি ফতোয়া ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে। তার আবশ্যক ফল হল তারা না দীনের সাথে সম্পর্ক রাখে, না দীনী বিষয় মীমাংসা করতে পারে। বরং তারা ফিকির করে শুধু ওই সকল বিষয়ের, যেগুলো তাদের চাকুরি ও হালুয়া-রুটির সাথে সম্পর্কিত। তাদের কোনো দীনী চিন্তাধারা নেই এবং এ বিষয়ের প্রতি তাদের গুরুত্বও নেই।

আধ্যাত্মিক মাশায়েখগণ এর বিপরীত। তারা নিরেট দীনী ঘরানায় জন্ম নিয়ে সুন্দর দীনী পরিবেশে লালিত-পালিত হন। তাদের মধ্যেই আপনি মুখলেস দায়ী ও পরিশুদ্ধ অভিভাবক পাবেন। তিনি বলেন, আমি গার্ডেন কলেজে ছিলাম। সেখানে শিক্ষার্থীদের বিষয়-নির্বাচন রুচি ও সম্পর্কের ভিত্তিতে হয় না। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কেবল ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে হয়। যেমন আমাকে প্রকৌশল বিদ্যায় নির্বাচন দেওয়া হয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবকে ধর্মীয় বিভাগের জন্য নির্বাচন করা হয়। তাদের মধ্যে কেউ বিচারপতি, কেউ মুফতি এবং কেউ আলেম হল। এর অনিবার্য ফল এই দাঁড়াল যে, এ সমস্ত লোক দীনী অনুভূতি ও ইলমি ওয়ারাসাতশূন্য প্রমাণিত হল। এ কারণেই তারা চাকুরিতে লিপ্ত আছে। দীনের প্রতি তাদের কোনো গুরুত্ব নেই। উম্মাহর জন্য কোনো চিন্তা নেই।

সাইয়েদ মির গনি সম্পর্কে তার উক্তি

প্রফেসর ইসমাইল আজহারী শায়খ মির গনির প্রশংসা করলেন। তার দাওয়াতি কৌশল, প্রজ্ঞা ও ইখলাসের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। বললেন, তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী। যুবসমাজকে অসৎ চরিত্র হতে মুক্ত রাখা এবং সময়ের স্রোতে প্রবাহিত হওয়া থেকে বিরত

রাখার ক্ষেত্রে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তায়ালাই তাকে এই বৃদ্ধ বয়সে আন্দোলন ও দাওয়াতের তাওফিক দান করেছেন। এটা এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তার হাতেই এই জাতির কোনো উত্তম ফয়সালা করবেন।

আফ্রিকায় ইসলামি দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

আফ্রিকার সেসকল লোকের মাঝে ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তার সাথে আলোচনা করি, যারা এখনো মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত। কোনো সন্দেহ নেই, এই দাওয়াত আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় ইবাদত। মুসলমানদের শক্তি অর্জন ও বেড়ে ওঠার উত্তম পন্থা। এই মাকসাদ অর্জনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হবেন এজাতীয় ব্যক্তিত্ব, যারা একে স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিবেন।

এদিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি রাখতে তার প্রতি আমি আশাবাদ ব্যক্ত করি। তিনি মিসর ও সুদানের ঐক্য-প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার জন্য অবহেলা ও গুরুত্বহীনতাকে দায়ী করেন। তারপর বললেন, আমি আলেম নই। অথচ বিষয়টি আলেমদের। তারাই এর যোগ্য। তিনি এ উদ্দেশ্যে 'জমিয়তে তাবলিগে ইসলাম' প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেন এবং তার সেক্রেটারি শায়খ শাওকি আসাদের সাথে সাক্ষাত করতে আমাকে বললেন। আমি সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করি। তারপর ছাত্রসংগঠন 'আঞ্জুমানে সুদান' ও 'আঞ্জুমানে মিসর' পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে পরিপূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। আমরা তাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি। তার জ্ঞান-গরিমা ও তার উত্তম কথা-বার্তায় আমি দারুণ প্রভাবিত হই। সেখান থেকে আমরা শরিয়াহ আদালত অভিমুখে রওনা হই। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হাসান মুদ্দাসসিরের সঙ্গে সাক্ষাত করি। সুদানের গ্রান্ড মুফতি শায়খ আবুল কাসেমের সাথেও সাক্ষাত করি। তাদের সাথে দক্ষিণ সুদানে দাওয়াত ও তাবলিগের মেহনত বিষয়ে আলোচনা করি। এসব এলাকা এখনও কুফুর ও মূর্খতায় নিমজ্জিত। প্রধান বিচারপতি জনাব মুদ্দাসসির আমাকে বললেন, ইংরেজরা অবশেষে কিউবায় দাওয়াত ও তাবলিগের অনুমতি দিয়েছে। ইতঃপূর্বে নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমরা একে শুভ লক্ষণ মনে করি। তাকে এ ব্যাপারে সেখানে বিশেষ নজর দিতে আবেদন করলাম। আমরা আদালতে থাকতেই শাহ ইকবাল আলি সেখানে আগমন করেন। তার হঠাৎ আগমনে আমরা

বিস্মিত হই। তিনি কিছু দিন যাবত সুদানে অবস্থান করছেন। আঞ্জুমান ইত্তেহাদে ইসলামির শাখা তৈরীর জন্য এখানে এসেছেন। এ সংস্থার প্রধান কার্যালয় প্যারিসে। ইত্তেহাদের প্রস্তাব সেসব লোকের পক্ষ থেকে এসেছে, যারা এর ঘোর বিরোধী। কিন্তু এখন তারা এর হর্তাকর্তা বনে গেছে। শাহ ইকবাল আলি সুদানের প্রত্যেকটি সভা-সমাবেশের আলোচিত ব্যক্তি। 'ওয়াহ্‌দাতে ওয়াদিয়ে নীলে'র সকল সদস্য এবং সাইয়েদ মির গনির ভক্তবৃন্দ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে।

তার সফরের উদ্দেশ্য এবং সুদানের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা আবদুর রহমান মাহদির বাসায় তার অবস্থান নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হচ্ছে। সরকারি লোকদের সঙ্গে বারবার দেখা-সাক্ষাত এবং গভর্নমেন্ট হাউসে তাদের শাখা করা সম্পর্কে আমাদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়েছে। আমাদের ধারণা অনুযায়ী প্রশ্নকারীদের জবাব দিয়েছি। আদালতে তার সঙ্গে আমাদের এ সাক্ষাত আল্লাহর পক্ষ থেকেই নির্ধারিত ছিল। আমাদের সঙ্গে শায়খ তাইয়েব ও তার ভাই আবদুর রহিমও ছিলেন। শাহ ইকবাল আলি পুলিশ ইন্সপেক্টর মুহম্মদ তাইয়েব হাশেম ও জাস্টিস হাসান মুদ্দাসসিরের সঙ্গে কথা বলে আমাদের দিকে মনোযোগ দেন। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলি। তার চলে যাওয়ার পর উপস্থিতিদের সামনে তার কথার অনুবাদ করে দিই।

আমি তার কাছে এই আশা প্রকাশ করি যে, তিনি যেন এই বৃদ্ধ বয়সে নিজেকে ইসলামের জন্য নিবেদন করেন। সব দিক থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে শুধু সেসব কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়েন, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ। নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। এশা ও তারাবির নামাজ আমরা খুরতুমের জামে মসজিদে আদায় করি। নামাজের পর রমজান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি।

শায়খ শাওকি আসাদের সঙ্গে সাক্ষাত

১৩ জুন ১৯৫১

আজ এগারোটায় শায়খ আবদুর রহিম ও শায়খ তাইয়েবের সঙ্গে তাবশিরুল ইসলামি সংস্থার সেক্রেটারি শায়খ শাওকি আসাদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। খুরতুমে অবস্থানরত জনৈক মিসরি অর্থনীতিবিদের অফিসে অনেক অপেক্ষার পর তার সঙ্গে দেখা হয়। দাওয়াত ও তাবলিগ প্রসঙ্গে তার সাথে আলোচনা হয়। তিনি এ ব্যাপারে যেসব কাজ হয়েছে তার

উল্লেখ করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য নিজের আগ্রহ ও সংকল্পের কথা বলেন। আমি তাকে চান্দা সংগ্রহ করে সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার চেয়ে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ ও মুসলিম দায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার আবেদন করি।

আমি তার নিকট কয়েকজন আলেম ও সংস্থার কতিপয় সদস্যকে ভারতে পাঠানোর প্রস্তাব দিই। তারা ওখানে গিয়ে দাওয়াতের পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবেন। মুখলিস দায়ীদের সঙ্গে দেখা করবেন। আমি তাকেও এ সফরের জন্য আবেদন করি। আমার পরামর্শকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি সংস্থার পরিচালকবৃন্দ ও সদস্যদেরকে একত্র করার প্রতিশ্রুতি দেন, যাতে আমি তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, কথা বলার সুযোগ পাই। খুরতুমের জামে মসজিদে আমরা এশা ও তারাবির নামাজ আদায় করি। তারাবির পর রমজান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। আমি উপস্থিত মুসল্লিদেরকে সম্বোধন করে বলি, মুসলমানদের জন্য রমজান হল তালুতের নদীর মতো। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের যাচাই-বাছাই করেন।

সাইয়েদ মির গনির সাথে দ্বিতীয় সাক্ষাত

৪জুন ১৯৫১

সাইয়েদ মির গনির লোকমারফত সংবাদ পেলাম সাড়ে দশটায় তিনি সাক্ষাতের সময় দিয়েছেন। এই সংবাদে আমরা দারুণ আনন্দিত হলাম। তার সাক্ষাতের জন্য আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমরা তার বাসার দিকে রওনা হলাম। আজকের সাক্ষাত অত্যন্ত উপকারী ও সন্তোষজনক ছিল। দু'ঘণ্টা পর্যন্ত আমাদের বৈঠক অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। এই দীর্ঘ বৈঠকে আফ্রিকায় ইসলামের দাওয়াত প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। তিনি তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেন। সেইসব প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচন হয়, যা এই দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দাওয়াতি কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তিদের যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় সে বিষয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি বিভিন্ন এলাকার অবস্থা, সেখানকার মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের মেজাজ ও মানসিকতার পার্থক্য ইত্যাদি বহুবিষয় আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। সত্যিই তিনি একজন হুঁশিয়ার এবং চিন্তাশীল মানুষ। তিনি বলেন, সুদানি

যুবকদের জন্য এই পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য হল, যাতে তারা দীন ও চরিত্র-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে পারে এবং দাওয়াতের কাজ প্রসারতা লাভ করে।

সাইয়েদ মির গনিকে শায়খ ওমর ইসহাক এবং তার সাথীরাও সমর্থন করেন এবং তার অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক ধরনের কথা বর্ণনা করেন। তারা মনে করেন, সুদানকে চারিত্রিক অবক্ষয়, স্বাধীন ও বেপরোয়া চলা-ফেরা থেকে বাঁচানোর ক্ষেত্রে তার ভূমিকা সবচাইতে বেশি।

আমি সাইয়েদ মির গনিকে ভারতে প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলিগের কারগুজারি, দায়ীদের অবস্থা, দেশের অলি-গলিতে এই জামাতের পদচারণা, জামাতের শৃংখলা, তাদের সফর, শিক্ষাপদ্ধতি, জিকির ও ইজতেমা ইত্যাদি প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করি।

যুবসমাজের বৈশিষ্ট্য

আমার কথায় তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, এতে সন্দেহ নেই যে, শুধু জোরালো কর্মকাণ্ড, হরকত ও আমলের দ্বারাই যুবসমাজের সুরক্ষা এবং আত্মসংশোধন সম্ভব। নিঃসন্দেহে হরকত ও আমল যুবকদের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। একে ঘুরানো যায়, বন্ধ করা যায় না। সুতরাং তাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। তবেই এর মাধ্যমে ভাল ও উন্নত ফল লাভের আশা করা যাবে।

এটা সেই মাধ্যম, যা সুদানে আপনার আন্দোলনের পদ্ধতি ও ভারতীয় দাওয়াতের পদ্ধতিকে এক করে দেয়। আমি তাকে পরামর্শ দিলাম, তিনি যেন একটি সুদানি প্রতিনিধিদল ভারত পাঠান। তারা সেখানকার দীনী পরিবেশ এবং ইসলাহি কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করবেন। ফলে দাওয়াতি কাজ আন্‌জাম দানকারী উভয় দেশের মধ্যে চমৎকার সেতুবন্ধন সৃষ্টি হবে। ইসলামি দাওয়াতের উন্নতির ক্ষেত্রে পথনির্দেশক হিসাবে কাজ করবে। সাইয়েদ গনি আমার এই পরামর্শ সমর্থন করলেন। এবং একে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আপনার পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। এ নিয়ে আমি গভীর চিন্তা-ভাবনা করব।

এভাবে আমি শায়খকে হজের মৌসুমে একটি প্রতিনিধিদল হেজাজে পাঠাতে পরামর্শ দিলাম। তারা ভারত ও পাকিস্তানের মুবাল্লিগ ও দায়ীদের সাথে সাক্ষাত করবেন। তিনি এই পরামর্শও সমর্থন করলেন।

তিনি শায়খ ওমর ইসহাককে বললেন, আমাদেরকে জুমার দিন শাবাব মির গনির বৈঠকে দাওয়াত করতে। উদ্দেশ্য ছিল আমি তার কর্মপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করব। আজকের বৈঠকে ভারত ও সেখানকার রাজনৈতিক হাল-চাল নিয়েও কথা হল। মুসলমানদেরকে তাদের ভাষা-সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় শিক্ষার উপর অটল থাকতে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তারও বিশদ আলোচনা হল। মুসলিম ও অমুসলিম সকলের জন্য একক নিয়ম-নীতি যেসব সমস্যার সৃষ্টি করবে সেসব বিষয়ে এবং তার সমাধান বের করা নিয়েও আলোচনা হল।

শিক্ষাকে সম্পূর্ণ দোষ-গুণ মুক্ত করা যাবে না

তিনি বললেন, আধুনিক শিক্ষাকে তার দোষ-গুণ থেকে পৃথক করা যাবে না। কোনো দেশে যখন একে চালু করা হবে তখন তার মিষ্ট ও তিক্ত উভয় স্বাদই তাকে নিতে হবে। তিনি আরও বললেন, মুসলিমদেশে পশ্চিমা কৃষ্টি-কালচারের বড় প্রভাব রয়েছে।

মুসলিম দেশগুলো তুরস্কের অনুগামী

এ সময় মুসলিমদেশগুলো তুরস্কের সেই ফর্মুলা অনুসরণ করছে, যা কামাল পাশা জন্ম দিয়ে গেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, তুরস্কে কামাল পাশার মত লোক ছিলেন, যিনি পশ্চিমা সভ্যতা ও নিজস্ব চিন্তাধারাকে জোরপূর্বক ক্ষিপ্রতার সাথে চালু করেছেন। আর অন্যান্য দেশ ধীরে ধীরে, অন্তত পঞ্চাশ বছরে তুরস্কের অবস্থানে পৌঁছুবে। তিনি পশ্চিমা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে নিজের মত পেশ করে বলেন, তার থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা ঠিক হবে না।

অনুবাদের মাধ্যমে জ্ঞানচর্চার ব্যর্থ চেষ্টা

তিনি বললেন, মিসর চেষ্টা করল চিকিৎসা বিজ্ঞানের পশ্চিমা বইগুলো আরবিতে অনুবাদ করে পড়বে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে তারা বোঝতে পারল অনুবাদের সাহায্যে পড়াশোনা করলে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উন্নতির সমতা থাকে না। অনুবাদ পিছনে ফেলে দেয়। অপর দিকে পশ্চিমাদের জ্ঞান ও আবিষ্কার অনেক আগে বেড়ে গেছে। কারণ অনুবাদের কাজ ধীর

গতিসম্পন্ন এবং এটা অলসতাকে টেনে আনে। তাই তারা ইউরোপের ভাষায় ডাক্তারি পড়া শুরু করল। প্রথম তাদের এই চিন্তা-চেতনা ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির আমি প্রশংসা করি। দ্বিতীয়ত তাদের প্রশস্ত জ্ঞান ও উজ্জ্বল মেধার স্ফূরণ অবলোকন করি। আমি অনুধাবন করলাম, তিনি মিসর ও মিসরের বাইরের ইলমি ও ইসলাহি আন্দোলন সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন।

তিনি ভালো-মন্দ সবধরনের সংবাদপত্র অধ্যয়ন করে তাদের শুকনো ও আর্দ্র, সঠিক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য করেন।

মিসরে সাহিত্যের প্রাবল্য

তার মত অনুযায়ী মিসরে সাহিত্যের রঙ বেশি। সেখানকার মানুষ এদিকে ধাবমান। সাহিত্যচর্চার তুলনায় তাদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষণের বিষয়টি অনেক দুর্বল। পুরো জাতিরই এদিকে মনোযোগ কম। এ কারণে 'আলমুকতাতাফ' শুধু ইলমি ও গবেষণাগ্রন্থ হওয়ার কারণে এর প্রচার-প্রসার তেমন হয়নি।

মিসরি পত্র-পত্রিকার অবস্থান

এই মানসিকতার কারণে মাসিক 'আলহেলাল' বাধ্য হয়ে কোনো ইলমি ও গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশ করে না। বিভিন্ন হালকা বিষয়, যা সাহিত্যপূর্ণ, সেগুলোই ছাপে।

এ সাক্ষাতে সাইয়েদ মির গনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত খোলামেলাভাবে কথা বলেন। তার চেহারায় আনন্দ প্রকাশ পেতে থাকে। আমি এ সময়কে গনিমত মনে করে লৌকিকতা ছাড়া একেবারে সাধারণ ও স্বাধীনভাবে কথা বলি। যেসব কিতাব আমি তার কাছে পাঠিয়েছিলাম তিনি তার উল্লেখ করে বললেন, কিতাবগুলোর উপর আমি একবার নজর দিব। তিনি এর প্রতিশ্রুতি দেন। তার নিকট আমার কিছু পুরনো কিতাবও দেখি। কিতাবগুলো মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী তাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। সাইয়েদ মির গনি শায়খ ওমর ইসহাককে এগুলো পড়তে দিয়েছিলেন।

সুদানি কায়দায় মেহমানদারি

মসজিদের ইমাম শায়খ ওমর এওয়াজের নিকট ইফতার করলাম। এই দাওয়াত ও আয়োজনে সুদানি খানার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাচ্ছিল। মেজবান

নিজস্ব পোশাকে আবৃত ছিলেন। প্রত্যেকটি বস্তু সুদানি এবং নিরেট তাদের রুচিগত ছিল। রকমারী খানায় পরিপূর্ণ একটি দস্তরখানে বসলাম। সেখানে হরেক রকমের ঠাণ্ডা পানীয় জল এবং সুদানি খাবারই বেশি ছিল। এশার নামাজের পর ছিল এই খানা-পর্ব।

আমার বক্তৃতা

রাতের খানার পর আমি আলোচনা করলাম। বললাম, সুদান ও আফ্রিকা পৃথিবীতে ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর তা তখনোই সম্ভব যখন আমাদের সুদানি ভাইয়েরা তাদের মূল্যমান অনুধাবন করবে। তাকে ভালভাবে ব্যবহার করবেন। আমি তাদেরকে ইসলামি দাওয়াত ও আন্দোলন পরিচালনার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি। উপস্থিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনকারীদের সম্মুখে আমার ভাষণ

সেখান থেকে উম্মে দারবান বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। এখানেই এশা ও তারাবির নামাজ আদায় করলাম। এরপর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা সমাপনকারীদের কেন্দ্রীয় মারকাজে গেলাম। সেখানে আজ রাত্রে সমাবেশের দিন ধার্য ছিল। সমাবেশে দারুস সালতানাতের তিন শহরের ওলামায়ে কেরাম, যুবশ্রেণী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপস্থিত ছিলেন। আমি আফ্রিকার ধর্মীয় গুরুত্বের উপর বক্তৃতা দিলাম। আমি বললাম, একসময় এশিয়া সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছে। তারা জাতির নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব সফলতার সাথে পরিপালন করেছে। তখন পৃথিবী বড় উপভোগ্য ছিল। কেননা তাদের নেতৃত্ব আম্বিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরপর বিশ্ব-নেতৃত্ব ব্যক্তিপূজারী ও স্বার্থবাজ ইউরোপের দিকে ফিরে গেছে। সেই নেতৃত্ব দ্বারা পৃথিবী ও মানবতার যেই দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তা সবাই জানে।

হে আফ্রিকার মুসলমান, এখন আফ্রিকার নেতৃত্ব গ্রহণের পালা। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব ও খেদমতের সুযোগ দেন। তিনি

তোমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তারপর বললাম আফ্রিকা কীভাবে এই সুযোগ থেকে উপকৃত হতে পারে, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নিজেদের এই অংশ কীভাবে অর্জন করতে পারে, কীভাবে পৃথিবীকে দীনমুখী করতে এবং ইসলামের খেদমত আন্‌জাম দিতে পারে সেই কথা।

আমি প্রাণ খুলে বক্তৃতা করলাম। প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা করি। বক্তৃতার পর নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে আমার পরিচয় হল। তারপর আমরা উম্মে দারবানের শিক্ষাসমাপনকারীদের জলসায় যাই। আমাদের পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় অনেকে চলে গেছেন। যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সঙ্গে পরিচিত হই। তারপর বাসায় ফিরে আসি।

শাবাব মির গনির সভায়

১৫ জুন ১৯৫১

সাইয়েদ মির গনির মুখপাত্র এলেন। মিসর থেকে যেসব কিতাব মির গনির জন্য প্রেরণ করেছিলাম তিনি তার একটি তালিকা চাইলেন। আমি কিতাবগুলোর নাম লিখে দিলাম। সম্ভবত কিতাবগুলো তার নিকট পৌঁছয়নি।

খুরতুমের জামে মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষ করে আমি দীনী বিষয়ে বক্তৃতা পেশ করি। আসর পর্যন্ত মসজিদেই অবস্থান করি। আসর নামাজের পর শ্রমিক-নেতা এবং সুদানের জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের চেয়ারম্যান আলহাজ সুলায়মান মুসার সাথে সাক্ষাত করি। মুহম্মদ সালেহ হরব আমাদেরকে তার নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে দেখা করতে বিলম্ব হয়ে গেল। তিনি ভদ্রতার সাথে আমাদের স্বাগত জানান। দ্বিতীয় দিন আমাদেরকে ইফতারের দাওয়াত দিলে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে দাওয়াত কবুল করি। এশার পর শাবাব মির গনির সভায় উম্মে দারবানে উপস্থিত হই। সেখানে সাইয়েদ মির গনির খোলাফা এবং এই তরিকার কিছু মাশায়েখ বিভিন্ন কবিতা শুনিয়েছেন। যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, পরিচ্ছন্ন পোশাকআশাক ও সুন্দর আসর দেখে আমি দারুণ খুশি হই।

সভায় আমার বক্তৃতা

শায়খ ওমর ইসহাক আমাকে বক্তৃতার জন্য বললে আমি উঠে দাঁড়াই। মুসলিম যুবক ও তাদের তরবিয়ত প্রসঙ্গে বক্তৃতা করি। এই বক্তৃতায় আমি দারুল আরকাম এবং তার সেসব যুবকের কথা উল্লেখ করি, যারা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাদেরকে ওইসব লোকের কৃতিত্ব গ্রহণ করার এবং ইসলামি শরিয়তকে শক্ত করে ধরার আহ্বান জানাই। সুন্নত অনুসরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। মনে হল বক্তৃতার প্রভাব তাদের উপর পড়েছে।

যে সঙ্গীত আমাদের ভাল লাগেনি

সভাকক্ষ থেকে বের হওয়ার পথে যুবকদের একটি মজমা দৃষ্টিগোচর হয়। বার-বার তারা সুর দিয়ে বলছিল, شيا لله يا حسن أنت سلطان الزمان [হে হাসান, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দাও। তুমি তো যুগের বাদশা]। এ ব্যাপারে আমরা আমাদের অপছন্দের কথা প্রকাশ করি। আমার মতে এটা কিছুতেই জায়েজ হতে পারে না। নিঃসন্দেহে এটা তাওহিদপরিপন্থি কাজ। কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করা এবং এই বিশ্বাস রাখা যে সে যুগের বাদশা, কীভাবে জায়েজ হবে? সাইয়েদ মির গনি এ বিষয়ে অবগত আছেন কি না কিংবা তিনি বিষয়টি পছন্দ করেন কি না জানি না। যাই হোক, আমার বিশ্বাস হল এই যে, তাওহিদ ও ইবাদতের উপযুক্ত একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই। এ দিকে দায়ী ও মুসলিহদের সর্বপ্রথম দৃষ্টি দেওয়া দরকার। এ বিষয়ে গাফেল ও উদাসীন থাকার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّي مِن دُوْنِ اللّٰه وَلٰكِن كُوْنُوْا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ. وَلَا يَأْمُرَكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ اَرْبَابًا ۗ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

'এটা কোনও মানুষের কাজ নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করবেন আর সে তা সত্ত্বেও মানুষকে বলবে, তোমরা

আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। এর পরিবর্তে [সে তো এটাই বলবে যে,] তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও। কেননা তোমরা যে কিতাব শিক্ষা দাও এবং যা কিছু নিজেরা পড়, তার পরিণাম এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবং সে তোমাদেরকে এ নির্দেশও দিতে পারে না যে, ফেরেশতা ও নবীগণকে আল্লাহ সাব্যস্ত কর। তোমরা মুসলিম হয়ে যাওয়ার পরও কি তারা তোমাদেরকে কুফুরির হুকুম দিবে'?[সুরা আলে ইমরান, ৭৯-৮০ আয়াত]

১৬ জুন ১৯৫১

সাইয়েদ মির গনির মুখপাত্র এলেন। তার হাতে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি ছিল। বইটি আমি মিসর থেকে পাঠিয়েছিলাম। দূত বললেন, সাইয়েদ সাহেব শুধু এ কিতাবটিই পেয়েছেন। তিনি এই বইটি ওই ব্যক্তির নিকট পেয়েছেন, যার হাতে আপনি বইগুলো পাঠিয়েছিলেন। ওইলোক এখন অন্য শহরে থাকে। আপনি যেসব বইয়ের নাম সূচিপত্রে উল্লেখ করেছেন সেগুলো কি আপনার নিকট আছে? তখন আমার নিকট যেসব বই ছিল সব কটির এক কপি করে দিই। কিতাব সংগ্রহের ব্যাপারে তার আত্মতৃপ্তি, অধ্যয়নের আগ্রহ এবং সব বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টিদান আমাদের প্রভাবিত করে।

জোহরের নামাজের পর জনাব আলি তালিবুল্লাহ এলেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। তার এক বন্ধুও সাথে ছিল। কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে কথা হয়। আমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হই। আমি তাকে 'ইখওয়ান স্সম্পর্কে কিছু কথা' পুস্তিকার দুইটি কপি হাদিয়া দিই।

সুলায়মান মুসার দাওয়াতে

আমরা আলহাজ সুলায়মান মুসার এখানে ইফতার করি। সেখানে মেহমানদের এক বড় জামাত অংশগ্রহণ করেন। তাদের অধিকাংশই জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের সদস্য। ইফতারিতে বহুকিছুর আয়োজন ছিল। মেজবান অনেক গুরুত্ব ও এহতেমামের সাথে আমাদের মেহমানদারি করেন। ইফতার এবং নামাজের পর মেজবানের অনুরোধে কিছুক্ষণ আলোচনা করি। এতে জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের প্রশংসা

করি। পরিশেষে তার মেহমানদারি ও জজবার শোকরিয়া আদায় করে আলোচনা শেষ করি।

সাইয়েদ মির গনির সাথে বিদায়ী সাক্ষাত

এখান থেকে সাইয়েদ মির গনির বাসায় গেলাম। শেষ কথাবার্তার জন্য তিনি আমাদেরকে স্মরণ করেছেন। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম শনিবার যুবসমাবেশে আমি যেই বক্তৃতা দিয়েছিলাম সাইয়েদ মির গনির লোকজনকে তা জানানো হয়েছে। তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সাইয়েদ গনি আমার আলোচনার প্রশংসা করলেন। সেখানে শায়খ ওমর ইসহাকও উপস্থিত ছিলেন। আজ রাত্রির কথাবার্তা ছিল হেজাজের দীনী অবস্থা, ইসলামি মারকাজসমূহে পথপ্রদর্শকের অপ্রতুলতা, দীনের অবমূল্যায়ন, দীনী দুর্বলতা, সীমাতিরিক্ত সৌখিনতা, অনর্থক কর্মকাণ্ড, ঘরে ঘরে অশ্লীল ও পর্নো সাহিত্য, ঈমান বিধ্বংসী উপন্যাসের ছড়াছড়ি এবং এসব কিছু যুবসমাজের দিল-দেমাগ ও চিন্তাজগতে ছেয়ে যাওয়া, যা মুসলমানদের মস্তিষ্কে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এর পর আমরা সুদানের খুরতুমস্থ 'আঞ্জুমানে উমুমি'তে গেলাম। সেখানে সুদানি যুবকদের একটি জামাত আমার জন্য অপেক্ষমাণ ছিল। তারা আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। এই মজলিসটি সাক্ষাত ও আলোচনার মজলিসের তুলনায় প্রেস-কন্‌ফারেন্সের সাথে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। তারপর আমরা তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরে আসি।

সুদানের ভৌগোলিক সীমারেখা, ধর্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা

১৭ জুন ১৯৫১

সুদান ত্যাগ করার আগে মনে হল সুদান ও তার ভৌগোলিক সীমারেখার উপর একবার নজর বুলিয়ে যাই। মানুষ যেসব দেশ ভ্রমণ করে এ বিষয় নিয়ে কিছু সময় কাটানো সেদেশের হক ও দাবি।

সুদানের আয়তন ২৬২৭০০০ [ছাব্বিশ লাখ সাতাইশ হাজার] বর্গ কিলোমিটার। তার দৈর্ঘ্য উত্তর দিকে হেলফা উপত্যকা থেকে নিয়ে দক্ষিণের জাওবা পর্যন্ত ১২০০ কিলোমিটার। প্রস্থ পূর্বে-পশ্চিমে লোহিতসাগর ও দারফুরের জেলাসমূহ এবং আফ্রিকার বিষুব এলাকার

মাঝে ১৫০০ কিলোমিটার। আয়তনের দিক দিয়ে এটা আফ্রিকার সবচেয়ে বড় অংশ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ৭০,০০,০০০ [সত্তর লক্ষ]।

প্রাকৃতিকভাবে সুদান তিন ভাগে বিভক্ত

১. মরুভূমি এলাকা। ৫১৭ কিলোমিটার প্রশস্ত। মিসর সীমান্ত লাগোয়া। এটা শুষ্ক ও বালুকাময় এলাকা। এর নাম নাওবা মরুভূমি।

২. সমতল এলাকা। ৫ ডিগ্রি প্রস্থে ৫১২ এবং ১৭ কিলোমিটার। এর উভয় রেখার মধ্যবর্তী বিষুবরেখার উত্তরে এই এলাকাটি অবস্থিত। আলজাজিরাকে তুলা চাষের জন্য নিধারণ করার পর সুদানের এ অংশটি কৃষির জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলজাজিরা এ দেশেরই নীলে আজরাক ও নীলে আবিয়াজের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। এখানে সুদানিদের সঙ্গে আরবেরও বহু অধিবাসী রয়েছে। সুদানের অন্যান্য এলাকা থেকে এখানকার মানুষ বেশি কর্মতৎপর।

৩. বিষুবরেখা। এই এলাকা প্রস্থে ৫১২ কিলোমিটার। দক্ষিণের শেষ অংশ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এখানকার অধিকাংশ এলাকায় মুষলধারায় বৃষ্টি হয়। গরমও পড়ে প্রচণ্ড। এলাকাটি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। বাসিন্দাদের অধিকাংশ সুদানি বংশদ্ভূত। এদের মধ্যে কিছু মূর্তিপূজক হাবশিও রয়েছে। সুদানের অধিকাংশ বাসিন্দা আরব ও সুদানি। তারা পরস্পরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। বিশেষ করে উত্তর ভূখণ্ডে। তাদের মধ্যে অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করেছে। ইসলামের বিজয়েরও আগে আরবগণ বাবুল মানদাবের পথে সুদান এসেছে। তারা এসে সুদানিদের সাথে একাকার হয়ে গেছে। তাদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এখানে কিছু গোত্র খালেস আরব হিসেবে এখনও আছে। তারা আরবীয় রীতি-নীতি, আখলাক-চরিত্র এবং ভাষাকে যথাসাধ্য সংরক্ষণ করে রেখেছে। আজকের পর্যটক এসব গোত্রের সঙ্গে মিশে আরবি রঙ ও মেজাজই অনুভব করেছে।

শাসনব্যবস্থা

সুদান আইনগতভাবে মিসরীয় ইংরেজদের অনুশাসনে রয়েছে। কিন্তু এটা সরাসরি ইংরেজদেরই অনুশাসন। সত্য কথা হল সুদান ইংরেজ উপনিবেশের উল্লেখযোগ্য অংশ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিসর নীল উপত্যকা থেকে ইংরেজ ফৌজ প্রত্যাহার করার আবেদন করেছিল। তখন ব্রিটেন এর মধ্যে সুদানের সমস্যা দাঁড় করিয়ে দেয়। এতে মিসর ও সুদানের মাঝে জোরদার আন্দোলন চলতে থাকে। যারা বললেন মিসর সুদানের অংশ, যেমনটি রয়েছে ভৌগোলিক সীমারেখায়, ব্রিটেন সরকার পুরোপুরি তাদের বিরোধিতা করল। অবশেষে মিসর ১৯৩৬ সালের চুক্তি ভঙ্গ করল এবং সুদানের সাথে করা আরও দুটি চুক্তি ভঙ্গ করে নীল উপত্যকার স্বাধীনতা ঘোষণা করল। এবং শাহে মিসরকেই উপত্যকার বাদশা করা হল।

সুদানের জেলা পরিচিতি

সুদানে সর্বমোট ১৫টি জেলা রয়েছে। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জেলা হল ১. দারফুর। ২. আলজাজিরা। ৩. কাসলা। ৪. খুরতুম। ৫. করোফান। ৬. উত্তর জেলা ৭. খত্তুল ইসতিওয়া [বিষুব এলাকা]। ৮. বালায়েন নীল।

সুদানের গুরুত্বপূর্ণ শহর

খুরতুম। জনসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। এই শহরটি ভূমির এমন একটি অবস্থানে আছে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে হাতির শুঁড়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। নীলে আজরাক ও নীলে আবিয়াজের সঙ্গমস্থলে এর অবস্থান। এটাই সুদানের রাজধানী এবং সবচেয়ে বড় শহর ও প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা।

উম্মে দারবান সুদানের পুরাতন রাজধানী, যা নীলে আবিয়াজের বাঁ দিকে অবস্থিত। এটি এখনো অনেক বড় শহর। তার জনসংখ্যা এক লক্ষের বেশি।

খুরতুম সুদানের নতুন শহর। এখানে উন্নত রাস্তা-ঘাট, আধুনিক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চোখ ধাঁধানো বহু বিনোদনকেন্দ্র রয়েছে। এখানে রয়েছে একটি কলেজ। ১৯০২ সালে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি। ১৯৪০ সালে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে শুরু করে।

কারিগরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

সুদান কারিগরিতে তেমন উন্নতি সাধন করতে পারেনি। তবে তুলা চাষে তাদের কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে, যার সিংহভাগ ব্রিটেন সরকার নিয়ে নেয়।

চারিত্রিক অবস্থা

সুদানিরা সাদাসিধে প্রকৃতির লোক। কিন্তু ইংরেজদের শাসনে ও রাজত্বের সংকটে পড়ে তাদের চরিত্রে রোগ ধরেছে। তাদের মধ্যেও মদ্যপায়ীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ইংরেজদের অন্ধ অনুকরণ এবং তাদের চরিত্র গ্রহণের ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমা সভ্যতার সাথে মিলেমিশে একটি ভিন্ন সভ্যতার জন্ম নিচ্ছে। যেমনটি আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূচনাকালে। মিসরেও এটা একটা আশ্চর্য বুনিয়াদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, যার দ্বারা দেশ ও জাতি আদৌ উপকৃত হতে পারে না। এই শ্রেণীর লোক বড় তিন শহর ও রাজধানীতে বেশি।

দীনী পরিবেশ

সুদানিরা ধর্মের ব্যাপারে কট্টোর। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ অনেক বেশি। তারা নাস্তিক্যবাদ ও স্বাধীনচেতা মনোভাব হতে অনেক দূরে। তারা এই অবস্থায়ই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজদের শাসনে পড়ে তাদের দীনী অবস্থা বিগড়ে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষা অন্যদের মত তাদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এ কথা জাজ্বল্যমান সত্য যে, এদেশে দাওয়াতের ভাল প্রসারতার দরুন দীনী প্রভাব তাদের মধ্যে এখনও অটুট রয়েছে। এটাও ঠিক যে, এই দীনদারির মধ্যে আধ্যাত্মিক বুজুর্গদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাদের কথার সামনে মাথা নত করা এতটা বেড়েছে যাকে শিরিক বলা যায়। সুদানিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় তরিকা হল সাইয়েদ মির গনির 'তরিকায়ে খাতামিয়্যা'। তার মসনদে এখনো সাইয়েদ মির গনি সমাসীন। অনেক মসজিদে মির গনির ছবি দেখা যায়। তা হলে ঘরের কী অবস্থা! সুদান ও হাবশার অধিকাংশ মসজিদে, যারা এই তরিকার সাথে সম্পৃক্ত না এবং যারা সাইয়েদ মির গনির অনুসারী না তারা খুতবা প্রদান করতে পারবে না।

বিদায় হে সুদান

আমরা স্টেশন অভিমুখে রওনা করলাম। আলহাজ সুলায়মান মুসা এবং আমাদের সম্মানিত মেজবান তার দুই ভাইসহ নাশতা, রাতের খাবার এবং সফরের বিভিন্ন পাথেয় নিয়ে আমাদের পূর্বেই স্টেশনে পৌঁছে গেছেন।

কথামত তিনি আমাদের জন্য ট্রেনে দুটি সিট বুকিং দিয়ে রেখেছেন। হাতে সময় একেবারে কম। সিট বুকিং দেওয়া সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দান করুন।

রেলওয়ের টিকিট কাউন্টারের প্রধান জনাব ইউসুফ কানাবী আমার নাম শুনে চিনতে পারলেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারিনি। আমার না চিনতে পারার কারণে তিনি অনুযোগ করে বললেন, আমি মক্কায় তুর্কিদের একটি অনুষ্ঠানে আপনার সঙ্গে দেখা করেছি। তখন আমাকে কিছু বই-পুস্তক হাদিয়া দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে এই অঙ্গীকারও করেছিলেন, যখন সুদান আসবেন আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি কি সেই অঙ্গীকার ভুলে গেছেন! আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার শোকরিয়া আদায় করলাম। তিনি আমাকে তার ভিজিটিং কার্ড দিলেন। তখন আমি তাকে ভালো করে চিনতে পারি। তিনি খুব আন্তরিকতার সাথে আমাদের কাজ করে দেন। আমাদের উপযোগী সিট বুকিং দিয়ে দেন।

আমরা যেসব বন্ধুর মেহমানদারিতে ছিলাম তারা আমাদের বিদায় জানালেন। আমাদের বিরহে তারা কাতর হয়ে ওঠেন। আমাদেরও একই অবস্থা। সুবহানাল্লাহ, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব কত গভীর! কত মজবুত!

১৮ জুন ১৯৫১

জোহরের সময় আমরা জাহাজে উঠি। জাহাজ রওনা করে। কয়েক ঘণ্টা পর আমাদের জাহাজটি একটা ডুবোচরে আটকে যায়। সেখানে পানি ছিল কম। ক্যাপটেন ও নাবিকগণ সেখান থেকে ছোটানোর অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু সম্ভব হয়নি। সারা রাত আমরা নীলনদে দাঁড়িয়ে কাটাই। এ সময়টায় বিরক্তির অন্ত ছিল না। কিছু করারও ছিল না। না পারি চলতে, না পারি বসতে।

১৯ জুন ১৯৫১

সাহায্যের জন্য একটি জাহাজ আসে। আমাদের জাহাজটিকে প্রথমে সেখান থেকে বের করে আনা হয়। তারপর উদ্ধারকারী জাহাজের সঙ্গে একে বেঁধে দেওয়া হয়। এই জাহাজটি আমাদের জাহাজকে শাল্লাল বন্দরে নিয়ে যাবে। আল্লাহর করুণায় আমাদের সফর শুরু হয়।

জোহরের পর বড় জাহাজটি তার সঙ্গে সংযুক্ত জাহাজ নিয়ে নীলনদের আরেক জায়গায় আটকে যায়। আগের চেয়ে আরো করুণ অবস্থার সৃষ্টি হল। আমরা বাকি দিন-রাত এখানেই পড়ে থাকি। বিরক্ত ও কষ্টের সীমা অতিক্রম করে গেছে। জাহাজের নাবিক ও কর্মকর্তারা এই মসিবত হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছেন। তারা হিম্মত হারিয়ে ফেলেছেন। আমরা বিষয়টিকে আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করে দিই। এরপর আমরা সকালের অপেক্ষা করতে থাকি।

মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্য

আমরা মুসলমান ও অমুসলমানের মধ্যে পার্থক্য দেখলাম। জাহাজের অধিকাংশ যাত্রী ছিল ইংরেজ ও অমুসলিম। তাদের কাউকে এ বিপদে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে কিংবা দোয়া করতে দেখিনি। তারা হাসি-তামাশা, ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া ও নাচ-গানে লিপ্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানযাত্রীরা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাদের কেউ কেউ আল্লাহর দরবারে দোয়া ও সাহায্যপ্রার্থনা করতে থাকেন। রোনাজারি করতে থাকেন। এ সবই আমার চোখে দেখা। আসলে অন্যান্য ধর্ম রুহানিভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে। আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নিঃশেষ হয়ে গেছে।

২০ জুন ১৯৫১

জোহরের পর পর্যন্ত আমরা এই মসিবতে আটকে থাকি। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে অনেক আগেই। দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে। যাত্রীরা সবাই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায়। ইতোমধ্যে সাহায্যের জন্য আরেকটি জাহাজ এগিয়ে আসে। অল্প প্রচেষ্টার পরই আমাদের জাহাজসহ উদ্ধারকারী জাহাজটিকে এই বিপদ থেকে বের করে আনে। এই বিপদমুক্তিকে জাহাজের খ্রিস্টান যাত্রীরা করতালি দিয়ে স্বাগত জানায়। এদিকে বহু মুসলমান এই মসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য দুরাকাত নামাজ মান্নত করেছিলেন। তারা নিজেদের মান্নত পুরা করতে লেগে যান। বিকেল তিনটার ঘটনা এটি। জাহাজ খুব জোরেশোরে চলতে থাকে। তখন লোকজন বলাবলি করতে থাকে, আল্লাহর মেহেরবানিতে আমরা সকালবেলা শাল্লাল পৌঁছে যাব।

শাল্লাল থেকে কায়রো

২১ জুন ১৯৫১

চাশতের সময় জাহাজ শাল্লাল বন্দরে পৌঁছয়। শাল্লাল দেখে সকলে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যেমন কেউ সফর থেকে ফিরে এসে নিজের শহর বা গ্রামের আশপাশ দেখে আনন্দিত হয়। আমরা এ খুশির ভিতরই ট্রেনে উঠি। আমাদের সিট সেকেন্ড ক্লাসের হওয়া সত্ত্বেও রাত অন্ধকারে কাটাই। ট্রেনের কর্মকর্তাদের কাছে বারবার অভিযোগ করেছি কিন্তু তারা ভ্রুক্ষেপ করেনি। ট্রেনের শৃঙ্খলা সুন্দর ছিল না। ছিল না আরামের পর্যাপ্ত উপকরণ। আলো ও পানি থাকা সত্ত্বেও আমরা বঞ্চিত থাকি। রাতের খাবার ডাইনিং রুমে খাই।

মিসর প্রত্যাবর্তনের আনন্দ

২২ জুন ১৯৫১

আমরা ভালবাসাভরা হৃদয় ও উদগ্রীব চোখে মিসরকে স্বাগত জানাই। যেন আমরা আমাদের মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছি। কারণ এখানে আমাদের বহুবন্ধু-বান্ধব রয়েছে। এবং কিছু সময় এখানে আমরা অতিবাহিত করেছি। তা ছাড়া আমাদের সফরের এমন একটি মনজিল শেষ হয়েছে, যা ছিল সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টকর।

আমরা ট্রেন থেকে অবতরণ করি। তারপর স্টেশন থেকে আজহারের উদ্দেশে রওনা হই। সেখানে আমাদের বন্ধু শায়খ আবদুল্লাহ কাবুলি থাকেন। আমরা আফগান ছাত্রাবাসে গিয়ে উঠি। আবদুল্লাহ কাবুলি সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তার বের হওয়ার পর আমরা সেখানেই থাকি। বিশ্রাম নিয়ে সফরের ক্লান্তি দূর করি। এখানে এসে জানতে পারি মাওলানা মুয়িনুল্লাহ ও মাওলানা আবদুর রশিদ দিন কয়েক আগে হেজাজে চলে গেছেন।

আশ্চর্য অনুভূতি

আশ্চর্য, নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছে। একেবারে ভিনদেশি। অথচ এ শহরেই কয়েক মাস কাটিয়ে গেছি। কবি সুন্দর বলেছেন, 'হাজুন ও সাফার মধ্যখানে কোনো বন্ধু পেলাম না; পেলাম না মক্কায় রাত্রিযাপনের সময় কোনো গল্পের সঙ্গী'।

আজহারে চোখ ফিরিয়ে দেখি নামাজি লোকে ভরপুর। অথচ কোনো পরিচিত মুখ নেই। শুধু তুরস্কের মুহম্মদ আমিনকে দেখতে পাই। তিনি অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। আমাদেরকে পেয়ে তিনি দারুণ খুশি হন।

আজহার থেকে বেরিয়ে আমরা বন্ধুবর আহমদ আবদুন নবী ও শায়খ রিয়াজুদ্দীন ফারুকির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবদুন নবীর বাসা-অভিমুখে রওনা হই। তাদের উভয়কে নতুন রাস্তার মাঝামাঝি পেয়ে যাই। তাদের সঙ্গে আলহাজ আবদুন নবীর বাসায় যাই। সেখানে ঘণ্টাখানেক থাকি। আহমদ আবদুন নবী আমাদেরকে ইফতারের দাওয়াত দেন। আমরা দাওয়াত গ্রহণ করি। এখান থেকে আমরা ইয়াসিন শরিফের সাথে দেখা করার জন্য সিরীয় ছাত্রাবাসে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি গ্রামে চলে গেছেন। অল্পক্ষণ সিরীয় বন্ধুদের সঙ্গে বসে থেকে আমাদের থাকার জায়গায় ফিরে আসি। এখানে ভারতীয় পদ্ধতিতে ইফতারি করি। ভারতীয় খাবার খাই। এখান থেকে বন্ধুবর আহমদ শিরবাসীর বাসার উদ্দেশে 'হিলমিয়া জাদিদা'য় যাই। ধারণা করেছিলাম তাকে পাব না। কিন্তু না, আমাদের ধারণা অসত্য প্রমাণিত হল। তাকে পেয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ তার সাথে বসে কাটাই। তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

জমিয়তে শুব্বানুল মুসলিমিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে

আজহারের সড়ক অতিক্রমের সময় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল্লাহ আকিলের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তার সঙ্গে জমিয়তে শুব্বানুল মুসিলিমিনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যাই। সেখানে হঠাৎ দেখি বদরযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত জায়গাগুলোতে মঞ্চায়ন করা একটি নাটক দেখানো হচ্ছে। মুহম্মদ সালেহ হরব, মুফতি আমিন আলহোসাইনী, শায়খ মুহম্মদ সবরী আবেদিন, শায়খ মুবাশশির তারাজী প্রমুখের সঙ্গে আমরা দেখা করি। তারা আমাকে মিসরে দেখে আশ্চর্য হন। আমি তাদেরকে সুদান থেকে ফিরে আসার কথা জানাই। সুস্থতার সাথে ফিরে আসতে পারায় তারা আমাকে মোবারকবাদ জানান। আমরা নাটকে অংশগ্রহণ না করেই চলে আসি।

২৩ জুন ১৯৫১

আমরা আলহাজ জালাল হোসাইনের অফিসে গেলাম। আমাদের অবর্তমানে যেসব চিঠিপত্র জমা হয়েছে তা গ্রহণ করলাম। ডাকের প্রতি আমি অনেক উদগ্রীব ছিলাম। পরিবার ও ভারতীয় বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অনেকদিন হল যোগাযোগ বন্ধ। তাদের কোনো খবরাখবর জানি না। এই ডাকে আমার আম্মাজানের চিঠিও ছিল। এ ছাড়া আমার ফ্যামেলি মেম্বারদের অনেকেই চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি মান্নত মেনেছিলাম তাদের সুস্থতার সংবাদ পেলে চার রাকাত নামাজ পড়ব। আমি মান্নত পুরা করলাম। সকল প্রশংসা ওই আল্লাহর, যার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের দ্বারা সকল ভালো আশা পূর্ণ হয়। তারপর আমরা অফিসে যাই। এখানে আমাদের কায়রো আসার বিষয়টি এন্ট্রি করিয়ে নিই। সেখান থেকে আমাদের বাসায় ফিরে এসে বিশ্রাম নিই।

আজহারের অফিসে

আজহারের অফিসে গেলাম। সেখানে শায়খ আহমদ শিরবাসী ও ড. মুহম্মদ ইউসুফ মুসার সঙ্গে দেখা করি। তারা আমাকে দাওয়াত করেন। তাদের দাওয়াত গ্রহণ করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করি। 'বিশ্ব কী হারালো'র নতুন সংস্করণের কপি তাদেরকে হাদিয়া দিই। তারপর শায়খ মাহমুদ শালতুতের অফিসে যাই। তার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি সেসব হাদিয়ার কথা উল্লেখ করলেন, যা আমি তাকে দিয়েছিলাম। তিনি আমাদেরকে ইফতার ও রাতের খাবারের দাওয়াত দিলেন। আমরা অক্ষমতা প্রকাশ করি।

মুসলিমদেশের ছাত্রদের ইফতার অনুষ্ঠানে

বন্ধুবর শায়খ লোকমান নদবী ইফতারের দাওয়াত দেন। আমরা ভারতীয় ছাত্রাবাসে যাই। সেখানে মুসলিমবিশ্বের ছাত্রদের একটি বড় জামাত দেখতে পাই। জানতে পারলাম সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মেহমান হিসেবে তারা এখানে প্রতিদিন ইফতার করে। খুব সুন্দর দৃশ্য। ইসলামি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের চমৎকার নিদর্শন। বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন রঙ ও বংশের ছাত্ররা পাশাপাশি বসে আছে।

কিন্তু একটা জিনিস ভালো লাগল না। পরিবেশটা হৈ-হুল্লোড়ে ভরা ছিল। শৃঙ্খলা ছিল না বললেই চলে। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে রোজার

শ্রেষ্ঠত্ব, রমজানের আজমত ও এহতেরামের বড় অভাব দেখতে পাই। তারা ইফতারের সময় সন্নিকটে হওয়ার ফজিলত অনুভব করছে না। না কেউ জিকিরে লিপ্ত ছিল, না কেউ স্থির হয়ে বসে ছিল। বরং শুধু চিল্লাচিল্লি শোনা যাচ্ছিল। এদ্দ্বারা অনুমিত হয় ছাত্রদের মধ্যে দীনের এহতেরাম ও জজবার ভীষণ কমতি রয়েছে।

এশার পর আবদুল্লাহ আকিল এবং আহমদ আস্সাল এলেন। তারা আমাদের সঙ্গে বাহি আলখাওলীর নতুন বাসা 'মাতারিয়া'য় যাবেন। আমরা বাসে উঠে বসলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর বাস থেকে নেমে ট্রেনে চড়লাম। স্টেশনে নেমে বাহি আলখাওলীর বাসায় যাই। তিনি আবদুল্লাহ আকিলকে বলে রেখেছিলেন, আমরা মিসরে ফিরলে তাকে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি নিজে এসেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। সুদান সফরের পূর্বে আমি তার বাসায় কয়েকবার গিয়েছিলাম। একবারও তাকে পাইনি। তখন সাক্ষাত না হওয়ার কারণে তিনি নিজে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করেছেন। আমার হৃদয়ে তার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রয়েছে। এ জন্য আবদুল্লাহ আকিলকে আমার সংবাদ দেওয়ার চাইতে আমি নিজে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা উচিত ও উপযুক্ত মনে করি।

তিনি যখন জানতে পারলেন আমরা গেইটে দাঁড়িয়ে আছি তখন উচ্চ স্বরে আনন্দধ্বনি তুলে বেরিয়ে এলেন। আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানালেন। মুয়ানাকা করলেন। নিজের দুই সঙ্গী জনাব আমিন দাবিদার ও মাতারিয়ার সহকারী স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর আমরা আলোচনায় মগ্ন হয়ে পড়ি। অনুভব করলাম প্রথম প্রথম পরিচিতজন ও বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত না হওয়ায় যে কষ্ট অনুভূত হচ্ছিল তা ধীরে ধীরে দূরীভূত হচ্ছে। শায়খ বাহি আলখাওলীর হৃদয়ের উষ্ণ ভালবাসার পরশে আমার অন্তরে নতুনভাবে সাহস সঞ্চার হচ্ছে। এতক্ষণ নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল। এখন দূর হয়ে গেছে। জনাব আমিন দাবিদার 'কাসাসুন-নাবিয়্যীন লিল আতফাল' ['নবী-কাহিনী কিশোর সংস্করণ'] এর লেখক আমি জেনে খুব খুশি হলেন। বইটি তিনি আগে পড়েছেন। এর বিন্যাস ও বর্ণনাভঙ্গির ব্যাপারে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সাক্ষাতে তিনি অনেক আনন্দিত হন। 'কাসাসুন-নাবিয়্যীন'র প্রশংসা, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের তার স্বীকৃতি আমার জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক

ও প্রেরণাদায়ক ছিল। কারণ এ বিষয়ে তার বিশেষ দক্ষতা রয়েছে। তিনিও শিশু-কিশোরদের উপযোগী বিভিন্ন বই লিখেছেন। গণশিক্ষা বিভাগে তিনি চাকুরি করেন। আমাদেরকে তার ঘরে কিছুক্ষণ বসানোর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমরা সবাই হাঁটতে হাঁটতে তার বাসার দিকে এগিয়ে যাই। বাহি আলখাওলী বিভিন্ন রসিকতামূলক কথার মাধ্যমে আমাদেরকে দারুণ আনন্দ দেন। কিছুক্ষণ চলার পর আমরা একটি প্রশস্ত ঘরে প্রবেশ করি। অল্প সময় সেখানে বসি। মিষ্টান্ন ও ঠাণ্ডা পানীয় জলের মাধ্যমে তিনি আমাদেরকে আপ্যায়ন করেন। আমিন দাবিদার তার লেখা শিশুসাহিত্যের কয়েকটি গল্পের বই আমাকে হাদিয়া দিলেন। আমাদের বিদায় দেওয়ার জন্য সকলে মাতারিয়ার স্টেশন পর্যন্ত আসেন। জনাব আমিন আগে বেড়ে সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কাটেন। সেখান থেকে বাসায় আসতে আসতে মধ্যরাত হয়ে যায়।

২৪ জুন ১৯৫১

আমরা আহমদ আবদুন নবীর ঘরে তার এবং জনাব রিয়জুদ্দীন ফারুকির সঙ্গে সাক্ষাত করি। সেখানে আবু নসর হোসাইনীর সাথেও দেখা হয়। ফারুকি আগামীকাল ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করেছেন। সেখান থেকে আমরা মিসরের বিমানবন্দর 'ইবরাহিম পাশা ময়দানে' যাই। আগামী সোমবার দামেশকের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়া বিমানের দুটি সিট বুকিং দিই। যাওয়ার পথে আতাবায় অবস্থিত 'মাকতাবায়ে মাহফুজ' হয়ে যাই। সেখানে গিয়ে জানতে পারি 'আধুনিকতা থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন' গ্রন্থের ছাপার কাজ এখনো সম্পন্ন হয়নি। জনাব মাহফুজ আফেন্দী প্রতিশ্রুতি দেন ডাক-মারফত পঞ্চাশ কপি দামেশকে পাঠিয়ে দিবেন।

সেখান থেকে ইবরাহিম সড়কের পাশে অবস্থিত 'মাকতাবায়ে ওয়াহাবা'র স্বত্বাধিকারী জনাব হাসান ওয়াহাবার নিকট যাই। সেখান থেকে 'ইসলামের কবি মুহম্মদ ইকবাল'র বিশ কপি কিনে নিই। বইগুলো সিরিয়া ও তুরস্কের বন্ধুদেরকে হাদিয়া দিব। তারপর 'দারুল কিতাব আল আরাবি'তে যাই। আলহাজ হিলমি মিনিয়াবির সঙ্গে সাক্ষাত করি। তার থেকে বিদায় নিয়ে আবার আহমদ আবদুন নবী ও ফারুকির সঙ্গে দেখা

করে বিদায় নিই। জনাব ফারুকির সঙ্গে দেখা করার আরেকটি উদ্দেশ্য এই ছিল– তার আগামীকালের সিদ্ধান্তকৃত প্রোগ্রামে না থাকতে পারার বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া। তাকে না পেয়ে বিষয়টি একটি কাগজে লিখে রেখে আসি।

ইখওয়ানি বন্ধুদের সঙ্গে

জনাব ইয়াসিন শরিফ এলেন। তার সঙ্গে আমরা আবদুল্লাহ আকিলের বাসায় যাই। সেখানে ইখওয়ানি নওজোয়ানদের সঙ্গে ইফতার ও খাবারে অংশগ্রহণ করি। তারপর আমরা ইখওয়ানের প্রধান কার্যালয়ের উদ্দেশে সবরী রোডের দিকে রওনা হই। শায়খ সাইয়েদ সাবেকের পিছনে তারাবির নামাজ আদায় করি। নামাজের পর শায়খ সাবেক ও তার বন্ধু-বান্ধবদের আবেদনে বয়ান করি। প্রফেসর আবদুল আজিজ কামেলের[১] সঙ্গে দেখা হয়। বহুদিন হয়েছে তার সঙ্গে দেখা করেছি। পুনর্সাক্ষাতের অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। আল্লাহ পূরণ করে দিয়েছেন। আমরা এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। প্রফেসর সালেহ ইশমাবী ও তার ভাই ডা. খলিল ইশমাবীর সঙ্গেও দেখা করি।

আবদুন নাফে সিবায়ী তার দিমাশকী বন্ধু-বান্ধবদের নামে আমার পরিচিতি, প্রশংসা ও পরামর্শসংবলিত পত্র লিখে দিলেন। সাইয়েদ মুহম্মদ বেগ গজনবীর গাড়িতে করে আমরা ফিরে আসি। সাইয়েদ সাবেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আফসোস! আরও অনেক বন্ধুর সাথে দেখা করতে পারিনি। তাদের অধিকাংশই বদরে কুবরা ও গাজওয়ায়ে খন্দকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছেন। যেমন, প্রফেসর আবদুল হাকিম আবেদিন, ডা. সায়িদ রমজান, শায়খ ফরিদ আবদুল খালেক, শায়খ মুহম্মদ আলগাজালী প্রমুখ। আমার বড় আক্ষেপ হল বিমান যোগে দামেশকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ায়। এতে আলেকজান্দ্রিয়া দেখার সুযোগ হারাই। এর আগে আমরা বৈরুতের সফর জাহাজে চড়ে আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে

---

[১] তিনি মিসরের 'ওয়াক্‌ফবিষয়ক মন্ত্রী' হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি 'কুয়েত ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর'ও ছিলেন।

রমজানের আরাম ও সময় বাঁচানোর কথা খেয়াল করে বিমানের সফরকেই প্রাধান্য দিই।

বিভিন্ন দিক লক্ষ্য করে আলেকজান্দ্রিয়া সফর ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ইখওয়ানি বন্ধু আমাদেরকে সেখানে সফরের দাওয়াত দিয়েছিলেন। আমরা আবদুল হাকিম আবেদিনের সঙ্গে আলেকজান্দ্রিয়া সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু গড়িমসি করতে করতে সময় পার হয়ে যায়।

বিদায় হে মিসর

প্রায় অর্ধবছর থাকার পর এখন মিসরকে আলবিদা জানাচ্ছি। মিসর আমার অন্যতম প্রিয় দেশ। অত্যন্ত আনন্দের সাথে এখানে দিন যাপন করেছি। তাই মিসরের বিচ্ছেদ বড় কষ্টের। প্রথমে এখানে এক-দুই মাসের বেশি থাকার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু সময় বাড়াতে বাড়াতে পাঁচ মাসেরও বেশি হয়ে যায়। যদি মিসরে আসার প্রাক্কালে আমাদেরকে বলা হত সেখানে পাঁচ মাস থাকতে হবে, তা হলে এটা আদৌ পছন্দ হত না। জোর গলায় অস্বীকার করতাম। আমাদের সম্মুখে ছিল মধ্যপ্রাচের দীর্ঘ সফর। সঠিকভাবে হিসাব করলে মিসরের জন্য মাত্র কয়েক সপ্তাহ বের করতে পারতাম। কিন্তু আমরা আমাদের ইচ্ছার উপর পরাজিত হলাম। মিসরের ব্যাপারে কোনো নিয়ম-নীতি মানা হয়নি। তাকে আপন অবস্থায় চলতে দিয়েছি। এমনকি এখানকার অবস্থানকে ফিতে দিয়ে মাপিনি। প্রেমাস্পদের আচরণ এটাই। সে তার পাওনার চেয়ে বেশি নিয়ে নেয়। পৃথিবীর সবকিছুই গাণিতিক সূত্রের অধীন না। এমনটি না হয়ে ভালোই হয়েছে। গণিতের আইন-কানুন চাপিয়ে দেওয়া হলে মানুষের জীবন সংকীর্ণ হয়ে যেত। প্রাণশক্তিহীন মেশিন হয়ে পড়ে থাকত। নতুনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে পাওয়া যেত না। আনন্দ-আহ্লাদ, স্বাদ-মজা, আত্মপ্রশান্তি কিছুই থাকত না। বরং হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি, জ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রতিকূল হয়ে উঠত। অন্তরের চাহিদা ও অনুপ্রেরণা আইন-কানুন ও নেজামের সাথে দ্রোহের সুর তুলত। অথচ এ দুটি জিনিস মিলেই জীবনকে করে তোলে অর্থবহ, কর্মময় ও সজীব। জীবনে আনে নতুন ছন্দ।

মিসর তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, উন্নত নাগরিকসুবিধা, গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতি সত্ত্বেও এ সফরের নির্ধারিত নীতিমালা থেকে আমাদেরকে নড়াতে

পারত না। আমাদের অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি করে নিজের পাওনার চাইতে বেশি কিছু আদায় করতে পারত না। কারণ আমরা বেড়ে উঠেছি এমন এক দেশে, যা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, যেখানে রয়েছে মনকাড়া অসংখ্য দৃশ্য। সবুজের সমারোহ। এবং উন্নত কৃষ্টি-কালচার।

তবে সেখানে আমাদেরকে আমাদের তৈরী নীতিমালা থেকে সরে আসতে এবং আমাদের অবস্থানকে দীর্ঘায়িত করতে বাধ্য করেছে কয়েকজন মুখলিস বন্ধুর উপস্থিতি। যাদের হৃদয় আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। যাদের রুহ আমাদের রুহের সঙ্গে মিশে গেছে। যারা নিজেদের আন্তরিকতা ও ভালবাসার কারণে আমাদের হৃদয়ভূমিতে ঘর বেঁধে নিয়েছেন। এবং সর্বোপরি তারা সফরের ক্লান্তি ও প্রবাসের নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দিয়েছেন। এমনকি আমরা যে ভিনদেশি সেই অনুভূতিটুকু বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

সেখানে পুষ্পিত ফুল ও জ্বলজ্বলে আঁখির ন্যায় কিছু প্রাণ রয়েছে। তারা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ঈমানি অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত। তারা আমাদেরকে ভালবেসেছেন। তারা আমাদের এবং আমরা তাদের প্রিয়জনে পরিণত হয়েছি। সেখানে এমন কিছু যুবক ছিল, যারা আপন প্রভুর উপর ঈমান এনেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়েত বৃদ্ধি করেছেন। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে তারা গুহা থেকে বেরিয়ে পৃথিবীর তাগুত ও অন্যায়ের সাথে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। বাতিলের মোকাবেলায় ঝাপিয়ে পড়েছিল। শক্তিশালী দীনী আন্দোলন প্রতিষ্ঠা, ব্যাপক ও সুগভীর জ্ঞানচর্চা এবং জোরেশোরে তার প্রচার-প্রসারের কাজে নেতৃত্বদান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক নির্দেশনার ক্ষেত্রে মিসর তার যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এসব জিনিসই মিসরের জমিনে আমাদেরকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত থাকতে বাধ্য করেছে। আমরা যে নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেছি, তা ছড়াতে সহযোগিতা করেছে। এগুলোই আমাদের সফরসূচিতে মিসরের অংশ বাড়িয়ে দিয়েছে।

সফরের পর অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন মিসরে আপনার কোন জিনিস ভালো লেগেছে আর কোন জিনিস ভালো লাগেনি? নিঃসন্দেহে প্রশ্নটি অনেক সঙ্গিন তবে অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্ববহ। এর জবাব দেওয়া কঠিন তবে অতি জরুরি।

যাই হোক, মিসরে আমার ভালোলাগা জিনিস, সেখানকার জীবনাচার, কর্মোদ্দীপনা, সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ, প্রচার ও প্রকাশনার

সহজসাধ্যতা এবং এর আধিক্য ও দ্রুততা, আরবিভাষার প্রতি মনোযোগ এবং একে আপন করে নেওয়া, এ ব্যাপারে তাদের আত্মমর্যাদা এবং এর জন্য তাদের প্রচেষ্টা, মাসয়ালা-মাসায়েলের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিদান, সর্বোপরি অন্যান্য আরব দেশের তুলনায় এখানকার মেধা ও সচেতনতা।

এ ছাড়া তাদের উত্তম চরিত্র, প্রশস্ত ও উদার মন, মুসলমান মেহমানদের সাথে উত্তম আচরণ, তাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, সাহস যোগানো এবং অকপটে তাদের যোগ্যতা স্বীকার করা, ঈমান ও আধ্যাত্মিক শক্তি, মানুষের সঙ্গে দ্রুত মিশা ও বন্ধুত্ব করার যোগ্যতা, ইলমের পিপাসা এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা, অধ্যয়নের প্রতি ঝোঁক ও কিতাব সংগ্রহের আগ্রহ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য আমার কাছে ভালো লেগেছে।

মিসরে যেসব জিনিস আমার পছন্দ হয়নি এবং যেগুলোকে আমি সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছি তা কোনো ধরনের লৌকিকতা ছাড়া আপনাদের খেদমতে তুলে ধরছি। এটা সেই দিলের কথকতা যে মিসর ও মিসরবাসীকে ভালবেসেছে। শুরুতে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বিষয়গুলো হল সেখানকার অবাধ বিচরণ, আনন্দ-ফুর্তি একটি বড় ও প্রভাবশালী মহলের অশ্লীল সাহিত্যের রমরমা ব্যবসা এবং আখলাক-চরিত্র, নীতি ও নৈতিকতার বিকিকিনি করে জীবন পরিচালনা করা। যেন এসব ব্যবসায়ী মিসরের সম্মান ও স্বাধীনতার স্বত্বাধিকারী।

এমন অনেক আনজুমান ও আন্দোলন আমার পছন্দ হয়নি, যা মিসরের পরতে পরতে প্রতিষ্ঠিত, যেগুলোর সিংহভাগেরই বিশেষ কোনো পয়গাম নেই। বিশেষ কোনো দাওয়াত নেই। কোনো আদর্শ নেই। এর মধ্যে আবার কিছুর পরিচালক ব্যক্তিগত বিষয়ে সমালোচনা, ছোট ছোট বিষয়ে মতবিরোধ এবং পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত।

মিসরে এমন একশ্রেণীর শিক্ষিত লোক পেয়েছি, যাদের হাতে রাষ্ট্রের বাগডোর, যারা শিক্ষা, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের ময়দানে শাহসওয়ার। কিন্তু তাদের অন্তর নষ্ট হয়ে গেছে। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। ইসলাম তাদের কণ্ঠনালীর নিচে নামে না। তারা স্বীকার করে না যে, ইসলামের কোনো ভবিষ্যৎ আছে। ইসলামের সঙ্গে তাদের একনিষ্ঠ ও আন্তরিক সম্পর্ক নেই। এজাতীয় লোক পাক-ভারত, তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া ও ইরাকেও দেখেছি। এরা বস্তুত সেই তরবিয়ত ও শিক্ষায় তৈরী, যা পশ্চিমা

সাম্রাজ্যবাদ খুব যত্নসহকারে রোপন করেছে, যাকে অনেক কৌশলে ইসলামি রুহানিয়ত ও দীনী তরবিয়তশূন্য করা হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকেরা আপন বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণায় পরস্পর একজোট। কারণ তাদের সকলের শিক্ষা-দীক্ষার উৎস এক ও অভিন্ন।

মিসরিদের জীবনযাত্রার ধরন ও উপকরণ এবং ধনী-গরিবের বিরাট ব্যবধান আমার পছন্দ হয়নি। পার্থক্য হতেই পারে। তবে গরিবদের একটা বিরাট অংশ এমন যে তারা দুবেলাই রুটি-রুজির মুখাপেক্ষি। তাদের নিকট শরীর ঢাকার কাপড় নেই। অপর দিকে এমন এমন লোকের উপস্থিতি দেখেছি, যাদের পাহাড়সম সম্পদ। অত্যধিক পানাহারের কারণে যারা বদহজমির শিকার। যাদের অন্তর গরিবদের জন্য ব্যথিত হয় না। যাদের মুখ দিয়ে ক্ষুধার তাড়নায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম মানুষের সান্ত্বনার জন্য একটি শব্দও বের হয় না। কোনো ধর্মই তা মেনে নিতে পারে না। কোনো ইনসাফ একে কবুল করতে পারে না। এটা মানবজীবনের একটা অগ্রহণযোগ্য বৈষম্য। কোনোক্রমেই এটি টিকে থাকার অধিকার রাখে না।

হ্যাঁ, এটা নিঃসন্দেহে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের ধর্মাচার। তারা মানুষের অধিকার দিতে জানে না। সঠিক দীনী আন্দোলন ও ইসলামি জাগরণের দ্বারাই এইসব দুর্বলতার দিক ও সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসার আশা করা যায়। সন্দেহ নেই, মিসরে দীনী ও ইসলাহি আন্দোলন পর্যাপ্ত রয়েছে। তারা আরববিশ্ব ও ইসলামের জন্য বিপ্লবের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আল্লাহ তায়ালা মিসর ও মিসরবাসীকে ভালো রাখুন। সুখে-শান্তিতে রাখুন। এই মুসাফিরের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম, যার ভাগ্যে এই মুসলিম দেশটির মহব্বত-ভালবাসা, আপ্যায়ন-ইকরামসহ সবকিছুই জুটেছে। আর এগুলোই একজন মুসলমান আশা করতে পারে। আবার সালাম, মিসর ও মিসরবাসীকে।

এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে

২৫ জুন ১৯৫১

ফজরের নামাজের পর আমরা মিসর এয়ারলাইন্সের অফিস 'ইবরাহিম পাশা ময়দানে'র দিকে রওনা করি। আমাদের সঙ্গে সাইয়েদ ইয়াসিন

শরিফ ছিলেন। বিভিন্ন আইনি জটিলতা স্বাভাবিক গতিতেই সম্পন্ন হয়েছে। আবদুল্লাহ আকিল, মুহম্মদ দামিরদাশী ও আহমদ আসসাল আমাদেরকে বিদায় জানাতে এসেছেন। তখন ছিল ঘুমের সময়। আমরা তাদের হিম্মত, ইখলাস ও অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। বিমানের কাছে পৌঁছার জন্য আমরা এয়ারবাসে আরোহণ করি। সকাল সাতটায় আমাদেরকে নিয়ে বিমান আকাশে ওড়ে। আমার সফরসঙ্গী ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী। দুঘণ্টা বাতাসে ভেসে আমরা এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে পৌঁছে যাই। এশিয়া থেকে আফ্রিকা। আমরা সিরিয়ার সীমানায় প্রবেশ করি। পনেরো মিনিটের মাথায় বিমান দামেশকের 'মিজ্জা বিমানবন্দরে' গিয়ে অবতরণ করে। বিশাল দূরত্বের এ সফর কোনো ধরনের ক্লান্তি ও দীর্ঘ সফরের অনুভূতি ছাড়াই শেষ হয়। শোকরিয়া সেই পূত-পবিত্র সত্তার, 'যিনি মানুষকে অজানা বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন।'

দামেশকে

আমি জনাব আবদুন নাফেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মধ্যম শ্রেণীর একটি হোটেলের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমাদেরকে মারজাস্থ 'হোটেল কসরুল উন্দুলুসে' থাকার পরামর্শ দেন। এটাই যথোপযুক্ত হোটেল ছিল।

আমরা এক ঘণ্টার বেশি সময় এয়ারবাসের জন্য অপেক্ষা করি। উদ্দেশ্য বাসে করে শহরের বিমানের সেবাদানকারী কোম্পানির অফিসে যাব। বাস অনেক বিলম্বে আসে। আফ্রিকা থেকে এশিয়া পৌঁছুতে যতটুকু সময় ব্যয় হয়েছে তার চেয়ে অবশ্য সামান্য কম সময় লেগেছে দামেশকের এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছুতে। যাই হোক, আমরা 'হোটেল কসরুল উন্দুলুস' পৌঁছি। আমরা দুজনে একটি রুম ভাড়া করি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করি।

দামেশকের আবহাওয়া খুব চমৎকার ছিল। আমাদের দেশের স্বাভাবিক আবহাওয়ার মতো। না গরম অনুভব করেছি, না প্রখর রোদের উত্তাপ। শহরও নিরিবিলি। শান্ত। কায়রোর হৈ-হুল্লোড় আর চিৎকার-চেচামেচির তুলনায় এখানে অনেকটা আরাম বোধ করেছি।

শায়খ মুহিউদ্দীন জামে মসজিদ

আমরা সর্বপ্রথম 'শায়খ আহমদ কাফতারু'[১]র সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। হোটেলের লোকদেরকে 'হাইয়ুল ইকরাদের' রাস্তা জিজ্ঞেস করি। তারা লোকেশন দিল, আপনারা 'শায়খ মুহিউদ্দীন এক্সপ্রেসে' আরোহণ করবেন। আখেরি মনজিলে নেমে পড়বেন। তারপর সেখানে যেকাউকে শায়খ আহমদ কাফতারুর কথা জিজ্ঞেস করলে বাড়ি দেখিয়ে দিবে। তাদের কথায় বোঝতে পারলাম শায়খ এখানকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের একজন।

আমরা গাড়িতে উঠলাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ শায়খে আকবর মুহিউদ্দীন রহ. এর কথা স্মরণ হল। এ পথেই তার সমাধি। জিয়ারত করে যাওয়ার ইচ্ছে হল। আমরা তার মহল্লায় অবতরণ করি। শায়খ মুহিউদ্দীন আকবরের নামেই মহল্লার নামকরণ করা হয়েছে। আমরা তার মসজিদে যাই। মসজিদটি অনেক সুন্দর। লোকজনে ভরপুর। কেউ নামাজের অপেক্ষা করছে। কেউ জিকিরে মশগুল। কেউ কুরআন তেলাওয়াত করছে। এটা ছিল আসরের আজানের পূর্বের সময়। দীনের হেফাজত ও পাবন্দির ক্ষেত্রে সিরিয়া তুলনাহীন। দীনের অবশিষ্ট সম্পদ রক্ষায়ও তার জুড়ি নেই।

অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এ মসজিদটিও মাজারের পাশে নির্মিত। এখানে কয়েকজন নেককার লোক শুয়ে আছেন। মসজিদের দেয়ালে সাটানো একটি কাষ্ঠখণ্ড দেখি। তাতে লেখা আছে- 'হে শায়খ মুহিউদ্দীন...।' লেখাটি আল্লাহ তায়ালার এই ফরমানের সরাসরি বিরোধী, 'وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰه فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰه اَحَدًا' 'মসজিদ আল্লাহ তায়ালার। সুতরাং তার সঙ্গে কাউকে ডেকো না।' [সুরা জিন, ১৮ আয়াত]

আসরের নামাজের পর শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবির[২] মাজার

---

[১] ইসলামি চিন্তানায়ক। ১৯১২ সালে দামেশকে তার জন্ম। ১৯৫২ সালে তিনি সিরিয়ার সর্বোচ্চ ইফতাবোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। জমিয়তে আনসার তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ইসলামি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের কারণে তাকে কয়েকটি দেশের ইউনিভার্সিটি থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রী দেওয়া হয়। ২০০৪ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

[২] কাজি আবু বকর মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবি রহ. হচ্ছেন হিজরি ৫ম শতাব্দীর বিশিষ্ট হাদিসবিশারদ ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা। তাঁর অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ রচনা হচ্ছে তিরমিযি শরিফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আরীযাতুল আহওয়াজী'। ৪৬৮ হিজরি ২২ শাবান স্পেনের ইসাবিলায় জন্মগ্রহণ

জিয়ারত করি। তিনি শায়খে আকবর নামে প্রসিদ্ধ। মাজারের পাশে একটি দেয়ালে লেখা 'বিগত লোকদের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। আমাদের সূর্য আকাশের উঁচু দিগন্ত রেখায় সর্বদা উদীয়মান থাকে।' এই লেখাটি দেখে আমি ভীষণ মর্মাহত হয়েছি।

উমুবী জামে মসজিদ[১]

সেখান থেকে আমরা শায়খ আহমদ কাফতারুর বাসায় যাই। বাইরে থেকে আওয়াজ দিই। তার কথা জিজ্ঞেস করি। ভিতর থেকে বলা হল তিনি উমুবী জামে মসজিদে আছেন। সেখানে তার দরস চলছে। এই সুন্দর সুযোগে আমি দারুণ আনন্দিত হলাম। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এটাই সিদ্ধান্ত ছিল যে, এ আজিমুশশান ইসলামি ঐতিহ্যের জিয়ারত দেরি না হোক, যার সম্পর্কে আমি ইতিহাস অধ্যয়নের শুরু থেকে পড়ে আসছি।

আমরা 'হামিদিয়া বাজার'[২] অভিমুখে রওনা হলাম। বাজারের মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। কিছুক্ষণ পর সেই ঐতিহ্যবাহী মসজিদে পৌঁছে যাই। মসজিদের দৃষ্টিনন্দন শানদার বিল্ডিং আমাদের চোখে পড়ে। প্রধান গেইট দিয়ে প্রবেশ করি। প্রশস্ত আঙিনা হয়ে ভিতরে যাই। সেখানে অনেক মানুষের সমাগম। কেউ নামাজ পড়ছে। কেউ তাসবি পাঠে নিমগ্ন। কেউ ব্যস্ত দরস-তাদরিসে। কিছু লোককে কথা-বার্তায় লিপ্ত দেখি। চমৎকার পরিবেশ। আমার চোখের পর্দায় ভেসে উঠেছে ইসলামের প্রথম যুগের স্মৃতি। বড় বড় শহরের চিত্র।

করেন। ৫৪৩ হিজরিতে মরক্কোয় তাঁর ইনতেকাল করেন।

[১] ঐতিহাসিক মসজিদ। প্রসিদ্ধ উমাইয়া খলিফা অলিদ বিন আবদুল মালেক এটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির কিবলার দিকের দেয়ালে চারটি মেহরাব রয়েছে। উসমানী খেলাফতকালে এগুলো ফেকাহভিত্তিক বিভিন্ন মাজহাবের পৃথক পৃথক নামাজের জামাতের জন্য ব্যবহৃত হতো। এখনো সেখানে হানাফী ও শাফেয়ীদের ভিন্ন ভিন্ন জামাত হয়। উম্মতে মুহম্মদীর শেষ অংশ হযরত ঈসা আ. ও ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে এই মসজিদ থেকে হেদায়েতের মশাল নিয়ে বের হবেন।

[২] হামিদিয়া বাজার। বাজারটি সুলতান আবদুল হামিদ খানের নামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বাজার। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বাজারটি চালু রয়েছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন, ইসলামপূর্ব বায়জেন্টিনা যুগে বাজারটির উদ্বোধন হয়। দামেশক জামে মসজিদের অদূরে তার অবস্থান।

আল্লাহর কি অপার কারিশমা! আমরা মসজিদ অতিক্রমকালে কোনো প্রোগ্রাম ছাড়াই তাওফিক আলকুনজির সাথে সাক্ষাত হয়ে যায়। আজহারে 'রওয়াকে হুনুদে'র প্রথম [২৪ জানুয়ারি] অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্রশংসাপত্র পাঠ করেছিলেন। আমাদেরকে দেখে আনন্দ ও খুশিতে খোশ-আমদেদ বললেন। রাতে হোটেলে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শায়খ আহমদ কাফতারুর দরসে

হাজারো লোকের এক বড় মজলিসের দিকে অগ্রসর হলাম। লাউড স্পিকার শায়খ আহমদ কাফতারুর ধ্বনিকে দূরে পৌঁছে দিচ্ছে। আমরা মনোযোগসহকারে আলোচনা শোনতে থাকি। কিছুক্ষণ পর শায়খের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়ল। দূর থেকে দেখে আমাদেরকে চিনে ফেললেন। কাছে ডেকে নিলেন। এত দ্রুত চিনতে পারায় আমরা বিস্মিত হলাম। কারণ হজের পর তার সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাত হয়নি। আমাদের দামেশকে আসার সংবাদও তাকে কেউ দেয়নি।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর্যন্ত দরস চলে। আলোচ্যবিষয় ছিল সুরা বুরুজ। তবে আলোচনা হয়েছে ব্যাপক। মানবজীবনের সকল দিক।

দরসের পদ্ধতি ছিল অনেক চমৎকার। শুধু আয়াতের অনুবাদ বা ইলমি কোনো বিষয় আলোচনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন, এমন না। বরং আয়াতসমূহকে মানুষের জীবন ও সামাজিক বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেন। একে শ্রোতাদের বোধগম্যের ভিতরে নিয়ে আসেন। উপস্থিত লোকজনের সঙ্গে তিনি স্থানীয় ভাষায় কথা বলেন। তিনি দেশে বিরাজমান অনৈসলামি শিক্ষা, যুবসমাজের দীনবিমুখ দীক্ষা এবং ইসলামের ব্যাপারে তাদের অবহেলা সম্পর্কে সমালোচনা করেন। ফিলিস্তিন ট্রাজেডির কথা তুলে ধরেন। মুসলমানদের ভয়-ভীতির মানসিকতা উল্লেখ করে বলেন, তারা কাপুরুষতার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। আল্লাহ না করুন, ইহুদিরা যদি সিরিয়া ও দামেশক দখল করে নেয় এবং এই মিম্বরের উপর তাদের কোনো লোক এসে বসে তা হলে কী অবস্থা হবে!

নওজোয়ান ও মাদরাসার ছাত্রদের উল্লেখযোগ্য হারে উপস্থিতি দেখে আমি খুব আনন্দিত হই। দরস শেষে আমরা তার সঙ্গে মুসাফাহা করি।

শায়খ বলেন, আপনি কায়রোয় অনেকদিন কাটালেন। আমি বললাম, আমার মিসর সফরের বিষয়টি কি আপনি জানতেন? বললেন, হ্যাঁ, জানতাম। শায়খ উঠে চললেন। তার ডানে বামে ছিলাম আমরা। দুপাশে ছিল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীদের ভিড়। দৃশ্যটি খুব দৃষ্টিনন্দন। এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে বিগত যুগের ওলামায়ে কেরামের ইজ্জত-সম্মানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা শায়খের বাসা হাইয়ুল ইকরাদে যাই। সেখানে ইফতার এবং খাওয়াদাওয়া করে তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। তারপর বিদায় নিই। জনাব আবদুল আজিজ কেনানীকে নিয়ে হোটেলে ফিরে আসি। জনাব আবদুল আজিজ 'লাজাকিয়া'র বাসিন্দা। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে দামেশকে এসেছেন। হোটেলে এসে ঘুমের কোলে গাঁ এলিয়ে দিই। এশার পর চোখ খুলে জানতে পারি মুহম্মদ তাওফিক আলকুনজি এসেছিলেন। জাগিয়ে তোলা মুনাসিব মনে করেনটি। তাই চলে গেছেন।

শায়খ বাহজা আল বায়তার[১]

২৬ জুন ১৯৫১

মরক্কোর শায়খ তকিউদ্দীন হিলালী[২]র মুখে সর্বপ্রথম শায়খ মুহম্মদ বাহজা আল বায়তার দামেশকীর নাম শুনেছিলাম। কখনো কখনো দীনী ও ইলমি বিভিন্ন বই-পুস্তকে তার নাম দেখতে পেতাম। তাকে একজন বড় মাপের সুন্নতের অনুসারী আলেম হিসেবে জানতাম। পরে শোনলাম 'আল-মানারে'র সম্পাদক সাইয়েদ রশিদ রেজার ইনতেকালের পর এর পরিচালনার ভার শায়খ বাহজা আল বায়তারকে দেওয়া হয়েছে। অচিরেই 'তাফসিরুল মানারে'র পরিপূর্ণতার কাজও তিনি শুরু কর্বেন। মোটকথা

---

[১] ১৩১১ হিজরিতে দামেশকে তাঁর জন্ম। মুহম্মদ খিযির হুসাইন, মুহম্মদ রশিদ রেজাসহ তৎকালীন বড় বড় ব্যক্তিদের থেকে তিনি ইলম অর্জন করেন। ১৩৪৫ হিজরিতে মক্কায় আন্তর্জাতিক ইসলামি সম্মেলনে যোগদান করেন। তখন বাদশা আবদুল আজিজ তাকে 'সৌদি শিক্ষা ইনস্টিটিউট'র পরিচারক হিসাবে নিয়োগ দেন। ১৩৯৬ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

[২] আরবি ভাষাবিদ ও গবেষক আলেম। ১৩১১ হিজরিতে তার জন্ম। সাইয়েদ সুলায়মান নদবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় আরবি সাহিত্যের শিক্ষক হিসাবে তাশরিফ আনেন। ১৪০৭ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

শায়খ বাহজা আমাদের জানাশোনা ও নিকটের লোকদেরই একজন। আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে 'আলমানার' দেখতাম। পত্রিকাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এবং মাজমাউল ইলমি ও তার সদস্যদের সম্পর্কে আগেই আমার জানাশোনা ছিল। এই জন্য শায়খ মুহম্মদ নাসিফ যখন তার নামে পত্র লিখছিলেন তখন আমি বেশ খুশি হয়েছি।

দামেশকে আজ আমাদের দ্বিতীয় দিন। আমি চাচ্ছিলাম সর্বপ্রথম শায়খ বাহজা আল বায়তারের সঙ্গে দেখা করব। এই উদ্দেশ্যে আমরা 'ময়দানে ফাওকানী'র দিকে রওনা করলাম। মসজিদে দাক্কাক পৌঁছে জানতে পারলাম, শায়খ শহরে গিয়েছেন। আসার নির্দিষ্ট সময় কারো জানা নেই। আসরের পর তিনি মসজিদে দরস দেন। সেখানে আমরা আসরের নামাজ আদায় করে ফিরে আসি। শায়খ আহমদ কাফতারুর বাড়িতে যাই। তিনিও বাড়িতে নেই। তবে সেখানে আবদুল আজিজ কেনানীকে পেয়ে যাই।

শায়খ আবুল খায়ের মায়দানীর সাক্ষাত

জনাব আবদুল আজিজের পথপ্রদর্শনে আমরা 'জমিয়তে ওলামা'র চেয়ারম্যান শায়খ আবুল খায়ের মায়দানীর[৩] বাসায় যাওয়ার ইচ্ছা করি। আমাদের সঙ্গে মুফতি আমিন আলহোসাইনীর লেখা পত্র ছিল। আমরা তার বাড়িতে প্রবেশ করি। বাড়িটি প্রাচীন তুর্কি স্টাইলে নির্মিত। বাসায় গিয়ে জানতে পারলাম, তিনি নামাজ পড়ছেন। কিছুক্ষণ পর শায়খ বেরিয়ে এলেন। একজন গাম্ভীর্যপূর্ণ মানুষ। মুখে ঘন দাড়ি। নুরানি অবয়ব। চেহারায় ইখলাস ও তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি। তাকে মুফতি আমিন আলহোসাইনীর পত্র দিলাম। তিনি খুশির সাথে গ্রহণ করলেন। পাঁচমুখে মুফতি হোসাইনীর প্রশংসা করলেন। তার ইখলাস ও স্বতন্ত্র মেজাজের গুণ গাইলেন। কিছুক্ষণ তার কাছে বসলাম। তারপর তার সঙ্গে অচিরেই আরেকবার সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলাম। মেহমানের সম্মানার্থে তিনি হোটেলে আসার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলেন। আমরা তাকে বারণ করলাম। কারণ আমাদের কোনো সময় নির্ধারিত ছিল না। হতে পারে তিনি এলেন কিন্তু আমাদেরকে পেলেন না।

---

[৩] আবুল খায়ের মায়দানী দামেশকের একজন প্রবীণ শিক্ষক এবং সেদেশের অধিকাংশ শিক্ষকেরও শিক্ষক। তিনি ছিলেন ওলামায়ে সালাফের জীবন্ত নমুনা। নকশবন্দিয়া তরিকার একজন পীরও ছিলেন তিনি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে

আমরা 'সানজিকদারে' অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে যাই। ইখওয়ানের দামেশক শাখার প্রধান ড. মুসতফা সিবায়ী[১]'র নামে লেখা মুফতি আমিন আলহোসাইনীর পত্র ছিল। মুসতফা সিবায়ী সম্পর্কে অনেক কিছু শুনেছি। তার বহু লেখা পড়েছি। এসব থেকেই তার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ জন্মেছে।

আমরা কার্যালয়ে প্রবেশ করি। ড. সিবায়ীর সেক্রেটারি খালিদ হাসানের সঙ্গে দেখা করি। তাকে আমার নাম বলতেই খোশ-আমদেদ জানান। তারপর বললেন, আমি আপনার লেখা 'বিশ্ব কী হারালো' পড়েছি। লোকজনকে পড়তে উৎসাহিতও করেছি। তিনি আমার গ্রন্থ 'ইসলামের উত্থান-পতনের ইতিহাস'ও পড়েছেন। তিনি আরও বললেন, 'বিশ্ব কী হারালো'র নাম শুনে সন্দেহ ও ভয়ের সাথে এটি সংগ্রহ করি। না জানি এমন হয়ে যায় যে, গ্রন্থটির ভিতরের লেখা তার আজিমুশশান নামের সাথে কোনো মিল নেই। কারণ এই শেষ যুগে মুসলিমবিশ্বে লেখালেখির জগতে চরম অবক্ষয় চলছে। নামের মাধ্যমে অনেক ধোঁকা দেওয়া হয়। কিন্তু বইটি ক্রয় করার পর সন্দেহ নিরসন হল। শঙ্কা দূরীভূত হল। তারপর তিনি জানান বইটি এখন ড. মুসতফা সিবায়ী অধ্যয়ন করছেন। বইটির তিনি খুব প্রশংসা করেন। ইখওয়ান সদস্যদেরকে পড়ার পরামর্শ দেন। সত্য কথা হল বইটির লেখক হিসেবে এ আলোচনায় আমি দারুণ আনন্দিত হই। বিশেষ করে এ বিষয় জেনে আমার মন খুশিতে ভরে ওঠে যে, আমার আগেই আমার বই দামেশকে পৌঁছে গেছে। আহলে ইলম ও রুচিশীলরা একে অনেক গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহর করুণা ও মেহেরবানি। এ ধরনের বিষয় ভাঙাহৃদয়কে সান্ত্বনা দেয়। বিষণ্ণতাকে কমিয়ে আনে।

---

[১] সিরিয়ার হিমসে ১৯১৫ সালে তার জন্ম। ১৯৩৩ সালে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য মিসরে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে সিরিয়াতে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫০ সালে সিরিয়া ইউনিভার্সিটিতে আইন অনুষদের প্রফেসর নিযুক্ত হন। শেষ বয়সে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৮ বছর শয্যাশায়ী ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি ইন্তিকাল করেন। জামে উমুবীতে তার জানাজার নামাজ পাড়া হয়।

মসজিদে দাক্কাকে

আমরা শায়খ বাহজা আল বায়তারের নিকট গেলাম। তার দরসে অংশগ্রহণ করার জন্য মসজিদে দাক্কাক পৌঁছি। সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি এখনো আসেননি। তার শিষ্য শায়খ আবদুর রহমান তিবীর দরসে উপস্থিত হলাম। দরসের বিষয় ছিল 'সৎকাজের আদেশ প্রদান ও অসৎ কাজে বাধাদান'। এখানে শায়খ জায়নুল আবেদিন তিউনেসীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি 'জমিয়তে হিদায়াতুল ইসলামিয়া'র চেয়ারম্যান। মিসরস্থ সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ 'কিবারুল ওলামা'র সদস্য, সাবেক শায়খুল আজহার আল্লামা মুহম্মদ খিজির হোসাইনের ভাই।

আমরা মসজিদে থেকে শায়খ বায়তারের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা আমাদের থাকার জায়গা এখান থেকে বহুদূর। রোজা রেখে তাড়াতাড়ি আসা অনেক মুশকিল। আবদুহু মারাদিনী নামে একব্যক্তি আমাদেরকে তার ঘরে আরাম করতে আবেদন করেন এবং এখানে থেকে শায়খ বায়তারের জন্য অপেক্ষা করতে বলেন। শায়খ আবেদিন একে সমর্থন করেন। লোকটির ইখলাস ও উত্তম চরিত্রের প্রশংসা করে আমরা তার আবেদন মঞ্জুর করে নিই।

আমরা আলহাজ মুহম্মদ সাদেকের সঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করি। মুহম্মদ সাদেক আদালতের কোনো এক পদে চাকুরি করেন। আবদুহু মারাদিনী আমাদের জন্য ইফতার ও খানা তৈরীর কাজে লেগে যান। আমরা তাকে এর থেকে বিরত থাকতে বলি। তার কাছে বিদায়ের অনুমতি চাই। কিন্তু তিনি আমাদের 'না' শোনলেন না। ভিনদেশি মেহমানের আগমনে তার আনন্দ দেখে এবং সুন্দর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করি। তার ঘরেই ইফতার ও খানা খাই। নিরেট ইসলামি জজবা ও দীনী সম্পর্কের কারণে তার আপ্যায়ন গ্রহণ করি। কারণ এ লোক আমাদের ব্যাপারে তেমন কিছুই জানেন না। একজন মুসলমান মেহমানের ইকরাম ও মেহমানদারি ছাড়া তার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। ইকরামুল মুসলিমিন এবং আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার ভিত্তিতে ছিল এ মেহমানদারি। তিনি কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তিও ছিলেন না। নেতৃস্থানীয় কোনো লোকও না। তার খাবারের মধ্যে অনেক স্বাদ অনুভব হয়। সময়টাও ছিল রোজার। আমরাও ছিলাম খুব ক্লান্ত।

সিরিয়ার পার্লামেন্টে

আমরা তার ঘর থেকে বের হলাম। জানতে পারলাম শায়খ বায়তার এখনো আসেননি। ঘটনাক্রমে রাস্তায় কয়েকজন বন্ধুসহ জনাব তাওফিক আলকুনজির সাথে সাক্ষাত হয়। তারা আমাদেরকে বললেন, আপনাদেরকে পার্লামেন্ট অধিবেশন দেখানোর জন্য দুটো পাশ নিয়েছি। এই সংবাদে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হই। কারণ আমরা আরবদেশের কোনো পার্লামেন্ট অধিবেশনে এখনো অংশগ্রহণ করিনি। আরবিভাষায় সংসদীয় বিতর্ক কখনও শুনিনি। আমি চাচ্ছিলাম সাংবিধানিক বিতর্কের জন্য আরবিভাষার যোগ্যতা ও প্রশস্ততা অনুমান করব। দেখব আরবি ভাষাভাষী লোকজন এ জগতে কতটুকু সফল। যদিও পূর্ব থেকে আমার বিশ্বাস রয়েছে আরবিভাষা অনেক ব্যাপক। তার সুযোগ-সুবিধা অনেক। প্রত্যেক নতুন ও পুরনোকে প্রকাশ করার দক্ষতা এতে বিদ্যমান। এরপরও আমি চাচ্ছিলাম বাস্তব ক্ষেত্র সরাসরি প্রত্যক্ষ করব। জনাব কুনজির এ সিদ্ধান্ত ছিল আমার মনোবাসনা এবং হৃদয়আকাশে লুক্কায়িত আগ্রহের পূর্ণ প্রতিফলন।

গাড়িতে কয়েকজন যুবকের সাথে পরিচয় হয়। তাদেরকে আমার কিছু বই হাদিয়া দিই। তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে হাদিয়া গ্রহণ করে। আহমদ জানাবীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। তিনি ‘উসুলুদ্দীন অনুষদ’ থেকে সদ্য লেখাপড়া সমাপ্ত করেছেন। শিক্ষাদানের পদ্ধতি নিয়ে তিনি পিএইচ,ডি করেছেন। এখন ফুরাতের একটি মাধ্যমিক স্কুলের দীনিয়াতের শিক্ষক। তিনি বললেন, আমি আপনার পুস্তিকা ‘শোন হে মিসর’ পড়েছি। আমার বন্ধুদেরকেও বারবার পড়িয়েছি।

দাওহাতুল আদাবে

একটি ঘটনা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। আমি যখন দামেশকে পৌঁছুই তখন সেখানকার দীনী মহলগুলোতে একটি ঘটনা তোলপাড় সৃষ্ট করে। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে এটিই প্রধান আলোচ্যবিষয় হয়ে দাঁড়ায়। ঘটনাটি হল ‘দাওহাতুল আদাব মাদরাসা’ কর্তৃপক্ষ ‘আলে আজম মিলনায়তনে’ একটি অনুষ্ঠান করে। সেখানে শহরের নেতৃস্থানীয় ও ধনিকশ্রেণীর লোকজন অংশগ্রহণ করে। সেনাবাহিনীর লোকেরাও আসে। মেয়েরাও

অনেকে উপস্থিত হয়। তবে তাদের কারো হিজাব ছিল না। অনুষ্ঠানটিতে কুচরিত্র ও নির্লজ্জতার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নৃত্য পরিবেশন করা হয়। মিসরে অবশ্য এ ধরনের অনুষ্ঠান আরও বেশি দেখা যায়।

সিরিয়াবাসী তাদের দীনী রঙ ও ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে এ অনুষ্ঠানটি বরদাশত করতে পারে নি। ইসলামি সম্ভ্রমবোধ ও দীনী চেতনা লালনকারীরা বরাবর এর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন।

এদিকে প্রফেসর আলি তানতাবি সিরিয়া ইউনিভার্সিটির মসজিদে জুমার খুতবা দেওয়ার সময় এ বিষয়ে আলোচনা করেন। সরকারের কঠিন সমালোচনা করেন। রেডিও তার খুতবা সরাসরি সম্প্রচার করে। ফলে তার আলোচনা-সমালোচনা ইথার তরঙ্গে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায়। সরকার তার সমালোচনার ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে। এবং তাকে শক্তভাবে জেরা করে। তার নামে আদালতে মামলা দায়ের করে। রেডিওর ইনচার্জকে বরখাস্ত করে। এসব কারণে ঘটনাটি শহরে আলোচনার শীর্ষে চলে আসে। সাংবাদিকরা শায়খ আলি তানতাবিকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে। তার সমালোচনা ও কুৎসা রটাতে থাকে।

বিভিন্ন ইসলামি সংগঠনের প্রধান, আলেম-ওলামা ও দীনদার লোকেরা আলি তানতাবির কথার সাথে একমত পোষণ করেন। তারা শায়খ তানতাবির বিরুদ্ধে সব অপপ্রচারের জবাব দেন।

কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি নিয়ে আজ সংসদে আলোচনা হবে। লোকজনের ধারণা সংসদ আজ উত্তপ্ত থাকবে। জোরালো বিতর্ক হবে। বিভিন্ন ইসলামি সংগঠন, বিশেষ করে ইখওয়ানের ইচ্ছা হল ঘটনাটির ব্যাপারে জনগণের অসন্তোষ এবং আলি তানতাবির সঙ্গে তাদের একাত্মতা প্রকাশ পাক। এ জন্য দীনদার লোকেরা চেষ্টা চালায় যাতে দর্শকগ্যালারিতে ওলামায়ে কেরাম ও দীনদার মানুষের উপস্থিতি বেশি হয়। এতে পার্লামেন্ট সদস্যদের সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির পরিমাণ কিছুটা হলেও অনুমান হবে। তা ছাড়া জনগণের সমর্থনে তারা নির্বাচিত হয়। তাই জনমত ডিঙিয়ে কিছু করা তারা পছন্দ করবে না। কারণ নীতি-নৈতিকতার ক্ষেত্রে জনসাধারণের মতামতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অধিবেশনে শায়খ বাহজাসহ বহুআলেম তাশরিফ আনেন। আমরা দূর থেকে একে অপরের সঙ্গে সালাম বিনিময় করি।

একটি চমৎকার প্রাসাদে অধিবেশন শুরু হল। প্রাসাদটি পশ্চিমা স্টাইলে নির্মিত। ড. মারুফ দুয়ালিবী[১] সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। আলোচনার একপর্যায়ে ওই বিষয়টি উত্থাপিত হল। সকলে একটু নড়েচড়ে গর্দান উঁচু করে বসলেন। কান সবার খাড়া।

প্রফেসর মোবারকের ভাষণ

দামেশকের সংসদসদস্য প্রফেসর মুহম্মদ মোবারক অগ্রসর হলেন। তিনি 'জমিয়তে ইশতিরাকিয়্যাতুল ইসলামিয়া'র সদস্য। এ সংস্থার প্রধান ড. মুসতফা সিবায়ী। মুহম্মদ মোবারক দলিল-প্রমাণের আলোকে সারগর্ভ আলোচনা করলেন। তার ভাষণ ছিল সংসদীয় ভাষায়। সাহিত্য ও ইলমি আন্দাজে। আলোচনার বিষয় ছিল 'মানবজীবনে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব'। এতে জাহেলি কৃষ্টি-কালচার বর্জন করে ইসলামি সভ্যতা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন এবং তা গ্রহণ করতে সকলকে আহ্বান জানান। আরব দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদের যেসব হুমকির মুখোমুখি তা বর্ণনা করেন। প্রতিটি জিনিসের মোকাবেলায় সবাইকে এমনভাবে প্রস্তুত হতে আহ্বান করেন, যা তাদের পূর্বের অবিভাজ্য শৌর্য-বীর্য ও বাহাদুরিকে জাগিয়ে তুলবে। তার আলোচনা সবাই মনোযোগ ও গুরুত্বের সাথে শোনেন।

তার পর ড. মুসতফা সিবায়ী উঠে দাঁড়ান। তিনি সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাটি উল্লেখ করে যথোচিত ভাষণ দেন। সরকারের পক্ষ থেকে তার ভাষণের প্রতিবাদ হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। বিরোধীরা অধিক সংখ্যক আলেম-ওলামা ও দীনদার লোকের উপস্থিতি দেখে নিশ্চুপ হয়ে যায়। জনগণের ক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং শায়খ আলি তানতাবির সমর্থকদের ব্যাপারে তারা নীরবতা অবলম্বন করে।

---

[১] ড. মারুফ দুয়ালিবী সিরিয়ার একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতি ছিলেন। আলেপ্পো ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি শরিয়াহ বিভাগে অনার্স-মাস্টার্স করেন। কর্মজীবনের প্রথম দিকে তিনি দামেশক ইউনিভার্সিটির আইন অনুষদের অধ্যাপক ছিলেন। সিরিয়ার পার্লামেন্টে তিনি কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে তিনি সৌদিআরবের রিয়াদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বাদশা ফয়সাল রহ. তাকে আইন ও রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা নির্বাচিত করেন। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আলমাদখাল ইলা উসুলিল ফিকহি' [المدخل إلى أصـول الفقـه] দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য।

স্পিকার অত্যন্ত হুশিয়ার। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারেন। উত্তেজনাকর পরিবেশকে অল্পতেই শান্ত করে ফেলেন। সরকারকে আরও নম্রতা ও হিকমতের সাথে কাজ করার পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে অধিবেশন কয়েক দিন মুলতবি রেখে এ বিষয়ে আরও আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য সময় নির্ধারণের পরামর্শ দেন।

সংসদীয় বিতর্কে আরবিভাষায় সাংসদদের বাগ্মিতা

আমি দেখলাম সংসদসদস্য বিতর্ক ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষ। ভাষাও সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সাহিত্যময়। যেসব সংসদসদস্য ইংরেজিতে আলোচনা করলেন তাঁদের চেয়ে আরবিতে বক্তৃতা দানকারীরা কোনো অংশে কম না। আমি আমাদের দেশের কয়েকটি নীতিনির্ধারণী সভায় অংশগ্রহণ করেছি। সেসবের তুলনায় এ অধিবেশন অনেক প্রশংসার দাবি রাখে। এখানে আরবিভাষা তার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। সদস্যরাও তাদের সংসদীয় বাগ্মিতা ও দক্ষতার জানান দিয়েছেন।

স্পিকারের আলোচনা এবং প্রধানমন্ত্রী খালিদ আজমের উত্তর আমার দারুণ পছন্দ হয়েছে। উত্তরগুলো ছিল নিপুণ, নিখুঁত, নিঃসন্দেহে এটা তার গাম্ভীর্য, প্রখর মেধা ও যোগ্যতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। সাহিত্যময় ভাষাপ্রয়োগ ও আঞ্চলিকতা পরিহার করার ক্ষেত্রে সিরিয়ার সংসদসদস্যরা মিসরীয়দের চেয়ে অগ্রগামী। যদিও মিসরের কোনো পার্লামেন্ট অধিবেশনে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি। তবে এটা আমার ধারণা।

অধিবেশন শেষ হওয়ার আগেই আমরা পার্লামেন্ট থেকে বের হয়ে আসি। গেইটে সিরিয়ার একদল যুবকের সাথে সাক্ষাত হয়। তাদের অধিকাংশই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মী ও সদস্য। তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় 'বিশ্ব কী হারালো'র মাধ্যমে। অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এ বইটি সম্পর্কে অবগত। সেখানে সাইয়েদ আবদুর রহমান আলবানীর সঙ্গেও পরিচয় হয়। তিনি দামেশকের ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের শিক্ষক। আজহার ও কায়রো ইউনিভার্সিটিতে তিনি পড়াশোনা করেছেন। আধুনিক ও ইসলামি শিক্ষা দুটোয় তিনি সমান পারদর্শী। আবদুন নাফে সিবায়ী তার নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের একটি বড় ধরনের সফলতা। দামেশকে আমার গ্রন্থ 'বিশ্ব কী হারালো' অধ্যয়নের জন্য লোকজনকে তিনিই সর্বপ্রথম দাওয়াত দেন।

দামেশকের আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাত

আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই। পথিমধ্যে বাহ্‌জা আল বায়তারের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। তার সঙ্গে দামেশকের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় আলেম উপস্থিত ছিলেন। 'দিরাসাতুল ইসলামিয়া'র প্রধান শায়খ মুহম্মদ আহমদ দাহমান, ড. আবুল য়ুস্‌র আবেদিন ও শায়খ মুহম্মদ সায়িদ বোরহানী ছিলেন। ড. আবুল য়ুস্‌র আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ.[1] এর বংশধর। শায়খ বায়তার আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি বলেন, শায়খ মুহম্মদ নাসিফ আমার কাছে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, আপনি অতিসত্বর মিসর সফর করবেন এবং তিনি আমার নিকট পৌঁছানোর জন্য আপনার মাধ্যমে একটি কিতাব পাঠাবেন। আমি অনেক দিন ধরে আপনার অপেক্ষা করছি।

আমি তাকে কিতাবটি দিলাম। মুহম্মদ আহমদ দাহমান আমাদেরকে তার ঘরে কিছুক্ষণ বসার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা দাওয়াত মঞ্জুর করে নিই। উপস্থিত সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ তার ঘরে গিয়ে বসি। তারপর এ কথা বলে উঠে আসি যে, আগামীকাল শায়খ বায়তারের সঙ্গে তার ঘরেই সাক্ষাত করব।

শায়খ বায়তারের ঘরে

২৭ জুন ১৯৫১

হোটেলে আবদুর রহমান আলবানী ও শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী[2] আসেন। তারা আলবেনিয়ার মূল বাসিন্দা। শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদিস ও সুন্নাহর নিরলস খেদমত করে যাচ্ছেন। আমরা ভারতবর্ষে ইলমে

---

[1] মুহম্মদ আমিন ইবনে আবেদিন রহ.। মুহম্মদ আমিন রহ. হানাফিদের ফাতাওয়া জগতের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ দুররে মুখতারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রদদে মুহতারের [যা ফাতাওয়ায়ে শামী নামে সর্বমহলে পরিচিত] রচয়িতা। পাঁচ খণ্ডে তার এই কিতাব ফিকহে হানাফির উপর লেখা সবচেয়ে বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থ। ১১৯৮ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১২৫২ হিজরিতে তিনি ইনতেকাল করেন।

[2] ১৯১৪ সালে আলবেনিয়ায় তাঁর জন্ম। হাদিসশাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান অতুলনীয়। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিলসিলাতুল আহাদিস আস্ সহীহা' ও 'সিলসিলাতুল আহাদিস আজ্ জয়ীফা'। অসাধারণ ইসলামি জ্ঞানের কারণে ১৯৯৯ সালে তিনি আন্তর্জাতিক বাদশা ফয়সাল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হন। এ বছরেই তিনি ইনতেকাল করেন।

হাদিস এবং এ বিষয়ে লেখা বিভিন্ন কিতাব নিয়ে আলোচনা করি। তারপর আমরা শায়খ বায়তারের বাসায় যাই। তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করি।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে আলোচনা হয়। শায়খ বায়তার তাঁর কিতাবাদি ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। ইবনে তাইমিয়ার উপর যেসব অপবাদ আরোপ করা হয় তিনি সংক্ষেপে তার আলোচনা করেন। বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে সেগুলো ভুল প্রমাণ করেন। ইবনে বতুতার সফরনামায় তার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার জবাব দেন। যেমন- তিনি দামেশকের উমুবী জামে মসজিদে তাকে খুতবা দিতে দেখেছেন। খুতবার পর মিম্বরের সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় তাকে এ কথাও বলতে শুনেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা এভাবে অবতরণ করেন'।

শায়খ বায়তার প্রমাণ করেন দামেশকে ইবনে তাইমিয়ার সঙ্গে ইবনে বতুতার সাক্ষাতই হয়নি। কারণ ইবনে বতুতা ৭২৬ হিজরি সনের রমজান মাসে দামেশকে আসেন। এ বছরই শাবান মাসে ইবনে তাইমিয়া কারারুদ্ধ হন। তা ছাড়া তিনি উমুবী জামে মসজিদের খতিব কখনোই ছিলেন না। তার সময় এ মসজিদের খতিব ছিলেন শায়খ জালালুদ্দীন কাজবিনী[৩]। এ হিসেবে বলা যায় ইবনে বতুতার এ কথা সম্পূর্ণ ধারণাপ্রসূত। বিষয়টির সমর্থন এদ্দ্বারাও হয় যে, তিনি এ সফরনামা নিজে লেখেননি। বরং অন্যকে দিয়ে লিখিয়েছেন।

আল্লামা জাহেদ কাউসারীর এ কথায় তিনি আশ্চর্য হন, 'ইবনে তাইমিয়ার কঠোরতার কারণে আমির খারবান্দাহ শিয়া হয়ে গেছেন।' ঘটনাটির প্রেক্ষাপট হল খারবান্দাহ তার স্ত্রীকে তিন তালাক দেন। তারপর

---

[৩] হিজরি সপ্তম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইলমি ব্যক্তিত্ব। তাঁর মূল নাম মুহম্মদ। ৬৬৬ হিজরিতে ইরাকের মোসেলে তাঁর জন্ম। মাত্র বিশ বছর বয়সে রুমের কোন এক অঞ্চলের বিচারকের পদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন পর সেখান থেকে দামেশকে চলে আসেন। দামেশকের জামে মসজিদে তাকে খতিব হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তালখিসুল মিফতাহ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ৭৩৫ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু।

তিনি লজ্জিত হয়ে আলেমদের নিকট এ সম্পর্কে ফতোয়া চান। সকলে ফতোয়া দেন এটা 'তালাকে মুগাল্লাজা'। এদ্দ্বারা আপনার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবেন না। ঘর করতে চাইলে অন্য স্বামীর ঘর তার করে আসতে হবে।

তখন আমির খারবান্দাহ প্রসিদ্ধ শিয়া ইবনে মুতাহহির হিল্লি[১]'র নিকট যান। তিনি ফতোয়া দেন এক তালাক পড়েছে। তাকে বিবাহ করা ছাড়াই ফিরিয়ে আনা যাবে। আমি একে হাদিস দিয়ে প্রমাণ করতে পারব। আমির খারবান্দাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তা হলে 'আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতে'র আলেমদের সাথে মুনাজারা করতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত আছি।

আমির খারবান্দাহ আহলে সুন্নতের আলেমদেরকে একত্র করলেন। ইবনে মুতাহহির হিল্লি তাদের সাথে মুনাজারা করে তাদেরকে হারিয়ে দিলেন। এটা দেখে আমির খারবান্দাহ শিয়া হয়ে যান। বলুন এখানে ইবনে তাইমিয়ার কী ভুল হয়েছে? এ দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমরা উভয়ে একমত থাকি যে, ইবনে তাইমিয়ার কিতাবসমূহ এখনো ইলমে দীনের অনেক বড় জ্ঞানভাণ্ডার। জামানার অগ্রগতি ও জ্ঞানের উৎকর্ষ সত্ত্বেও তা সময় ও আধুনিকতার সাথে সমানতালে চলতে সক্ষম। বর্তমান যুগের বহুজ্ঞানীকে খামুশ করার যোগ্যতা তার রয়েছে। এ সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার মূলকথা হল তিনি ইসলামের মূলনীতিসমূহ ভালো করে বুঝেছেন। এগুলোকেই নিজের আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছেন।

শায়খ বায়তার বললেন, আজহারের কিছু আলেম আমাকে শুনিয়েছেন, তারা যখন একত্ববাদ সম্পর্কে আজহারের কুতুবখানায় বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন শুরু করেন তখন তাদের মনে এ ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। তারা আশংকায় পড়ে যান যে, না জানি আবার ইসলামকে অস্বীকার করে বসেন। কিন্তু ভাগ্যগুণে এ সন্দেহ থেকে তারা মুক্তি পেয়েছেন। ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন কিতাব নিয়ে যখন পড়া শুরু করেছে তখন নতুনভাবে

---

[১] বিশিষ্ট শিয়া ইমাম। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকে তার জন্ম। বিভিন্ন বিষয়ে রচিত তার অনেক কিতাব রয়েছে। ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যু।

তাদের অন্তরে ইসলাম বদ্ধমূল হয়। সন্দেহের নিরসন ঘটে। পুরোপুরিভাবে একত্ববাদের বিশ্বাস জন্মে।

আমি তাকে বললাম, যারা ইসলাম নিয়ে অধ্যয়ন করে তাদের প্রথম ধাপেই মনে হবে দীন বোঝার ক্ষেত্রে মুতাজিলারা সবচেয়ে বেশি সূক্ষ্ম ও প্রখর মেধার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু গভীরে তলিয়ে দেখলে মনে হবে ইসলাম সম্পর্কে আকলের প্রথম স্তরে রয়েছে তারা। তাদের চিন্তা-চেতনা কাচা। অপরিপক্ব। এর ব্যতিক্রম হল মুহাদ্দিসগণ। ইলমে হাদিসে তারা অনেক পারদর্শি ছিলেন। হক পর্যন্ত পৌঁছার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন তারাই। মুতাজিলাদের মোকাবেলায় তাদের মতামত আকলের অনেক নিকটবর্তী ছিল। তাদের আলোচনা সহজেই যুক্তিতে ধরত।

ড. আহমদ আমিনকে আমি স্পষ্টভাবে বলেছি, আপনার ‘ফজরুল ইসলাম’ ও ‘দুহাল ইসলাম’ মুতাজিলিদেরকে তাদের মাকাম থেকে অনেক উপরে উঠিয়ে ফেলেছেন। আমার কথা শুনে শায়খ বায়তার বললেন, তিনি যখন দামেশকে আসেন তখন আমি জিজ্ঞেস করেছি, আপনার পর্যবেক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন ইসলামি দল ও ফেরকার মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বেশি হকের উপর রয়েছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি জবাব দিলেন, মুতাজিলা। আমি বললাম, ইসলামি সালতানাতে দীর্ঘদিন মুতাজিলাদেরকে সবধরনের রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়। এ ছাড়া তাদের চিন্তা-চেতনা এবং আকলনির্ভর বিভিন্ন মতাদর্শ ও খেয়ালের জয়জয়কারও ছিল তখন। একপর্যায়ে ইউরোপেও আকলনির্ভর দর্শনের চর্চা শুরু হয়। কিছু নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানও সেখানে গড়ে ওঠে। তবে তারা শুধু আকলের উপর নির্ভর করার প্রবক্তা ছিল না। ফলে তাদের কারণে শুধু আকলের মর্যাদা হ্রাস পায়। এ কারণে ইতেজাল [মুতাজিলা মতবাদ] তার প্রভাব ও স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে। এর উদ্যম ও তৎপরতা কমে যায়।

দামেশকে ফরাসি সরকারের স্মৃতিচিহ্ন

গতকালের নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আরবি অ্যাকাডেমি দেখতে বের হই। গাড়িতে চড়ে বসি। কিছুক্ষণ চলার পর দামেশকের একটি বাজারের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকি। তারপর একটি রাস্তায় গিয়ে উঠি। রাস্তাটির নাম হারিক। এটি একটি গ্রামের উপর দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। শায়খ

বায়তার আমাদের জানিয়েছেন, এ গ্রামটি অনেক শানদার ছিল। মনকাড়া ছিল। দামেশকের আমির-ওমারা ও কোতালি খান্দানের এটি বসতভিটা। কিন্তু গ্রামটি দেখে জালেম ফরাসিদের চক্ষুশূল হয়। তারা একে আক্রমণ ও গুলির নিশানা বানায়। বহুজায়গায় আগুন লাগিয়ে দেয়। বহুজনপদ ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। মহল্লাবাসীকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। ফরাসিরা পুরুষ-মহিলা, ছোট-বড় কারো মাঝে পার্থক্য করত না। সকলের উপর নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালাত। তারা একেবারে হিংস্র জংলী। দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিকে তারা শত বছর পিছিয়ে দিয়েছে। এ কারণে সেখানকার নতুন আবাসন প্রকল্পগুলোতে ফ্রান্সের বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রতিনিধিত্বকারী কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি।

আরবি অ্যাকাডেমিতে

আমরা আরবি অ্যাকাডেমিতে যাই। সেখানে প্রতিষ্ঠানটির ডেপুটি চেয়ারম্যান প্রফেসর শায়খ আবদুল কাদির মাগরিবী ও প্রফেসর খলিল মরদম বেগের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। ছাত্র বয়সেই তাদের উভয়ের বিভিন্ন লেখা ও বই-পুস্তক পড়েছি। সেই সুবাদে অনেক আগে থেকেই তাদের সম্পর্কে আমার জানাশোনা ছিল। আমাদের দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামার ছাত্রসংগঠন 'আলইসলাহ' তাদের কিতাবের গ্রাহক ছিল। তাদের সাথে ভারতের মুসলমানদের সম্পর্কে আলোচনা করি।

অ্যাকাডেমির লাইব্রেরির জন্য আমার মরহুম পিতা মাওলানা আবদুল হাইয়ের কিতাব 'নুজহাতুল খাওয়াতির'র প্রথম খণ্ড হাদিয়া দিই। লাইব্রেরিতে প্রবেশ করে দেখি আবুল আলা মুরির মূর্তি। আশ্চর্য হলাম। আমাদের আরব ভাইদের উপর পুনরায় মূর্তিপ্রীতি সাওয়ার হয়েছে। ইতিহাস ও স্মরণীয় বস্তু হিসেবে তা আবার আবির্ভূত হয়েছে।

জহিরিয়া গ্রন্থাগার

অ্যাকাডেমির অফিস 'মাদরাসা আদিলিয়া আলকুবরা'র ভবনে। ভবনটি মজবুত শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড়িয়ে। অ্যাকাডেমির জন্য এ ভবনটি নির্বাচন মানানসই হয়েছে। মাদরাসাটিকে আদিলিয়া বলা হয়। সুলতান সালাহুদ্দীন রহ. এর পুত্র সুলতান আদিলের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। মাদরাসার যেই অংশে লাইব্রেরি সেখানেই তার সমাধি। এই

মাদরাসায় বসে কাজি ইবনে খাল্লিকান[১] তার প্রসিদ্ধ কিতাব 'ওয়াফাইয়াতুল আ'য়ান' [وفيات الأعيان] লিপিবদ্ধ করেছেন।

ইবনে মালেক নাহবী এইখানে দাঁড়িয়ে লোকজনকে তার দরসে বসার জন্য ডাকতেন। তিনি বলতেন, কেউ আছে কি কিছু শিখবে! কেউ আছে কি যে উপকৃত হবে! ইবনে খালদুনও[২] এ মাদরাসায় এসেছেন।

মাদরাসাভবনের সামনে জহিরিয়া গ্রন্থাগারের ভবন। সুলতান জহির বিবারাসের নামে লাইব্রেরিটির নামকরণ করা হয়েছে। এ বিল্ডিংয়েই তিনি সমাহিত। দামেশকের সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি এটি। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া, হাফেজ ইবনে আসাকির[৩] দামেশকী, ইমাম জাহাবীসহ বড় বড় লেখকদের বহুপাণ্ডুলিপি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। কিন্তু সেসবের মধ্যে এ গ্রন্থাগারটিই সবার উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে।

গ্রন্থাগারের দুর্লভ কিতাবাদি

গ্রন্থাগারে যেসব দুষ্প্রাপ্য কিতাব রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, আস-সুনান সংকলক ইমাম আবুদাউদ সিজিসতানীর[৪] কিতাব 'মাসায়েলে ইমাম আহমদ'। কিতাবটির রচনাকাল ২৬৫ হিজরি। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য

---

[১] ইবনে খাল্লিকান বিশিষ্ট ফকিহ আলেম, কবি ও ইতিহাসবিদ। সাহিত্য ও রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি দুইবার দামেশকের বিচারক নিয়োজত হন। পরবর্তীকালে বিচারকার্য ছেড়ে কায়রো গিয়ে ফাতাওয়া ও শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করে জগদ্বাসীকে ঋণী করেছেন। তাঁর জন্ম ৬০৮ হিজরিতে ইনতেকাল ৬৮১ হিজরি।

[২] ইবনে খালদুন রহ.। বিশ্বনন্দিত ইসলামি ব্যক্তিত্ব। সারা জীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজে ব্যয় করেন। দীর্ঘদিন আলআজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মালেকী মাযহাবের উপর অধ্যাপনা করেন। তাঁর রচিত 'মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন' ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নসম্পদ। তিনি ৭৩২ হিজরির ২ রমজান মরক্কো জন্মগ্রহণ করেন। ৮০৮ হিজরির ২৬ রমজান ইনতেকাল করেন।

[৩] বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। ১১০৫ সালে দামেশকে তার জন্ম। 'তারিখে দামেশক' তাঁর জগতবিখ্যাত গ্রন্থ। মৃত্যু ১১৭৭ খ্রিস্ট সালে।

[৪] ইমাম আবু দাউদ রহ.। সুলায়মান ইবনে আসআস সিজিস্তানী। ইমাম আবু দাউদ সিজিস্তানী নামে সুপ্রসিদ্ধ। ২০২ হিজরি সনে খোরাসানের অন্তর্গত সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। সিহাহ সিত্তার অন্যতম হাদিসগ্রন্থ আবু দাউদ শরিফ তাঁর অমরকীর্তি। রাবিদের নাম, উপনাম, বংশ, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি আলাদা করে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আবু দাউদ শরিফ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জারাহ-তাদিল বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ২৭৫ হিজরির ১৫/১৬ শাওয়াল তিনি ইনতেকাল করেন।

কিতাব হল 'আলকাওয়াকিবুদ দুরারি'[১]। কিতাবটির নাম দেখে যা-ই বোঝা যাক না কেন, মূলত এটি একটি ইসলামি বিশ্বকোষ। ১২০ খণ্ডের এক বিশাল গ্রন্থ। এখানে শুধু ৪৪ খণ্ড সংরক্ষিত আছে। তাও আবার এক জায়গায় নেই। এখান থেকে কিছু কিছু লেখা ভিন্ন ভিন্ন বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন- কিতাবুল ওয়াসিলা, সুরা নাস ও সুরা ফালাকের তাফসির, সুরা ইখলাস ও সুরা নুরসহ বিভিন্ন সুরার তাফসির। ভবনের দ্বিতীয় তলায় রয়েছে প্রশস্ত রিডিংরুম। আমরা গ্রন্থাগারের পরিচালকের সঙ্গে দেখা করি। তিনি অত্যন্ত শিক্ষিত ও মার্জিত রুচির অধিকারী। বিভিন্ন ইলমি স্মৃতির প্রতি তার গভীর মনোযোগ রয়েছে।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সমাধির পাশে

আমরা 'জহিরিয়া গ্রন্থাগার' থেকে বেরিয়ে উমুবী জামে মসজিদের দিকে রওনা করি। মসজিদে যাওয়ার পূর্বে ইসলাম ও মুসলমানের অহঙ্কার, দীন ও মিল্লাতের ঝাণ্ডা উড্ডয়নকারী গাজি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সমাধির পাশে যাই। তিনি মুসলিম উম্মাহর ইজ্জত রক্ষা করেছেন। ইসলামের শির সমুন্নত করেছেন। ক্রুসেডারদের আক্রমণ ও অগ্রযাত্রা প্রতিহত করেছেন। তাদের শক্তি ও শৌর্য-বীর্য চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছেন।

আমরা কিছুক্ষণ কবরস্থানের গেইটে দাঁড়াই। তার বিভিন্ন স্মৃতি ও মহান খেদমতের কথা সবিনয়ে স্মরণ করি। পৃথিবীতে তার এসব খেদমত চিরদিন বাকি থাকবে। হিত্তিনের যুদ্ধের কথাও স্মরণ করি। এ যুদ্ধেও ক্রুসেডাররা চরমভাবে পরাজিত হয়। তাদের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এটি ইসলামের এমন এক মহান বিজয়, যা বিগত বহুবিজয়কে বিস্মৃত করে দেয়। এর সামনে অন্যান্য বিজয় উল্লেখ করার অযোগ্য। তখন আমি মুরদা ফিলিস্তিন ও তার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে জারকালীর এ পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করি- 'আমাদের মাঝে সালাহুদ্দীনকে আবার পাঠান। নতুন করে হিত্তিন কিংবা এ জাতীয় যুদ্ধ সংঘটিত করুন।'

---

[১] কিতাবটির পুরো নাম الكواكب الدراري في ترتيب مسند الامام احمد على ابواب البخاري

আমি জীবনের শুরু থেকেই সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী[২] ও সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে সম্মান করতাম। মূল্যায়ন করতাম। তাদের ব্যাপারে অন্তরে এমন বিশ্বাস রাখতাম, যা অন্য কোনো মুসলিম বাদশা সম্পর্কে ছিল না। আমি তাদের উভয়কে ভালবাসা এবং তাদের জন্য দোয়া করাকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করি।

আমরা সেই মহান মুজাহিদের কবর জিয়ারত করি, যিনি মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুসরতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তার রুহকে সন্তুষ্ট করেছেন। দীনের পক্ষে শত্রুর মোকাবেলায় নিজের উদ্যম ও যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ইসলামের ইজ্জত রক্ষা করেছেন। বায়তুল মুকাদ্দাসকে হেফাজত করেছেন। মুসলিম উম্মাহর সম্মান ও স্বাধীনতা টিকিয়ে রেখেছেন। আমরা তার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করি।

আমার বন্ধুরা আমাকে জানাল- ফরাসি জেনারেল গৌরু সিরিয়া বিজয় করে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কবরের সামনে আসে। কবরে আঘাত করে বলে, 'সালাহুদ্দীন, আর কতদিন ঘুমাবে? দেখো আমরা এসে পড়েছি। আমরা সিরিয়া বিজয় করে ফেলেছি'। এটা ফরাসিদের আক্রোশ ও ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। ইউরোপিয়ানদের ঔদ্ধত্য ও আত্মম্ভীরতা বৈ কিছু না। তারা এর প্রকাশ করল কবরের পাশে দাঁড়িয়ে। মুরদাকে মেরে বাহাদুর সাজার মত অবস্থা। 'একজন জীবিত মানুষ হাজারো মৃতের উপর বিজয়ী হতে পারে।' তারাও তাই করেছে। সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আজ জীবিত থাকলে দেখিয়ে দিতেন।

নাসর গম্বুজ

এখান থেকে আমরা উমুবী জামে মসজিদ অভিমুখে রওনা করি। সেখানে গিয়ে জোহরের নামাজ আদায় করি। নাসর গম্বুজের নিচ দিয়ে

---

[২] নুরুদ্দীন জঙ্গী ইসলামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বীর মুজাহিদ, বিচক্ষণ সমরকুশলী ও সফল রাষ্ট্রনায়ক। তিনি সত্য, ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদিনের জামানার পুনরাবৃত্তি করেছেন। তার পুরোটা জীবন জিহাদে কেটেছে। তিনি এবং তার প্রধান সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর সমর পরিচালনা হয়েছিল পশ্চিমা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে। নুরুদ্দীন জঙ্গি মুসলমানদের মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি করে ইউরোপের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। নুরুদ্দীন জঙ্গির বিজয়গাথা কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনার জন্য আলাদা গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন। তাঁর জন্ম ৫১১ হিজরি মোতাবেক ১১১৮ খ্রিস্টাব্দে। ১১৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন।

অতিক্রমের সময় শায়খ বাহজা আল বায়তার বললেন, এ দেশের রীতি হল এই গম্বুজের নিচে দামেশকের সবচেয়ে বড় আলেম দরস দিবেন। দামেশকের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সাইয়েদ বদরুদ্দীন হাসানী রহ.[১] এ গম্বুজের পাশে দরস দিতেন। নিচে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে লোকজন সাহসী হয়ে ওঠে। পূর্বের নিয়ম ভেঙ্গে এর নিচে দরস দিতে শুরু করে।

আমরা উমুবী জামে মসজিদ থেকে বের হই। পথিমধ্যে আমরা 'মাদরাসা দারুল হাদিস' দেখতে পাই। এখানে ইমাম নববী রহ.[২] দরস দিতেন।

প্রফেসর আমিরীর সাথে

রাস্তায় শায়খ আবদুর রহমান আলবানী আমাদেরকে বললেন, মারজায় অবস্থিত 'হোটেল সামিরে আমসিসে' নিযুক্ত পাকিস্তানে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত প্রফেসর ওমর বাহাউল আমিরী অবস্থান করছেন। আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। হঠাৎ এ সাক্ষাতে আমি খুব আনন্দিত হই। আমার ধারণাই ছিল না যে, তিনি সিরিয়ায় আছেন। দামেশকে তো দূরের কথা।

আমরা তার রুমে প্রবেশ করি। তাকে জিজ্ঞেস করি- আপনি কি আমায় চিনতে পারছেন? তিনি বললেন, কেন নয়! মক্কায় আপনার সঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাত হয়েছে। তারপর আমরা আলোচনা শুরু করি। শায়খ আবদুর রহমান আলবানী সিরিয়া ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রবন্ধপাঠের প্রস্তাব পেশ করলেন। প্রফেসর আমিরী তার প্রস্তাবে একমত পোষণ করে বললেন, আমি এর জন্য চেষ্টা করব। তখনি তিনি স্পিকার ড. মারুফ দুয়ালিবীর সাথে যোগাযোগ করলেন। তার কাছে আমার আলোচনা করে

---

[১] তাঁর মূল নাম মুহম্মদ ইবনে ইউসুফ। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে দামেশকে তাঁর জন্ম। তৎকালীন সময়ে তিনি সিরিয়ার বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ছিলেন। সনদসহ তাঁর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম মুখস্থ ছিল। ১৯৩৫ সালে তার মৃত্যু।

[২] ইমাম নববী রহ.। হাদিসের জন্য বিবেদিতপ্রাণ যুগশ্রেষ্ঠ মহামনীষী। তিনি জীবনের সবকিছু হাদিসের জন্যে বিসর্জন দিয়েছেন। এমনকি বিবাহ পর্যন্ত করেননি। হাদিসশাস্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত রিয়াজুস সালেহীন ও আল-মিনহাজ দুনিয়াখ্যাত প্রসিদ্ধ হাদিস সংকলন। ৬৩১ হিজরির ৫ মহররম দামেশকের নবওয়া নামক গ্রামে তাঁর জন্ম। ৬৭৬ হিজরির ২৪ রমজান তিনি ইনতেকাল করেন।

এ আশা ব্যক্ত করলেন যে, দামেশক ইউনিভার্সিটিতে তার কোনো প্রোগ্রাম রাখা হোক। ড. মারুফ এ ব্যাপারে তাকে ভাইস চ্যান্সেলর কুসতুনতিন জারিকের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেন। স্পিকার ব্যবস্থাপনার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আগামীকাল শায়খ আলবানীকে যেতে বললেন। তার কাছ থেকে আলোচনার বিষয়বস্তু জানবেন।

হোটেলে একজন ফিলিস্তিনি নাগরিক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমাদের তাবলিগী বন্ধু মুফতি জায়নুল আবেদিন এবং তার জামাতের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। জামাতটি সিরিয়ায় দুবার এসেছিল। মাওলানা রশিদ আখতার নদবীও আসেন। তিনি আমাদের দরসে হাদিসের সাথী ছিলেন। আমাদের শিক্ষক ছিলেন নদওয়াতুল ওলামার শায়খুল হাদিস মাওলানা হায়দার হাসান খান টুঙ্কি। একবারও আমার ধারণা হয়নি যে, সিরিয়ায় তার সঙ্গে দেখা হবে। দীর্ঘদিন যাবত তিনি উপন্যাস লিখে আসছেন। একজন আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসেবে পাঠকনন্দিত। আমরা ছাত্র জামানার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। স্মৃতির শ্যাওলা সরিয়ে কিছুক্ষণ সাঁতার কেটে আসি জীবন নদীতে। এ ধরনের আবহ যেকোনো পুরনো সাথীর সঙ্গে দেখা হলেই হয়ে থাকে।

ইতোমধ্যে জনাব কুনজিও আসেন। আমরা তার ঘরে যাই। এ ঘরে শায়খ জায়নুল আবেদিন তিউনেসীর সঙ্গে ইফতার ও খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। তারপর আমরা শায়খ বাহজা আল বায়তারের নিকট যাই। তার কাছে কিছুক্ষণ বসি। সেখান থেকে থাকার জায়গায় ফিরে আসি।

কিছু স্মরণীয় সাক্ষাত

২৮ জুন ১৯৫১

এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে মুহম্মদ আসেন। তিনি ফিলিস্তেনের অধিবাসী। তার কিছুক্ষণ পর শায়খ বাহজা আসেন। আমরা আলাপচারিতা শুরু করি। শায়খ বাহজা একজন মিষ্টভাষী। তার কথা যেকারো হৃদয় কেড়ে নেয়। বিরক্তি লাগে না। শুনতেই মন চায়। তিনি প্রাণবন্ত হৃদয়ের অধিকারী আলেম। শায়খ তকিউদ্দীনের পর আমি তার চেয়ে বেশি সাহিত্যপূর্ণ আরবিভাষায় কথা বলতে কাউকে দেখিনি।

প্রফেসর মোবারকের নির্বাচিত চার কিতাব

প্রফেসর মুহম্মদ মোবারক আসেন। গত বুধবার সিরিয়ার পার্লামেন্টে তিনি এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি গতকালও এসেছিলেন। কিন্তু আমরা ছিলাম না। আগুনঝরা বক্তৃতার কারণে আমরা তাকে মোবারকবাদ জানাই। তিনি বললেন, 'এটা আপনার কালজয়ী গ্রন্থ 'বিশ্ব কী হারালো'র বরকত ছিল'। এ কথায় তার বিনয় প্রকাশ পাচ্ছে। নিজেকে ছোট মনে করার কারণেই তার এ বাক্য প্রকাশ। নতুবা বাস্তব কথা হল সেই বক্তব্য ছিল তার স্বতন্ত্র ঈমানি শক্তির বহিঃপ্রকাশ। ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা থেকেই তিনি এ জজবা আহরণ করেছেন।

শায়খ বায়তারকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, সাম্প্রতিককালে ইসলামি লাইব্রেরিগুলোতে চারটি নতুন কিতাব যুক্ত হয়েছে। কিতাব চারটি হল- সাইয়েদ কুতুবের 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার'। মুহম্মদ আসাদের 'সজ্ঘাতের মুখে ইসলাম'। আবদুর রহমান আজ্জামের 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' এবং 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'। তৃতীয় কিতাবটি বাকি তিনটির সমপর্যায়ে না হলেও গুরুত্বপূর্ণ। 'সজ্ঘাতের মুখে ইসলাম' কিতাবটি সংক্ষিপ্ত। 'ইসলামে সামাজিক সুবিচার' বিশেষ এক বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা। কিন্তু 'বিশ্ব কী হারালো'র পরিসর সবচেয়ে ব্যাপক। তবে তথ্যসমৃদ্ধ। শুরুতে আমরা ইসলামের প্রতিরোধ সম্পর্কে প্রফেসর ফরিদ অজদিসহ আরও কজন লেখকের বই পড়তাম। তারা তাদের লেখায় দলিল-প্রমাণ পেশ করেছেন ইউরোপীয়ান লেখকদের বই থেকে। কিন্তু 'বিশ্ব কী হারালো' পশ্চিমা সভ্যতার মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে। ইউরোপীয়দের মনগড়া বানোয়াট বিভিন্ন বিষয় ভুল প্রমাণ করে দেখিয়েছে।

প্রফেসর মুহম্মদ মোবারক কিছুক্ষণ বসে থেকে বিদায়ের অনুমতি চাইলেন। তিনি সংসদীয় কমিটির সদস্য। কমিটির একটি মিটিঙে তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে।

শায়খ আবদুর রহমান আলবানী আসেন। তিনি নিয়মিত আমার নিকট দামেশকের একটি দৈনিক পত্রিকা পৌঁছাতেন। উদ্দেশ্য ছিল আমি যাতে সিরিয়ার বর্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারি। এবং এ সম্পর্কে নিজের মতামত পেশ করতে পারি। এ

কারণে তিনি পত্রিকাটি কোন্ চিন্তা-চেতনার তার প্রতি লক্ষ্য করতেন না। এর আগে তিনি সিরিয়ার এক কপি সংবিধানও সরবরাহ করেছিলেন।

শায়খ কাফতারুর সঙ্গে

শায়খ আহমদ কাফতারু ফোন করেন। বললেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হোটেলে আসছেন। তিনি আমাকে দামেশকের 'গুতা'য় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। ব্যস্ততার কারণে আমার সঙ্গে দেখা না করতে পারায় ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি এলেন। আমার এখানে এক ঘণ্টা পর্যন্ত বসেন। নিজের কর্মপদ্ধতি, চিন্তাধারা এবং এ দেশের দীনী খেদমত নিয়ে আলোচনা করেন। খুব উপকারী আলোচনা হয়। আমরা দীনী খেদমতের ব্যাপারে মতবিনিময় করি।

ইসলাহ্ ও সংশোধন সম্পর্কে শায়খ কাফতারুর অভিমত

শায়খ আহমদ আফেন্দীর মনে করেন ঘুণেধরা এ সমাজকে সংস্কার সংশোধন করার এবং মানবজীবনে দীনকে প্রতিষ্ঠা করার সবচেয়ে সফল ও নিকটবর্তী মাধ্যম হল সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উপর প্রভাব বিস্তার করা। হেজাজে থাকা অবস্থায়ই তার এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি। তার এই মতের উপর তিনি এখনো অটল আছেন। তার এই ধারণা পোষণের কারণ হল দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ এবং কোনো বিধি-নিষেধ জারি করার অধিকার রয়েছে সরকারি লোকদের। ফলে তাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্নভাবে সাক্ষাত করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সুসম্পর্ক। তাদের মাঝে আস্থা ও নির্ভরশীলতা অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া তা কোনোভাবেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

সাধারণ দাওয়াতের দ্বারা সারা বছর যে সফলতা আসবে তা এক সপ্তাহ বা তারচেয়েও কম সময়ে সরকারি লোকদের দ্বারা অর্জিত হবে। ইসলাহ ও সংশোধন সম্পর্কে তার বিশেষ মূলনীতি রয়েছে। রয়েছে ভিন্ন ফর্মুলাও। এ ব্যাপারে তার খেয়াল হল এগুলোকে যদি বাস্তবায়ন করা হয় তা হলে দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে দীনী জজবা সৃষ্টি হবে। তার এই মূলনীতিতে রয়েছে শিক্ষাব্যবস্থাকে সংস্কার করে ইসলামি পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো। বেতার, ফিল্ম ও সিনেমার সংস্কার, সঠিক পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং মসজিদের

ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই নতুন মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে জাতির আত্মগঠনে বড় ধরনের সফলতার আশা করা যায়।

শায়খ আহমদ সূক্ষ্ম দৃষ্টি, প্রখর মেধা ও প্রশস্ত চিন্তার অধিকারী একজন আলেম। তিনি আপন কাজে খুবই তৎপর। বর্তমান সরকারের পূর্বের গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের সঙ্গে মিলেমিশে পেশাদার নারীদের উপর বিধিনিষেধ আরোপ ছিল তার অবদান। এক্ষেত্রে তিনি সফলও হয়েছিলেন। আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি বর্তমান সিরীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়কের সঙ্গে দেখা করে প্রায় ঘণ্টাখানেক কথা বলেছেন। তখন তিনি তাকে বলেছেন, আপনি নিজেকে ইসলামি নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করুন। দীনের খেদমতকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করুন। তা হলে শুধু আরববিশ্বই না বরং সমগ্র ইসলামি বিশ্বের পথ-প্রদর্শক ও লিডার হতে পারবেন।

শায়খ আফেন্দীর এ আলোচনার তাৎক্ষণিক ফল এই হল যে, সেনাপ্রধান দেশের মোড় ঘুরাতে এবং একে সংশোধন করতে শায়খের কাছ থেকে কিছু ফর্মুলা চাইলেন। নিজের পিএসকে বলে রেখেছেন- শায়খ আফেন্দীকে যাতে সবসময় আসার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং তার রিপোর্টকে সবার আগে পেশ করা হয়। কিন্তু শেষ ঘটনা হল সরকারের মোকাবেলার জন্য ওলামায়ে কেরাম যখন এক প্লাটফর্মে আসতে শুরু করে তখন তিনি পরিবেশ ঘোলা করে ফেলেন। এ কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন।

দামেশকের 'গুতা'য়[১]

তারপর আমরা গুতার উদ্দেশে বের হই। শায়খ আহমদ আফেন্দীর গাড়িতে চেপে বসি। তিনি নিজেই ড্রাইভ করেন। তাসাউফের একটি সিলসিলার পীর এবং শহরের প্রসিদ্ধ আলেম হওয়া সত্ত্বেও তার এ সরলতা আমার খুব ভালো লাগে।

---

[১] গুতা দামেশকের নিকটবর্তী পৃথিবীর অন্যতম উর্বর অঞ্চল। গুতা উর্বরতা, সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণের ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। অনেক সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীর মাজার গুতায় অবস্থিত। ইমাম মাহদি আ. এর নেতৃত্বে পরিচালিত সেনাবাহিনীর সদরদপ্তর হবে এই গুতা।

আমরা গুতায় পৌঁছি। তার গ্রামের মসজিদের খতিব শায়খ আবদুল হাকিমের বাড়িতে যাই। জানতে পারলাম গুতা অনেক প্রশস্ত এলাকা। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পনেরো কিলোমিটার বিস্তৃত। মাঝে মাঝে কয়েকটি ছোট নদী বয়ে গেছে। আমরা যে বাড়িতে মেহমান হই তার ভিতর দিয়েও একটি খাল বয়ে গেছে। পানি ছিল বেশ স্বচ্ছ। আমরা এই পানি দিয়েই অজু করি। সেখানেই জোহরের নামাজ আদায় করি। তারপর আমরা গ্রামের আরও ভিতর দিকে যাই। শায়খের এক বন্ধুর বাগানে প্রবেশ করি। জয়তুন, খুবানি, আখরোট, আঙুর, আনার, নারকেল ইত্যাদি গাছের বাগান। আমরা তার ভিতরে ঘোরাঘুরি করি। আমি এর আগে জয়তুন ও খুবানি গাছ কোথাও দেখিনি। এ সময়টা খুবানির মৌসুম। এখান থেকে আমরা পূর্ব-নির্ধারিত প্রোগ্রাম অনুযায়ী শায়খ বায়তারের নিকট যাই। সেখানে ইফতার ও খাবারে অংশগ্রহণ করি।

সিরিয়ার রাজনৈতিক পালাবদল ও কিছু ঘটনা

এখানে সিরিয়ায় সংঘটিত কিছু ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা সমীচীন মনে করছি, যাতে দেশটির সঠিক অবস্থা সামনে চলে আসে। সিরিয়ায় দুই বছরের কম সময়ে তিনটি বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়েছে। প্রথম বিপ্লব ছিল শোকরি বেগ কোতালি সরকারের বিরুদ্ধে হোসনি যায়িমের। দ্বিতীয় বিপ্লব ছিল হোসনি যায়িম সরকারের বিরুদ্ধে সামি হান্নাবির। আর তৃতীয়বার ছিল সামি হান্নাবি সরকারের বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থান। এখনো সিরিয়া সামরিক সরকারের অধীন। যদিও গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রেসিডেন্ট হাশিম বেগ আতাসি এবং প্রধানমন্ত্রী খালিদ আজম। কিন্তু সব কিছুর নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব সেনাপ্রধান জেনারেল আদিব শিশকালির হাতে।

আমি নির্ভরযোগ্য লোকদের নিকট বিগত সরকার, ব্যক্তি এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করেছি। তারা আমাকে জানিয়েছেন, শোকরি বেগ দীনদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তবে বেশ দুর্বল ছিলেন। ফলে তার দীনদারি রাষ্ট্রের উপর তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তার বিদ্রোহের কারণ ছিল তিনি হোসনি যায়িমকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হোসনি যায়িম বরখাস্তের নির্দেশ কার্যকর করার একদিন আগেই বিদ্রোহ করে বসেন। ফলে শোকরি বেগের পতন ঘটে। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে।

হোসনি যায়িম দৃঢ় মনোবলের অধিকারী মানুষ। তার কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু আশা করেছিল। এমনকি কিছু মানুষ মনে করেছিল বর্তমান সময়ে তার মতো মানুষের প্রয়োজন ছিল, যিনি ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবেন। সিরিয়ার মর্যাদা ও স্বকীয়তা রক্ষা করবেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার মধ্যেও পরিবর্তন এসে যায়। মনমতো কাজ করতে শুরু করে। অপব্যয় করতে থাকে। ভোগ-বিলাস ও নাজ-নেয়ামতের মধ্যে ডুবে পড়ে। একপর্যায়ে তার উপর বহির্বিশ্বের সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকানোর অপবাদ চাপানো হয়। তখন সেনাবহিনীতে দ্বিতীয়বার বিদ্রোহ হয়। তিনি সামি হান্নাবির বাহিনীর হাতে কাঠের পুতুল ছিলেন। বিদ্রোহ সম্পর্কে তার হাতে কোনো পরিকল্পিত প্লান ছিল না। তিনি মোটামুটি ভালো মানুষ ছিলেন। দীন এবং দীনদারদেরকে তিনি সম্মানের চোখে দেখতেন। শায়খ আহমদ কাফতারু বলেন, তিনি ঈদের দিন 'হাইয়ুল ইকরাদে' নিজের ঘরে অবস্থান করছিলেন। তখন আচম্বিত সেনাবাহিনীর এ্যাড মিনিস্টার সামি হান্নাবি দরজায় এসে উপস্থিত হন। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। আধা ঘণ্টা বসে থেকে আবার চলে যান।

ডক্টর মুহসিন বারাজী হোসনি যায়িমের সরকারের সময় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার কোনো প্রিয় ব্যক্তি তাকে তার ঘরে হত্যা করে ফেলে। কোনো কোনো সূত্রে জানা যায় তাকে নির্বাসনে থাকাকালীন বৈরুতে হত্যা করা হয়। এরিমধ্যে তৃতীয় বিদ্রোহ সঙ্ঘটিত হয়।

এখন মূলত দেশের ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে। তারা কাউকে আপন পদে বহাল রাখা বা বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে স্বাধীন। ডক্টর নাজিম কুদসি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু পলিসি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অনুকূলে ছিল না। এ কারণে মন্ত্রণালয়ে কিছু পরিবর্তন চলে আসে। এই পদে সমাসীন হন খালিদ আজম। সামরিক সরকারের স্থায়িত্ব এবং রাজনীতিতে তাদের হস্তক্ষেপ, রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা এবং সার্বিক কর্মকাণ্ডকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা দেশের ভবিষ্যতের জন্য এখন হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের পতন, জনগণের অধঃপতন এবং চারিত্রিক অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ এই ক্ষমতার পালাবদল।

ফিলিস্তিন সম্পর্কে সিরীয়দের অনুভূতি

আমি সিরিয়ার জনগণের মধ্যে ফিলিস্তিন হাতছাড়া হওয়ার ব্যাপারে চরম ক্ষোভ ও উত্তেজনা লক্ষ করেছি। এ ব্যাপারে তারা ভীষণ মনোক্ষুণ্ন।

আরব লিগের প্রতি তারা খুবই অসন্তুষ্ট। ফিলিস্তিন ট্রাজেডিতে আরব লিগ ও আরব সরকারগুলোর উপর তাদের এতটুকু বিশ্বাস নেই। সকল সভা-সমাবেশে ফিলিস্তিন ট্রাজেডি এবং এ সম্পর্কে আরব সরকারগুলোর নীরব ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা হয়। প্রত্যেক মজলিসের আলোচনার মূল কথা হল এ কারণে আরবদের লজ্জিত হতে হবে। আফসোস করতে হবে।

উমুবী মসজিদে জুমার নামাজ

২৯ জুন ১৯৫১

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী, আমাদের ফিলিস্তিনি বন্ধু মাহমুদ ইবরাহিম ও আবদুর রহমান আলবানী আসেন। সিদ্ধান্ত হয় জর্দানের পূর্বাঞ্চল সফর করার জন্য সেখানকার দূতাবাস থেকে ভিসা নিতে বৈরুত যাব। দামেশকে তার দূতাবাস নেই। বায়তুল মুকাদ্দাস জিয়ারতের পাক্কা নিয়ত করে ফেলি। এ অঞ্চল জর্দানের হাশেমি সরকারের অধীন।

জুমার নামাজ উমুবী মসজিদে আদায় করি। খুতবাটি ছিল প্রাণময়। বিষয় ছিল চরিত্র সংরক্ষণ ও দীনী সম্ভ্রমবোধ। আলোচনায় দাওহাতুল আদাবের অনুষ্ঠানের প্রতিও হালকা ইঙ্গিত ছিল। নামাজের পর প্রফেসর মুহম্মদ মোবারকও একই ধরনের আলোচনা করেন। আজকের আলোচনাটি ছিল স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কথা বলার একটি উত্তম নমুনা।

আমরা জানতে পারলাম বন্ধুবর সাইয়েদ মাহমুদ হাফিজ মক্কী দামেশকে এসেছেন। তার সম্পর্কে এরচেয়ে বেশি কিছু জানার সুযোগ হয়নি। আমরা নামাজের পর আবদুর রহমান আলবানীর নিকট সাইয়েদ মক্কীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে এবং তাঁর খোঁজখবর নিতে বের হলাম। এরপর 'হালবুনী' এলাকায় যাই। সেখানে শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহির বাড়িতে গেলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। গতকাল হালব [আলেপ্পো] গেছেন। আমাদের জন্য তিনি অপেক্ষায় ছিলেন। নিজের ঘরে আমাদের জন্য একটা জায়গা তৈরি করে রেখেছিলেন। সেখানে আমরা একটি মজলিস দেখি। মজলিসে কাসিদায়ে বুরদা পাঠ করা হচ্ছে। মজলিসটি মাহমুদ হাফিজ মক্কীর। কাসিদায়ে বুরদার পাঠ শেষ হল। আমরা তার সঙ্গে দেখা করি। একে অপরের সাথে সাক্ষাত করতে পেরে আমরা আনন্দিত হলাম। তিনি আমাদেরকে হোটেলে না থেকে এখানে থাকতে

বললেন। আমরা আগামীকাল আসার প্রতিশ্রুতি দিই। তিনি আমাদের সাথে আমাদের থাকার জায়গায় এলেন। কিছুক্ষণ থেকে ফিরে গেলেন।

আজ আমাদের ইফতার ও খানার আয়োজন একটি আড়ম্বরপূর্ণ হোটেলে হয়। মেজবান ছিলেন আবদুর রহমান আলবানী। আমরা রোজাদারদের একটা বড় জামাত হোটেলে ইফতার করতে দেখি। ইফতারে আমাদের সঙ্গে প্রফেসর আহমদ মাজহার আলআজামাও ছিলেন। তিনি শায়খ আলবানীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ইফতারের পর আমরা আমাদের হজের সাথী বন্ধুবর কামাল আল খতিবের সঙ্গে দেখা করতে বের হই।

শায়খ কামালের সঙ্গে সাক্ষাত

তার বাড়ির উদ্দেশে বের হই। রাস্তায় সুলতান নুরুদ্দীন শহীদের সমাধির পাশ দিয়ে আমরা বাড়িতে যাই। আমরা প্রফেসর কামাল আল খতিবের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি আমাদের সঙ্গে এক ঘণ্টা পর্যন্ত কথা বলেন। তিনি আগামীকাল শায়খ সালাহীর বাড়িতে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। সেখান থেকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

জানতে পারলাম আল-মানার পত্রিকার মালিক জনাব বশির আল আউফ আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। এখান থেকে আমরা ইখওয়ানের মারকাযে যাই। ইখওয়ানরা তারাবির জন্য সেখানে একত্র হয়। আমি তাদের সামনে তাহাজ্জুদের ফজিলত, দিনের মামুলাত ও তার প্রতিক্রিয়া এবং দায়ীদের শক্তি ও কাজে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করি।

কয়েকদিনের জন্য জর্দানের পূর্বাঞ্চল সফরের প্রোগ্রাম করেছি। আমার ইচ্ছা ছিল, রমজানের শেষ রাতগুলো মসজিদে আকসায় কাটাবো। বন্ধুরাও এ মতে সায় দেন। আমরা সফরের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই। আফসোস, শায়খ মুসতফা সিবায়ীর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। যখনই তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি জবাব পেয়েছি তিনি সফরে আছেন। অথবা অনেক ব্যস্ত। আমার লজ্জা লাগছে যে, কতদিন ধরে দামেশকে আছি অথচ তার সাথে সাক্ষাত করতে পারিনি।

৩০ জুন ১৯৫১

আজকের সংবাদপত্র নিয়ে আমাদের বন্ধু শায়খ আবদুর রহমান আলবানী আসেন। শায়খ কাফতারু ফোনে আলাপ করেন। আমরা আবদুল

ওহ্হাব সালাহীর বাড়িতে যাই। অনেক বিস্তৃত ও প্রশস্ত একটি জায়গায় বসি। ভারতীয় বংশদ্ভূত জনাব আবু জরের সাথে সাক্ষাত করি। তার বাবা-মা ভারত থেকে সিরিয়ায় হিজরত করেন। উভয়ে ভারতের আলেম ছিলেন। মাওলানা ফজলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর মুরিদ তার পিতা।

জনাব আবদুল ওহ্হাব সালাহী সন্ধ্যায় চলে আসেন। অত্যন্ত আগ্রহভরে আমাদের সাথে দেখা করেন। আমাদের হোটেলে থাকার ব্যাপারে তিনি অনুযোগ করেন। আমরা তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আমরা সাইয়েদ মাহমুদ হাফিজের বাসায় ভারতীয় পদ্ধতিতে তৈরী সুস্বাদু খাবার খাই।

ডক্টর কোতালি আসেন। তিনি জানান যে, ১৯৪৭ সনে তিনি মুহম্মদ কামাল আলখতিব, শায়খ আবু জরসহ অনেককে নিয়ে মক্কায় আমার এক মজলিসে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এখানে প্রতিটি সভায় এখন ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা হয়। বিষয়টিও অন্তরে আঘাত দেওয়ার মতো। জনসাধারণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারগুলোর অলসতা এবং সেসব হুমকি সম্পর্কে জানতে পারলাম, যা আরব দেশগুলোকে পরিবেষ্টন করে আছে।

আম্মান এবং দামেশকের মধ্যখানে

১ জুলাই ১৯৫১

সকাল ন'টায় আমরা আম্মানের উদ্দেশে রওনা করি। মেজবান শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহী, প্রফেসর আবদুর রহমান আলবানী, প্রফেসর আবু ইজ্জাহ ও সাইয়েদ মাহমুদ হাফিজ আমাদের বিদায় দিতে আসেন। গাড়ি চলতে শুরু করে। আমরা আজরুআত, রমসা এবং জারকার মধ্য দিয়ে পথ অতিক্রম করি। জোহরের সময় আমরা আম্মানে পৌঁছে যাই। জোহর ও আসরের নামাজ শহরের মসজিদে আদায় করি। মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকে কানায় কানায় ভরা। সেখানে একজন আলেমকে দরস দিতে দেখি।

আম্মান থেকে কুদুসে

আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে একটি ছোট গাড়িতে আরোহণ করি। গাড়িটি আমাদেরকে নিয়ে চলতে শুরু করে; সাপের মতো এঁকে- বেঁকে পেঁচ খেয়ে খেয়ে। পাহাড়-পর্বত মাড়িয়ে পথ অতিক্রম করতে থাকে। পথে

'মৃতসাগর'[১] পড়ে। লোকেরা বলে এটি সাদুম বস্তি। এখানে হযরত লুত আ. এর সম্প্রদায় বসবাস করত। তাদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ বস্তিটিকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকেই এই ছোট্ট সাগরটি তৈরি হয়। মহান আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেন-

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ وَاِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

'তারপর অন্যদেরকে আমি সমূলে উৎপাটিত করেছিলাম। তোমরা তাদের ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়ে গমন করো ভোর বেলায় এবং কখনো রাত্রি বেলায়। তারপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না!' [সুরা সাফ্‌ফাত, ৩৬-৩৮ আয়াত]

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ وَاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

'জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত। নিশ্চয়ই এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন আছে।' [সুরা হিজর, ৭৬-৭৭ আয়াত]

শায়খ আবদুল ওহ্হাব নাজ্জার 'কাসাসুল আমবিয়া' গ্রন্থে লিখেছেন- মৃতসাগরটি 'বুহায়রায়ে লুত' নামে প্রসিদ্ধ। এর অস্তিত্ব এই ঘটনার পূর্বে আদৌ ছিল না। এর পরেই এটি সৃষ্টি হয়। বস্তিটিকে উল্টিয়ে দেওয়ার পর এর পৃষ্ঠদেশ অন্যান্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চারশ কিলোমিটার নিচে চলে যায়। ১৯৩০/৩১ খ্রিস্টাব্দে আমরা জানতে পারি মৃতসাগরের আশপাশে কওমে লুতের বসবাসের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে।'

আম্মান ও কুদুসের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিছু নিচু জায়গা আছে। জায়গাগুলো সমুদ্রের পিঠ বরাবর। আমরা জর্দান নদীর কোল-ঘেষে পথ অতিক্রম করি। নদীটিকে এখন 'নাহরে শরিয়াহ' বলা হয়। এই নদীটিই পূর্বজর্দান এবং ফিলিস্তিনের মাঝে প্রতিবন্ধক।

---

[১] মৃতসাগর জর্ডানে অবস্থিত ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। এর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হল বড় কোনো সমুদ্রের সঙ্গে এর সংযোগ নেই। হযরত লুত আ. এর জাতির উপর আল্লাহর গজবের প্রতিক্রিয়ায় এ সাগরের উৎপত্তি। এর পানি তুলনামূলক বেশি খাড় ও লবণাক্ত রাসায়নিক উপাদান অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় অধিক। এ সাগরে মাছসহ কোনো জলজ প্রাণী জীবিত থাকে না। ছোট এই সমুদ্র দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল ও প্রস্থে ১১ মাইল। এর গভীরতা ১৩০০ ফিট।

আমরা বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছাকাছি এক জায়গায় পৌঁছে যাই। এখানকার জমিন বেশ উঁচু মনে হয়। মৌসুমের মধ্যেও পরিবর্তন অনুভব করি। সূর্য ডোবার সাথে সাথে আমরা পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করি। এই ভূমি আল্লাহ তায়ালার বরকতে পরিপূর্ণ।

মসজিদে আকসায়

আমরা বাবুজ জোহরায় গিয়ে নেমে পড়ি। এরপর যাবিয়াতুল হুনুদের দিকে হাঁটতে থাকি। সেখানে একটি কামরায় আসবাবপত্র রেখে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। বাজারের এক হোটেলে রাতের খাবার খাই। সরাইখানার একজন খাদেম আমাদেরকে মসজিদে আকসার পথ দেখিয়ে দেয়। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো অনেক ক্ষীণ। কোনো কিছুই ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বায়তুল মুকাদ্দাসের পাশ দিয়ে হেঁটে যাই। মসজিদের দক্ষিণ পাশে কিবলার দিক দিয়ে প্রবেশ করি। এতটুকু জায়গাকে বর্তমানে মসজিদে আকসা বলা হয়। অথচ চার দেয়ালের ভিতরের পুরো অংশই মসজিদে আকসা ছিল। এর চারপাশে আল্লাহ তায়ালা অফুরন্ত বরকত দিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, আমরা মসজিদে প্রবেশ করি। এশা ও তারাবির নামাজ আদায় করি। বের হওয়ার সময় জানতে পারি শায়খ মুহম্মদ সাদেক মুজাদ্দেদী একটি কামরায় ইতিকাফ করছেন। তিনি মিসরে নিযুক্ত আফগান রাষ্ট্রদূত। আমরা তার নিকট যাই। সালাম বিনিময় করি। তার সাথে সাক্ষাত করি। তারপর থাকার জায়গায় ফিরে আসি। আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম।

২ জুলাই ১৯৫১

দ্বিতীয়দিন আমরা ভারতীয় খানকার পরিচালক মাওলানা নাজির হসান আনসারীর সাথে দেখা করি। তারপর মসজিদে যাই। সারাদিন মসজিদেই কাটাই। অনেক রুহানিয়ত অনুভব হয়েছে। দারুণ প্রশান্তি লেগেছে।

শায়খ মুহম্মদ সাদেকের দাওয়াতে

মাগরিবের নামাজ পড়ে বের হচ্ছিলাম। দেখি জনৈক আফগানমন্ত্রীর নাতি আমাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, শায়খ সাদেক খাবারের দস্তরখানে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা তার সঙ্গে খাবারে

অংশগ্রহণ করি। শায়খ বললেন, আমরা যেন তার এখানেই থাকি। কারণ সরাইখানা মসজিদ থেকে বেশ দূরে। রাত্রে সেখানে যাওয়া কষ্টকর। তার এ প্রস্তাব আল্লাহর রহমত মনে করে এখানেই আরামে থাকতে শুরু করি। বায়তুল মুকাদ্দাসের কিছু লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তারা শায়খের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে ওয়াক্ফ মন্ত্রণালয়ের সচিব ইমাম সাইয়েদ ফুয়াদ এবং হারামের ইন্সপেক্টরও ছিলেন। শায়খ মুহম্মদ সাদেক প্রতিবছরই বায়তুল মুকাদ্দাসে ইতিকাফ করেন। এ কারণে তিনি এখানকার মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাদের প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তার থাকার জায়গাটা সর্বদা বন্ধু-বান্ধব আর সাক্ষাতপ্রার্থীদের আগমনে মুখরিত থাকে।

মাওলানা মুহম্মদ আলি জাওহারে[১]র কবরের পাশে

৩ জুলাই ১৯৫১

আমরা সারাদিন মসজিদেই কাটাই। বিরক্তিকর কিংবা ক্লান্তিদায়ক কোনো কিছু ছিল না। মসজিদের ভিতরের প্রতিটি জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখি। ভারতের প্রসিদ্ধ ইসলামি ব্যক্তিত্ব বিখ্যাত মুজাহিদ নেতা মাওলানা মুহম্মদ আলি জাওহারের সমাধির পাশে গিয়ে দাঁড়াই। রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া করি। তার সেসময়ের কথা আমার খুব স্মরণ হয় যখন তিনি ভারত উপমহাদেশের জনপ্রিয় নেতা এবং মুকুটহীন সম্রাট ছিলেন। অবাক লাগে তিনি সেই কোথাকার ভারতে জন্মগ্রহণ করেছেন। ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করেছেন। মৃত্যু হয়েছে লন্ডনে। সমাহিত করা হয় কুদুসে। আল্লাহ তায়ালার দয়া যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।

---

[১] ১৮৭৮ সালের ১০ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও খেলাফত আন্দোলনের অকুতোভয় নেতৃপুরুষ। ব্রিটিশ বিরোধী গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্রিকা 'কমরেড' ও উর্দু পত্রিকা দৈনিক 'হামদর্দ' প্রকাশ করেন। ইংরেজদের রোষে পড়ে তাকে দুইবার কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩০ সালে লন্ডনে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, আমি পরাধীন দেশে ফিরে যাব না। ভারতের স্বাধীনতা না দিলে এখানেই আমার কবরের জায়গা দিতে হবে। এর কয়েকদিন পরই তিনি সেখানে ইনতেকাল করেন।

শায়খ সাদেক মুজাদ্দেদীর ইতিকাফের স্থান

শায়খ সাদেক আমাদেরকে অস্বাভাবিক ভালবাসেন। আমাদের ইজ্জত-সম্মান ও ইকরাম করতে কোনো অংশে ত্রুটি করেননি। তার ইতিকাফের স্থান মাগরিবের নামাজের পর এক জাকজমকপূর্ণ মাহফিলে পরিণত হয়। শহরের সবশ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মসজিদের খাদেম, মুহাফিজ ও সর্বস্তরের কর্মচারী-কর্মকর্তা তার মজলিসে আসেন। বহু ওলামায়ে কেরামও আসেন। তার দস্তরখান অনেক প্রশস্ত। এতে থাকে বহু ধরনের খাবার। মেহমানও থাকে বিভিন্ন স্তরের। বসলে মনে হয় কাবুলে কোনো আফগানির দাওয়াতে এসেছি। এখানে হারামের শায়খ সাইয়েদ তাওফিক আলহোসাইনীর সাথে আমার পরিচয় হয়। তিনি অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। অমায়িক লোক।

ফিলিস্তিন সমস্যার বাস্তবতা

ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় শরিক হয়ে কিছু হৃদয়বিদারক বাস্তবতা জানতে পারি। তিনি বললেন, আরব লিগ ও আরব সরকারগুলোর মাধ্যমে ইহুদিরা যে পর্যন্ত পৌঁছেছে কোনো দিন তারা এর স্বপ্নও দেখেনি। কল্পনাও করেনি। তারা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের এক বিঘত ভূমিকে গনিমত মনে করে। কিন্তু আমাদের কীইবা করার আছে! আরবসরকারগুলোই তাদেরকে এই সুযোগ করে দিয়েছে। দেশের একটি বড় ভূখণ্ড তাদের হাতে তুলে দিয়েছে, যা ইহুদিদের ধারণায় কখনও আসেনি। তিনি সুকৌশলে আরব লিগকে তিরস্কার করেন। কারণ এই নপুংসক সংস্থাটির মাধ্যমে মুসলমানদের চেয়ে ইহুদিরাই বেশি উপকৃত হচ্ছে।

আরব নেতাদের কুকীর্তি

তিনি বললেন, আমি একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন সিরিয়ায় নিযুক্ত মিসরি রাষ্ট্রদূত। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন বড় বড় আরব-নেতা ও মন্ত্রীরা। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মদ পান শুরু হয়। আমি বাঁকা চোখে এ দৃশ্য দেখতে থাকি। তারা গ্লাসের পর গ্লাস, বোতলের পর বোতল খেয়ে সাবাড় করে ফেলে। একপর্যায়ে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের রগ-রেশায় মদের প্রভাব পৌঁছে যায়।

নেশাগ্রস্ততার কারণে তারা মৃত মানুষের মতো পড়ে থাকে। তখন লাশের মতো করে তাদেরকে গাড়িতে উঠিয়ে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। বলুন এই নেতাদের কাছ থেকে ভালো কী আশা করা যায়?

তারপর তিনি আরব সেনাবাহিনীর লজ্জাজনক চরিত্র, মদপান, পাপাচার ও তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের আলোচনা করেন। যুদ্ধের ময়দান ও সীমান্ত পাহারা দেওয়ার সময় তাদের এসব কর্মকাণ্ড আল্লাহর অসন্তোষ ও গোস্বার কারণ। যার ফলে তারা বিজয় লাভ করতে পারে না। তার এ আলোচনায় আমি আরব সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণ বোঝতে পারি।

৪ জুলাই ১৯৫১

আজ ঈদের চাঁদ দেখা যাওয়ার কথা। কিন্তু চাঁদ ওঠেনি। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র মাসের আরও একদিন বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ফিলিস্তিন সম্পর্কে একটি কথা

শায়খ সাদেক 'দীনিয়াতুল ইলমিয়া পরিষদে'র সেক্রেটারি প্রফেসর আসআদ ইমাম আলহোসাইনীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিষদটি মিসরের 'কিবারুল ওলামা'র ন্যায় একটি সংস্থা। এর কমিটি রাষ্ট্রের দীনী বিষয়গুলো দেখাশোনা করে। প্রফেসর আসআদ অত্যন্ত শিক্ষিত লোক। ফিলিস্তিন ট্রাজেডির সময় তার দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর ভারী ভারী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু মসজিদের পাথরের উপর কোনো বোমা পড়েনি। মসজিদ ও মসজিদের পাথর উভয়টিই অক্ষত থাকে।

ইসলামিবিশ্ব পানিশূন্য সমুদ্রের মতো

তারপর তিনি বলেন, আমি আহমদ হিলমী পাশার নিকট যাই। তিনি কুদুসের সেনাবাহিনীর কমান্ডার। তার কাছে বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করি। তিনি বললেন, এর সমাধান কী? আমি বললাম, এ সংবাদটি সমগ্র মুসলিমবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ এই পবিত্র জায়গা আমাদের একার নয় বরং সকল মুসলমানের। তিনি আমার এ প্রস্তাবে একমত হলেন। এ দায়িত্বটা আমাকেই সোপর্দ করলেন। তারপর আমি রেডিওর মাধ্যমে ধারাহিকভাবে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত এ সংবাদটি প্রচার করি। বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস করার যে অপচেষ্টা চলছে তা অবহিত করি। কিন্তু

আফসোস, কারো কর্ণকুহরে আমার আওয়াজ পৌঁছল না। ইথারে ইথারে আমার ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে শুধু ভেসে বেড়াল। আমি বললাম, জনাব, মুসলিমবিশ্ব কোথায়? এ তো প্রাণহীন এক সমুদ্র, যার মধ্যে এক ফোঁটা পানিও নেই।

চারিত্রিক অবক্ষয়

প্রফেসর আসআদ আমাকে আরও এমন কিছু কথা শোনান, যার দ্বারা মুসলমানদের চারিত্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতন স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, 'একবার মসজিদে আকসার ইমাম উপস্থিত ছিলেন না। তখন খুতবা দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর আসে। জুমার খুতবা নাকি ঈদের খুতবা মনে করতে পারছি না। খুতবায় ফিলিস্তিন ট্রাজেডির কারণ বর্ণনা করলাম। অতীত ও বর্তমানকে তুলনা করলাম। আমি মসজিদ থেকে বেরও হইনি। ব্রিটিশ-সরকারের মেজিস্ট্রেটের নিকট সংবাদ পৌঁছে যায়। তিনি আমার নিকট জবাব তলব করেন।' এ ধরনের আরও অনেক কথা বলেন।

প্রফেসর আসআদ আলহোসাইনী আমাকে জানান যে, ইলমিয়্যা পরিষদ কয়েক দিনের মধ্যে একটি মিটিং ডাকবে। এ উদ্দেশ্যে সংস্থার সদস্যরা শাওয়ালের পাঁচ তারিখে একত্র হবেন। তিনি আমাকে উক্ত সভায় আসার দাওয়াত দেন। প্রতিশ্রুতি দেন পরিষদের সভাপতি শায়খ মুহম্মদ আল আমিন শানকিতীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিবেন।

মসজিদে আকসায় আমার অনুভূতি

আজ সারাদিন মসজিদেই ছিলাম। তার প্রশস্ত আঙিনা এবং দূর পর্যন্ত বিস্তৃত জমিনের বাউন্ডারির ভিতর পায়চারি করি। আশপাশের মনোলোভা দৃশ্য অবলোকন করি। আমি কোনো অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নই। তবু মসজিদুল আকসার নীরব কান্না শোনতে পাই। প্রতিটি বোধসম্পন্ন ব্যক্তি অন্তরের চোখে তাকালেই তা বোঝতে পারবে। সে তার প্রিয়জনদের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'অচিরেই তাকে আরও বড় মসিবতের মোকাবেলা করতে হবে। তারা যেন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।' আমার হৃদয়ে বেদনার ঝড় মরুসাইমুম হয়ে বইতে থাকে। হৃদয় স্পন্দিত হওয়ার গতি বেড়ে চলছে।

ফিলিস্তিনের মুসলমান

আমি ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে পরবাসী ও এতিম অবস্থায় দেখতে পাই। তারা না কোনো ইজ্জত অনুভব করছে, না ভবিষ্যতের ব্যাপারে তাদের কোনো আশা-ভরসা আছে। তাদের অন্তর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তারা মাথা নত করে থাকে। বায়তুল মুকাদ্দাসের আশপাশের এলাকা এবং কুদুসের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে তারা একত্র হয়। জোহর ও আসরের নামাজের পর মুসল্লিদের একটা বড় অংশ মসজিদে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ তেলাওয়াত করে। কেউ ওয়াজ-নসিহতের মজলিসে বসে। কেউ জিকিরে মগ্ন থাকে। অর্থাৎ সবাই নিজের মত করে ইবাদতে নিমগ্ন থাকে। আমি তাদের অনেকের সাথে বসেছি। দু'চারটি কথা বলেছি। সবাইকে দেখি মর্মাহত। উৎকণ্ঠিত। তারা আমাকে এমন এমন কারগুজারি শুনিয়েছে, যেগুলো চোখকে অশ্রুসজল করে ফেলে। হৃদয় চুরমার করে দেয়। আরবের রাজা-বাদশা ও নেতৃবৃন্দের তারা কঠোর সমালোচনা করে।

পুরো ফিলিস্তিন যেন আর্তকণ্ঠে আমাদেরকে ডেকে ডেকে বলছে, আমার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত! কেউ আছে কি যে আমাকে একটি সুস্থ-সবল হৃদয় দিয়ে আমার অন্তর্জ্বালা দূর করবে? হ্যাঁ, ভালো কথা। তারা কেন পরিবর্তন করবে? একে কেন নেবে? কেউ কি ভালোর বিনিময়ে খারাপ গ্রহণ করে?

আমি বিভিন্ন ওয়াজ-নসিহতের মজলিস ঘুরেছি। বিভিন্ন হালকায় বসেছি। খুঁজে বেড়িয়েছি কোথাও কোনো সঞ্জীবনী আত্মা আছে কি না! কোথাও প্রাণশক্তি পাওয়া যায় কি না! কোথাও ব্যথাতুর হৃদয়ের সন্ধান মেলে কি না! কোথাও এমন অন্তরের খোঁজ পাওয়া যায় কি না যে শেষ পরিণতির অতল গহ্বর তলিয়ে দেখবে। কোথাও এই লাঞ্ছনা-অপমানের কারণ অনুসন্ধানকারী বের করা যায় কি না! কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। কোনো জায়গায় এ দুর্লভ জিনিস পাইনি।

হ্যাঁ, একব্যক্তিকে পেয়েছি যে সাদাসিধে পোশাকে বলছেন, আমার বন্ধুরা, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহর ভয় দেখাইনি? এসব গুনাহর শেষ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করিনি? তখন তোমরা ফাঁকি দিতে। বলতে, 'সে তো একজন সুফি দরবেশ। কী আর জানে।' এখন তোমরা সবকিছু প্রত্যক্ষ করছ।

তিনি আল্লাহর নাফরমানি ও গুনাহ্ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলছিলেন, এটা খোদার খোদায়িত্বের সঙ্গে বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা এবং আরেফিনদের কথার অবমূল্যায়নের অশুভ পরিণতি।

আমি লক্ষ্য করলাম তিনি যখনি বক্তৃতার জন্য দাঁড়াতেন, লোকজন তার চারপাশে জমা হয়ে যেত। বক্তৃতা চলাকালীন কেউ উঠত না। বাহ্যিকভাবে তাকে আলেম মনে হত না। তাই কেউ ইলমি প্রশ্ন করলে তার পাশে বসে থাকা একজন আলেমের দিকে ইঙ্গিত করতেন। যখন এই আলেম কথা বলতে শুরু করতেন লোকজন এলোমেলো হয়ে যেত।

আল্লাহর অলিরাই মানুষের উপর রাজত্ব করে

আমি সবসময় লক্ষ করেছি আল্লাহর আহলে দিল অলিগণই মানুষের উপর রাজত্ব করে। আলেমগণের কথায় মানুষ এত প্রভাবিত হয় না যতটুকু হয় আল্লাহর অলিদের কথায়। হ্যাঁ, আলেম হওয়ার সাথে বেলায়েতের মাকামও অর্জিত হলে সোনায় সোহাগা।

ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার জনগণের হিসাব অনুযায়ী আজ রমজানের ৩০ তারিখ। আমরা চাঁদ দেখেছি। শায়খ সাদেক মুজাদ্দেদীর সঙ্গে রাতের খাবার খাই। শহরের নেতৃস্থানীয় বহুলোক এবং বড় বড় অফিসারেরা তাকে মোবারকবাদ জানাতে আসে। আমি এ সুযোগকে গনিমত মনে করে ঈদ উপলক্ষে কিছু আলোচনা করি।

মসজিদে আকসায় ঈদের নামাজ

৫ জুলাই ১৯৫১

ঈদের ঘোষণার জন্য তোপধ্বনি দেওয়া হল। সূর্য ওঠার পরপরই লোকজন দলে দলে মসজিদে আসতে শুরু করে। এক প্লাটুন সৈন্য ইউনিফর্ম পরে মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যায়। খতিব সাহেব যথোচিত খুতবা দেন। বাদশা আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করেন। ঈদটি ছিল কোনো মুসলিমদেশে উদ্‌যাপিত ঈদের নকলচিত্র।

ফিকে ঈদ

ঈদটা ফিকে ফিকে মনে হল। লোকজন শুধু বাহ্যিকভাবে উত্তম পোশাক পরিধান করে নিজেদের শরীর সাজিয়েছে। কিন্তু ভিতরে

অনাড়ম্বরতা থেকেই গেছে। সবার অন্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ। ক্ষত-বিক্ষত। তারা কৃত্রিম আনন্দ-উল্লাসের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। একে অপরকে মোবারকবাদ দিচ্ছে। সালাম বিনিময় করছে। কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যথা ও দুঃখের সঙ্গে আনন্দ-উল্লাসের লড়াই চলছে। ব্যথা ও দুঃখেরই বিজয়। আনন্দের পরাজয়।

আজ আমার দুঃখও সজীব হয়ে উঠেছে। বিজয় লাভ করেছে। কোনো আনন্দ-উদ্দীপনা অনুভূত হচ্ছে না। আমি শায়খ মুজাদ্দেদীর রুমে গেলাম। এখানে সবশ্রেণীর লোক এসে শায়খকে মোবারকবাদ জানাচ্ছে। ঈদের সালাম পেশ করছে।

একটি দাওয়াত

শায়খ মুজাদ্দেদী আমাকে নিয়ে একটি বাসায় গেলেন। বাসাটি ছিল মুফতি আমিন আলহোসাইনীর এক প্রিয় ব্যক্তির। তার নাম আবু সায়িদ। এখানে আমরা দুপুরের খানা খাই।

আফগান বিদ্রোহের ঘটনা

শায়খ মুজাদ্দেদী আমাকে শাহ আমানুল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘটনা শোনান। বিদ্রোহের কারণ তুলে ধরেন। বাদশার ইউরোপ সফর এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করেন। এসব কাজের শেষ পরিণতি তিনি কোনো দিন ভেবে দেখেননি। যেমন- তিনি নারীদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন। বেপর্দার অনুমতি দিয়েছেন। একটি নারী প্রতিনিধিদল তুরস্কে পাঠিয়েছেন। তার হেরেমের ভিতরেও পর্দা ছিল না। সাইয়েদ মুজাদ্দেদী বাদশাকে এসব বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তাকে নসিহত করেছেন রানীর বেপর্দা সম্পর্কে। কারণ তিনি যে অবস্থায় দেশ থেকে সফরে বের হয়েছেন সে অবস্থায়ই ফিরে এসেছেন। এ জন্য বাদশা শায়খ মুজাদ্দেদীর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। অথচ ইতঃপূর্বে তিনি শায়খের বাড়িতে এসে দেখা-সাক্ষাত করতেন। আহলে খানকার জন্য যেই খাবার পাকানো হত তা তাবাররুক হিসেবে আহার করতেন। শুধু কথা বলা বন্ধ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি শায়খকে বন্দিও করেন। তার কিছু সাথী-সঙ্গীকে ফাঁসি দিয়েছেন। তারপর শায়খকে এই শর্তে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন যে, শায়খ এ বিদ্রোহ দমন করবেন

এবং হাবিবুল্লাহকে বোঝাবেন। হাবিবুল্লাহ বিদ্রোহীদের লিডার। তিনি বাচ্চা সেকা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। শায়খ এ শর্ত পালনে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, বিষয়টি এখন তার হাত থেকে বেরিয়ে হাবিবুল্লাহর নেতৃত্বে চলে গেছে। শায়খের সঙ্গে এসব অন্যায় আচরণ ও রানীর পর্দাহীনতা বিদ্রোহের গুরুত্বপর্ণ কারণ।

প্যারিস থেকে বাদশা নাদির খাঁর আসা এবং বিদ্রোহ দমন করার শেষ উপাখ্যান পর্যন্ত শায়খ বর্ণনা করেন। জ্ঞানটা আমার সঠিক উৎস থেকে অর্জিত হয়েছে। কারণ আরবিতে একটা প্রবাদ আছে, 'ঘরের মানুষই ঘরের খবর ভালো জানে।'

এখান থেকে আমরা মসজিদে আকসায় ফিরে আসি। তারপর আমি ও মাওলানা ওবায়দুল্লাহ বলিয়াবী শায়খ ইয়াকুব বোখারীর নিকট যাই। তিনি বোখারার লোকদের খানকার শায়খ। আমাদের সাথে তার নামে লেখা মুফতি আমিন আলহোসাইনীর একটি চিঠি ছিল। আমরা তার হাতে পত্রখানা দিই। তিনি চিঠিটি মাথার উপর রেখে মুফতি হোসাইনীর প্রশংসা করেন। তারপর আমরা তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি।

বাদশা শরিফ হোসাইনের আক্ষেপ

এ বর্ষীয়ান বুজুর্গ আমাকে একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। একবার তিনি মুফতি আমিন আলহোসাইনীর সাথে শরিফ হোসাইনের শুশ্রূষার জন্য আম্মান যান। তখন তিনি মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ছিলেন। মাটি লাগোয়া একটি বিছানায় তিনি শুয়ে ছিলেন। ডাক্তার ছিল তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। আমাদেরকে দেখে তিনি ইঙ্গিতে বসাতে বলেন। কয়েকজন তাকে বসাল। বসিয়ে ছেড়ে দিলে তিনি চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আওয়াজ দিয়ে বললেন, আবদুল্লাহ! পুত্র আবদুল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিলেন। তখন তিনি বললেন, এটা আমার অপরাধের শাস্তি। তুমি এখেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। এ কথা শুনে উপস্থিত সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। আবদুল্লাহ ভেঙে পড়েন। জোরে জোরে কাঁদতে থাকেন।তারপর আমরা বিদায়ের ইচ্ছা প্রকাশ করি। তখন বাদশা আবদুল্লাহ মুফতি হোসাইনীকে থাকতে এবং খানা খেয়ে যেতে অনুরোধ করেন। মুফতি সাহেব অপারগতা প্রকাশ করেন। দাওয়াত কবুল করতে অস্বীকৃতি জানান।

তখন ছিল রাত। ঠাণ্ডাও ছিল অনেক বেশি। আমি মুফতি হোসাইনীকে না থাকার কারণ জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, আমার ইচ্ছা ছিল নিজের ঘরেই খাব। বাদশা আবদুল্লাহর মেহমানদারিতে খানা খাওয়ার চাইতে বরং এটাই উত্তম। এমন ঘটনা দু'বার হয়েছে।

কুদুস ও খলিলের মাঝে

আমরা শায়খ ইয়াকুবের নিকট থেকে ফিরে আসি। শায়খ মুজাদ্দেদীর সাথে খলিল শহরের দিকে রওনা করি। হযরত ইবরাহিম খলিলুল্লাহর নামে শহরটির নামকরণ করা হয়েছে। রাস্তায় এসে জানতে পারলাম শহরটি কুদুস থেকে অনেক দূরে। ইহুদিদের নতুন বসতি মাঝখানে প্রতিবন্ধক হয়ে কুদুস ও খলিলের রাস্তাকে দীর্ঘ করে দিয়েছে। আমরা আশ্রয় শিবিরগুলোর পাশ দিয়ে যাই। ভিতরের লোকদেরকে মানবেতর জীবনযাপন করতে দেখি। হযরত ঈসা আ. এর জন্মস্থান 'বায়তে লাহম'[১]র পাশ দিয়ে যাই। খলিলের কাছাকাছি গিয়ে একটি মসজিদে নামাজ পড়ি। তারপর হাইফার সাবেক মুফতি ইলমিয়্যাতুল ইসলামিয়া পরিষদের সদস্য শায়খ ইউসুফ তাহবুবের ঘরে যাই। চা নাশতা করি।

মসজিদে খলিলে

আমরা মসজিদে খলিলে যাই। ইবরাহিম আ. এর মাজারের উপর দিয়ে জিয়ারত করি। এটি সেই দ্বিতীয় কবর, যার সঠিক হওয়ার ব্যাপারে মদিনার রওজায়ে আতহারের পর সকলে একমত।

শায়খ আলি জা'বারির বাড়িতে

এখান থেকে আমরা খলিল শহরের মেয়র শায়খ মুহম্মদ আলি জা'বারির বাসায় যাই। তার ওখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য একের পর এক লোকজন আসতে থাকে। কিছুক্ষণ বসে থেকে বাড়িঅলাকে মোবারকবাদ জানায়। তারপর সাইয়েদ মুজাদ্দেদীকে সালাম করে ফিরে যায়। রাত পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে। এখানে সাক্ষাতের কয়েকটি উপলক্ষ একত্র হয়ে গেছে। যেমন- ঈদ, শায়খ

---

[১] বেথেলহেম

মুজাদ্দেদীর আগমন। তিনি খলিল শহরে বেশ পরিচিত। এখানে তিনি বছরে একবার আসেন। এ দুটি বিষয়ের সাথে সাথে পৌর নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসাও একটি কারণ। মোটকথা এসব কারণে শায়খের ঘর সাক্ষাতপ্রার্থী ও মোবারকবাদ জানাতে আসা লোকজনে ভরপুর। একদল আসে আরেক দল ফিরে যায়। তাদেরকে চা, কফি, চকলেট ও বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। আমরা নৈশভোজ সেরে শুয়ে পড়ি।

মসজিদ সম্পর্কে আমার প্রতিক্রিয়া

৬ জুলাই ১৯৫১

আমরা ফজরের নামাজ মসজিদে সাইয়েদুনা ইবরাহিমে আদায় করি। সেখানে এশরাক পর্যন্ত অবস্থান করি। মসজিদের চারপাশে রয়েছে কুরআনের আয়াতের ম্যুরাল। আয়াতগুলো পড়ে আমার ভালো লাগল। এতে রয়েছে- 'ইবরাহিম আ. এর ঘটনা। পিতা ও স্বসম্প্রদায়ের সাথে তার আলোচনা। মূর্তি ভাঙা। তাওহিদের দাওয়াত। হিজরত এবং তার মকবুল দোয়াসমূহ। কাবা শরিফ নির্মাণ। হযরত ইবরাহিম আ. এর ব্যক্তিত্ব চরিত্রমাধুর্য ।' আমার ইচ্ছা হল এগুলো পড়ব। গভীরভাবে চিন্তা করব। বর্তমান অবস্থার সাথে নতুনভাবে ফিট করব। আমি আয়াতগুলো পড়ে পড়ে নতুন স্বাদ অনুভব করি। জুমার পর আমার আলোচনায় এ বিষয়ে শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি তাদেরকে পরামর্শ দিই তারা যেন এ আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। এগুলোকে নতুনভাবে পড়েন। এখেকে তারা অবশ্যই নতুন নতুন বিষয় উদঘাটন করতে পারবেন।

শায়খ জা'বারি আমাদের সঙ্গে পরিচয় করনোর জন্য শহরের আলেমদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ একত্র করেন। তারা আমাদের সাথে তার ঘরে দুপুরের খানা খান। খাবার গ্রহণের পর তারা আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তার ঘরে শহরের শিক্ষিত ও দীনদার লোকেরা বরাবর আসা-যাওয়া করতে থাকেন। এই ধারা অর্ধরাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

আমরা খলিল শহর ঘুরে ঘুরে দেখেছি। শহরটি দারুণ চমৎকার। ফিলিস্তিনিদের গ্রীষ্মকালীন নিবাস বলা যায় এটিকে। জানা যায়, শহরটির উচ্চতা সমুদ্রের পিঠ হতে চার হাজার ফিট। এই শহরের একটি বৈশিষ্ট্য হল এখানে কোনো খ্রিস্টান নেই। শহরবাসীরা এক বছর লড়াই করে একে

ইহুদিমুক্ত করেছে। যারা মারা গেছে তারা তো চলেই গেছে। যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়ে বেঁচেছে।

শহরের অধিবাসীদের একটা দাপট রয়েছে। রয়েছে শান-শওকত ও উচ্চাভিলাষ। এটা তাদের একক বৈশিষ্ট্য। এ নিয়ে তারা গর্ব করে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে ইসলামের জন্য বাঁচিয়ে রাখুন। এখান থেকে আমরা বায়তুল মুকাদ্দাস ফিরে আসি। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বন্ধুরা আমাদেরকে 'বাঁচাও, বাঁচাও হে মুতাসিম'র ঘটনার নাটক দেখতে আমন্ত্রণ জানান। আমরা অপারগতা প্রকাশ করি।

৭ জুলাই ১৯৫১

জোহরের পর আমরা খলিল শহরকে আলবিদা জানাই। আসরের নামাজ 'যাবিয়াতুল হুনুদে' এসে আদায় করি। যাবিয়াতুল হুনুদ হল একটি সরাইখানার মত। ভারতীয়দের থাকার জন্য কোনো কল্যাণকামী বন্ধু এটি নির্মাণ করেন। শায়খ আসআদ আলহোসাইনীর সাথে তার বাড়িতে সাক্ষাত করি। তারপর শায়খ ইয়াকুব বোখারীর সাক্ষাতে যাই। গিয়ে দেখি তিনি বোখারার কয়েকজন মেহমানের সঙ্গে খানা খাচ্ছেন। আমাদেরকেও খাবারে শরিক করলেন। এশার নামাজের পর যাবিয়াতুল হুনুদে ফিরে আসি।

৮ জুলাই ১৯৫১

আজ এশরাকের পর আমরা মসজিদুল আকসায় যাই। যেসব দিনের ডায়েরি অসম্পূর্ণ ছিল তা সম্পন্ন করি। মসজিদে যেতে রাস্তায় একজন বর্ষীয়ান বুজুর্গের সাথে সাক্ষাত করি। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলি। তার ভাষা খুব চিত্তাকর্ষক। ইংরেজদের ব্যাপারে তার মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ। তিনি বললেন, পৃথিবীর এমন কোনো খারাপ কাজ নেই যার পিছনে তাদের হাত নেই। যদি আপনি সংবাদ পান সমুদ্রের অতল গহ্বরে মাছেরা পরস্পর লড়াই করছে, তা হলে বোঝতে হবে সেখানেও তাদের কালো হাত রয়েছে। এমনকি কারো ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া দেখলে মনে করতে হবে এখানেও তাদের চক্রান্ত কাজ করছে। ফিলিস্তিনিরা সন্দেহাতীতভাবে এ কথা বলতে পারবে যে, ফিলিস্তিনের বিভিন্ন শহর ধ্বংস করা এবং সেগুলোকে বিরানভূমিতে পরিণত করা, আরবদের দেশান্তরিত করা এবং তাদেরকে এদিক-সেদিক বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার মূল হোতা ইংরেজজাতি।

এসব লম্পট ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অপরাধে অপরাধী হল ইংরেজরা। ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপর বিপদ ডেকে এনেছে এই জাতিই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর বুকে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ফেতনা-ফাসাদ ও ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ ইংরেজজাতি।

তিনি মুফতি আমিন আলহোসাইনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তার পবিত্রতার সাক্ষ্য দেন। মসজিদে আকসা এবং কুদুসের যেসব লোকের সাথে আমরা সাক্ষাত করি সবাইকে মুফতি হোসাইনীর প্রশংসা করতে শুনি। তাদের সবাইকে তার আশেক মনে হয়েছে। তারপর আমি মসজিদে আকসা যাই। জোহর পর্যন্ত সেখানে লেখালেখিতে ব্যস্ত থাকি।

মসজিদে আকসার নিদর্শনাবলী

আসরের নামাজের পর আমরা শায়খ তাওফিক আলহোসাইনীর সাথে সাক্ষাত করি। তিনি আমাদেরকে পুরনো একটি দেয়াল দেখালেন, যাকে ইহুদিদের 'কাঁদানিয়া দেওয়াল' বলা হয়। তিনি বললেন, ইহুদিদের হাতে তথাকথিত তাওরাতের যে দশটি আহকাম নষ্ট হয়েছে, সেগুলো মসজিদে আকসার কোনো এক অংশে পড়ে আছে। কিংবা কোথাও ডেবে গেছে। এটা বর্তমান ইহুদিদের বিশ্বাস। তাদের যেহেতু ভিতরে প্রবেশ নিষেধ এ জন্য তারা দেয়ালগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন করে। এ দেয়ালটি প্রাচীন বাউন্ডারির একটি অংশ।

আমরা শায়খের সাথে ভূগর্ভে প্রবেশ করি। সেখানে বোঝা গেল একটি বড় বিল্ডিং ও উঁচু উঁচু খাম্বা রয়েছে। কথিত আছে এটি হযরত সুলায়মান আ. এর আস্তাবল। আমরা মসজিদে আকসার চার দেয়ালের আশপাশ ঘুরে দেখি। এর অধিকাংশ জায়গাই জনমানবশূন্য। বিরান হয়ে পড়ে আছে। চারদিকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। এ এলাকা জবরদস্তিমূলক ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত আরবদের অধিবাস ছিল একচ্ছত্র।

আমরা মসজিদের দক্ষিণ কর্নারে অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে প্রবেশ করি। এটা ওআইসিরও কার্যালয়। আমরা তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনাও করি। মাগরিবের নামাজ 'মসজিদে সাখরা'য় আদায় করি। নামাজের পর মসজিদের ইমাম জনাব আসআদের নিকট যাই। সেখানে এক জামাতের সঙ্গে খাবার খাই। তাদেরকে আমার সাথে ভোজে

অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। মসজিদে সাখরায় এশার নামাজ আদায় করি। তারপর খানকায় ফিরে আসি।

ইলমিয়াতুল ইসলামিয়া পরিষদের অনুষ্ঠানে

৯ জুলাই ১৯৫১

সকাল ন'টা। আমরা ইলমিয়াতুল ইসলামিয়া পরিষদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য মারকাজে আওকাফে উপস্থিত হই। এটি মাজলিসুল ইসলামি আল-আলার ভবন। সংস্থাটি ফিলিস্তিনে ইসলামি কায়দায় জীবনযাপনের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করে আসছে। মুফতি আমিন আলহোসাইনীর সভাপতিত্বে আওকাফ অন্যান্য দীনী খেদমতও আনজাম দিয়ে আসছে। এ ভবনেই আওকাফের অফিস। এখানেই মাজলিসের অনুষ্ঠান হয়। এটা এ আয়াতের অত্যন্ত সত্য প্রমাণ, تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ 'আমি সেদিনগুলোকে মানুষের মাঝে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনি।'

[সুরা আলে ইমরান, ১৪০ আয়াত]

ইমাম আসআদ আল হোসাইনী আমাকে অনুষ্ঠানের সভাপতি শায়খ মুহম্মদ আল আমিন শানকিতীর দিকে এগিয়ে ধরলেন। তিনি জর্দানের মন্ত্রী-পর্যায়ের লোক। বাদশা আবদুল্লাহর সচিব। ইতঃপূর্বে তিনি একবার প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। কিছুকাল শিক্ষামন্ত্রীও ছিলেন।

অনুষ্ঠানে আমার আলোচনা

শায়খ শানকিতী খুব আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে আমার সাথে কথা বলেন। 'আপনার আগমন শুভ হোক' বলে আমাকে স্বাগত জানান। পাক-ভারত এবং সেখানকার আলেমদের প্রচেষ্টা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মজলিসের অন্যান্য সদস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর বলেন, আপনার মনে যা আসে এবং যা আমাদের জন্য উপকারী মনে করেন তার কিছু কিছু আলোচনা করুন। আমি শরণার্থীদের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করি। এ সম্পর্কে আলেমদের সাথে সম্পর্ক করতে বলি। শরণার্থীদের মাঝে দাওয়াতি মেহনত আন্‌জাম দেওয়ার কথা বলি। তাদের মাঝে দীনী রুহ ও আত্মসচেতনতা জাগ্রত করা এবং ইসলামি বোধ-বিশ্বাসের জজবা সৃষ্টি করার উপর জোর দিই। এর ফলে তারা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে সক্ষম

হবে। খ্রিস্টান মিশনারি ও কমিউনিজমের প্রচারণা রুখে দিতে পারবে। খ্রিস্টানসম্প্রদায় শরণার্থীদের সাহায্যের নামে জোরে-শোরে মিশনারি তৎপরতা চালাচ্ছে।

এই সামান্য প্রচেষ্টার কারণে তারা সকল বিপদ-আপদ সহ্য করে নিতে পারবে। একজন মুমিন মুজাহিদের ন্যায় এই স্তরগুলো অতিক্রম করতে পারবে। আমি আরও বললাম, এই অবস্থা সাময়িক। বেশি দিন থাকবে না। তবে এর প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী ঈমান। জোরালো দাওয়াত, কর্মতৎপরতা ও রুচিবোধ। আমি ভারতবর্ষের দাওয়াতের স্ত রগুলোর বর্ণনা দিই। এ ছিল আমার 'ভারতবর্ষে ইসলামি দাওয়াত ও তার ক্রমবিকাশ' পুস্তিকার সারমর্ম। শায়খ শানকিতী আমার আলোচনার উত্তরে যথোচিত কিছু কথা বললেন। আমার শোকরিয়া আদায় করলেন। এবং এ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ইলমিয়াতুল ইসলামিয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য

এখানে পাঠককে ইলমিয়াতুল ইসলামিয়া পরিষদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ভালো মনে করছি। প্রফেসর আসআদ আলহোসাইনীর কাছ থেকে আমি যতটুকু জেনেছি এখানে তুলে ধরছি। পরিষদটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। এর কার্যক্রম ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিচে তুলে ধরা হল।

১. সরকারের মধ্যে আলেমদের অবস্থান উঁচু করা।
২. ফজিলত ও উত্তম চরিত্রের দাওয়াত ব্যাপক করা।
৩. ওয়াজ-নসিহতের কর্মসূচি সুবিন্যস্ত করা।
৪. আলেম শব্দের মর্ম নির্ধারণ করা। কাকে আলেম বলা যাবে তা নির্ণয় করা।

এ কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য ১৯৫১-৫২ সনের বাজেট হল ৫৮৮২ জর্দানি দিনার, যা ৭০৫৯৬ রুপি সমপরিমাণ। পরিষদের সদস্য সংখ্যা এগারোজন। তারা প্রত্যেকেই জর্দানের জাদরেল আলেম।

আমি শুনেছি খোদ বাদশা সংগঠনটির প্রতি বিশেষ নজর রাখেন। যে অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে সেখানে পরিষদের আটজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আসরের নামাজের পর আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে যাই। সেখানে ইখওয়ানের স্কাউটিং ও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের খবরাখবর নিই। ক্যাম্পটি খলিল শহরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলাফল, সাথীদের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও সুন্দর নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে তারা অত্যন্ত আনন্দিত।

আমরা আসআদ আলহোসাইনীর সাথে তার ঘরে সাক্ষাত করি। তারপর যাবিয়াতুল হুনুদে ফিরে এসে বিশ্রাম নিই।

কুদুস সফর শেষ হয়েছে। আমরা আম্মানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিই। উদ্দেশ্য সেখানে কিছুদিন কাটাব। তারপর আবার দামেশকে ফিরে যাব।

১০ জুলাই ১৯৫১

গতকাল আমরা আম্মান সফরের প্রস্তুতি নিই। যাবিয়াতুল হুনুদের পরিচালক মাওলানা নাজির হাসান আনসারীর সাথে সাক্ষাত করি। তার কাছে কিছুক্ষণ বসি। তারপর মসজিদে আকসায় ফিরে আসি। মাওলানা মুহম্মদ আলি জাওহারের কবর জিয়ারত করি। ফাতেহা পড়ি। তারপর টেক্সিতে উঠে বসি। জোহরের সময় আম্মান পৌঁছে যাই। সেখানে একটি হোটেলে খানা খাই। খাবারের পর সাআদা বাজারে অবস্থিত আলহাজ কাসেম আমআরীর বাড়ির উদ্দেশে রওনা করি। আমাদের দামেশকের মেজবান শায়খ আবদুল ওহহাব সালাহীর কাছ থেকে একটি পত্র নিয়ে এসেছিলাম। এটি তাকে দিই। তিনি আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। আমাদেরকে অনেক আরামে রাখেন। বাজারে খাওয়ার কারণে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমরা সেখানে পুরোপুরি ইজ্জত ও এহতেরামের সাথে থাকি।

আসরের পর আম্মানের ইখওয়ান-প্রধান আবদুল লতিফ আবু কাওরার সাথে দেখা করার জন্য ইখওয়ানের কার্যালয়ে যাই। কায়রো থাকাকালীন তার সাথে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। ইখওয়ান কার্যালয়ে তাকে পেলাম না। এরপর আমরা মসজিদে কাবিরের দিকে রওনা করি। হঠাৎ দেখি শায়খ মুজাদ্দেদী নামাজের জন্য মসজিদে আসছেন। তার নামাজ পড়া হলে আমরা দেখা করি। এ সাক্ষাতে আমরা সবাই যারপরনাই আনন্দিত হই।

আলহাজ আবু কাওরার ঘরে

আলহাজ আবদুল লতিফ আবু কাওরা মসজিদের দরজায় শায়খ মুজাদ্দেদীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাদের সবাইকে পাহাড়ের

উপর নির্মিত তার ঘরে নিয়ে যান। এখান থেকে পুরো শহর দেখা যায়। আমরা কিছু শুকনো ফল খাই। চা পান করি। এখান থেকে আম্মান দেখা যায়। আলোয় ঝলমল করছে। যেন একটি আনার, যাকে দুটুকরো করা হয়েছে। তার লাল টকটকে দানাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। রাতে যেসব দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মোহনীয় ছিল এটি। আমরা থাকার জায়গায় ফিরে আসি। শায়খ মুজাদ্দেদী বাদশা আবদুল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে 'রাগদান প্রাসাদে' গেলেন।

বাদশা আবদুল্লাহর দাওয়াত

কিছুক্ষণ পর শায়খ মুহম্মদ আল আমিন শানকিতী হাজি কাসেমের দোকান থেকে ফোন করে তাকে জানান যে, মহামান্য বাদশা আপনার মেহমানের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি যেন খুব দ্রুত চলে আসেন।

আমরা সবেমাত্র নৈশভোজে বসেছি। হাজি কাসেম কৌতুক করে বললেন, এখন তো আপনি মহামান্য বাদশার সঙ্গে বিশেষ খাবার খাবেন। আমি বললাম, শাহি খাবারের চাইতে আপনার এ সাধারণ খাবারই আমার বেশি প্রিয়।

তখনই আমরা রাগদান প্রাসাদের উদ্দেশে রওনা করি। তার একজন গার্ডকে আমাদের আসার বিষয়টি আগেই জানানো হয়েছিল। সে রাস্তায় আমাদের সঙ্গে দেখা করে ড্রাইভারকে বলল বাদশা তাঁবুতে আছেন। মেহমানকে সেখানে নিয়ে যাও। আমরা তাঁবুতে পৌঁছি। এখানে তিনি কয়েকজন কর্মচারি ও উপদেষ্টাসহ তাশরিফ এনেছেন। রাস্তায় শায়খ শানকিতী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। আমরা সামনে অগ্রসর হলে বাদশা আবদুল্লাহ সাদাসিধেভাবে আনন্দভরা হৃদয়ে আমাদেরকে স্বাগত জানান। জানতে পারলাম শায়খ মুজাদ্দেদী তার কাছে আমাদের আলোচনা করেছেন। তখন বাদশা তাকে বলেছেন, তাদেরকে কেন নিয়ে আসেননি। তখনই তিনি আমাদেরকে ডেকে পাঠান।

বাদশার সাথে আলোচনা

আমি বাদশাকে সালাম দিই। মুসাফাহা করে তার সামনে বসি। শায়খ মুজাদ্দেদী আমার এবং ভারতে আমার হাসানী খান্দানের পরিচয় তুলে ধরেন। তখন আমি সাইয়েদ শরিফ রেজার লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি

করি। কবিতাটি তিনি জনৈক আব্বাসী খলিফাকে কেন্দ্র করে রচনা করেন। আব্বাসী যুগের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী কবি ছিলেন। তিনি সাইয়েদ বংশীয় ছিলেন। ছিলেন অত্যন্ত আত্মমর্যাদাশীল ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

শরিফ রেজা কোনো এক জায়গায় তৎকালীন খলিফার প্রশংসায় কবিতাটি আবৃত্তি করেন। তখন তিনি নিজের উচ্চমর্যাদাশীল হাশেমী গোত্রের কথা উল্লেখ করে নিজেকে বাদশার সমকক্ষ সাব্যস্ত করেন। শুধু এতটুকু পার্থক্য বর্ণনা করেন, বাদশার মাথায় খেলাফতের মুকুট আছে। আর তিনি এখেকে বঞ্চিত। শাহ আবদুল্লাহ হাসানী মক্কার অভিজাত ও মর্যাদাসম্পন্ন বংশের সদস্য। এ কারণে এ পঙ্ক্তিটি যথোপযুক্ত হয়েছে।

বাদশা পঙ্ক্তিটি বারবার আবৃত্তি করতে থাকেন। এর বাকি অংশটুকু পূর্ণ করেন। বোঝতে পারলাম পুরো কাসিদাটিই তার মুখস্থ। বাদশা আমার দিকে ইঙ্গিত করে শায়খ মুজাদ্দেদীকে বললেন, তার দৈহিক গঠন ইয়ামানের 'হোসনী সাদাত'র ন্যায়।

রাজকীয় দস্তরখানে আমার আলোচনা

এদিক-সেদিক বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হল। তারপর বাদশা খাবারের জন্য উঠলেন। আমাকে তার পাশে বসালেন। দস্তরখানে বসে আমি তাকে বললাম, যে সরকার ইসলামি বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে, দীনকে রাজনীতি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডে চালু করে তার প্রতি সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তিনি এমন ইজ্জত-সম্মানের অধিকারী হন, পৃথিবীর বড় থেকে আরও বড় হুকুমতের ভাগ্যেও তা জোটে না, সে দেশের সীমানা যতই ছোট হোক, তার আমদানি যতই কম হোক। বাদশা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনলেন এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে জবাব দিলেন। খাবারের পর আমরা সকলে বৈঠকখানায় গেলাম। আমি আমার আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখি।

সম্পদ উপার্জন ও তাবলিগ

রাষ্ট্রের দুটি ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি রয়েছে। একটি হল সম্পদ উপার্জন। অপরটি পথপ্রদর্শন। ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি ইসলাহ ও হেদায়েতের উপর হওয়া উচিত। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদি ও দায়ী বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। মাল উপার্জনের জন্য না। হযরত আলি রা.

এবং হযরত মুয়াবিয়া রা. এর মাঝে এই মতবিরোধটিই ছিল। হযরত আলি রা. চাইতেন নববী আদর্শের খেলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকুক। রাজত্বে পরিবর্তন না আসুক।

বাদশার জবাব

বাদশা আবদুল্লাহ আমার সবকথা মনোযোগসহকারে শোনেন। এ পথে এগিয়ে যাওয়ার সমস্যাগুলো বর্ণনা করেন। নিজের নেক আকাঙ্ক্ষার কথা বলেন। রাষ্ট্রকে আরও সমৃদ্ধ এবং সেনাবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন তা উল্লেখ করেন। দেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও পরিকল্পনার ব্যাপারেও আলোচনা করেন। তিনি বলেন, এদেশ প্রথমে একটি ছোট শহর ছিল। জনসংখ্যা সাত হাজারের বেশি ছিল না। এখন অনেক বড় হয়েছে। দুটির মধ্যে এখন তুলনা করা যায় না।

তারপর তিনি আমার পরবর্তী প্রোগ্রাম জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আগামীকাল ইনশাআল্লাহ রওনা করব। এ কথা শুনে তিনি বললেন, হযরত, এখানে কয়েক দিন থাকার মধ্যে কৃপণতা করবেন না। কমপক্ষে তিনদিন তো থাকবেনই। তারপর শায়খ শানকিতীর সঙ্গে কিছু কথা বললেন। আমি শুনিনি। আমি তাকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি হাদিয়া দিই। বাজারে আসার আগেই আমার ইচ্ছা ছিল বইটি তার কাছে পৌঁছাব। আল্লাহ তায়ালা আমার নিজ হাতে বইটি তাকে হাদিয়া দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি শোকরিয়া আদায় করে হাদিয়া গ্রহণ করলেন। তারপর আমরা বিদায় নিয়ে ফিরে আসি। এই বৈঠকে শায়খ মুজাদ্দেদী ও শায়খ শানকিতী ছাড়া জনাব ফওজি পাশা মুলাক্কা ও জনাব ইবরাহিম হাশেম পাশাও ছিলেন।

ফিলিস্তিনের সম্পর্কে কিছু বাস্তবতা

১১ জুলাই ১৯৫১

ফজরের নামাজের পর আমরা আফগান রাষ্ট্রদূত শায়খ মুহম্মদ সাদেক মুজাদ্দেদীর সাথে সাক্ষাত করে বিদায় নিতে হোটেলে যাই। সেখান থেকে আমাদের থাকার জায়গায় ফিরে আসি। শায়খ মুহম্মদ আল আমিন শানকিতী তাশরিফ আনেন। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। তিনি

বলেন, মহামান্য বাদশা গতরাতের সাক্ষাতে দারুণ আনন্দিত হয়েছেন। তিনি আসরের পর তার ঘরে যাওয়ার জন্য আমাকে দাওয়াত দেন।

এর মধ্যে আলহাজ ইবরাহিম মাসউদ আসেন। তার সঙ্গে একজন ফিলিস্তিনি বন্ধুও ছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যবসায়ী। সচেতন ঈমানদার। দীন ও উম্মতের ব্যাপারে তিনি দরদ অনুভব করেন। মানুষের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত। তিনি সেসব মানুষের একজন, যাদের মধ্যে আমি মর্যাদাবোধ, শক্তিশালী ঈমান ও সঠিক চেতনা অনুভব করেছি। তিনি বর্তমান বাদশা এবং তার পর যিনি বাদশা হবেন তার সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে অনেক কিছু জানেন। পরবর্তী বাদশা হবেন আমির তালাল।

ফিলিস্তিনে হাস্যকর এবং হতাশাজনক যে ঘটনা ঘটেছে তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আরব লিগ ও আরব সরকারপ্রধানগণ ফিলিস্তিনের মঞ্চে যে হাস্যোদ্দীপক ও গোঁজামিলের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি খুব ভালো জানেন। তার কাছ থেকে অনেক বাস্তব তথ্য জানতে পারলাম। তার কথা থেকে আমি যে বিষয়টি উদ্ধার করেছি তা হল ফিলিস্তিনের ঘটনাটা একটি নাটক, যাকে ইংরেজ ও তার দোসররা অনেক আগেই সাজিয়ে রেখেছিল। এখানে যুদ্ধ-বিগ্রহের কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। ছিল একটি পরিকল্পিত সাজানো স্কিম। নাটকটির অভিনয়ে ছিল আরব নেতারা। ফিলিস্তিনের নির্দোষ রক্তের দায় তাদের ঘাড়ের উপর বর্তাবে। ফিলিস্তিনের অপমান ও লাঞ্ছনার ব্যাপারে ফিলিস্তিনি জনগণ দায়মুক্ত। কারণ তাদের জানাই ছিল না ভিতরে ভিতরে কী খেলা চলছে। তা ছাড়া তাদের সন্ধি বা যুদ্ধ করার অধিকার ছিল না। অভিজ্ঞতাও ছিল না।

জানতে পারলাম, গালিব পাশা ইংরেজদের সন্ধিরই উকিল ছিল না। সে ইহুদিদেরও উকিল ছিল। সে জর্দান সেনাবাহিনীর নামে বিভিন্ন শহর দখল করে ইহুদিদের জন্য ছেড়ে দিত। আবার কখনো আরব সেনাবাহিনীকে পিছনে সরিয়ে দিত। এবং তাদের সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াত। তখন ইহুদিরা এসে সে এলাকা দখল করে নিত। তিনি বললেন, গালিব পাশা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রাজ রিচার্ড সার্ডিলের অনুগত গোলাম ছিল। তার মধ্যে ক্রুসেডের চেতনা কাজ করছিল। আমার মন চায় তাকে একবার দেখে আসি এবং তার এই অপতৎপরতা সফল হওয়ার জন্য 'মোবারকবাদ' জানাই।

মুহম্মদ শানকিতীর সাক্ষাত

আমরা জনাব মুহম্মদ আল আমিন শানকিতীর নিকট যাই। একটি সুন্দর ও মনোলোভা জায়গায় গিয়ে বসি। জায়গাটি শান-শওকতের দিক দিয়ে রাজা-বাদশাদের মহলের সাথে তুলনা করা যায়। এখানে চা-নাশতা খাই। তারপর আমরা তার সঙ্গে আলহাজ নাশেদ, শায়খ মুহম্মদ ইউসুফ আবদুর রহমান বারকাবী ও শায়খ মুহম্মদ মালিক শানকিতীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আম্মান স্টেশনে যাই। প্রথমজনের সাক্ষাত না পেয়ে দ্বিতীয়জনের নিকট গেলাম। শরণার্থী শিবিরের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করি। শরণার্থীদের ঝুঁপড়ি ও তাঁবুগুলো সেসব বালাখানার পাশে, যা আম্মানের সৌন্দর্যের প্রতীক। আম্মানের গর্ব অহঙ্কার।

শরণার্থীদের করুণ দশা

এ করুণ অবস্থা মূলত একটি কঠিন মসিবতের আভাস দেয়। এ অবস্থা কিছুতেই আল্লাহ তায়ালার পছন্দ না যে, কিছু লোক ক্ষুধায় কাতরাবে আর কিছু লোক বদহজমে মরবে। তাদের বহুজনের ঘর নেই। তাঁবুতে থাকে। রোদ-বৃষ্টি-ঝড় তাদের নিত্যসঙ্গী। এসব থেকে তাদেরকে বাঁচানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। অপর দিকে এমন লোকেরও অভাব নেই, যারা বালাখানায় জীবন-যাপন করছে, যাদের প্রয়োজনের চাইতে বেশি ঘর-বাড়ি রয়েছে। এর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সেই ব্যক্তির সাথে, যার হালকা-পাতলা গড়ন। কিন্তু গায়ে ঢিলেঢালা লম্বা জামা।

আমরা শায়খ মালিক শানকিতীর সঙ্গে দেখা করি। দীর্ঘক্ষণ তার সাথে কথা বলি। থাকার জায়গায় ফিরে এসে জানতে পারি বাদশা বারবার আমাদেরকে তালাশ করেছেন। শায়খ মুহম্মদ আল আমিন শানকিতী দোকান থেকে ফোনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন। বাদশা মিসরের 'মজলিসে শুয়ূখ'র এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণের জন্য আমাদেরকে খুঁজেছিলেন। তারা রাতে বাদশার মেহমান হয়েছিলেন। আমরা তাদের সাথে দেখা করিনি। হাজি কাসেমের জনৈক বন্ধু তাকে জানিয়ে দিয়েছেন মেহমান শহর দেখতে বাইরে গেছেন।

ইলমিয়াতুল ইসলামিয়া কলেজ ভ্রমণ

১২ জুলাই ১৯৫১

শায়খ মুহম্মদ ইউসুফ আবদুর রহমান বারকাবী এবং আম্মানের ইখওয়ান-সভাপতি আলহাজ আবদুল লতিফ আবু কাওরা আমাদের নিকট আসেন। আসর পর্যন্ত থাকেন। তারপর আমরা আলহাজ আবদুল লতিফের সঙ্গে 'ইলমিয়াতুল ইসলামিয়া কলেজ' দেখতে যাই। শুভাকাঙ্ক্ষিদের সাহায্য-সহযোগিতায় কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন্ধুবর হাজি আবদুল লতিফ এটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি এখানে বড় অংকের অনুদানও দিয়েছেন। তার পর অন্যান্য দিক থেকে অনুদান আসা শুরু হয়।

আমরা কলেজের বিভিন্ন বিভাগ, লাইব্রেরি, মসজিদ এবং হলরুম ঘুরে দেখি। প্রাইমারির প্রধানশিক্ষক মাহমুদ আবেদীর অফিসে যাই। তার সাথে আলোচনা করি। শহিদ নুরুদ্দীন জঙ্গী, গাজি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ও ক্রুসেড যুদ্ধ[১] সম্পর্কে কথা হয়। মাহমুদ আবেদী বলেন, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার জন্য মিসর থেকে বের হয়েছিলেন।

রাফাহ ক্রসিং আরব লিগের সবচেয়ে বড় ভুল

আরব লিগ ও আরব সরকারগুলোর সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ফিলিস্তিন থেকে মিসর যাওয়ার স্থলপথ রাফাহ ক্রসিং বন্ধ করার অনুমতি দেওয়া। এর ফলে ইহুদিরা রাস্তাটি দখল করে নেয়। মিসর যদি ফিলিস্তিনে সাহায্য বা সেনাবাহিনী পাঠাতে চায় তা হলে এ স্থলপথ ব্যবহার করা এখন আর সম্ভব হবে না।

---

[১] ১০৯৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচশ বছর জেরুসালেম মুসলমানদের শাসনাধীনে ছিল। ১০৯৫ সালে ফাতেমী শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে পোপ দ্বিতীয় অরবন খ্রিস্টান বিশ্বের প্রতি জেরুসালেম শহর উদ্ধারের জন্য ক্রুসেডের [ধর্মযুদ্ধ] ডাক দেয়। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ১০৯৯ সালে জেরুসালেম দখল করে নেয়। মিসরের সুলতান সালহুদ্দীন আইয়ুবী ১১৭১ সালে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেন। ১১৮৭ সালে হিত্তিনের যুদ্ধে জয় লাভের মধ্য দিয়ে এ অভিযান পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়।

প্রবন্ধের প্রস্তুতি

আমি 'দামেশক ইউনিভার্সিটি'তে একটি প্রবন্ধ পাঠের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। প্রবন্ধটির প্রস্তুতি সম্পর্কে ভাবছিলাম। বিষয় 'আরবজাহান যেভাবে তার নেতৃত্ব ফিরে পাবে' হওয়ার বেশি সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যখন ফিলিস্তিন সফর করি এবং কুদুসে কিছুদিন অতিবাহিত করি তখন ফিলিস্তিনই আমার চিন্তায় প্রাধান্য পায়। ফিলিস্তিনের অবস্থা বড় নাজুক। ভয়াবহ। এখন এ বিষয়টিই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে 'ফিলিস্তিন ধ্বংসের কারণ' বিষয় নির্ধারণ করি। আমি নিয়ত করেছি সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জীবনী অধ্যয়ন করব। তিনি যেসব গুণ ও চরিত্রের অধিকারী ছিলেন সেগুলি সম্পর্কে ধারণা নিব। ক্রুসেডারদের উপর তার বিজয় লাভের রহস্য জানব। তার এবং যারা আজ ফিলিস্তিনের সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে তাদের মধ্যকার পার্থক্য জানব।

সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর জীবন-চরিতের উপর লেখা বই সম্পর্কে জানতে চাইলাম। জনাব আবেদী বললেন, আমার নিকট ইবনে শাদ্দাদের 'ইয়োসুফি সৌন্দর্য'[২] এবং ইবনে ইমাদ কাতেবের 'অকাট্য বিজয়'[৩] আছে। গ্রন্থ দুটি তিনি আমাকে ধার দিলেন। ইবনে শাদ্দাদের গ্রন্থে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল। আমি প্রবন্ধ রচনার সময় এ গ্রন্থ থেকে বেশি উপকৃত হয়েছি। প্রবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ফিলিস্তিন সমস্যার মূল কারণ'।

এশার পর আমরা হাজি কাসেমের এক বন্ধুর বাসায় যাই। তার নাম হাজি বাশার। তিনি শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদের একজন। তার ওখানে একজন কুর্দি সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তুর্কিদের বিরুদ্ধে কুর্দিদের বিদ্রোহের সময় তিনি তুরস্ক থেকে হিজরত করে এসেছিলেন। তিনি শিক্ষিত এবং আত্মমর্যাদাশীল মুসলিম। তার থেকে জানলাম, তিনি ইরানের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মুসাদ্দাকের নিকট ছিলেন। তিনি তারবার্তা পাঠিয়েছেন। তারবার্তায় দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও সফলতার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাকে মোবারকবাদ জানিয়েছেন।

---

[২] المحاسن اليوسفية

[৩] الفتح القسى

বাদশার দাওয়াতে

১৩ জুলাই ১৯৫১

আমরা জুমার নামাজের জন্য মসজিদে যাই। গেটে এক প্লাটুন সৈন্য মোতায়েন দেখতে পাই। অনুমান করলাম বাদশা এখানে জুমার নামাজ আদায় করবেন। অল্পক্ষণ পর বাদশা তাশরিফ আনলেন। মেহরাবের কাছাকাছি নামাজ আদায় করলেন। নামাজের পর জানতে পারলাম বাদশা শাহিমহলে তার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণের জন্য আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন।

আমাদের বন্ধু ও মেজবান হাজি কাসেম আমআরী সুন্নত পড়ছিলেন। দুজন সিপাহি তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। সালাম ফিরালে সিপাহি দুজন তাকে বললেন, তিনি যেন আমাদেরকে শাহিমহলে নিয়ে যান। বাদশা আমাদের অপেক্ষায় আছেন। উপস্থিত লোকজন বোঝতে পারল সৈন্য দুজন তার অপেক্ষায় ছিল। নামাজের পর তার সাথে কিছু কথা বলেছে। এতটুকুতেই সারা শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়ল হাজি কাসেম মসজিদে গ্রেফতার হয়েছেন। এতে তার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা পেরেশান হয়ে পড়েন। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো ছিল। তিনি তার মেহমানসহ বাদশার মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে শাহিমহলে গিয়েছেন।

রাজধানীতে থাকাকালীন ইতঃপূর্বে হাজি কাসেম বাদশার সাথে কখনোই সাক্ষাত করেননি। তাই শাহিমহলে যেতে কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে যান। আমাদের কারণে তার সাহস বৃদ্ধি পেল। আমরা শাহি মহল অভিমুখে রওনা করি। সেখানে পৌঁছুতেই বাদশা আবদুল্লাহ হাজি কাসেমকে বললেন, মেহমানকে নিয়ে আসতে এত বিলম্ব করলেন কেন? হাজি কাসেম এর কোনো উত্তর না দিয়ে বাদশাকে সালাম দিলেন। তার হাতে চুমু খেলেন।

আমরা দস্তরখানে বসলাম। বৃহস্পতিবার না আসতে পারায় দুঃখ প্রকাশ করলাম। বললাম, আমরা দাওয়াতের সংবাদ সফর থেকে ফিরে এসে পেয়েছি। তিনি বললেন, আমি চাচ্ছিলাম মিসরের ওই প্রতিনিধি দলের সাথে আপনার সাক্ষাত হোক।

'বিশ্ব কী হারালো'র উপর পর্যালোচনা

বাদশা আমার 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' গ্রন্থের কিছু অংশ পড়েছেন। তিনি আমাকে ডক্টর আহমদ আমিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তার সম্পর্কে আমার যা কিছু জানা ছিল বর্ণনা করি। বাদশা তার সমালোচনা করে বললেন, তিনি ভূমিকা লিখে বইটির মান কমিয়ে দিয়েছেন। ভূমিকাটি বইয়ের ভীষণ ক্ষতি করেছে। এটা বই থেকে পৃথক থাকাটাই সমীচীন ছিল। এ ধরনের ভূমিকার কোনো প্রয়োজন নেই। আমি বললাম, যেই ব্যক্তি এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন যে, শুধু ইসলামই পৃথিবীতে নেতৃত্বের আসনে থেকে সফলতার সুউচ্চ শিখরে পৌঁছুতে পারে তিনিই এ বইয়ের ভূমিকা মনোযোগ ও উদ্যম নিয়ে লিখতে সক্ষম।

আফসোস, আমাদের অনেক সাহিত্যিকবন্ধু মনে করেন ইসলামের জামানা ফুরিয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তার যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করা বৃথা। এ চিন্তাধারা এই বইয়ের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। আমি সাইয়েদ কুতুবকে আবেদন করব তিনি যেন এর একটি ভূমিকা লিখে দেন। তিনিই এ কিতাবের ভূমিকা লেখার বেশি উপযুক্ত।

মসজিদে আকসা সম্পর্কে

আলোচনার এ ধারা বহুক্ষণ চলতে লাগল। বাদশার মুখে এমন কথা শুনি, যা তার গভীর অধ্যয়নের সাক্ষ্য দেয়। কুরআন নিয়ে গবেষণা এবং তাতে ডুবে থাকার প্রমাণ বহন করে।

আমি মসজিদে আকসার প্রতি বাদশার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। শরণার্থীদের দিকেও মনোযোগ দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি এর প্রতিশ্রুতি দেন। তারপর এমন কিছু আপত্তির কথা বলেন, যা মসজিদে আকসায় দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। তিনি বলেন, যে কমতি আপনি এখন অনুভব করছেন তা সময়ের সংকীর্ণতা, শত্রুর সংখ্যাধিক্য ও বন্ধুদের হিংসার কারণে হয়েছে। দ্বিতীয়বার সফরে এসে আপনি ইনশাআল্লাহ এমন কিছু দেখবেন, যা আপনাকে আশ্বস্ত করবে। আপনি খুশি হবেন। 'বিশ্ব ও আরব উপদ্বীপ' এবং 'ইসলামের কবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল' বই দুটো তাকে হাদিয়া দিই। তারপর তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

ইখওয়ানরা তাদের কার্যালয়ে আমার আলোচনা করার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন। আলোচনার বিষয় ছিল 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো।' এটি আমার বইয়েরও নাম। লেখক, সাহিত্যিক ও শিক্ষিত লোকদের এক বিশেষ দল জমায়েত হয়েছেন। আমি আলোচনার কোনো প্রস্তুতি নিইনে। উপস্থিত মাথায় যা আসে তা-ই উপস্থাপন করি। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়ের সারমর্ম পেশ করি। এর চেতনা তুলে ধরি।

ইখওয়ানের কার্যালয় থেকে আমরা জনাব আবদুল লতিফের বাসায় যাই। সেখানে এশার নামাজ আদায় করি। তারপর খানা খাই।

১৪ জুলাই ১৯৫১

সকাল বেলা। আম্মান থেকে গাড়িতে উঠি। আসরের সময় দামেশকে পৌঁছে যাই। পূর্বসিদ্ধান্ত মোতাবেক 'হালবুনি'তে অবস্থিত শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহীর বাড়িতে অবস্থান করি। তিনি একজন নেককার বুজুর্গ। অত্যন্ত উন্নত স্বভাব-প্রকৃতির লোক। আমাদের পূর্বের মেজবান সাইয়েদ মাহমুদ হাফিজের শ্বশুর তিনি। তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রধান। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী মানুষ। ভীষণ দুঃসাহসী।

১৫ জুলাই ১৯৫১

শায়খ আহমদ কাফতারুর নিকট যাই। তার থেকে আমার অনেকটি পত্র গ্রহণ করি। সবকটিই মদিনা মুনাওয়ারা থেকে আসা। সেসবের মধ্যে আমার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ রাবে নদবীর পত্রও ছিল। এখানে মুহম্মদ নমর আসেন। তিনি বর্তমানে ফিলিস্তিনের সম্মানিত খতিব। এর আগে তিনি হাইফার খতিব ছিলেন। 'আলকুরআনের পথনির্দেশ'[১] তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি। তারপর আমরা শায়খ বাহজা আল বায়তারের নিকট যাই। তার মজলিস পূর্বের মতই মুগ্ধকর। চমৎকার। সাহিত্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা, ইতিহাস এবং তাফসির ও হাদিসের জ্ঞানে পরিপূর্ণ।

---

[১] من هدى القرآن

শায়খ মুসতফা সিবায়ীর সাক্ষাত

আমরা শোনতে পেলাম প্রফেসর সায়িদ রমজান উমাইয়া হোটেলে অবস্থান করছেন। তার সাক্ষাতে গিয়ে দেখি ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের একটি বড় জামাত তাকে ঘিরে আছে। আমরা দুজন তার সাথে দেখা করি। ভিড়ের কারণে একসাথে দেখা করতে পারিনি। যেন আমরা বিচ্ছিন্ন দুই ভাই। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আঞ্চলিক প্রধান শায়খ মুসতফা সিবায়ী আসেন। আমি তাকে এ-ই প্রথম দেখি। তিনি অত্যন্ত ভালবাসা ও উদ্যম নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করেন।

তিনি আমার পাকিস্তান সফরের সময় লেখা কিছু প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেন। প্রবন্ধগুলো আমার কোনো পাকিস্তানি বন্ধু তাকে হাদিয়া দিয়েছিলেন। শেষে বললেন, 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইয়ের লেখকের সাথে সাক্ষাত করার আমার খুব আগ্রহ ছিল। আজ তা পূরণ হল। আমরা উভয়ে একে অপরের চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও চেতনা এক ও অভিন্ন হওয়ার কথা উল্লেখ করি।

রিয়াজ সুলেহ বেগের হত্যাকাণ্ড

১৬ জুলাই ১৯৫১

শায়খ আহমদ কাফতারুর বাড়িতে নাশতা-পর্ব সমাপ্ত করি। তার বাগানে গিয়ে ঝরনার পাশে গাছের ছায়ায় বসি। কফি পান করি। শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ[২] আমাদের সাথে দেখা করতে আসেন। তার লেখা কয়েকটি গ্রন্থ আমাকে উপহার দেন। গ্রন্থগুলো নতুন পদ্ধতিতে লেখা। তথ্য-উপাত্তে ভরপুর।

আজকের দৈনিক পত্রিকাগুলো লেবাননের দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী রিয়াজ সুলেহ বেগের আকস্মিক মৃত্যুর খবর ছেপেছে। হত্যাকাণ্ডটি আম্মান বিমানবন্দরে ঘটেছে। তিনি তার এলাকায় যাচ্ছিলেন। বিভিন্ন সভা-

---

[২] প্রসিদ্ধ আলেম ও হাদিসতত্ত্ববিদ । ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার হালবে তাঁর জন্ম। তাঁর বংশ পরম্পরা হযরত খালেদ বিন অলিদ রা. পর্যন্ত পৌঁছয়। আল্লামা মুহম্মদ জাহেদ কাওসারী তাঁর উল্লেখযোগ্য উসতাদ। তিনি সত্তরের অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। الرسول المعلم ও قيمةالزمان عندالعلماء তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ১৯৯৭ সালে সৌদি আরবের রিয়াদে তিনি ইনতেকাল করেন।

সমাবেশ ও মজলিসে এটি আজকের আলোচনার একমাত্র বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিছু লোক পাঁচমুখে তার প্রশংসা করছে। তারা তাকে আরবের সফল নেতাদের একজন গণ্য করছে। আর কিছু লোক তাকে ইহুদিদের সাথে আরবের যুদ্ধ বাধানোর মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করছে। সিরীয়রা তাকে সিরিয়ার তিনটি জেলা খ্রিস্টান অধ্যুষিত লেবাননের অন্তর্ভুক্ত করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করছে। তার মধ্যে সিরিয়ার ত্রিপলি শহরটিও আছে। কারণ তিনি লেবাননের আরব লিগে প্রবেশের শর্ত দিয়েছেন সিরিয়া এসব জেলায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। এগুলো লেবাননকে দিয়ে দিতে হবে। সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী জামিল মরদম বেগকে তিনি তার চাতুর্য, বাগ্মিতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে একপ্রকার রাজি করে ফেলেছিলেন। যাই হোক, তিনি আরবের সেসব নেতার একজন ছিলেন যারা পশ্চিমা রাজনৈতিক চেতনায় লালিত-পালিত হয়েছেন। তার সরকার আরবের সেসব সরকারের একটি, যারা ইউরোপকে সন্তুষ্ট রেখে চলে।

তার আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাছে পছন্দনীয় হওয়ার কথা নয়। তবে এটা প্রমাণ করে জনগণের মাঝে ক্ষোভ ছিল এবং দেশের সার্বিক অবস্থা ভালো ছিল না। নেতাদের কাজে লোকজন বিক্ষুব্ধ ও মনোক্ষুণ্ন ছিল, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটল এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

জনাব মোবারকের আলোচনা

আজ দুপুরের খাবার খাই প্রফেসর আবু ইজ্জাহ আমিন গিফারীর বাসায়। আসরের সময় হাওরানের মুফতি শায়খ বারাকাত আহমদ আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন। আমরা তার সাক্ষাতে ধন্য হই। আহমদ আবদুল গফুর আত্তার আমার সম্পর্কে তার কাছে বলেছিলেন। গায়েবিভাবে আমাকে পরিচয় করিয়েছিলেন। দামেশকের সংসদসদস্য প্রফেসর মুহম্মদ মোবারকও আসেন। আমাদের সাথে তার সাক্ষাত হয়। খুব চমৎকার মজলিস হয়েছিল। তিনি এদেশের রাজনীতির চড়াই-উৎরাইয়ের বর্ণনা দেন। তার আলোচনা ছিল চিন্তাশীল। তথ্যভিত্তিক। তার এই আলোচনা থেকে আমি অনেক কিছু আহরণ করি। দেশের রাজনৈতিক ও দীনী অবস্থার মোড় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাই।

শায়খ হাসান হাবান্নাকার সাক্ষাত

১৭ জুলাই ১৯৫১

সাইয়েদ মাহমুদ হাফিজের নিকট নাশতা করি। তারপর তার সাথে গিয়ে মায়দান এলাকায় শায়খ হাসান হাবান্নাকার সঙ্গে সাক্ষাত করি। তিনি দামেশকের একজন বড় মাপের আলেম। শিক্ষা-দীক্ষা যোগ্যতার জগতে তিনি অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব। দামেশকের মায়দান এলাকাটি দীন ও ইলমের মারকাজ হিসেবে প্রসিদ্ধ। ইসলামি রীতি-নীতি ও প্রাচ্যের নিয়ম-নীতি অনুযায়ী জীবনধারণের ক্ষেত্রে এ এলাকার মানুষ বিখ্যাত। দামেশকের অধিকাংশ আলেম এই এলাকায় থাকেন। কেউ কেউ হয়তো অল্প দিনের মধ্যে অন্যত্র চলে যাবেন। এখানে এখনো শায়খ বাহজা আল বায়তার, শায়খ হাসান হাবান্নাকা, শায়খ জায়নুল আবেদিন, শায়খ মক্কী কাত্তানীর মত বড় বড় বহু ব্যক্তি রয়েছেন।

দীনী মাদরাসা ও তার রদবদল নিয়ে আলোচনা

শায়খ হাসানের নিকট দীনী দাওয়াত, দাওয়াতি মেহনতকে মাদরাসা শিক্ষার সঙ্গে একীভূত করা, ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতভাবে জামাতে বের হওয়া, জনসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া এবং দীনের প্রাথমিক ও মৌলিক বিষয়গুলোর প্রচার-প্রসার ঘটানোর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করি। এই কর্মসূচির উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলি, এতে ছাত্রদের মধ্যে দীনী রুহ সৃষ্টি হবে। দাওয়াতের মশক হবে। জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক পয়দা হবে। এভাবে একে অপরকে বোঝতে শিখবে।

এই বিষয়টি মাদরাসাগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে নেই। দীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা এখন একটি শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। যান্ত্রিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। যাতে নেই প্রাণশক্তি। নেই অন্তরের ব্যথা ও অস্থিরতা। ভিতরে আবেগ-উচ্ছ্বাস নেই। অনুভূতি নেই। ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে রুহানি সম্পর্ক তো আকাশ-কুসুম কল্পনা।

এর জন্য মাদরাসা থেকে বের হতে হবে। তা হলে নতুনভাবে সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। ফলে ছাত্ররা উপকৃত হবে। অপর দিকে জনসাধারণও লাভবান হবে। তারা দীনের খোরাক পাবে।

শায়খ হাবান্নাকা আমার কথাগুলো খুব মনোযোগসহকারে শ্রবণ করেন। পাক-ভারত এবং সিরিয়ার মাদরাসাগুলোর পরিবর্তনটা এক ধরনের কি না তার হিসাব নেন। তারপর বলেন, মাদরাসাগুলোর এ পরিবর্তন বরং স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে আধুনিকতার রঙে রঞ্জিত হওয়ার পূর্বে আমরা এক খান্দানের লোক ছিলাম। ছাত্র-শিক্ষক সবাই এক পরিবারের সদস্য ছিলাম। একে অপরের সঙ্গে জীবন কাটাতাম। একে অপরের সেবা করতাম। অনেকদিন পর বাড়িতে যেতাম। সময়ের সিংহ ভাগই ছাত্রদের মাঝে কাটাতাম।

কিন্তু জামানার পালাবদলে আমাদের মাদরাসাগুলোতে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি চলে এসেছে। দীক্ষায়ও নতুনত্ব এসেছে। ফলে ছাত্র-শিক্ষক দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে অনেক পর্দা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন নতুন পদ্ধতি ও নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। এ কারণে আমরা আগের মত রুহশূন্য প্রাণহীন হয়ে গেছি। আমাদের মাঝে কোথাও কোনো সঞ্জীবনী শক্তি নেই।

সাধারণ্যের মাঝে দীনী দাওয়াতের প্রভাব

তারপর শায়খ হাবান্নাকা জনসাধারণের মাঝে দীনী দাওয়াত এবং মুখলিস দীনী ব্যক্তিত্বের প্রভাবের আলোচনা করেন। তিনি শায়খ আলি দাকার, জনসাধারণের মাঝে তার প্রভাব এবং এর কারণে ক্ষিপ্রতার সাথে লোকজনকে দীনের দিকে ধাবিত হওয়ার বর্ণনা দেন। তারপর বলেন, এ অবস্থা ফরাসিদেরকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। তারা একে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র মনে করছে। এই ধার্মিক প্রজন্মের প্রভাব ভবিষ্যতে ভালো কিছু হবে। এ কারণে ফরাসিরা লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দাড়ি বড় করা, সুন্নতের এহতেমাম করা এবং দীনী নিয়ম-নীতি গ্রহণ করার পর কী হবে? এরপর কি কোনো রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্লান-পরিকল্পনা আছে? এর জন্য কী প্রস্তুতি চলছে? এজাতীয় বহুপ্রশ্ন। আসলে তারা শায়খ আলি দাকারের প্রভাবে লোকজনকে দীনের দিকে ধাবিত হতে দেখে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

শায়খ হাসান হাবান্নাকা দাওয়াতের প্রসার ঘটিয়ে, জনগণের উদ্দেশে কাজ করে, তাদের মাঝে দীনী সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং এসব কাজে

তার যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে সেই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সিরিয়ার জনগণের সুস্থ মনন ও উন্নত চরিত্র এবং দীনী দাওয়াতের দ্বারা তাদের প্রভাবিত হওয়ার কথা বলেন।

প্রফেসর মুহম্মদ নমর আলখতিব আমাদের জন্য তার ঘরে একটি মজলিস আয়োজন করেন। সেখানে বেশ কজন শিক্ষিত ফিলিস্তিনি এবং কয়েকজন আলেম অংশগ্রহণ করেন।

১৮ জুলাই ১৯৫১

আজ সারাদিন 'ফিলিস্তিন সমস্যার মূল কারণ' প্রবন্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকি। আগামী সোমবার প্রবন্ধটি দামেশক ইউনিভার্সিটিতে পড়ব। দামেশকে পৌঁছার পর থেকেই এ রচনাটি আমার চিন্তা-চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়ব এভাবেই থাকবে। সকল রচনার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আমার এ অবস্থা হয়। কারণ এগুলো আমার হৃদয়ের অভিব্যক্তি, আমার চিন্তা-চেতনার মূল নির্যাস। চাই এ রচনা মানুষকে সন্তুষ্ট করুক বা না করুক।

কবি হাওমানির সঙ্গে কথাবার্তা

আজ আসরের পর সিরিয়ার প্রসিদ্ধ কবি মুহম্মদ আলি আলহাওমানি এই অধমকে খোঁজতে এসেছেন। এর আগেও তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। বন্ধুবর আহমদ আবদুল গফুর তার কাছে আমার আলোচনা করেছিলেন। সেই থেকেই আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে তিনি উদগ্রীব ছিলেন। আমার সে সময়টায় লজ্জা অনুভূত হয় যখন কোনো লেখক, সাহিত্যিক ও আহলে ইলম আমার ব্যাপারে শুনে বা আমার কোনো কিতাব পড়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

জনাব হাওমানি বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। নিজের লেখা কবিতা পড়ে শোনান। অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। আরব সরকার এবং আরবজাতি সম্পর্কে তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি তাদের দুর্বল পয়েন্টগুলো জানেন। এগুলোর সমালোচনাও করেন। তিনি দেশের জনগণের চারিত্রিক অবক্ষয়, রুহানিয়তশূন্যতা, বস্তুবাদের প্রাধান্য এবং নেতৃস্থানীয় শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করেন। নেতৃত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ির এ পৃথিবীতে

ইখওয়ানদের প্রকাশ্যে ইসলামি চিন্তা ও আদর্শ লালন করা, দীনী চেতনা জাগ্রত করা এবং ফিলিস্তিনের ময়দানে জিহাদের জজবা ও শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইতঃপূর্বে আমি আরব সেনাবাহিনীর যুদ্ধ না করা, ফিলিস্তিনের শহর খালি করে দেওয়া এবং পিছনে ফিরে আসা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি এসব কথায় তার সমর্থন পাওয়া যায়। জনাব হাওমানি ফিলিস্তিনে অবস্থানকারী জনৈক মিসরীয় প্রত্যক্ষদর্শীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মিসরি সেনাবাহিনীকে রণাঙ্গন থেকে শুধু পিছনের চৌকিগুলো খালি করেই নয় বরং এরচেয়ে বহু পিছনে চলে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। ময়দানে শুধু ইখওয়ানরা থেকে যায়। তারাই ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি একনাগাড়ে বহুদিন তাদের সাথে ছিলাম। যাতে তারা গোস্বায় আত্মঘাতি কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে বসে। নিজেদেরকে এমন জায়গায় না নিয়ে আসে যেখান থেকে ফিরে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

নতুন মুখের সাক্ষাত

জনাব হাওমানি ও প্রফেসর কালকিলীর সাথে মাগরিবের পর আমরা শায়খ বাহজা আল বায়তারের বাড়ির উদ্দেশে বের হই। তিনি কয়েকজন সংসদসদস্য, সাংবাদিক, বিভিন্ন সংস্থার সেক্রেটারি আর কিছু শিক্ষিত লোককে সাক্ষাত ও পরিচয়ের জন্য দাওয়াত করেছেন। সেখানে সিরিয়ার আলেম শায়খ মুহম্মদ আলি জাবিয়ানের সাথে সাক্ষাত হয়। মাওলানা শিবলী নোমানী তার সফরনামায় শায়খ আলি জাবিয়ানের কথা উল্লেখ করেছেন। সফরনামাটির নাম 'রোম থেকে শাম'। মাওলানা নোমানী তার সাথে ইস্তাম্বুলে সাক্ষাত করেছেন। আমরা আহলে ইলম ওলামায়ে কেরামের সাথে কথা বলি। কিছু ফল-ফ্রুট আর কফি পানের পর ফিরে আসি।

আমার ফিলিস্তিন সম্পর্কীয় রচনার উপাদান

১৯ জুলাই ১৯৫১

একটি রচনার প্রস্তুতিতে আজ সারাদিন ব্যস্ত থাকি। শায়খ বায়তারের কুতুবখানা থেকে ইবনুল আসিরের 'তারিখুল কামিল' এবং ইবনে

কাসিরের[১] 'বিদায়া ও নিহায়া' ধার নিই। ইবনে শাদ্দাদের কিতাবের কিছু নির্বাচিত অংশ আমার কাছে আগে থেকেই ছিল।

ফিলিস্তিন ধ্বংসের গুরুত্বপূর্ণ কারণসমূহ নিয়েই আমার এ রচনা। এর মধ্যে প্রথম কারণ হল নিজেদের নীতি-আদর্শ ও আকিদা-বিশ্বাসের জন্য জীবনবাজি রাখার ও প্রাণ উৎসর্গ করার মত আবেগ-অনুভূতির বড় অভাব। আলোচনার শুরুতেই বলে দিতে চেয়েছি যে, রাসুল সা. ছোট-বড় সকল মুসলমানের অন্তরে ঈমান, একিন, আকিদা ও জান্নাত অর্জনের আগ্রহ-উদ্দীপনা কী পরিমাণ সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর এই ঈমান, যা আরবদের সবচেয়ে বড় শক্তি, সবচেয়ে বড় পুঁজি, কীভাবে দুর্বল হয়ে গেল। বিভিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বস্তুবাদ কীভাবে তাদেরকে গ্রাস করে নিল। তারা জীবনের ওই চাবি খুইয়ে ফেলেছে। নিজেদের পুঁজি হারিয়ে খালি হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় কারণ হল আকলকে আবেগের উপর প্রাধান্য দেওয়া। জান কোরবানির ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার আবেগ হারিয়ে ফেলা। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি চিন্তা করা। ফলাফল ও পরিণাম নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া। এখানে আমি সমীচীন মনে করেছি রুহানি শক্তি এবং বিপদের সময় সিনা টান করে দাঁড়ানোর জজবা সম্পর্কে কিছু কথা বলে দেওয়া। এ জজবা ও আবেগ ঈমানি শক্তিবলে অর্জিত হয়। আমি বিশ্লেষণ করি যে, আরবদের ইতিহাসে এ বিষয়টির মর্যাদা কী পরিমাণ এবং এর শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়।

আমি সেসব উজ্জ্বল কীর্তি ও অবদানের কথা উল্লেখ করতে চাই, যা আরবদের শানদার বিজয়, জাজ্বল্য সাফল্য ও শ্রেষ্ঠ মানব হওয়ার কারণ ছিল। যেই সভ্যতা-সংস্কৃতি উন্নতির চাবিকাঠি ছিল, তা বড় বড় ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দান করেছে। একটি চমৎকার তামাদ্দুনের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যার ছায়াতলে শুধু মুসলমানই না বরং বিশ্ববাসী প্রশান্তি পেয়েছে।

---

[১] হাফেজ ইবনে কাসির রহ.। তাফসিরের সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ তাফসিরে ইবনে কাসিরের রচয়িতা। বিদায়া ওয়ান নিহায়াসহ হাদিস, তাফসির, ফিকাহ ও ইতিহাসের উপর অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়ার অনুসারী ছিলেন। অধিক অধ্যয়নের ফলে শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান। তিনি ৭০০ হিজরিতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭৭৪ হিজরির ২৬ শাবান ইনতেকাল করেন।

সুফল পেয়েছে। নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করেছে। আমি এও বলে দিয়েছি যে, আরবজাতি নিজেদের শৌর্য-বীর্য, সাহসিকতা, অগ্রসরমানতা এবং ইজ্জত-সম্মানের তোয়াক্কা না করে হাসিমুখে কষ্ট বরণ করে নেওয়ার জজবা খুইয়ে ফেলেছে। এও বলে দিই যে চিন্তা-চেতনায় তারা কী পরিমাণ অতিরঞ্জন করছে। অন্যের উপর নির্ভর করার দোষ তাদের মধ্যে চলে এসেছে। আল্লাহর উপর ভরসা করার গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। এখন তারা এতটাই কাপুরুষ হয়ে পড়েছে যে, নিজেদের পবিত্র ভূমি আল্লাহর শক্রদের হাতে তুলে দিচ্ছে। বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে তারা দুর্বল জাতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে হীন লাঞ্ছিত ও অপমানিত জাতির মোকাবেলায় ভীতু কাপুরুষ সাব্যস্ত হয়েছে।

তৃতীয় কারণ হল আরবসরকার ও জনগণের মাঝে এমন একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতি, ফিলিস্তিন এবং তার সংকট যার চিন্তা-চেতনা ও অনুভূতিতে প্রবলভাবে ছেয়ে যাবে। এটাই তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয় হবে। ভাববে তো একে নিয়ে। জীবিত থাকবে তো এর স্বার্থে। চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কোরবানি করবে তো এর জন্য। এখানে আমি ইসলামের ইতিহাস, হযরত আবু বকর রা. ও সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর কিছু উপমা উল্লেখ করি, তাদের কিছু নমুনা তুলে ধরি এবং তা বিশ্লেষণ করে দিই যে, ওই দুই মহান ব্যক্তিত্বের মধ্যে ইসলামি মর্যাদাবোধ ও বাতিল প্রতিরোধের আবেগ কত প্রবল ছিল। তাদের চিন্তা-চেতনা, ব্যথা ও দরদ ওই মায়ের মতো ছিল, যার একমাত্র সন্তান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তার মধ্যে এখন শুধুই ব্যকুলতা অস্থিরতা কান্না হতাশা আর হাহাকার।

প্রফেসর তাইসির জাবিয়ান

এশার নামাজের আগে শরিয়াহ ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল তাইসির জোবিয়ান এলেন। তার সাক্ষাতে আমরা ধন্য হই। আমি ছোটবেলায় 'আলফিরদাউস' নামের একটি বই পড়েছিলাম। বইটি কয়েকজন নবীন লেখকের প্রবন্ধসমষ্টি। এদ্দ্বারা আমি দারুণ প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম। বইটির ভাষাশৈলী বিভিন্ন সময়ে অনুসরণ করার চেষ্টা চালিয়েছি। ওই পদ্ধতিতে লিখতে চেয়েছি। যখন আমি প্রফেসর তাইসির জাবিয়ানের নাম শুনি তখন সাথে সাথে আমার স্মৃতিপটে ওই প্রবন্ধ সংকলনটির কথা ভেসে

ওঠে। স্মরণ হয় সেটি তো প্রফেসর জাবিয়ানেরই সংকলন ও সম্পাদনার ফসল। আমি তাকে বইটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, এটি আমার প্রাথমিক বইসমূহের একটি। তিনি আম্মান থেকে আমার জন্য একটি কপি পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমার এই বইটির প্রতি আগ্রহের কারণ হল এটি আমার ছেলেবেলার স্মৃতি। ছেলেবেলার স্মৃতি মানুষের নিকট একটু বেশিই প্রিয় হয়ে থাকে।

বা।শো আবদুল্লাহর হত্যা সংবাদ

২০ জুলাই ১৯৫১

সকালবেলা জনাব আলি জাবিয়ান, জনাব কালকিলী, কবি হাওমানি ও শায়খ বায়তার আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এসব ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে খুব আনন্দঘন মজলিস হয়। জুমার নামাজ মসজিদে দাক্কাকে শায়খ বায়তারের পিছনে আদায় করি। আসরের পর শায়খ মুহিউদ্দীন জামে মসজিদে যাই। শায়খ আহমদ কাফতারুর দরসে অংশগ্রহণ করি। দরসে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। সেখানে হঠাৎ জর্দানের বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে হোসাইনের হত্যার সংবাদ আসে। সংবাদটি শায়খ আহমদ কাফতারুর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখেন, এমন কয়েকজন রেডিওতে শুনেছেন। গত শুক্রবার তার বাসভবনে একসঙ্গে এক দস্তরখানে ছিলাম। আজ তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। পূত-পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি মৃত্যু দেন। মৃত্যুগ্রহণ করেন না। তার পবিত্র সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল। তার মৃত্যুর মাঝে আমাদের জন্য অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। অনেক নসিহত আছে।

তিনি একটি ছোট্ট রাষ্ট্রের বাদশা ছিলেন, যার জনসংখ্যা কয়েক হাজারমাত্র। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে একটি বড় রাজ্যের অধিপতি হয়ে যান। তার বড় বড় আশা ছিল। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন ছিল। এর কিছুই বাস্তবতার মুখ দেখল না। তিনি তার আশা ও স্বপ্নের ঘোরেই ছিলেন। ইতোমধ্যে তাকে মৃত্যু আলিঙ্গন করল। তিনি এমনভাবে জীবনযাপন করেছেন, যা সমালোচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অনেক লোক তার সঠিক মাকসাদ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। আরবের সমস্যার ব্যাপারে তার অবস্থান সন্দেহযুক্ত ছিল। অতিরিক্ত কথা হল এ হত্যায় আমার হৃদয় দুঃখ

ও বেদনায় ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে। চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরেছে। যাই হোক, এ শাহাদাত তার জন্য ভালো। তবে দেশের জন্য ভালো না মন্দ তা জানা নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে দেশের অবস্থা নিয়ে। হতে পারে তার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। আরও নাজুক হবে। তখন জনগণ তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। তার মাগফিরাতের দোয়া করবে। সালাম পাঠাবে।

ফিলিস্তিনের এ সমস্যাটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলে যাওয়ার ভয় হয় আমার। এমনটি হলে দেশটি ইহুদিদের দখলে চলে যাবে। আমার আরেকটি ভয় হল এ পরিস্থিতি থেকে ইংরেজজাতি ফায়েদা লুটে নেয় কিনা। কারণ তারা অফাদারি কাকে বলে জানে না। কোনো নীতিমালাও তাদেরকে আটকে রাখতে পারে না। যাই হোক, আল্লাহ তায়ালা বিদায় গ্রহণকারীকে ক্ষমা করুন। ফিলিস্তিনবাসীর উপর আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের দৃষ্টি পড়ুক। তাদের পরিবার-পরিজনকে হেফাজত করুন।

শায়খ আহমদ কাফতারুর দরস থেকে আমরা উঠে যাই। আমার দিকে একটি ছেলে এগিয়ে আসে। তার চেহারা থেকে প্রখর মেধা ও বুদ্ধিমত্তার আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। ছেলেটি সালাম দিয়ে বলল, আপনার লেখা 'শোন হে মিসর' আমি পড়েছি। গুরুত্বসহকারে পুস্তিকাটি সংরক্ষণ করে রেখেছি। ছেলেটি তার অনুভূতি প্রকাশ করল। ইতোমধ্যে আরেকজন এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, এ আমার ছেলে। ছেলেটির কথায় আমি দারুণ আনন্দিত হই। আমার বই পড়ে বড় বড় ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি ও সন্তোষ প্রকাশ করার পর এমন আনন্দ আমি পাইনি। আল্লাহ তায়ালা তার মাঝে বরকত দান করুন। তার যোগ্যতা বাড়িয়ে দিন।

মাগরিবের পর জনাব কালকিলীর নিকট যাই। সেখানে আলেম-ওলামা ও লেখক-সাহিত্যিকদের একটি বড় জামাতের সাথে বৈঠক হয়। তাদের মধ্যে আল্লামা বাহজা আল বায়তার, মুহম্মদ নমর আলখতিব, মুহম্মদ কামাল আলখতিব, আলি হাওমানি উপস্থিত ছিলেন। আরও উপস্থিত ছিলেন আমির আমানুল্লাহ খাঁর সাবেক সেক্রেটারি জনাব আদিব খাঁ। সেখানেই আমাদের বৈকালীন নাশতা ও রাতের খাবার সম্পন্ন হয়।

কয়েকজন হিতাকাঙ্ক্ষীর সান্নিধ্যে

২১ জুলাই ১৯৫১

আমরা শায়খ আহমদ কাফতারুর নিকট নাশতা করি। তারপর সারা দিন একটি রচনার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকি। প্রফেসর আবদুর রহমান আলবানীর ওখানে দুপুরের খাবার খাই। সেখানে ওমর বাহাউল আমিরীর সাথে দেখা হয়। সিরিয়ার শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি'র সদস্য ড. আমিন মাসরির সাথে তিনি এসেছিলেন। ওমর আমিরী বলেন, এক বন্ধুর বাড়িতে তার দাওয়াত ছিল। আলবানীর ঘরে আমার আসার কথা শুনে বন্ধুকে না বলে দিয়েছি। তিনি আমার সাথে দেখা করার আগ্রহে এখানে চলে এসেছেন। তার ইখলাস দেখে আমি অনেক খুশি হই। মেজবানও তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি মেজবানের অন্যতম মুখলিস বন্ধু।

প্রফেসর আদিব খাঁর সাথে

শায়খ আলবানীর ঘর থেকে আমরা জনাব আদিব খাঁর বাড়ির উদ্দেশে রওনা করি। সেখানে এক ঘণ্টা অবস্থান করি। বিভিন্ন বিষয়ে তার সঙ্গে মতবিনিময় হয়। তিনি সেই বইয়ের কথা উল্লেখ করেন যাতে তিনি এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ইংরেজদের বিভিন্ন প্লান-প্রোগ্রাম ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল ভারতবর্ষ হাতছাড়া না করার উদ্দেশ্যে। আর এটাই তাদের রাজমুকুটের মণি-মুক্তা।

আমি এই বইটির ভাষাশৈলী, উচ্চাঙ্গের বাক্য নির্বাচন ও ভারসাম্যপূর্ণ দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন দেখে প্রভাবিত হই। প্রফেসর আদিব খাঁ আফগানিস্তান ও সিরিয়ায় লালিত-পালিত হন। তিনি উভয় দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক। আরবি-ফারসি উভয় ভাষাই তিনি সমানভাবে জানেন। তিনি আমানুল্লাহ খাঁর বেগম রানী সুরাইয়ার নিকটাত্মীয়।

জমিয়তে গাররা ও নাদিল আরাবি পর্যবেক্ষণ

২২ জুলাই ১৯৫১

শায়খ মুহম্মদ আলি জাবিয়ান এবং শায়খ মুসতফা সিবায়ী আমাদের সাথে সাক্ষাত দিয়ে ধন্য করেন। আমরা জমিয়তে গাররার কার্যালয়

পর্যবেক্ষণে যাই। সংস্থার প্রধান শায়খ আহমদ দাকারের সাথে দেখা করি। এর পর 'নাদিল আরাবিতে' যাই। অল্পক্ষণ সেখানে অবস্থান করি। এর সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করি। পাক-ভারতের সাথে আরবের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, সেখানকার আলেমদের আরবিভাষাজ্ঞান এবং তাদের লেখালেখির কাজে অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা হয়।

আমি তাদেরকে বললাম, এই আত্মিক সম্পর্ক এবং আরবদের সাথে লাখো মুসলমানের বন্ধুত্ব অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং এ সম্পর্ক আরবে থাকা মুষ্টিবদ্ধ খ্রিস্টানদের ঐক্যবদ্ধতার চেয়েও প্রগাঢ় ও সুদৃঢ়। ইসলামি ঐক্যের এ সম্পর্ক লাখো মানুষের বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাদের সঙ্গে আত্মিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে। এ ঐক্য আরবজাতীয়তাবাদের চেয়ে কোনো অংশেই কম না। বরং তার চেয়েও বেশি মজবুত। বেশি গ্রহণযোগ্য। অথচ আরব জাতীয়তাবাদের ভিত্তি শুধু ভাষা ও ভূমি-কেন্দ্রিক। এ বিষয়টি আমার তুলে ধরার কারণ হল আমি জানতে পেরেছি এ প্রতিষ্ঠানটি আরবের বাথ পার্টি ও তার সদস্যদের দ্বারা প্রভাবিত। আর বাথ পার্টি চরম আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

ইসলামি তামাদ্দুন মজলিস

আজ আমাদেরকে বন্ধুবর মুহম্মদ কামাল আলখতিব ইসলামি তামাদ্দুন মজলিসে দাওয়াত দেন। আমরা যাতে এর সদস্য ও কর্মকর্তাদের সাথে পরিচিত হতে পারি। এখানে শায়খ বাহজা আল বায়তার, মুহম্মদ নমর আলখতিব, আহমদ মাজহার আজামা এবং কয়েকজন বিচারপতিও আসন গ্রহণ করেন। শায়খ মুহম্মদ কামাল আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, এই মজলিসের উপযোগী কিছু বলুন। আমি আরবের ভিতরে এবং বাইরে আরবজাতির জিম্মাদারি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলি। আরবের ভিতরে ইসলামি পয়গাম ও চিন্তা-চেতনার ব্যাপারে এমন একিন সৃষ্টি করবে, যা নওমুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দ টিকিয়ে রাখবে। মজলিসে অংশগ্রহণকারীরা এই ইসলাহ ও সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যম ও পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেন। তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এভাবে আরবের অভ্যন্তরে দীনী দাওয়াতের প্রচার-প্রসার নিয়ে আমি আলোচনা করি। সংস্থার সদস্যদের সামনে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করি। তারা যেন তার

প্রতি নজর দেন। জনসাধারণের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কারণ তারা দীনী বিষয়ে পথপ্রদর্শনের মুখাপেক্ষী। তাদের এমন রাহবারের প্রয়োজন, যিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন। সদস্যদের উদ্দেশ্যে আরও বলি, তারা যেন তাদের ইলমি ও দাওয়াতি কর্মকাণ্ড শিক্ষিতসমাজে সীমাবদ্ধ না রাখেন। আরবের বাইরের জিম্মাদারি হল অন্যান্য জাতির মাঝেও দীনী দাওয়াতের মেহনত জারি রাখা।

দামেশক ইউনিভার্সিটিতে প্রবন্ধপাঠ

২৩ জুলাই ১৯৫১

সকালে শায়খ বায়তারের সঙ্গে সাক্ষাত করি। শায়খ মুসতফা সিবায়ীর বাসায় ইখওয়ানের একটি জামাতের সাথে দুপুরের খাবার খাই। তাদের মধ্যে ওমর আমিরী, মুহম্মদ মোবারক, মুহম্মদ নমর, আহমদ দাকার, জনাব আবদুর রউফসহ অনেকেই ছিলেন। আজ দামেশক ইউনিভার্সিটিতে আমার প্রবন্ধপাঠের কথা। আসরের পর আমরা সেখানে যাই। ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কুসতুনতিন জারিকের[১] অফিসরুমে কিছুক্ষণ বসি। একটি আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করলাম। প্রফেসর কুসতুনতিনও তার 'বিপর্যায়ের কারণ'[২] গ্রন্থে ফিলিস্তিনের রাজনৈতিক সমস্যার ব্যাপারে আরবদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কারণসমূহ আলোচনা করেছেন। কয়েকদিন আগে প্রফেসর আলবানী আমাকে তার এই বইটি দেখিয়েছেন।

দুজন মানুষের চিন্তাধারা এবং প্রমাণ পেশ করার পদ্ধতি অভিন্ন না হওয়া একটি স্বভাবজাত বিষয়। কুসতুনতিন এ বইটিতে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা গ্রহণ করতে, পুরনো চিন্তা-চেতনা পরিত্যাগ করতে এবং দীনকে জিন্দেগী থেকে পৃথক রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন। তার সাথে আমার মিল এ কথার উপর যে, আরবদের ঈমানি জজবার প্রয়োজন। কিন্তু জজবার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অমিল।

---

[১] কুসতুনতিন জারিক। একজন খ্রিস্টান বুদ্ধিজীবী। দামেশক ইউনিভার্সিটির ভিসি।

[২] তিনি معنى النكبة [বিপর্যয়ের কারণ] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি ফিলিস্তিন সমস্যার উপর লেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম।

আমরা অল্পক্ষণ তার রুমে বসি। ভারতবর্ষে আরবিভাষার অবস্থান, মূল্যায়ন, মুসলমানদের এ দিকে দৃষ্টিদান এবং এ ভাষার তারা যে খেদমত করছেন সে ব্যাপারে আলোচনা করি। আল্লামা বাহজা আল বায়তার ভারতীয় আলেমদের আরবি শেখার বৈশিষ্ট্য, যোগ্যতা, ইসলামি ঐক্য এবং ইসলামকে শক্ত করে আকড়ে ধরা সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রফেসর কুসতুনতিন আশঙ্কা করছিলেন যে, গ্রীষ্মের ছুটি এবং এ দিনগুলোর অত্যধিক গরমের কারণে শ্রোতা কম হয় কিনা। এ জন্য আমাকে আগে-ভাগেই বলে দিলেন– যদি শ্রোতা কম হয়, তা হলে এ ব্যাপারে আমাকে অপারগ মনে করবেন।

আমরা ইউনিভার্সিটির হলরুম অভিমুখে চললাম। উপস্থিতির সংখ্যা অনেক বেশি। এত প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণের মধ্যে হলরুমটি কানায় কানায় ভরে গেল। উপস্থিতির মধ্যে পার্লামেন্টের স্পিকার ডক্টর মারুফ দুয়ালিবী, প্রফেসর ওমর আমিরী, ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কুসতুনতিন জারিক এবং প্রভোস্ট প্রফেসর ইউসুফ আলআশ ছিলেন।

পার্লামেন্ট সদস্যদের মধ্যে ছিলেন প্রফেসর আবদুল ওহ্হাব হাওমাদ, প্রফেসর মুহম্মদ মোবারক, ড. মুসতফা সিবায়ী। ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন শিক্ষক ও প্রফেসরগণ ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে সাহিত্যে অনুষদের দুই প্রফেসর ড. আমজাদ তারাবলুসী, প্রফেসর সায়িদ আফগানী এবং শায়খ বাহজা আল বায়তার ছিলেন। 'দের ইয়াসিন মাদরাসা'র প্রিন্সিপাল নমর মাসরী, শিক্ষামন্ত্রণালয়ের 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি'র সদস্য, তামাদ্দুন মজলিসের পরিচালক ও তার পত্রিকার সম্পাদক জনাব আহমদ মাজহার আজামা ছিলেন। 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি'র আরেক সদস্য প্রফেসর আমিন মাসরী এবং ইসলামি তামাদ্দুনের সদস্য মুহম্মদ কামাল খতিব ছিলেন। প্রবীণ আলেমদের মধ্যে ছিলেন শায়খ আহমদ কাফতারু, শায়খ মক্কী কাত্তানী, শায়খ আহমদ দাকার, জমিয়তে গাররার প্রধান শায়খ আবদুর রউফ আবু তওক। দামেশকের আলেমদের মধ্যে ছিলেন শায়খ মুহম্মদ আলি জাবিয়ান। এদের ছাড়াও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

শায়খ বাহজা অগ্রসর হলেন। শ্রোতাদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি প্রবন্ধপাঠ শুরু করি। শায়খ মুসতফা সিবায়ী

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে প্রবন্ধের উপর পর্যালোচনা করেন। রচনায় যে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে তার সমর্থন করেন। এ আশাও ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ফিলিস্তিনের জন্য এমন এক ব্যক্তিত্ব নির্বাচন করবেন, যিনি এ সংকটকে নিজের করে নিবেন। এর জন্য একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন। সে ব্যক্তি এর জন্য রাত্রি জাগরণ করবেন। যেন তার একমাত্র সন্তান রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। তারপর অনুষ্ঠান শেষ হয়। আলহামদু লিল্লাহ্ মজলিসটি সফল হয়েছে।

শায়খ আলি জাবিয়ানের দাওয়াত এবং ...

২৪ জুলাই ১৯৫১

শায়খ মুহম্মদ আলি জাবিয়ানের নিকট নাশতা করলাম। নাশতায় আমাদের সাথে ছিলেন আল্লামা বাহ্জা আল বায়তার, আমাদের মেজবান শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহী, শায়খ মুসা তাবিল ও তার সাহেবজাদা। নাশতা খাওয়ার সময় মুহাদ্দিস সাইয়েদ বদরুদ্দীন হাসানী রহ. ও শায়খ আবদুল হাকিম আফগানী রহ. সম্পর্কে আলোচনা হয়। এ ছাড়া দাওয়াতের পদ্ধতি ও হিকমত নিয়েও কথা হয়। এ সময় শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহীর আলোচনা কথা শায়খ বদরুদ্দীন হাসানী সম্পর্কে ছিল। বদরুদ্দীন হাসানী রমজানের কোনো একদিন দামেশকের বিভিন্ন গোত্রকে বলে পাঠিয়েছেন- 'এটি পবিত্র মাস। এ মাসে দোয়া কবুল হয়। আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। বদরুদ্দীন তোমাদের কাছে আবেদন করছে, তোমরা গোসল কর। আল্লাহর জন্য দু'রাকাত নামাজ পড়। তারপর মুসলমান এবং বদরুদ্দীনের জন্য দোয়া কর। হতে পারে তোমাদের দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।'

কথা বলার এ ভঙ্গিমা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। এর ফলে দেশের বহু গোত্র তাওবা করে। তাদের অবস্থার উন্নতি হয়।

শায়খ বাহ্জা বলেন, একবার শায়খ বদরুদ্দীনের পিতা শোনলেন যে মসজিদের একেবারে পাশে একটি পানশালা খোলা হয়েছে। তখন তিনি সাইয়েদ আবদুল কাদির জাজায়েরী[১]'র নিকট যান। পানশালা বন্ধ করানোর

[১] একজন অসীম সাহসী বুজুর্গ। হযরত আবদুল কাদির জিলানী রহ. এর বংশধর। ১৮০৮ সালে তার জন্ম। আলজেরিয়ায় ফরাসিদের আগ্রাসন শুরু হলে তিনি মাত্র সাতাইশ বছর বয়সে

জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি এই বলে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, এখানে আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। বন্ধ করার কোনো শক্তি আমার নেই। এই জবাব শুনে বদরুদ্দীনের পিতা তার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, আমি এই মুরদার জানাজা পড়ছি। আল্লাহু আকবার বলে তার জানাজার নামাজ শুরু করে দিলেন। তিনি বললেন, এটা কী হচ্ছে? উত্তর দিলেন, জানাজার নামাজ। কারণ আপনি মুরদা। মসজিদ লাগোয়া পানশালা বন্ধ করতে অক্ষম। তারপর তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। দোকানটিকে ক্রয় করে ওয়াক্ফ করে দেন। মুসা তাবিল শায়খ সাইয়েদ বদরুদ্দীন হাসানী ও শায়খ আবদুল হাকিম আফগানীর চরিত্র ও অভ্যাস এবং ইলম ও দীনের খেদমত সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা শোনান। অনেক বিষয়ে কথা বলেন। অত্যন্ত চমৎকার মজলিস হয়।

শায়খ জাবিয়ানের বাড়িতে যাওয়ার পথে আমরা হযরত জায়েদ বিন সাবেত রাদি. ও হযরত জায়েদ বিন আরকাম রাদি. এর কবর জিয়ারত করি। এই দুই মহান সাহাবির দিকে কবর দুটোর সম্পর্ক কতটুকু সহিহ জানা নেই। শায়খ মুসতফা সিবায়ী সাক্ষাত করে আমাদেরকে ধন্য করেন। তিনি আমাদের হালব, হিমস ও হামাতে সফর করার এবং ইখওয়ানের বিভিন্ন কার্যালয়ে আলোচনা করার প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন।

ডা. সায়িদ রমজান দুপুরের খাবারের দাওয়াত করেছেন। আমরা 'উমুবী হোটেলে' যাই। ডা. রমজান এবং তার বন্ধু জনাব হুদা আত্তিবার সঙ্গে খাবার খাই।

জমিয়তে গাররায় আমার আলোচনা

জমিয়তে গাররার মসজিদে জানকিজে আলেম-ওলামা এবং বিভিন্ন দীনী সংগঠনের প্রধানগণ একত্র হয়েছেন। আহলে ইলম এবং মাদরাসার লোকজনের একটি বড় অংশ সমবেত হয়েছেন। আমি দাওয়াত, জনসাধারণের মাঝে এর প্রচার-প্রসার এবং মাদরাসাসমূহে এ কাজের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করি। এ বিষয়ে আমি আমার অভিজ্ঞতা তুলে

তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু করেন। ১৮৪৭ সালে এক অতর্কিত হামলায় তিনি গ্রেফতার হন। দীর্ঘদিন তিনি নির্বসনে ছিলেন। ১৮৮৩ সালে তিনি ইনতেকাল করেন।

ধরি। জনসাধারণ থেকে পৃথক থাকা, তাদের সাথে সম্পর্ক না গড়া এবং তাদের মাঝে দীনী চেতনা জাগ্রত না করার কারণে মাদরাসাসমূহকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো তুলে ধরি। তাদেরকে দাওয়াতের সেই পদ্ধতি বলে দিই, যা বর্তমানে লখনৌ এবং দারুল উলুম নদওয়াতুল ওলামায় চলছে। দাওয়াতের এ পদ্ধতির দ্বারা মাদরাসা এবং শহরের যে উপকার হয়েছে তা উল্লেখ করি। মঙ্গলবারের প্রোগ্রামের প্রতি লক্ষ্য করে এভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মারকাজেও আলোচনা করি।

পূর্বজর্দানের সংবাদ

২৫ জুলাই ১৯৫১

পূর্বজর্দান এবং বায়তুল মুকাদ্দাস নিয়ে আমার যে আশংকা ছিল আজকের পত্রিকা তারই সংবাদ দিয়েছে। সেখানকার অবস্থা ঘোলাটে হয়ে গেছে। গালিব পাশা এ সুযোগকে গনিমত মনে করছে। সে ফিলিস্তিনে নিরপরাধ লোকজনকে কোণঠাসা করে ফেলেছে। কুদুসবাসীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে নিজের মনের জ্বালা নিভাচ্ছে। তাদের একটি বড় অংশকে চক্রান্তের অপবাদ দিয়ে কারারুদ্ধ করছে। বায়তুল মুকাদ্দাস এখন জর্দান সেনাবাহিনীর দয়া ও অনুগ্রহের উপর টিকে আছে। তারা দয়া করলে অস্তিত্ব থাকবে অন্যথায় না। ইংরেজদের সহযোগিতা পেয়ে ফিলিস্তিনের সব দুর্বল কাপুরুষ এখন বাঘ বনে গেছে এবং তাদের সাথে হাত মিলিয়ে যা ইচ্ছা তাই করছে।

আরবের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার মাঝে একতা নেই। তারা সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের যে জীবন আছে তারা এর কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। তারা না কোনো জালেমকে রুখে দাঁড়িয়েছে, না বায়তুল মুকাদ্দাসের পক্ষে আওয়াজ তুলেছে।

শুধু এক মুফতি আমিন আলহোসাইনী আছেন। তার সমস্ত চেষ্টা তিনি ব্যয় করেছেন। কিন্তু একা আর কতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়!

আজ আমরা শায়খ হাসান হাবান্নাকার সাথে দেখা করি। তার মাদরাসা দেখতে যাই। তার সঙ্গেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিই।

ফিলিস্তিন সংকট নিয়ে আলোচনা

আমরা 'মহানবীর আগমনপূর্ব সময় ও পরিবেশ'[১] গ্রন্থের লেখক প্রফেসর মুহম্মদ ইজ্জত দারুজার সাথে দেখা করতে যাই। আমি ১৯৪৭ সনে গ্রন্থটি মক্কায় পড়েছিলাম। 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' বইটি রচনার ক্ষেত্রে আমি এ গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি।

ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা হয় মুহম্মদ ইজ্জত ফিলিস্তিনের অধিবাসী। বহুদিন যাবত তিনি ফিলিস্তিনের সমস্যা নিয়ে কাজ করছেন। এ সম্পর্কে তার কয়েকটি বইও বেরিয়েছে। তিনি এমন কিছু বাস্তব তথ্য জানান, যা আমাদের পূর্বের জানাশোনাকে সমর্থন করে। যেমন আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে আরব সরকারগুলোর দুর্বলতা সম্পর্কে জেনেছি। আরবদের এ বিষয়ে মনোযোগ না দেওয়া এবং কোনো কাজ না করা বিষয়টি জেনেছি।

তিনি বলেন, ফিলিস্তিন সংকটের ব্যাপারে আরব সরকারগুলো মোটেই আন্তরিক না। তাদের যুদ্ধ করার দৃঢ় সংকল্প তো নেই-ই। মনোবলও নেই। সংকটের একপর্যায়ে তাদেরকে বলা হয়েছিল আপনারা নিজেদের শক্তি একত্র করুন। ইসরাইল[২]কে একেবারে ধূলিসাৎ করে দিন। তখন আর এটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তারা জবাব দিয়েছে আমরা যুদ্ধে শরিক

---

[১] عصر النبى عليه السلام وبيئته قبل البعثة

[২] মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া নামে পরিচিত ইসরাইল রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে ইহুদিদের কোনো বাসস্থান ছিল না। ১৮৯৭ সালে ইহুদি নেতা দার্শনিক থিওডোর হার্জ্জল সুইজারল্যান্ডের ব্যাসলে এক আন্তর্জাতিক ইহুদি সম্মেলন আহ্বান করে। সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে ১৫০ জন ইহুদি পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদ অংশগ্রহণ করে। উক্ত সম্মেলনে ইহুদিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথমে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মাধ্যমে সাইপ্রাস, ল্যাটিন আমেরিকা, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানে তারা তাদের বাসভূমি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এতে সফল না হতে পেরে ১৯০৫ সালে বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে ফিলিস্তেনে তা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর জন্য তারা তদানীন্তন পরাশক্তি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারস্থ হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পররাষ্টমন্ত্রী আর্থার বেলফোর কুখ্যাত 'বেলফোর ঘোষণায়' ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে দুই ভাগ করে এক ভাগে আরব রাষ্ট্র আর অন্যভাগে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৪৮ সালের ১৫ মে ব্রিটিশ ফিলিস্তিন ও জেরুসালেম থেকে নিজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি পৃথক ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।

হয়েছি এ আশায় যে, ব্রিটেন ও আমেরিকা এ বিষয়টিতে মধ্যস্থতা করবে এবং এর সমাধান দিবে। এ জন্য আরব সরকারগুলো এই ব্যাপারে তেমন দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা প্রকাশ করেনি এবং ফিলিস্তিনের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধে নামেনি।

এর শেষ পরিণাম হল ইসরাইল আপন অবস্থায় টিকে রইল এবং ধীরে ধীরে তারা একটি শক্তি হয়ে দাঁড়াল। এখানে না আমেরিকা এলো, না ব্রিটেন। তারা উভয়ে বরং ইসরাইলকে সাহায্য করল। সার্বিক আনুকূল্য প্রদান করল।

এ কথা সত্য যে, অন্যের শক্তিবলের উপর ভিত্তি করে আর যা-ই হোক, রণাঙ্গনে লড়াই করা যায় না। কোনো জাতি বা সরকার তৃতীয় কারো হস্ত ক্ষেপ বা মধ্যস্থতার উপর ভরসা করে যুদ্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ হয় শর্তহীন এবং আইন-কানুন ছাড়া।

মাজায়ায়

২৬ জুলাই ১৯৫১

আজ শায়খ আবদুর রহমান আলবানী আমাদেরকে গ্রীষ্মকালীন নিবাস 'মাজায়া' নিয়ে গেলেন। এখানে তিনি সপরিবারে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করেন। জায়গাটি শান্ত, শান্তিপূর্ণ ও মনোরম। মনোলোভা প্রাকৃতিক সৌন্দযের্র মধ্য দিয়ে আমরা পথ চলতে থাকি। আমাদের ডান পাশে ছিল 'বারাদা' নদী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সিরিয়া বিভিন্ন কুদরতি দৃশ্যে পরিপূর্ণ। বিশেষত দামেশক। আল্লাহ তায়ালা এ দেশকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, মনকাড়া দৃশ্য, স্বচ্ছ মঠা পানি, নির্মল বাতাস দান করেছেন। আজকের দিনটি মাজায়াতেই কাটাই।

বালুদান কনফারেন্সের স্মৃতি

আমি দূর থেকে সিরিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রীষ্মকালীন নিবাস বালুদান দেখি। সাইয়েদ আবদুর রহমান আলবানীকে বললাম, এ নামটি হয়তো ইতঃপূর্বে শুনেছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ফিলিস্তিনের প্রসিদ্ধ 'বালুদান সম্মেলন' এখানে হয়েছিল। এই সম্মেলনে আরব দেশগুলোর বড় বড় শায়খ ও নেতারা উপস্থিত হয়েছিল। এখানে এসে তারা সীমাহীন মদ পান করে। আনন্দ-

উল্লাসে সময় কাটায়। এসব কিছু হয়েছে ফিলিস্তিন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার নামে। তারা একত্র হয়েছে। আবার পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো ফায়সালা হয়নি। কার্যকরী কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। দুঃখের বিষয় হল এরপর তাদের কয়েকজন ঘোষণা করেছে, আমরা এমন একটি সমাধানে, এমন একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, যা পুরো পৃথিবীকে অবাক করে দিবে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গাছের একটি পাতাও নড়েনি।

সফরের প্রতিক্রিয়া, ফলাফল এবং আমার আলোচনা

আজ ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আমার আলোচনা করার কথা ছিল। আমি এ সফরের প্রতিক্রিয়া এবং যে ফলাফলে পৌঁছেছি তা দুটি পয়েন্টে একত্র করে শ্রোতাদের সামনে পেশ করি।

প্রথম পয়েন্ট ঃ যেই শ্রেণীর হাতে দেশের ক্ষমতা, ইসলাম পরিপূর্ণভাবে তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করেনি। ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ তারা পুরোপুরি হজম করতেও পারেনি। ইসলাম একটি ধর্ম এবং মানুষের জীবনবিধান– এই বিশ্বাস তারা করে না, যেমন বিশ্বাস করে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলনীতি ও তার উপকারিতাকে। ইসলামের ব্যাপারে তাদের এতটুকু আন্তরিকতা নেই যতটুকু তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশের চিন্তা-শক্তি জঘন্যভাবে বিগড়ে গেছে। এ কারণে ইসলাম রাষ্ট্র-পরিচালনা করতে পারে, মানুষের সফলতা ও কামিয়াবি ইসলামের মধ্যে রয়েছে– এটা তারা গ্রহণই করতে পারে না।

দ্বিতীয় পয়েন্ট ঃ আরবের জনগণ রাজনীতিতে অনেক দুর্বল। জীবনের প্রাথমিক ও মৌলিক নীতিমালাগুলোও তারা বোঝে না। বন্ধু ও শত্রুর মাঝে পার্থক্য করতে পারে না। ভালো-মন্দ চিনে না। না পারে শত্রু বোঝতে, না জানে বন্ধুর সাথে সুসম্পর্ক গড়তে। তারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর মত, যাদেরকে লাঠির মাধ্যমে চালাতে হয়। বকরির পালের মতো চিন্তা-ভাবনা ছাড়া তারা কোনো এক দিকে চলতে শুরু করে। যতদিন পর্যন্ত এ জাতির মধ্যে বুঝ-শক্তির কমতি থাকবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দুশমনের প্রচার-প্রোপাগান্ডার শিকার হবে। এ জাতির সদস্যরা যেদিক থেকেই আওয়াজ শুনবে সেদিকেই দৌড় দিবে।

এর ব্যতিক্রম হল ইউরোপ। নিজেদের মধ্যে বহুশত দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তারা জাগ্রত মেধার অধিকারী। বন্ধু ও শত্রুর মাঝে পার্থক্য করতে

পারে। কোনো ধোঁকাবাজ তাদেরকে বেশি দিন ধোঁকা দিতে পারে না। জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, দাবি পূরণ না করে তাদের শিরাতন্ত্রীকে অকার্যকর করে কেউ ক্ষমতার মসনদে থাকতে পারে না। এরা সেই জাতি যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের হিরো 'মিস্টার লয়েড জর্জ' এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিরো 'উইনস্টন চার্চিল'কে প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে থাকতে দেয়নি। যুদ্ধের শেষপর্যায়ে তাদের সফলতা তাদের ব্যাপারে কোনো সুপারিশ করতে পারেনি। নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনি। ফার্ডিন মাইয়ুর স্পেন থেকে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার উপর বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ ছিল তিনি জার্মানির সামনে মাথা নত করেছেন। অস্ত্র ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু আমাদের অবস্থা হল যাদের হাতে ক্ষমতার লাগাম তারা দেশের তেল পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলেন। সবচেয়ে বেশি মূল্যবান ও দামি জিনিসগুলোর মধ্যে খেয়ানত করেন। রাষ্ট্রীয় অধিকারসমূহের অপব্যবহার করেন। জাতি কখনো এর হিসাব নেয় না। তাদেরকে শাস্তিও দেয় না। এর কারণ হল, জনগণের সমষ্টিগত বিবেক জাগ্রত না। রাজা-বাদশারা যা ইচ্ছা তা-ই করেন। এমপি-মন্ত্রীরা বাদশার মন যুগিয়ে চলেন। এ কারণে বাদশার গদি ঠিক থাকে। তার ইজ্জত-সম্মান সংরক্ষিত থাকে। ভয়-ভীতি বলতে তার কিছুই থাকে না।

তবে আবার যখন জনগণের বিবেক জাগ্রত হবে তখন কেউ ক্ষমতা দ্বারা লাভবান হতে পারবে না। খেয়ানত করতে পারবে না। দ্বিতীয়বার নিজের আশা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না।

এ জন্য অত্যন্ত জরুরি হল জনগণকে সজাগ করা, সচেতন করা, ব্যাপকভাবে তাদের অন্তর ও বিবেককে জাগ্রত করা, তাদের সাথে সম্পর্ক করে দীনী দাওয়াদের বীজ বপন করা এবং এ পরিমাণ যোগ্য বানিয়ে তোলা যাতে তারা ভালো-মন্দ বোঝতে পারে, বন্ধু-শত্রু, মুখলিস-মুনাফিকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। হ্যাঁ, যদি আমার ভাইয়েরা বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে দাওয়াতের কাজ করে, দীনী চেতনা জাগ্রত করে এবং সঠিক অনুভূতি সৃষ্টির জন্য দুই সাল কিংবা পাঁচ সালের প্রোগ্রাম বানিয়ে প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি বস্তিতে ছড়িয়ে পড়ে, তা হলে কোনো ঘর দাওয়াত ছাড়া থাকবে না। গরিবের ঝুঁপড়ি, বাদশার শাহিমহল পর্যন্ত দাওয়াত পৌছে

যাবে। এমন কোনো মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার নিকট দাওয়াতের পয়গাম পৌঁছানো হয়নি, যার নিকট ইসলামি দাওয়াতের হুজ্জত পরিপূর্ণ হয়নি।

এটাই সে হাকিকি শক্তি, যার মাধ্যমে আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করা যেতে পারে। জাতির মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চার করা যেতে পারে। এটা এমন এক কাজ যার মাধ্যমে বিভিন্ন গতিধারার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়।

দামেশক ইউনিভার্সিটির মসজিদে জুমার খুতবা

২৭ জুলাই ১৯৫১

গতকাল অবগত হয়েছি হেজাজের সাহিত্যিক বন্ধু আহমদ আবদুল গফুর আত্তার দামেশকে এসেছেন। এখন 'আর-রশিদে' অবস্থান করছেন। রাতে তার নিকট গিয়েছিলাম। তাকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে পেয়ে ভিজিটিংকার্ড রেখে ফিরে আসি। সকালবেলা তিনি আমাদের নিকট আসেন। আমাদের সঙ্গে নাশতা করেন। তার সাক্ষাতে আমরা অনেক আনন্দিত হই। দামেশক ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা ভার্সিটির মসজিদে আমাকে জুমার খুতবা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। আমি অপারগতা প্রকাশ করি। কারণ জুমার খুতবা আমার কাছে বোঝার মতো মনে হয়। অথচ আমি আমার মহল্লার ইমাম। আলহামদু লিল্লাহ, ইমামতির এ পদ আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে চলে আসছে। আমার আব্বা ও দাদা উভয়ে ইমাম ছিলেন। আমার বড় ভাইও ইমামতি করেন। কিন্তু এর আজমত ও গুরুত্ব আমার অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও ভারী মনে হয়। যাই হোক, তারা আমার ওজর-আপত্তি গ্রহণ করেনি। অবশেষে তাদের কথাই ঠিক রইল।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস দিয়ে খুতবা শুরু করি। হাদিসটি হল কেয়ামতের দিন বান্দাকে চারটা জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করার পূর্বপর্যন্ত সে পা সরাতে পারবে না। একটি তার জীবন। সে এটি কোথায় ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়টি তার যৌবন। সে একে কোন কাজে লাগিয়েছে। তৃতীয়টি তার মাল। সে এটি কোথা থেকে উপার্জন করেছে এবং কোথায় ব্যয় করেছে। চতুর্থটি তার ইলম। এ দিয়ে সে কী কাজ করেছে। আমি এ হাদিসটির ব্যাখ্যা করি। তারপর বলি, ভার্সিটির ছাত্ররা, তোমরা বল সে ছাত্র কত বড় ভাগ্যবান যাকে পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন বলে

দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে আবার কত বড় হতভাগা, পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্ন জেনেও সময় নষ্ট করেছে। প্রস্তুতি নেয়নি। উত্তর ঠিক করেনি। শুনে রাখুন, অচিরেই আমাদেরকে এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ প্রশ্নগুলো বলে গেছেন। তিনি উম্মতের উপর সহানুভূতিশীল ছিলেন। কারণ তার জানা আছে দুনিয়া প্রস্তুতির জায়গা। চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও কোরবানির জায়গা। পরকাল হল পুরস্কার পাওয়ার জায়গা। ফল ভোগ করার জায়গা।

তারপর আমি হাদিসের একটি অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। অংশটি হল যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে- এটা কোথায় লাগিয়েছ। আমি কয়েকজন সাহাবি এবং কয়েকজন সাহেবে আজিমত লোকের কথা উল্লেখ করি। এ কথা বলে দিই যে, তাদের নিকট যৌবনের কী অর্থ ছিল। তারা যৌবনকাল দ্বারা কীভাবে উপকৃত হয়েছেন। আমি তাদের নিকট হযরত মুসআব ইবনে ওমায়ের রা. এবং তার পর হযরত ওমর বিন আবদুল আজিজ রহ. এর ঘটনা বর্ণনা করি। তারা কীভাবে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের জীবন ছেড়ে দিয়ে যুহদ-তাকওয়া ও দরবেশির জীবন গ্রহণ করলেন তা তুলে ধরি। আরও বর্ণনা করি যে, তারা কীভাবে সাদাসিধে জীবনযাপন ও স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া শুরু করলেন। এ কারণে তারা ঈমানি স্বাদ অনুভব করেছেন। কোরবানি ও আত্মত্যাগের মজা আস্বাদন করেছেন। তারা সেসব স্বাদকে তুচ্ছ মনে করেছেন যেগুলো জীব-জন্তুও ভোগ করে, যেগুলোতে সামান্য ইঁদুরও মজা পায়।

আশরাফিয়ার গ্রীষ্মকালীন নিবাসে শায়খ সিবায়ীর সাথে

আজ শায়খ মুসতফা সিবায়ী আমাদেরকে আশরাফিয়ার গ্রীষ্মকালীন নিবাসে নিয়ে যান। বহু মানুষ এখানে গরমের মৌসুম কাটায়। শায়খ মুহম্মদ মোবারক এবং কিছু ইখওয়ানি জোয়ানও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। শায়খ সিবায়ী আমাদেরকে নদীর তীরে একটি সুন্দর কুটিরে নিয়ে যান। জায়গাটি পরিবেশবান্ধব। মনকাড়া। এখানে বসলে মন ভরে ওঠে। দুই মহান ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় দারুণ মজা অনুভূত হয়। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আন্দোলন এবং রাজনীতিতে তাদের দখল নেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা হয়।

শায়খ সিবায়ী দাওয়াতের কিছু অভিজ্ঞতা শোনালেন। তিনি বললেন, কীভাবে লোকজন দ্রুত আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়। পতঙ্গের মতো ঝাপিয়ে পড়ে। তারপর সাধারণ থেকে আরও সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে দূরে সরে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তারপর বললেন, পরিশেষে জনতার ভিড় ছুটে গেল। সেসব মুখলিস ব্যক্তিই অবশিষ্ট রইলেন, যারা দাওয়াতকে ভালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন। মিসরে ইখওয়ান আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাসানুল বান্নার সাথে তার যেসব স্মৃতি রয়েছে তাও তিনি তুলে ধরলেন। সারা পৃথিবী তার এবং তার দাওয়াতের জন্য পাগলপারা হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দলগুলোও তাকে সমর্থন জানায়। ইখওয়ানের অনুষ্ঠানগুলোর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিটি অনুষ্ঠান স্মৃতি হয়ে আছে। ইখওয়ানের এ জয়জয়কারের সময় অফদ পার্টির সভাগুলোতে লোকের সমাগম কমে যায়। পার্টির সদস্যরা লোকজনকে টেনে টেনে জলসায় নিয়ে আসত। স্বেচ্ছায় কেউ আসত না। কিন্তু সরকার যখন ইখওয়ানদের বিরুদ্ধে চলে যায়, তাদের মোকাবেলা করতে থাকে তখন অসংখ্য লোক দল ছেড়ে চলে যায়। নিজেকে বাঁচানোর জন্য কেটে পড়ে। মিসরের পত্রিকাগুলো এ বিষয়টি নিয়ে অনেক ঠাট্টা করেছে। বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বের দাবিদারেরা ইখওয়ানকে আশ্রয়হীন করে ছেড়ে যায়।

হাসানুল বান্না এই পরিবর্তন আগে থেকেই অনুভব করেছিলেন। হজ থেকে ফিরে এসে সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন এখন শুধু মানসগঠনের উপর দৃষ্টি দিবেন। তাদের তরবিয়তের জন্য সব প্রচেষ্টা ব্যয় করবেন। আন্দোলন আর প্রসারিত করবেন না। কিন্তু এর পূর্বেই মিসরে ইখওয়ানের উপর মহাবিপর্যয় নেমে আসে। ইখওয়ান সদস্যদের গণহারে বন্দি করা শুরু হয়। দাওয়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়। হাসানুল বান্নাও এ বিপদের মোকাবেলা শুরু করেন। সংকটের সমাধানে লেগে যান। এরই মধ্যে হঠাৎ তার শাহাদাতের ঘটনা ঘটে।

এভাবে দামেশকেও আলেম-ওলামা ও দীনদার লোকদের কাছে প্রথম প্রথম অনেক মানুষ ভিড়তে থাকে। এমনকি শোকরি বেগ কোতালি জমিয়তে গাররায় আসেন। সেখানে নির্বাচনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ওলামায়ে কেরাম তার ধোঁকায় পড়ে যান। তার ঘোষিত

প্রার্থীদেরকে ভোট দেন। ওলামায়ে কেরাম দলের চেয়ারপার্সনের নিকট যাওয়া-আসা শুরু করেন। তাকে বিভিন্ন পরামর্শ দেন। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে কর্তৃত্ব করেন। নেতৃস্থানীয় লোকেরা আলেমদের এই কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা সাধারণ একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের সংবাদপত্রগুলোকে আলেমদের বিরুদ্ধ উস্কিয়ে দেয়। তখন আলেমদের বিরুদ্ধে বহু লেখালেখি হয়। ফলে জনগণ আলেমদের থেকে দূরে সরে যায়। তাদের সঙ্গ বর্জন করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গড়ায় যে, আলেমদের পোশাক পরে লোকজন বাজারে যেতে পর্যন্ত লজ্জা বোধ করতে লাগল।

যুবকদের ধর্মীয় উচ্ছ্বাস

আমরা আশরাফিয়া থেকে ফিরে আসি। শায়খ আবদুর রহমান আলবানীর সঙ্গে তার বাসায় যাই। উদ্দেশ্য ছিল ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করব। সেখানে আজ তাদের জমায়েত হওয়ার কথা। আমার আলোচনার বিষয় ছিল 'দায়ীগণের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী এবং আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি'।

সেখানে পৌঁছে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা চোখে পড়ে। ঘটনাটি বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করছে। সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইউসুফ আজামা 'মায়সালুনে'র যুদ্ধে শহিদ হয়েছিলেন। তার ভাস্কর্য স্থাপন নিয়ে গরম বিতর্ক চলছে। পাগড়ি পরা একজন প্রবীণ আলেম ভাস্কর্য স্থাপনের পক্ষে তার চিন্তাধারা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। তার সবচেয়ে বড় দলিল হল সিরিয়ার বন্ধুদের পক্ষ থেকে হাদিয়া দেওয়া ভাস্কর্যটি যদি আমরা স্থাপন না করি, তা হলে উন্নত ও সভ্য জাতি আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করবে। তারা বলবে, সিরিয়ার বাসিন্দারা নীচ প্রকৃতির লোক। তাদের মধ্যে সভ্যতার ছোঁয়া পৌঁছায়নি। এটা অত্যন্ত লজ্জাকর কথা। অপর দিকে রয়েছে ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। তাদের শিক্ষা ছিল ইউনিভার্সিটির মতো। আশঙ্কা ছিল তারা হয়ত ভাস্কর্য স্থাপনের পক্ষে মত দিবে। এটাকে সমর্থন করবে। কিন্তু তাদের ওই বয়োবৃদ্ধের উপর ক্রোধ চলে এলো। তারা অনেক জজবা নিয়ে তার মত খণ্ডন করল। তার যুক্তিকে উড়িয়ে দিল। তাদের মধ্যে অনেকে গোস্বা ও রাগে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ

হারিয়ে ফেলছিল। শায়খের সম্মানার্থে অন্যরা তাদেরকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

নিঃসন্দেহে এসব যুবক ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পেরেছে। এখানে তারা প্রমাণ করেছে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা নেই। ইসলামের ব্যাপারে তাদের পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস রয়েছে। দৃশ্যটি দেখে আমি এ ফল বের করেছি যে, আহলে দীন নিজের স্থান ছেড়ে দিয়েছে। পশ্চিমা চিন্তা-চেতনা ও সভ্যতার দিকে ধাবিত হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে ভয়-ভীতি ঢুকে গেছে। সম্ভবত ইসলামি নেতৃত্ব এখন সেসব যুবকের হাতে চলে যাচ্ছে, যারা জড়বাদী তাহজিবের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝে বড় হয়েছে। সম্ভাবনা রয়েছে, এখন আযরের ছেলেরা এবং মঠ-মন্দিরে পালিতরা দুনিয়ার সামনে ইবরাহিমী নমুনা পেশ করবে।

আল্লামা কুরদ আলির সাক্ষাত

২৮ জুলাই ১৯৫১

আজ আমরা শায়খ বাহজা আল বায়তারের বাসায় নাশতা করি। আমাদের সঙ্গে আহমদ আবদুল গফুরও ছিলেন। তারপর আমরা আরবের প্রসিদ্ধ আলেম, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মুহম্মদ কুরদ আলির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে যাই। আমাদের ভাগ্য ভালো। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। বেরিয়ে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানান। তিনি আমাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেন। এমন উদার প্রকৃতির মানুষ আমি শিক্ষিত সমাজে কাউকে দেখিনি। আমি তাকে বললাম, সর্বপ্রথম আপনার যে লেখা আমি পড়েছি তা হল 'স্পেনের অতীত-বর্তমান'[১] গ্রন্থের একটি অধ্যায়। লেখাটি আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি এখেকে কিছু সুন্দর বাক্য মুখস্থ করেছি। তিনি বললেন, আমি শুনেছি গ্রন্থটি নাকি ভারতে অনুবাদ হয়ে বেরিয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। আমাদের সহপাঠী এবং সহকর্মী মাওলানা আবদুস সালাম নদবী অনুবাদ করেছেন। তারপর

---

[১] حاضر الاندلس وغابرها

তিনি বললেন, আমি স্পেন দেখেছি। স্পেনে আমি সেই তারিখে যাই আরবরা যেই তারিখে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। এ দিনটিকে প্রতিবছর সেখানে স্মরণীয় দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ফলে আমার অন্তর বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সারাদিন আমি বিষণ্ন অবস্থায় কাটাই।

তারপর তিনি ভারতের আলেমদের আত্মশক্তি, লেখালেখি ও ইলমি আন্দোলনের প্রশংসা করেন। তারপর বলেন, আপনার জানা আছে যে, আল্লামা ইবনে আবেদিন শামির ইলমি কর্মকাণ্ড ও অবদানে ভারতবর্ষের ভূমিকা রয়েছে। ভারতের সাথে তার সুগভীর সম্পর্ক ছিল। ভারতে গেলে তার পিতা তার জন্য সেখান থেকে ফেকাহর কিতাব খরিদ করে আনতেন। আল্লামা শামি রহ. এসব কিতাব অধ্যয়ন করতেন। এভাবে তিনি বড় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ফেকাহর উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। সুতরাং তার বড় হয়ে ওঠার পিছনে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য।

তিনি আমাকে তার লেখা 'كنوز الاجداد' [কুনূযুল আজদাদ–পূর্বপুরুষের রত্নভাণ্ডার] গ্রন্থটি উপহার দেন। তার মতে এটি তার শ্রেষ্ঠ কর্ম। তারপর আমরা 'আরবি অ্যাকাডেমি'তে যাই। প্রফেসর খলিল মারদাম বেগের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাত করি। তিনি আমাকে 'দিওয়ানে আলি ইবনে জাহাম' হাদিয়া দেন। কিতাবটি সংশোধনের কাজ তিনি নিজে করেছেন। এরপর পাদটীকাও তিনি লিখেছেন।

শায়খুল ইসলাম এবং তার কয়েকজন ছাত্রের সমাধি

আমরা দামেশক ইউনিভার্সিটিতে যাই। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর কুসতুনতিন জারিকের সাথে সাক্ষাত করি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার কবর জিয়ারত করা। তার কবর মেডিকেল কলেজের পাশে। এ কবরখানাটিকে 'মাকবারায়ে সুফিয়া' বলা হয়। বিভিন্ন মনীষীর জীবনীগ্রন্থে এ কবরখানাটির কথা উল্লেখ আছে। 'সিলকুদ্ দুরারি' [মুক্তার মালা] গ্রন্থের লেখক মুরাদী এবং 'খোলাসাতুল আসার'র লেখক মুহিব্বী বারবার বলেছেন, তাদেরকে যেন 'মাকবারায়ে সুফিয়া'য় সমাহিত করা হয়। এখানে 'তারিখে দামেশক'র লেখক ইবনে আসাকির, 'মুকাদ্দামাহ'র লেখক ইবনুস সালাহ, 'বিদায়া ও নিহায়া' এবং 'তাফসিরে ইবনে কাসিরে'র লেখক হাফেজ ইমাদুদ্দীন রহ. এর কবর ছিল। এক

রাত্রিতে এসব কবর জমিনের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। ইউনিভার্সিটি কর্মকর্তারা কোনো কবরের চিহ্ন পর্যন্ত রাখেনি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এখানে ভার্সিটির জন্য নতুন ভবন নির্মাণ করা। ইবনে তাইমিয়ার কবরটিও জমিনের সাথে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে সময় সৌদি বাদশার বন্ধু শোকরি কুতালির হস্তক্ষেপে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কবরটি রক্ষা পায়।

ফেরার সময় ময়দানে তাহতানিতে হাফেজ ইবনুল কাইয়্যুম রহ. এর কবর জিয়ারত করি। আল্লাহ তায়ালা এই দুই ব্যক্তিত্বকে ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ থেকে উত্তম থেকে উত্তমতর যোগ্যতা দান করেছেন। এই যোগ্যতা দেওয়া হয় দীনের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারীদের পরিবর্তন-পরিবর্ধন, পথভ্রষ্টদের প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড এবং মূর্খদের অসার কথাবার্তা মোকাবেলাকারীদেরকে।

শায়খ জায়নুল আবেদিন, শায়খ হাসান হাবান্নাকা, জনাব বাহজা আল বায়তার, আহমদ আবদুল গফুর আত্তার এবং আরও কজন ইখওয়ানি বন্ধুর সাথে মুহম্মদ তাওফিক আলকুনজির বাসায় দুপুরের খানা খাই। তারপর জনাব কামেল কাসাবের সাথে সাক্ষাত করি। পনেরো বছর পূর্বে আলফাতাহ পত্রিকার মাধ্যমে তার সম্পর্কে জেনেছিলাম। তিনি আগামীকাল সকালবেলা আসার প্রতিশ্রুতি দেন।

আরববিশ্বের ব্যাপারে শায়খ কাসাবের বিশ্লেষণ

২৯ জুলাই ১৯৫১

শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহী ও মুহম্মদ নমর খতিবের সাথে শায়খ আবু ইজ্জতের বাসায় নাশতা করি। তারপর আবদুল ওহ্হাব সালাহীর বাড়িতে যাই। সেখানে জনাব বাহজা আল বায়তার, শায়খ কামেল কাসাব ও ইমাম আবদুল ফাত্তাহ সাক্ষাত দিয়ে আমাদেরকে ধন্য করেন।

আজ হিমস সফরের কথা থাকায় তারা আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় জানান। সেখান থেকে যাব হামাত। হামাত থেকে আলেপ্পো। তারপর তুরস্ক।

সফরের উদ্দেশ্যে রওনা করার পূর্বে শায়খ কামেল কাসাবের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আরবের বর্তমান বাদশাদের কথা উল্লেখ করেন। আরব সরকারগুলোর উপর তার গবেষণা কর্মের ফলাফল বিশ্লেষণ

করেন। তাদের কাছ থেকে যেসব জিনিস পাওয়ার আশা ছিল তা কীভাবে ব্যর্থ হল তার বর্ণনা দেন।

দীনের সাহায্য এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সহযোগিতার ব্যাপারে তাদেরকে বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, তাদের থেকে কোনো কল্যাণ আশা করা বৃথা। তারা নিজেদের পেট ও চাহিদা পূরণের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। শায়খ কাসাব মুসলমানদের যে অবস্থা দেখেন এবং ইসলাম অবমাননার যে দৃশ্য তার চোখে পড়ে তজ্জন্য তিনি অত্যন্ত বিষণ্ন, বিচলতি, ব্যথিত। তিনি খাঁটি ঈমানদার। দীনের প্রতি তার যথেষ্ট আবেগ-উদ্দীপনা ও মহব্বত-ভালবাসা রয়েছে।

তিনি এ কারণে খুব দুঃখ প্রকাশ করেন যে, আমরা দামেশকে এসেছি অথচ তিনি জানেন না। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে সাক্ষাত হল। তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করেন। নিজের পীড়িত হৃদয় খুলে কথা বলেন।

হিমসের পথে

শায়খ মুসতফা সিবায়ী এবং বন্ধুদের এক জামাত আমাদের সাথে সাক্ষাত করেন। আমরা হিমসের উদ্দেশে গাড়িতে উঠে বসি। শায়খ মুসতফা সিবায়ী আমাদের হিমসে পৌঁছার পূর্বে ইখওয়ান সদস্যদেরকে আমাদের আসার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা দামেশক ও হিমসের মধ্যকার দূরত্ব অতিক্রম করি। এ সময় সিরিয়ার বিভিন্ন বিজয়ের ইতিহাস আমাদের চোখের পর্দায় ঘুরতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম এবং অন্যান্য মুজাহিদীনে ইসলামের পদাতিক এবং ঘোড়সওয়ার বাহিনীর দৃশ্যপট চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

এ ভূখণ্ডকে একসময় ঘোড়সওয়ার মুজাহিদীন নিজেদের ঘোড়ার খুর দিয়ে দলিত করেছেন। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা আমেরিকার তৈরী দ্রুতগামী ও আরামদায়ক গাড়িতে চড়ে পথ চলি। কাল এবং আজকের মধ্যে কত পার্থক্য! অতীত এবং বর্তমানের মাঝে কত বড় ব্যবধান!

আমরা চারটায় হিমস পৌঁছে যাই। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে প্রবেশ করি। একটি শানদার এবং পরিচ্ছন্ন ভবন। ভবনের সামনে বাগান

আছে। পানির হাউজ আছে। বন্ধুবর শায়খ মুসতফা সিবায়ীর ভাই প্রফেসর নাসুহ সিবায়ী এবং শায়খ আবদুল মাজিদ তারাবলুসীর সাথে দেখা হয়। আসরের নামাজের পর তারা আমাদেরকে 'আসী নদী'র বিনোদন কেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করি। নদীর তীরে বসে বিকালের নাশতা খাই। সেখানে আমরা মৌসুমের পরিবর্তন অনুভব করি। ঠাণ্ডাও একটু বেশি মনে হল।

আমার বয়ান

তারপর আমরা ইখওয়ানের কার্যালয়ে ফিরে যাই। এশার নামাজের পর আমার বয়ানের প্রোগ্রাম। অনুষ্ঠানস্থল লোকজনে কানায় কানায় ভরে গেছে। অনুষ্ঠানে শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষিতশ্রেণীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

শায়খ আবদুল মাজিদ স্বাগত ভাষণ দেন। সবার মাঝে তিনি আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি এগিয়ে যাই। প্রথমে আমার কথা এবং তারপর ছেলেবেলা থেকে হিমসের সাথে আমার ভালবাসার কথা উল্লেখ করি। আমাদের বংশের নারীরা অধিকাংশ সময় একত্র হত। এটি অনেক আগে থেকেই আমাদের বংশে প্রচলিত। বিশেষ করে কোনো ঘটনা ঘটলে তারা জমায়েত হয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করত। সকলে এক জায়গায় একত্র হওয়ার পর 'সমসমুল ইসলাম' বইটি পাঠ করত। এর লেখক আল্লামা ওয়াকিদী রহ.[১]। আমাদের বংশের একজন বুজুর্গ সাইয়েদ আবদুর রাজ্জাক কালামী বইটি উর্দু ভাষায় কাব্যানুবাদ করেছেন। বইটি শ্রোতাদের উপর দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করত। যখন এ কবিতাগুলো আবৃত্তি করা হত তখন অন্তর ছটফট করতে থাকত। চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে থাকত। সাইয়েদুনা খালিদ এবং অন্যান্য মুজাহিদ সাহাবি ও মুসলিম সৈনিকদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম এখান থেকেই আমি জেনেছি। তাদের বাহাদুরি, শৌর্য-বীর্য, জান নিয়ে খেলা করা, শাহাদাতের তামান্না এবং নশ্বর জীবনকে তুচ্ছ মনে

---

[১] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। ১৩০ হিজরিতে মদিনায় তাঁর জন্ম। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত কিতাবসংখ্যা প্রায় ২৮টি। 'ফুতুহুশ শাম', 'কিতাবুল মাগাজি' তাঁর সাড়াজাগানো গ্রন্থ। ২০৭ হিজরিতে তাঁর ইনতেকাল।

করার বিষয়টি আমি এই বই থেকে জেনেছি। তাদের ভালবাসা আমার হৃদয়ের গহীনে জায়গা করে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে এটা আমার মেজাজ ও আকিদা-বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

সিরিয়া বিজয়ের ইতিহাস এবং ভারতীয় মুসলিমজীবনে এর প্রভাব

আমি বললাম, হে সিরিয়া ও হিমসবাসী, যে ইতিহাস তোমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে তা ভারতীয় মুসলমানদেরকে তাদের চারপাশে ঘিরে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মীদের সাথে একাকার হওয়া থেকে বাঁধ সেধে আছে। ইসলামবিরোধীদের প্রবল তোড়ে ভেসে যাওয়া থেকে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ সেই ইতিহাস, যা তখন থেকে এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে জীবনধারণ, শক্তিঅর্জন এবং বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে উৎসাহের নির্ঝরনীরূপে কাজ করছে। দীনী জজবা ও আবেগের স্থায়িত্ব, সংরক্ষণ এবং মুসলিমজাতির মাঝে তা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে এই ইতিহাসের বড় ভূমিকা রয়েছে। এর চেয়ে বড় আক্ষেপ ও ব্যথার বিষয় কী হতে পারে যে, হিমসবাসী এইসব উজ্জ্বল ইতিহাসের ব্যাপারে গাফেল। এর পয়গামের ব্যাপারে উদাসীন। সেসব মুসলিম ব্যক্তিত্ব ও জানবাজ মুজাহিদ থেকে তারা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে।

মুসলিমবিশ্বের জন্য প্রয়োজন একজন সাইফুল্লাহর

আমি বললাম, আজ মুসলিমবিশ্ব বস্তুগত উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে আশাতীত উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু তাদের মাঝে কোনো সাইফুল্লাহ নেই। কোথাও আল্লাহর কোনো তরবারি নেই। এটাই তাদের মূল দুর্বলতা। হিমসবাসী, এ তলোয়ার তোমাদের দেশেই সমাহিত। তোমাদের মধ্যে কি এ যোগ্যতা আছে যে, মুসলিম জাহানকে সাহায্য করবে? মুসলিম দুনিয়ার খোয়া যাওয়া তরবারি অথবা কবরে ঘুমন্ত বাহাদুরকে উদ্ধার করবে? জাগিয়ে তুলবে?

তারপর তাদেরকে বললাম, মুসলিমবিশ্বের শুধু বাহ্যিক রূপরেখা অবশিষ্ট আছে। শুধু নাম বাকি আছে। সেই প্রাণশক্তি নেই। হাকিকত

নেই। নেই সেই সাইফুল্লাহ। এ কারণেই তাকে এখন চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হচ্ছে। এটিই শত্রুকে তার উপর বাঘ বানিয়ে দিয়েছে।

বর্তমানে মুসলিমবিশ্বে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে তা দূরীভূত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার আপন পোশাক পরিধান না করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সঠিক ঈমানি শক্তি তার মধ্যে না আসবে। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। দৈনন্দিন জীবন থেকে এর অনেক উদাহরণ পেশ করি। বোঝা গেল বক্তৃতা শ্রোতাদের মনমতো হয়েছে। মনে হচ্ছিল বক্তৃতা উপস্থিতির মধ্যে একটি বড় অংশের অনুভূতির অনুবাদ। তাদের অভিজ্ঞতা এবং মুসলিমবিশ্বের অবস্থা বক্তৃতাকে সত্যায়ন করছিল।

খালিদ বিন অলিদ রা. এর সমাধির পাশে

৩০ জুলাই ১৯৫১

আজ সকালে আমরা সাইয়েদুনা খালিদ বিন অলিদের সমাধি জিয়ারতে বের হই। একটি মসজিদে প্রবেশ করি। মসজিদটি খালিদ বিন অলিদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। তার সমাধির সামনে দাঁড়াই। তখন তার জীবন-ইতিহাস, জিহাদের ময়দানে তার বীরত্ব ও অস্বাভাবিক সাহসিকতার কথা স্মরণ করি। আল্লাহ তায়ালা তাকে বিপদ-আপদ মোকাবেলা করার যে শক্তি ও যোগ্যতা, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত দান করেছিলেন এবং নিজেকে কোরবান করার যে জজবা দান করেছিলেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। সেখানে দাঁড়ানোর ফলে আমার হৃদয়ে দারুণ অনুভূতি সৃষ্টি হয়। অনেক বিষয়ে আমাকে সজাগ করে তোলে। তার ইতিহাসকে তাজা ক দেয়। এ মহান মুজাহিদের আজমত, মহব্বত ও মর্যাদা আল্লাহ পা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। রাসুল সা. তার নাম রেখেছিলেন সাইফুল্লাহ।

একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর সাক্ষাত

আমরা একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখতে যাই। মসজিদে খালেদ বিন অলিদের একপাশে একটি দীনী মাদরাসা আছে। তারপর আমরা আমাদের মুখলিস বন্ধু শায়খ আবদুল আজিজের সাথে দেখা করতে যাই। তিনি 'দারুল ইফতা'র সচিব। তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে গতবছর হজের সফরে। তিনি আমাকে তখন হিমসে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন।

পাঁচদিন হয়েছে তার পিতা ইনতেকাল করেছেন। আল্লাহ তার উপর রহম করুন। তার বাসায় গিয়ে তার সাথে সাক্ষাত করি। তাকে সান্ত্বনা দিই। মরহুমের ইচ্ছা ছিল আমরা তার বাড়িতে অবস্থান করব। আমাদের জন্য একটি রুমও তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আমাদের আসার অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে আল্লাহর হুকুম চলে আসে। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করুন। তার মর্যাদা সুউচ্চ করুন। তিনি দুনিয়ায় রেখে যান বহুবন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষী। রেখে যান আমাদের বন্ধু শায়খ আবদুল আজিজের মতো উত্তরসূরি। রেখে যান অনেক অম্লান স্মৃতি।

হিমসের গ্রান্ড মুফতির সাক্ষাত

আমরা শায়খ আবদুল আজিজের সাথে শায়খ মুহম্মদ তাওফিক আবুল হাসান আতাসির সাথে সাক্ষাত করতে যাই। তিনি হিমসের গ্রান্ড মুফতি। প্রেসিডেন্ট হাশেম[১] বেগ মুফতি আতাসির চাচাত ভাই। আতাসি খান্দান ইলম ও দীনদারিতে পুরো সিরিয়ায় প্রসিদ্ধ। মুফতি সাহেবের বয়স অনেক বেশি। চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। অত্যন্ত নেককার ও আমলদার মানুষ। উত্তম চরিত্রের অধিকারী। আলেমে বাআমলের তিনি জীয়ন্ত উদাহরণ। সদা হাস্যমুখ। আমাদের দেশের বড় বড় আলেমদের সঙ্গে সহজেই তার তুলনা করা যায়।

আমরা জোহরের নামাজ মসজিদে নুরুদ্দীন জঙ্গিতে আদায় করি। এটি শহরের অন্যতম বৃহৎ জামেমসজিদ। তারপর আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অফিস দেখতে যাই। কিছুক্ষণ পর সেখান থেকে ফিরে আসি। জনাব আবদুল আজিজের ঘরে খানা খাই। তারপর সেখানে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিই। দ্বিতীয়বার হিমসের গ্রান্ড মুফতি শায়খ আবুল হাসান আতাসির সাথে সাক্ষাত করি। মসজিদে সাইয়েদুনা দিহয়া কালবীতে আসরের নামাজ আদায় করি। নামাজের পর মুফতি সাহেবের সাথে তার ঘরে কিছু সময় বসি। তারপর জনাব আবদুল আজিজের পিতার কবর জিয়ারত করতে যাই। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অফিসে আলেম-ওলামা

---

[১] সিরিয়া প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট। ১৮৭৫ সালে হিমসে তার জন্ম। ১৯৬০ সালে তার মৃত্যু।

এবং ইখওয়ানদের এক বড় জামাত একত্র হয়েছে। আমরা তাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করি। আলেপ্পো থেকে জনাব ওমর আমিরী এসেছেন। তিনি পাকিস্তানে নিযুক্ত সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত। তিনি কিছুক্ষণ আমাদের সাথে বসেন। তারপর দামেশকের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান।

রাস্তায় কয়েকজন ফিলিস্তিনির সাথে দেখা হয়। তারা গতরাতে ইখওয়ানের অফিসে যে আলোচনা করেছিলাম তার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, ওই আলোচনা তাদের ঈমান তাজা করেছে। তারা আমাকে অনুরোধ করেন, কোনো এক বাসায় আজ রাতে আমরা একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করব, সেখানে আপনি অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। আমাদের কিছু বন্ধু-বান্ধব এবং শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে দাওয়াত করব। আমরা তাদের দাওয়াত কবুল করি। এশার নামাজের পর জলসায় অংশগ্রহণ করি। দেখি শহরের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাদের সামনে আলোচনা করি। তারা অত্যন্ত মনোযোগসহকারে, প্রশান্তচিত্তে আমার আলোচনা শ্রবণ করেন। তারপর রাতের খানা খেয়ে ফিরে আসি।

ওমর বিন আবদুল আজিজের সমাধির পাশে

৩১ জুলাই ১৯৫১

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে ইখওয়ানি বন্ধু-বান্ধব, শহরের আলেম-ওলামা, মুফতি মুহম্মদ তাওফিক, শায়খ আবদুল আজিজসহ অনেকেই সাক্ষাত করে আমাদেরকে ধন্য করেন। তাদের সঙ্গে আমি ওমর বিন আবদুল আজিজের কবর জিয়ারত করতে 'সামআনে' যাই। এটি হিমসের একটি প্রত্যন্ত এলাকা। কবরটি একটি টিলার উপর অবস্থিত। চারপাশে আঙুরের বাগান।

আমি খেলাফতে রাশেদার পঞ্চম খলিফা এবং ইসলামের একজন বড় মুজাদ্দিদের সমাধির পাশে বসি। তার অসাধারণ যুহুদ, তাকওয়া ও ঈমানি শক্তির কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। খেলাফতে রাশেদার আদলে পরিচালিত তার জীবন-ইতিহাস স্মরণ করি। তার জন্য কল্যাণের দোয়া করি। দরবারে এলাহিতে এই বাহাদুর জোয়ানের উপর ক্ষমা ও রহমতের বারিধারা অব্যাহত রাখার দরখাস্ত করি। বর্তমান জামানায় ইসলাম ও

মুসলমানদের জন্য, মানুষ ও ক্ষতবিক্ষত মানবতার জন্য তার মতো একজন দরদী রাহবারের বড় প্রয়োজন।

আফসোস, জামানা এখন তার মতো লোক আনতে পারে না। জামানা তার মতো লোক জন্ম দিতে কার্পণ্য করে।

হামাতের পথে

আমরা হামাত শহরের দিকে রওনা করি। আসরের নামাজের সময় সেখানে পৌঁছুই। বন্ধুদের এক জামাত আমাদের স্বাগত জানায়। 'আলে আজম প্রাসাদে' আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক মহল। বর্তমানে এটি কয়েকটি সংস্থার কার্যালয়।

জিলানী খান্দান

আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে কিছুক্ষণ অবস্থান করি। কার্যালয়টি আলে আজমের এক কর্নারে অবস্থিত। জ্বরের প্রচণ্ড তাপ অনুভব হল আমার। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শহর-প্রধান এবং এর সেক্রেটারি জনাব আবদুল গনি সাআতি আমাদের নিকট আসেন। অত্যন্ত মহব্বতের সাথে দেখা করেন। আমি গিলানী খান্দান সম্পর্কে জানতে চাইলাম। আমি আমার শহর লখনৌতে এ খান্দানের একজন সদস্য সাইয়েদ আলি গিলানীর সাথে সাক্ষাত করেছিলাম। তিনি ফিরিঙ্গীমহলে থাকেন। সেখানকার আলেম-ওলামাগণ তার ভক্ত। বহু লোক তার জিকিরের হালকায় বসে। তিনি এ খান্দানের সাইয়েদ নেজার গিলানী নামের একজন নওজোয়ানকে ডেকে পাঠান। জানতে পারলাম তিনি সাইয়েদ আলি গিলানীর ভাতিজা। তারা শায়খ মুহম্মদ মুরতজা গিলানীর কথা উল্লেখ করলেন। দেশের সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে তার অবস্থান সবার শীর্ষে। শায়খ আবদুল আজিজ সাআতি আমাকে সাইয়েদ মুরতজার সাথে সাক্ষাত করার পরামর্শ দেন। আমি বললাম, এখন আমার প্রচণ্ড জ্বর অনুভব হচ্ছে। তারপরও তার সঙ্গে দেখা করব। আমরা তার সাথে সাক্ষাত করি। কিছুক্ষণ তার কাছে বসি। তারপর ইখওয়ানের কার্যালয়ে ফিরে আসি। তাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। সভায় বহুসংখ্যক আলেম ও শিক্ষক উপস্থিত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে আমার আলোচনা

আমি অনুষ্ঠানে আলোচনা করি। সিরিয়ার ইসলামি জিহাদ কীভাবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে উৎসাতি করেছে তার বর্ণনা দিই। ইসলামের জন্য তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শত্রুর প্রতিরোধকে নিজেদের গৌরব মনে করা সিরিয়ার ইসলামি জিহাদেরই ফসল। তারপর বলি ওই জিহাদ তাদের মাঝে কীভাবে দীনী প্রাণশক্তি জাগ্রত করেছে। কীভাবে ইসলামের মর্যাদা সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করেছে।

সিরিয়াবাসীর জিম্মাদারি

ইসলাম ও জিহাদের পথ অনুসরণের জিম্মাদারি সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশি সিরিয়াবাসীর উপর বর্তায়। তাদের জন্য জরুরি হল তারা নিজেদের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিবে। এখন সিরিয়াবাসী যদি অবলীলায় জাতীয়তাবাদের মূলনীতির দিকে ধাবিত হয়, আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগানে উন্মাদ হয়ে পড়ে, তা হলে পাকভারতের মুসলমানরাও তাদের চারপাশে ঘিরে থাকা সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধর্মীদের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। আর মুসলমানরা এমন করলে সংখ্যাগরিষ্ঠরা তাদেরকে স্বাগত জানাবে। তাদেরকে মাথার উপর বসাবে।

হে আরববাসী, সেই দাওয়াত তাদেরকে এ কাজ থেকে বাঁধা দিয়ে রেখেছে, যা তোমাদের পূর্বপুরুষেরা দিয়েছেন। এই ইতিহাস, যা সিরিয়া ও আরবের অন্যান্য দেশে সৃষ্টি হয়েছে, এখেকে যদি সিরিয়ার লোকেরা অব্যাহতি গ্রহণ করে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তা হলে অন্যরা, যাদের সাথে এর বংশীয় সম্পর্ক নেই, তারা অনেক আগেই একে 'সালাম' দিয়ে বসবে। যদি এমনই হয়, তা হলে হে সিরিয়াবাসী ইসলামের জন্য আমাদের যারা শহিদ হয়েছেন, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। সেই পবিত্র রক্তধারা ফিরিয়ে দাও, যা দীনের জন্য প্রবাহিত হয়েছে।

আমার ইচ্ছা ছিল তাদের দীনী চেতনা ও বিশ্বাস জাগিয়ে তোলা, তাদেরকে সচেতন করা, তাদের অন্তরের দুর্বল পয়েন্টে আঘাত করা। আমি তাদের চেহারায় এর প্রভাব লক্ষ করি। আলোচনা খুব কঠিন ছিল। অন্তরের গভীরে পৌঁছে যাওয়ার মত। আমি ইচ্ছে করেই এমনটি করেছি। কারণ জজবার বশবর্তী হয়ে গতানুগতিক ধারায় 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' শ্লোগান শুনে শুনে আমি বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর আমরা কার্যালয়ের একটি রুমে বসি। সেখানে হামাতের কয়েকজন আলেম ও মাশায়েখের সাথে পরিচয় হয়। শায়খ মুহম্মদ হামিদের সাথে পরিচয় হয়। তিনি হামাতের অত্যন্ত বড় মাপের সচেতন মুসলিহ আলেম। গর্হিত ও শরিয়ত-বিরোধী কাজ তিনি কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করেন। তার মোকাবেলা করেন। শায়খ মুহম্মদ মুনির লুতফির সঙ্গেও পরিচয় হয়। তিনি তার 'সাম্যবাদের স্বরূপসন্ধান'[১] গ্রন্থের একটি কপি আমাকে হাদিয়া দেন। গ্রন্থটি পড়ে জানা যায় লেখক বর্তমান যুগ সম্পর্কে সজাগ-সচেতন। চিন্তাগত এবং সামষ্টিক বিভিন্ন বিষয়ে তার ধারণা স্বচ্ছ।

হামাতের চরকি

১ আগস্ট ১৯৫১

গতরাতে শায়খ মুহম্মদ আফেন্দী গিলানী আমাদেরকে নাশতার দাওয়াত দেন। আমরা তার বাসার উদ্দেশে রওনা করি। রাস্তায় হামাতের পানি ওঠানোর বিভিন্ন চরকি দেখি। এটা এ শহরের বৈশিষ্ট্য। পানি সেচের এটি প্রাচীন পদ্ধতি। এদ্দ্বারা পুকুরের পানি বিভিন্ন উঁচু জায়গায় পৌছানো হয়। এই চরকিগুলোর সঙ্গে ছোট ছোট ঢাকনা লাগানো বাক্স আছে। সেগুলো পানিতে ডুবে পানি ভরে ঘুরতে থাকে। তখন এগুলো থেকে পানি পড়ে। এভাবে শহরের সব জায়গায় পানি পৌছানো হয়। চরকিগুলো ঘোরার সময় লাগাতার একটি আওয়াজ হতে থাকে। যার ফলে সমগ্র পরিবেশ গুঞ্জরিত থাকে। রাতে এ আওয়াজ তীব্র হয়। তখন পরদেশি লোকেদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু শহরবাসীর এর মধ্যে ঘোমানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। ফলে তাদের কোনো সমস্যা হয় না। চরকির মাধ্যমে পানি সেঁচের এ পদ্ধতিটি অনেক পুরনো। রোমান-যুগ থেকে চলে আসছে। গিলানী খান্দানের সবচেয়ে পুরনো কয়েকটি ঐতিহাসিক ভবনের পাশ দিয়ে আমরা যাই। তারা বাগদাদ থেকে এখানে এসেছিলেন। সম্ভবত তারা আবুল ফিদা[২]র যুগে এসেছেন। আমাদের মেজবানের ঘরে গিয়ে আমরা নাশতায় অংশ নিই।

---

[১] حقائق عن الشيوعية

[২] প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ। ১৩৭৩ খ্রিস্ট সালে দামেশকে তার জন্ম। তারিখে আবুল ফিদা ও তাকবীমুল বুলদান তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মিসরের বাদশা নাসির তাকে হামাতের স্বায়ত্তশাসন দেন। সেখানেই ১৩৩১ সালে তার মৃত্যু হয়।

হামাতের ঐতিহাসিক নিদর্শন

আমরা শহর এবং এর ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি দেখার জন্য বের হই। আবুল ফিদা জামে মসজিদ দেখি একে জামিউল হাইয়াতও বলা হয়। হাইয়াত অর্থ সাপ। এ নামে নামকরণের কারণ হল মসজিদের স্তম্ভগুলোয় এমনভাবে দাগ টানা হয়েছে, যা সাপের মতো দেখা যায়। মসজিদটি এখন ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের আশ্রয়কেন্দ্র। তারা এখানে নিজেদের ঘরে থাকার মতো করে কোনোরূপ লৌকিকতা ছাড়া অবস্থান করে। এখানে তারা সন্তানও জন্ম দেয়। আমি দামেশকে বহু মসজিদে শরণার্থীদের এভাবে থাকতে দেখেছি। এটা সরকারের নির্দেশে হয়েছে। মানুষের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত ঘরবাড়ি ও জায়গা-জমি থাকা সত্ত্বেও এর বৈধতা আমার বুঝে আসে না।

আবুল ফিদা হামুবী

আমরা আবুল ফিদা হামুবীর কবর দেখি। তিনি ইতিহাসের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'তারিখে আবুল ফিদা'র লেখক। গ্রন্থটি তার নামেই প্রসিদ্ধ। হাতে গোনা কয়েকজন শাসক রাষ্ট্রপরিচালনার পাশাপাশি লেখালেখি করেছেন। জ্ঞানসাধনা ও বিদ্যাচর্চা করেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব আবুল ফিদা হামুবী। তিনি অত্যন্ত চৌকস আলেম ও বড় লেখক ছিলেন। তার যুগে হামাতে একটি চমক দেখা দেয়। হামাত উন্নতির সুউচ্চ সোপানে পৌঁছে যায়। এমনকি একপর্যায়ে এটি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

ইবনে রুশদ উচ্চ বিদ্যালয়ে

আমরা বাদশা মুজাফ্‌ফারের নির্মিত মসজিদও দেখি। মসজিদটি আলীশান। একসময় এটি গির্জা ছিল। পরবর্তী সময়ে একে ক্রয় করে মসজিদে রূপান্তর করা হয়।

আমরা ইবনে রুশদ উচ্চ বিদ্যালয়ে যাই। স্কুল ভবনটি আধুনিক স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে সাক্ষাত করি। গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন শিক্ষক গতকালের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। তারা আমার আলোচনা শুনে প্রভাবিত হওয়ার কথা জানালেন।

আলে আজমের মহল

আমরা আলে আজমের মহল দেখেছি। এর এক অংশে আমরা কিছু সময় থেকেছিও। মহলটি অনেক চমৎকার। তার মধ্যে রাজকীয় জীবনের রূপরেখা স্পষ্ট। এখানে তুর্কি শাসনামলের রাজা-বাদশারা থাকতেন। এখানে গরিব কৃষকদের ধন-সম্পদ এনে শাসক ও মালদারদের চাহিদা পূরণে ব্যয় করা হত। মহলের একজন অধিবাসীর যেসব জিনিস প্রয়োজন হতে পারে তার সবকিছু এখানে আছে। যেসব জিনিসের প্রয়োজন সাধারণত পড়ে না তাও আছে। সেটা আছে শুধু এ কারণে যে, কখনো এর জরুরত হতে পারে।

বর্তমানে এই মহলে একটি মাদরাসা, দুইটি সংস্থার অফিস রয়েছে। এরই এক অংশে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়।

কয়েকজন ইখওয়ানি বন্ধুর সাথে জনাব আবদুল্লাহ হাল্লাকের বাসায় আজ দুপুরের খানা খাই। খাবারের আয়োজনে তিনি বেশ লৌকিকতা অবলম্বন করেছিলেন। তবে বোঝা যাচ্ছে খানা তৈরীর ব্যাপারে তিনি বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লোকজন, বিশেষ করে নওজোয়ানরা, আমার থাকার জায়গায় সাক্ষাতের জন্য বরাবর আসা-যাওয়া করতে থাকে। এ সময় তারা আমাকে দীনী বিষয়ে বহুপ্রশ্নও করে। আমি সেগুলোর জবাব দিই। আজ সন্ধ্যায় তাদের একটি বড় অনুষ্ঠান হবে। সেখানে তারা অনেক রাত পর্যন্ত থাকবে।

কেল্লা ভ্রমণ

২ আগস্ট ১৯৫১

আমার এবং আমার সফরসঙ্গী মাওলানা ওবায়দুল্লাহর পালাক্রমে জ্বর আসতে থাকে। ইখওয়ান বন্ধুরা, বিশেষ করে আবদুল গনি সাআতি ও সাইয়েদ নেজার গিলানী অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের শুশ্রূষা ও দেখভাল করেন। ইখওয়ান বন্ধুরা আমাদের এমন সেবা করেন, যার তুলনা করা সম্ভব না। মনে হচ্ছিল আমরা আমাদের পরিবারের মাঝে অবস্থান করছি।

সাইয়েদ মুরতজা গিলানী আমাদের সাথে সাক্ষাত করতে ও শারীরিক অবস্থা জানতে বারবার তাশরিফ আনেন। দীনী সম্পর্ক ও ইসলামি

ভ্রাতৃত্বের একটি বাস্তব নমুনা ছিল এটি। আমাদের প্রতি তাদের এত মনোযোগ ও ভালবাসা লক্ষ করি, যা কোনো বড় থেকে আরও বড় প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিও আশা করতে পারে না। কোনো ধনবান ব্যক্তি যা কল্পনা করতে পারে না। আল্লাহ্ তায়ালা এসব বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করুন।

আজ আমরা আবদুল গনির সাথে খায়রিয়্যা কেল্লা ভ্রমণ করি। তার বিভিন্ন নিদর্শন অবলোকন করি। শোনলাম একটি ভিনদেশি কোম্পানি কেল্লা খোদাইয়ের কাজ করছে। সেখান থেকে তারা বিভিন্ন মূল্যবান জিনিস সরিয়ে নিচ্ছে। সিরীয় সরকার কোম্পানির সাথে চুক্তি করেছিল খোদাইয়ের পর যেসব ঐতিহাসিক জিনিস পাওয়া যাবে তার অর্ধেক কোম্পানি পাবে আর অর্ধেক পাবে সিরিয়াসরকার। কিন্তু এ কাজটি দেখাশোনার ক্ষেত্রে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারেনি। যার ফলে সরকার ধোঁকা খাচ্ছে। ভালো ভালো বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন ভিনদেশে চলে যাচ্ছে।

আমরা কেল্লা থেকে শহরে আসি। পথিমধ্যে একটি খ্রিস্টানপল্লী দেখতে পাই। আবুল ফিদা উচ্চ বিদ্যালয়টিও দেখি। কিছু সময় শিক্ষক হাল্লাকের অফিসে কাটাই। বিদ্যালয়ের কাছে একটি মসজিদ আছে। এখানে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। মসজিদটি পরিষ্কার পরিপাটি। আমরা আবুল ফিদা হোটেলের সামনের সড়কে পায়চারি করি। সড়কটি অনেক সুন্দর। নদীর পাশ দিয়ে কিছুদূর অতিক্রম করি। হামাত মিউনিসিপ্যালিটির ভবন ও গভর্নমেন্ট হাউস দেখি। হামাতের দৃশ্য ও পরিবেশ চমৎকার মনোলোভা।

৩ আগস্ট ১৯৫১

আমরা নাশতা করে একটি ছোট গাড়িতে করে আলেপ্পোর উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই। আমরা মাআররাতুন নোমান দেখার দৃঢ় সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে এখন তা হালকাভাবে একনজর দেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এটা তার হক ও চাহিদা থেকে অনেক কম। কারণ সময়ের স্বল্পতা সেখানে আমাদেরকে দীর্ঘক্ষণ থাকার অনুমতি দেয়নি। আমি জীবনের একটা বড় অংশ তার কবিতা ও সাহিত্য অধ্যয়নে

কাটিয়েছি। এখানকার প্রসিদ্ধ কবি আবুল আলা মাআররী[১]'র কাব্যগ্রন্থ 'আগুনের শিশির'[২] অনেক পরিশ্রম করে পড়েছি। গ্রন্থটি আমার মুখস্থর মত হয়ে গেছে।

মাআররাতুন নোমানে

আমরা মাআররাতুন নোমানে প্রবেশ করি। আবুল আলার কবিতা আমার স্মৃতিপটে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আমি বলছিলাম, এটাই মাআররাতুন নোমান; তার সম্পর্কে তার সুপুত্র বলেছে, 'হে বিজলি, কারখ আমার মাতৃভূমি না। বরং জামানার ঘূর্ণিপাক বহুদিনে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বিজলি, তোমার কাছে আমার মাতৃভূমি মাআররা কি এক ফোটা পানি পায়, যা দিয়ে কোনো অশান্ত তৃষ্ণার্ত নিজের পিপাসা মিটাবে!'

আবুল আলার সমাধির পাশে

গাড়ি আবুল আলার সমাধির পাশে গিয়ে থামে। আমরা গাড়ি থেকে নামি। কবরের সীমানায় প্রবেশ করি। আমি ঘুরে ফিরে সেই পঙ্ক্তিই দেখতে পাই, যা কবরের উপর লিখতে তিনি অসিয়ত করেছিলেন। 'আমি আমার পিতার ভুল ও সীমালঙ্ঘনের ফসল, কিন্তু আমি কখনো এ ভুল করিনি।'

পঙ্ক্তিটি কবরের উপর উৎকীর্ণ ছিল না। বরং একটি কাগজের উপর লেখা ছিল। হয়তো কোনো তিরস্কারকারী কাগজে লিখে টানিয়ে দিয়েছে। আবুল আলার কবরের পাশে একটি লাইব্রেরি আছে। সরকার লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা করেছে। আমি ভালো করে লাইব্রেরিটি ঘুরে ঘুরে দেখি। এখানে কবির সব কটি গ্রন্থ সংরক্ষিত নেই। তার জ্ঞানসাধনার বিভিন্ন স্মৃতিও নেই। তার সম্পর্কে যেসব বই লেখা হয়েছে তারও সবটি নেই। অথচ লাইব্রেরিটি তার স্মরণে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানে তার লেখা সকল গ্রন্থ থাকা উচিত ছিল। তার সম্পর্কে লেখা সকল বইও বিদ্যমান থাকা জরুরি

---

[১] অসাধারণ প্রতিভাবান আরব কবি। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে সিরিয়ার 'মাআররাতুন নোমান' জনপদে তার জন্ম। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। ১০৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[২] ديوان سقط الزند

ছিল। এই কুতুবখানায় ভারতবর্ষের কীর্তি-পুরুষ আল্লামা আবদুল আজিজ মায়মুনীর লেখা 'আবুল আলা এবং তার ইতিবাচক ভাবধারা'[১] গ্রন্থটিও থাকা আবশ্যক ছিল। এ বিষয়ে এ বইটি সবচেয়ে বেশি বিশ্লেষণধর্মী।

সাইফুদ্দৌলাহর রাজধানীতে

এরপর আমরা আলেপ্পো যাই। এটি ছিল সাইফুদ্দৌলাহর রাজধানী। কবি মুতানাব্বি ও আবু ফিরাস হামদানি এখানকার লোক ছিলেন। হামদানির শাসনামলে কবিদের প্রাণকেন্দ্র ছিল এটা। এখানে সাহিত্য ও কাব্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আরবিভাষার ছিল এখানে জয়জয়কার। এটা সেই জায়গা, যার সম্পর্কে আবু বকর খাওয়ারেজমী বলেন, 'আমার হৃদয় উন্মুক্ত করা, বোধশক্তি বৃদ্ধি পাওয়া, মেধা দীপ্তিময় হওয়া, জবান তেজস্বী করা এবং সাহিত্যের এ অবস্থানে পৌঁছার ক্ষেত্রে আলেপ্পোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভিন্ন বিষয়ের ভূমিকা অসাধারণ, যা আমার মেধা ও অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে গিয়েছিল। এটা তখনকার কথা যখন আমার যৌবনের ডাল তরতাজা ও সবুজ-শ্যামল ছিল।'

বর্তমানে শহরটি দামেশকের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনবসতি এবং বিল্ডিঙের শান-শওকতের ক্ষেত্রে দামেশকের সাথে পাল্লা দিতে সক্ষম। সিরিয়ার সবচেয়ে বড় শিল্পনগরী এটি। একসময় লেবানন, ফিলিস্তিন এবং পূর্ব জর্দান এই শহরের অন্তর্গত ছিল। আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে যাই। কেন্দ্রের প্রধান জনাব আবদুল কাদির সাবসাবী অত্যন্ত উদার মন ও আগ্রহ নিয়ে আমাদের সাথে দেখা করেন। জুমার নামাজ পড়ে আমরা তার ঘরে যাই। খানা খেয়ে কিছুক্ষণ আরাম করি।

প্রফেসর মুসতফা জারকা[২]

আজ আমার বয়ানের নির্ধারিত দিন। বিষয় ছিল 'আরবজাতি কীভাবে তার আন্তর্জাতিকতা ফিরিয়ে আনবে'। ইখওয়ানের কার্যালয়ে দুটি বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম বয়ান ছিল আমার। দ্বিতীয় বয়ানটি ছিল ল'

---

[১] ابو العلاء وما اليه

[২] প্রখ্যাত সিরীয় আলেম ও বিশিষ্ট রাজনীতিক। দুইবার তিনি সিরিয়ার পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আল ফিক্‌হুল ইসলামী ফি সাওবিহিল জাদীদ'। ১৯৮৪ সালে তিনি আন্তর্জাতিক ফয়সাল অ্যাওয়ার্ড পান। ১৯০৭ সালে তাঁর জন্ম।

কলেজের প্রফেসর মুসতফা আহমদ জারকার। আহমদ জারকা নিজের সঙ্গী ডক্টর মারুফ দুয়ালিবীর সাথে ১৯৫১ এর জুলাই মাসে প্যারিস কন্‌ফারেন্সে সিরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। কন্‌ফারেন্সটি ছিল ইসলামি ফেকাহ বিষয়ে। সেখানে সপ্তাহব্যাপী আলোচনা হয়। এ উভয় ব্যক্তিত্ব সিরিয়া ও ইসলামি শরিয়তের সুন্দর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তার আজকের আলোচনার বিষয় এই সপ্তাহব্যাপী কন্‌ফারেন্স।

আমি দামেশকে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব ছিলাম। কিন্তু এই সাক্ষাত ও পরিচয় আলেপ্পো এবং শায়খের মাতৃভূমিতে হওয়াই তকদিরে লেখা ছিল। অনুষ্ঠান মঞ্চে আমাদের উভয়ের সাক্ষাত হয়।

প্রফেসর ওমর কারকুকি সামনে অগ্রসর হয়ে আলোচনা করেন। আজ রাতের দুই আলোচককে স্বাগত জানান। উপস্থিত শ্রোতাদের নিকট উভয়কে পরিচয় করিয়ে দেন। এটি একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান ছিল। এখানে উপস্থিত হয়েছেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ওলামায়ে কেরাম ও বিভিন্ন কলেজের বহুছাত্র। ইখওয়ানি নওজোয়ান ছাড়াও শিক্ষিত বহুলোক এসেছেন।

আলেপ্পোর অনুষ্ঠানে আমার আলোচনা

প্রফেসর ওমর কারকুকির আলোচনার পর আমি আলোচনা করি। উত্তম হত যদি আলোচনা আগেই লিখে নিতাম। কারণ বিষয়টি গবেষণাধর্মী ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা এবং ধারাবাহিক সফরের কারণে লেখার সুযোগ হয়নি।

তৎকালীন পৃথিবীর উপর আরবের বিজয় রহস্য

যাই হোক, আমি আলোচনা শুরু করি। ইসলামের প্রথম যুগে পৃথিবীর উপর আরবদের বিজয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল, গোত্রীয় আমিত্ব, সামাজিক কাজকর্মে আত্ম-অভিমান, স্বজাতি ও মাতৃভূমির প্রতি অন্ধঅনুরাগ ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত জীবনযাপন। অন্তর দ্বারা সেই আকিদা মেনে নেওয়া, যা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। যা শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। বরং তাদেরকে সহাবস্থান দান করে। উচু-নীচু, ধনী-গরিব ও কোরেশি নেতা ও হাবশি গোলামকে এক স্তরে রাখে। এসবের

মাঝে কোনো ব্যবধান সৃষ্টি করেনি। তারা নিছক বংশ, জাতি, দেশ ও মাতৃভূমির ব্যাপারে চিন্তা করেনি। তারা চিন্তা করেছে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ ও সফলতার, ব্যক্তিসত্তা ও স্বগোত্রের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে নয় বরং তারা সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ কামনায় বের হয়েছেন। তারা নিজে থেকে বের হননি বরং তাদেরকে পাঠানো হয়েছে। উদ্দেশ্য লোকজনকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনা। মানুষের উপাসনা থেকে এক আল্লাহর ইবাদত ও অনুসরণের দিকে আহ্বান করা। তাদের এ কাজে অগ্রসর হওয়া দারিদ্র্য কিংবা অর্থনৈতিক মন্দার কারণ ছিল না। বরং মানুষের বস্তুবাদী জীবনের সংকীর্ণতা, প্রবৃত্তির গোলামি এবং বিভিন্ন মতাদর্শ ও সরকারের পক্ষ হতে জনগণের উপর নির্মম নির্যাতন দেখে তারা এ পথে এসেছে। যাতে তারা লোকজনকে দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে, প্রশান্তির দিকে এবং ভ্রান্ত মতাদর্শের জুলুম-নিপীড়ন থেকে ইসলামের ইনসাফ ও সুবিচারের নীড়ে আনতে পারে। তাদের এ পরিবর্তন ইখলাসের ভিত্তিতে, নিঃস্বার্থভাবে, যা পুরো দুনিয়াকে তাদের সামনে নুইয়ে দিয়েছে। তাদের ইখলাস ও নিঃস্বার্থতার সামনে সকল জটিল কঠিন সমস্যা গলে পানি হয়ে গেছে। অথবা জ্বলে পুড়ে ধোঁয়ায় পরিণত হয়েছে।

আরবজাতি যেভাবে আন্তর্জাতিক অবস্থানে ফিরবে

আরবজাতিগোষ্ঠী যদি নিজেদের সেই আন্তর্জাতিক অবস্থান ফিরে পেতে চায় তা হলে তাদেরকে ইসলামের মেজাজ ও রুচিবোধের দিকে ফিরতে হবে আগে। একে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে ইখলাস ও নিঃস্বার্থতা আনতে হবে। দুঃখ ও বেদনাহত লোকদের প্রতি দয়া ও ভালবাসা দেখাতে হবে। তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু আফসোস, এ গুণগুলো এখন জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী কুচক্রি স্বার্থবাজ লোভী বিলাসী লোকগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। এগুলো দিয়ে তারা ময়দানে খেলছে।

আরব এবং তাদের নেতারা যেই জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলেছে তা অন্যান্য জাতীয়তাবাদের মতোই লোহার ছাঁচের ন্যায়, যাতে নেই এতটুকু ব্যাপকতা ও বিনম্রতা। নেই দয়া-মায়া– মমতা। এর পক্ষে বিশ্বজনীন সর্বজনীন আদর্শ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়, যার চারপাশে লোকজন এসে

সমবেত হবে, আশ্রয় নিবে। এটা জীবনধারণের এমন কোনো মূলনীতি বা আইন-কানুনও নয়, যার উপর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের জাতীয়তা ও মাতৃভূমির অখণ্ডতা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করবে। এটা মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি ও পৃথকীকরণের একটা সুদূরপ্রসারী নীলনকশামাত্র। এদ্দ্বারা সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হবে না। এ কেবল মানুষদেরকে বহুধা বিভক্ত করে দেওয়ার মাধ্যম। কখনো এদ্দ্বারা ভালবাসা ও একতা সৃষ্টি হবে না। আরবজাতি যেন জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের সাথে আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব ও রুহানি কমান্ড দেওয়ার দুরাশা না করে। কারণ এটা দীনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দীনই তাদেরকে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের আসনে পৌঁছিয়ে দিয়েছিল। এখনও শুধু দীনই তাদেরকে পূর্বের অবস্থানে আনতে সক্ষম। জাতীয়তাবাদ না।

ফিকহে ইসলামির অনুষ্ঠানে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

আমার পর মুসতফা আহমদ জারকা মঞ্চে এলেন। আমার আলোচনা তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেন। এর প্রশংসা করেন। এই সমর্থন ও প্রশংসা তার আরবীয় ভদ্রতার বহিঃপ্রকাশ এবং অবশ্যই এটি ছিল আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের হক আদায় করার ক্ষেত্রে আমার দুর্বলতা অনুভব হচ্ছিল।

তারপর তিনি সপ্তাহব্যাপী ফিকহে ইসলামি অনুষ্ঠানের কারগুজারি আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি মানুষের উপর বড় প্রভাব বিস্তার করে। সপ্তাহব্যাপী আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারা ফিকহে ইসলামির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। সকলের কাছে এ বিষয়টি প্রতিভাত হয় যে, ফিকহে ইসলামি সকল আইন-কানুনের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ নির্ঝরনী। বর্তমান পৃথিবী যেসব সমস্যার সম্মুখীন তার সমাধানের যোগ্যতা এর রয়েছে। মানব-রচিত আইন এর সমাধান দিতে অক্ষম। কন্‌ফারেন্সে যেসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার মধ্যে এর স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি একে ফ্র্যান্স থেকে আরবিতে অনুবাদ করে শোনান। 'সপ্তাহব্যাপী ফিকহে ইসলামি কনফারেন্সে যেসব আলোচনা হয়েছে তা থেকে এ বিষয়টি সামনে এসেছে যে, ফিকহে ইসলামির মূলনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কারো মতবিরোধের সুযোগ নেই। ফিকহে ইসলামির অধীনে বিভিন্ন মাজহাব, ফেকাহশাস্ত্রের যেসব

মূলনীতি পেশ করেছে তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় মানুষ জীবন চলার পথে যেসব প্রয়োজন ও সমস্যার মুখোমুখি হয় ফিকহে ইসলামি তার যথাযথ সমাধান দিতে সক্ষম।'

শায়খ মুসতফা জারকা ইসলামি শিক্ষামহলে অনেক বড় ব্যক্তিত্ব। আলেপ্পোর শরিয়াহ কলেজ থেকে তিনি পড়াশোনা শেষ করেছেন। পাশাপাশি ফ্র্যান্স ভাষাও আয়ত্ত করেছেন। বর্তমানে তিনি দামেশক ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। দীনী এবং ফিকহী বিষয়ে তার রয়েছে অগাধ পাণ্ডিত্ব। এক্ষেত্রে তিনি বিদগ্ধ আলেম ও গবেষকের মতোই শ্রেষ্ঠ অর্জনকারী। তার মধ্যে আধুনিক শিক্ষা এবং বর্তমান যুগের নতুন নতুন মাসয়ালা ও তার সমাধান, উভয় জ্ঞানের সমন্বয় আছে। ডক্টর মারুফ দুয়ালিবীরও এই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, এ জাতীয় কীর্তিমান ছাত্ররা সফলকাম। বর্তমান সময়ে এদেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

৪ আগস্ট ১৯৫১

শায়খ মুহম্মদ বানহানের সাথে তার বাসায় সাক্ষাত করি। তিনি ঈমানি শক্তি এবং কুরআন নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। জানা যায় তিনি বিশেষ ধরনের এক মানুষ।

আজ দুপুরের খাবার আলেপ্পোর আলেমদের এক জামাতের সাথে আমাদের মেজবান জনাব আবদুল কাদির সাবসাবীর বাসায় খাই। তাদের মধ্যে শায়খ মুসতফা জারকা, আবুল খায়ের যায়নুল আবেদিন এবং আলেপ্পোর একজন বিচারপতি শায়খ আবদুল ওহ্হাব তুনজী ছিলেন। মুসতফা জারকার মধ্যে আমাদের মতোই কিছু চিন্তা-চেতনা ও উচ্চাভিলাষ অনুভব করি। আমাদের একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাত করার দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্তরসমূহের সাক্ষাত এবং সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া ইলম ও চিন্তা এক হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখে। মাগরিবের নামাজ আমরা উমুবী জামে মসজিদে আদায় করি। তারপর পুরনো একটি বাজারে কিছুক্ষণ ঘোরা-ফেরা করি। বাজারটি তুর্কি শাসনামলের প্রাচ্যের কয়েকটি শহর ও সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করছে। আমরা আমাদের মেজবান আবদুল কাদির সাবসাবীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরি এবং অফিস দেখতে যাই। তিনি আলেপ্পোর ঝানু আইনজীবীদের একজন।

আলেপ্পোর লাইব্রেরিতে

৫ আগস্ট ১৯৫১

আমরা আজ 'দারুল কুতুব আল ওয়াতানিয়্যাহ' দেখতে যাই। এটি সিরিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার। লাইব্রেরিটি এখন প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। অথচ এখন উন্নতির যুগ চলছে। তবে সন্দেহ নেই যে, এটি একটি বড় লাইব্রেরির ভিত্তিমাত্র। দামেশকের 'আরবি অ্যাকাডেমি'র তত্ত্বাবধানে এটি পরিচালিত হচ্ছে। লাইব্রেরির পরিচালক সব কটি শাখা আমাদের ঘুরিয়ে দেখান। আধুনিক পদ্ধতিতে লাইব্রেরিটি সাজানো হয়েছে।

মাদরাসা উলুমে শারইয়্যাহ

আমরা শরিয়াহ আদালত দেখতে যাই। বিচারপতি আবদুল ওহ্হাব তুনজীর সাথে কিছুক্ষণ বসি। তারপর মাদরাসা উলুমে শারইয়্যাহয় যাই। প্রতিষ্ঠানের পরিচালক শায়খ আতাউল্লাহ সাবুনীর অফিসরুমে বসি। দাওয়াতকে মাদরাসার তালিমের সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে তার সঙ্গে আলোচনা করি। কিছু সময় আবদুল কাদির সাবসাবীর অফিস এবং ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে কাটাই।

হারিমের পথে

৬ আগস্ট ১৯৫১

আমরা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর নিকট নাশতা করি। তারপর আমাদের বন্ধু প্রফেসর সাবসাবীর সাথে হারিম মহল্লার উদ্দেশে রওনা করি। তুর্কি সীমান্তের পাশ দিয়ে আমরা পথ চলি। সীমান্ত আমাদের ডান পাশের এত নিকটে যে, গাড়ি যদি পাহাড়ের উপত্যকায় পড়ে যায় তা হলে তা তুর্কি সীমান্তে পড়বে। আর সিরিয়ার সীমান্ত থাকবে বাম পাশে। আমরা এই গ্রামে কিছু সময় অতিবাহিত করি। এটা আলেপ্পোবাসীর গ্রীষ্মনিবাস। গরমের মৌসুমে অভিজাত শ্রেণী এখানে বিশ্রামে আসেন।

শায়খ জারকা, শায়খ আবুল খায়ের এবং আলেম-ওলামা ও ব্যবসায়ীদের একটি বড় জামাতের সাথে শায়খ আতাউল্লাহ সাবুনীর বাসায় দুপুরের খাবার খাই। মেজবান সিরীয় স্টাইলে খুব উন্নত খাবার তৈরি করিয়েছেন। খাবারের পূর্বে একটি কাগজ পাই। তাতে লেখা ছিল,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا 'পানাহার কর, তবে অপচয় করো না'।[সুরা আ'রাফ, ৩১ আয়তাংশ]

আয়াতের নিচে যেসব খাবার পরিবেশন করা হয় তার একটি দীর্ঘ সূচি ছিল। মেহমানদের জন্য অনুমতি ছিল সে যা ইচ্ছা তা-ই চাইতে পারবে।

আলেপ্পোর কেল্লায়

আমরা আজ প্রফেসর ওমর কারকুকি এবং কয়েকজন ইখওয়ানি বন্ধুর সাথে আলেপ্পোর কেল্লা দেখতে যাই। কেল্লাটি বহুকালের পুরনো। ধারণা করা হয় এটি রোমানদের তৈরী। সুলতান মুজাফ্ফর এবং ইসলামি সালতানাতের অন্য বাদশারা যুগে যুগে একে নতুনভাবে সংস্কার করেন। আমরা কেল্লার বন্দিখানা দেখি। এখানে অপরাধীদেরকে বন্দি করে রাখা হত। অন্য বহু নিদর্শন দেখতে পাই। তারপর 'মসজিদে ফেরদাউস' ঘুরে দেখি। আসার সময় জনাব হাসান সাবুনীর বাসায় কিছুক্ষণ আরাম করি।

সাইফুদ্দৌলাহর স্মৃতির খোঁজে

আমি সাইফুদ্দৌলাহর বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করি। কিন্তু কোনো কিছুই এখন আর নেই। কাল-পরিক্রমায় সব বিলীন হয়ে গেছে। ইবনে খালদুন এ কথা বলে অত্যুক্তি করেননি যে, আরবদের স্মৃতিস্মারক ও প্রাসাদগুলো তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

তুরস্ক সফরের ইচ্ছা পরিত্যাগ

৭ আগস্ট ১৯৫১

তুরস্ক সফরের ইচ্ছা করেছিলাম। সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। অথচ আলেপ্পো আসা হয়েছে এ সফরের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু সময় স্বল্পতা এবং হজের মৌসুম চলে আসার কথা চিন্তা করে তুরস্ক সফর আপাতত মুলতবি করি। তুরস্ক সফরের বিষয়টি অন্য এক প্রশস্ত ও উপযোগী সময়ের জন্য রেখে দিই। কারণ তুরস্ক সফর, সেখানকার বড় বড় ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাত এবং দীনী ও ইলমি বিভিন্ন কেন্দ্র দেখার জন্য দু'সপ্তাহ যথেষ্ট না। এর পরিচয় ও সাক্ষাতের জন্য এক মাসের বেশি সময়ের প্রয়োজন। মদিনায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমরা দামেশকে ফেরার দৃঢ় সংকল্প করে ফেলি। হযরত আলি রা. যথার্থ বলেছেন, 'আমি আমার রবকে চিনেছি

স্বপ্নভঙ্গের মাধ্যমে'। যখন তুরস্কের ট্রেন আলেপ্পো থেকে ইস্তাম্বুলের উদ্দেশে যাত্রা করে তখন খুব আফসোসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকি। আর বলি, 'এক দিন আমরাও যাব'।

আলেপ্পো থেকে দামেশক

সকাল সাড়ে নয়টায় আলেপ্পো [হালব] থেকে বের হই। হিমসে দুপুরের খাবার খাই। কিছু সময় 'নাবাকে' কাটাই। সেখানে আমরা একটি পার্কের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছিলাম। একজন খাদেম এসে আমার নাম নিয়ে ডেকে বলে, অমুকে আপনাকে ডেকেছেন। আমি তার নিকট যাই। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক মধ্য বয়সী যুবক। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সিনিয়র অফিসার। আমি জানতে চাইলাম আপনি আমাকে কীভাবে চেনেন? তিনি ব্যাগ থেকে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো'র একটি কপি বের করে দেখান। তারপর বলেন, দামেশক ইউনিভার্সিটিতে আমি আপনার আলোচনা শুনেছি। এই কিতাবটি সফরে পড়ার জন্য সঙ্গে এনেছি। তিনি দুপুরের খাবার তার সঙ্গে খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমরা তার কাছে ওজর পেশ করে চলে আসি।

হিমসে খেয়ে নিয়েছিলাম। আসরের নামাজ দামেশকে 'মসজিদে হালবুনি'তে আদায় করি। আমাদের মেজবান অভ্যাস অনুযায়ী অত্যন্ত আনন্দচিত্তে ও খুশিমনে আমাদের সাথে দেখা করেন। মনে হচ্ছিল আমরা কোনো লম্বা সফর থেকে ঘরে ফিরেছি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যালয়ে যাই। সেখানে ওমর বাহাউল আমিরীর আলোচনার প্রস্তুতি চলছিল। তার আলোচনা শোনার জন্য আমরা থেকে যাই। আমাদের বন্ধু জনাব মুসতফা সিবায়ী কিছু বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। এ সফরের কারগুজারি শোনানোর জন্য বলেন। তার হুকুম পালন করি। সফরের বিভিন্ন অনুভূতি তুলে ধরি। নিজের মতামতও পেশ করি।

৮ আগস্ট ১৯৫১

মদিনা মুনাওয়ারা সফরের সিদ্ধান্ত হয়। ইতোমধ্যে জরুরি অফিসিয়াল কাজ সম্পন্ন করে ফেলি। রবিবার একটি সৌদি বিমানে ফ্লাইট নির্ধারণ হয়। আজ আমরা বন্ধুবর আহমদ আবদুল গফুর আত্তারসহ মেহমানদের

এক জামাতের সাথে শায়খ মুহম্মদ নমর আলখতিবের বাসায় দুপুরের খানা খাই। ইউনিভার্সিটির কয়েকজন নবীন শিক্ষক আমাদের নিকট আসেন। তাদের অধিকাংশই ইখওয়ানের কর্মী-সমর্থক। আমার চারপাশে বসে তারা বহুক্ষণ আলোচনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন।

৯ আগস্ট ১৯৫১

আমার দামেশকে আসার কথা ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা জানতে পারে। ফলে তারা অনেকেই দেখা করতে আসে। বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে আমার মন ভরিয়ে দেয়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে চৌকস ও উদ্যমী ছাত্র মনে হল নাবিসাহ গাবরাকে। সে মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে। আমার সাথে আলোচনায় অংশ নেয়। তার সঙ্গে চারুকলা অনুষদের ছাত্র আহমদ রাত্তেব নাফ্ফাখও ছিল।

আজকের উল্লেখযোগ্য বিষয় হল আল্লামা বাহজা আল বায়তারের সাথে সাক্ষাত। শায়খ আবদুর রহমান আলবানী আমাদের দামেশকে আসার কথা জনেন না। জানলে অবশ্যই তিনি বহু আগে দেখা করতে আসতেন। আমরা তাকে জানাতে চেয়েছিলাম কিন্তু সম্ভব হয়নি। কারণ তিনি তার গ্রীষ্মকালীন নিবাস মাজায়ায় ছিলেন।

১০ আগস্ট ১৯৫১

আমার ইচ্ছা দামেশকের শেষ জুমা উমুবী জামে মসজিদে পড়ব। জুমা পড়ে উমুবী জামে মসজিদকে আলবিদা জানালাম। শায়খ মুহিউদ্দীন জামে মসজিদে শায়খ কাফতারুর দরসে অংশগ্রহণ করি। এশা পর্যন্ত তার সাথে থাকি।

প্রফেসর আমিন মাসরীর সাথে

১১ আগস্ট ১৯৫১

আজ সকালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচলিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমির সদস্য প্রফেসর আমিন মাসরী সাক্ষাত করে আমাকে ধন্য করেন। তিনি সিরিয়ার পক্ষ হতে পাকিস্তানে আরবিভাষা শিক্ষা এবং এর প্রচার-প্রসারের দায়িত্ব আন্জাম দিয়ে আসছেন।

আরবের বাইরে আরবিভাষার প্রচার-প্রসারে আমার অভিমত

তিনি এ বিষয়ে আমার পরামর্শ চান। তার কাছে এমন একজন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা শোনাই, এ বিষয়ে যার অনেক আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। আমি তাকে বলি, এ বিষয়টি দুটি পয়েন্টে সীমাবদ্ধ। একটি হল এমন এক সিলেবাস ও শিক্ষা কারিকুলাম চালু করা, যদ্দ্বারা আরবিভাষা শিখা সহজ হবে। পদ্ধতিটি সেসব কাঠিন্য ও জটিলতামুক্ত হবে, যা সেসব দেশের পুরনো শিক্ষাপদ্ধতিতে রয়েছে।

দ্বিতীয়টি হল এমন শিক্ষক তৈরি করা, এ বিষয়ে যারা দক্ষতা ও পাণ্ডিত্বের অধিকারী হবে, যারা হবেন মুখলিস, পাঠদান ও শিক্ষকতার প্রতি আগ্রহী, যিনি তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করবেন। এ দুটি পয়েন্ট সিরিয়া এবং অন্য আরবদেশগুলো গ্রহণ করতে পারে। এ উভয়ের উপরই সফলতা সীমাবদ্ধ। প্রফেসর আমিন আমার কথার সাথে একমত পোষণ করেন। বিষয় দুটি বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি তার আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমি পাক-ভারতে আরবিভাষা পাঠদান পদ্ধতির নমুনা হিসেবে 'কাসাসুন নাবিয়্যীন' এবং 'আলকিরাআতুর রাশিদাহ'র এক এক সেট হাদিয়া দিই। জনাব আমিন আলমাসরীর সাথে আমাদের বন্ধু আবদুর রহমান আলবানী এবং শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী আসেন। অত্যন্ত উপকারী ও আনন্দঘন মজলিস হয়। আজ জনাব বাহজা আল বায়তারও সাক্ষাত করে আমাদেরকে ধন্য করেন।

দের ইয়াসিন মাদরাসায়

আমরা দের ইয়াসিন মাদরাসা দেখতে যাই। এটি ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দের ইয়াসিন সেই হতভাগা শহর, যেখানে বহু গণহত্যা ও রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আরবদেরকে ভেড়া-বকরির মতো জবাই করা হয়েছে।

মাদরাসাটি পরিচালনা করেন প্রফেসর নমর মাসরী। আমরা মাদরাসার বিভিন্ন গেইট দেখি। মাদরাসার বিভিন্ন বিভাগ ও রুমে বসি। আজকের দুপুরের খানা খাওয়ার দাওয়াত শায়খ আবদুর রহমান আলবানীর সাথে আমাদের বন্ধু মুসতফা সিবায়ীর বাসায়। আল্লামা বাহজা আল বায়তার, শায়খ নমর আল খতিব ও শায়খ কালকিলী আমাদেরকে বিদায় জানাতে তাশরিফ আনেন। নাবিসা গাবরা, আবদুর রহমান আলবানী ও আহমদ রাতেবও আসেন। নাবিসা গাবরা অনেক রাত পর্যন্ত আমাদের কাছে

ছিলেন। আমার রচনা 'মুসলিমবিশ্বে জ্ঞান বিস্তারের পন্থা'[১]র প্রতিলিপি তৈরি করতে থাকেন। কারণ রচনাটি তার সংগ্রহ করার খুব আগ্রহ ছিল। পরবর্তী সফরের সময় কাছাকাছি হওয়ার কারণে প্রবন্ধটি সংগ্রহে রাখার এ ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি ছিল না।

সিরিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

সিরিয়াকে আলবিদা জানানোর পূর্বে সমীচীন মনে করছি দেশটির উপর আরেকবার নজর বুলাব। এখানকার বিভিন্ন তথ্য ও পরিচিতি তুলে ধরব। তবে সেগুলো করা হবে সেইসব মুসলিম পর্যটকের মতো, এ দেশের শহরগুলোতে যার বারবার আসা-যাওয়া রয়েছে।

আয়তন ও জনসংখ্যা

এক সময় শাম একটি বিশাল আয়তনের দেশ ছিল। পরবর্তী সময়ে দেশটিকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। এর থেকে লেবানন, ফিলিস্তিন ও পূর্ব জর্দানকে পৃথক করে দেওয়া হয়। টুকরো টুকরো করার পর অবশিষ্ট অংশকে সিরিয়া বলা শুরু হয়। বর্তমানে এ অংশটির আয়তন ১৮১৩৩৭ [এক লক্ষ একাশি হাজার তিনশ সাঁইত্রিশ] বর্গ কিলোমিটার। ১৯৪৮ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এখানকার জনসংখ্যা ৩০৪৩০০০ [তিরিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার]। আর ১৯৫১ সালের হিসাব অনুযায়ী একত্রিশ লক্ষ। এর মধ্যে মুসলমান হল পঁচিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার। অর্থাৎ দেশে জনসংখ্যার ৮৫% মুসলমান। তাদের মধ্যে আবার আহলে সুন্নতই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আহলে সুন্নতের সংখ্যা হবে ৫.৮২%। শিয়ারা ৫.১৮% এর চেয়ে বেশি হবে না। দারুজ ৮৭ হাজারের চেয়ে কিছু বেশি। অর্থাৎ তারা ৫.৩%। এখানে ইয়াজিদিদেরও একটা ফেরকা আছে। তারা বেশ ভালোভাবেই আছে। তাদের অনুসারীদের সংখ্যা সাতাইশ হাজার। খ্রিস্টান আছে ৫.১৫%। অর্থাৎ চার লাখ ষাট হাজার।

সিরিয়ার শাসন ব্যবস্থা

ব্যস্থাপনার সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে সিরিয়াকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছে। আবার প্রদেশগুলোকে ভাগ করা হয়েছে কতকগুলো

---

[১] كيف توجه المعارف في الاقطار الاسلامية

জেলায়। আর জেলাগুলোকে ভাগ করা হয়েছে কতকগুলো থানায়। অনেকগুলো গ্রামের সমন্বয়ে একটি থানা করা হয়েছে। সিরিয়ায় নয়টি প্রদেশ রয়েছে। ১. দামেশক। ২. হালব [আলেপ্পো]। ৩. হাওরান। ৪. হিমস। ৫. হামাত। ৬. আলফুরাত। ৭. আলজাজিরা। ৮. লাজিকিয়াহ ও ৯. জাবালুদ দারুজ। জেলা রয়েছে ৩৬টি। থানা হল ৯২টি। গ্রামের সংখ্যা ২৭০৩টি।

শিক্ষিতের হার ও অর্থনৈতিক অবস্থা

লেবানন ছাড়া আরবের অন্যান্য দেশের তুলনায় শিক্ষার হার এখানে সবচাইতে বেশি। এখানে শিক্ষিতের হার ৪৫%। লেবাননে শিক্ষিতের হার ৮০%। এখানে সচ্ছল ও মধ্যবিত্তের সংখ্যাও মিসর-হেজাজের চেয়ে কম নয় বরং বেশিই হবে। সিরিয়ার কৃষকেরা স্বাভাবিকভাবে এ পরিমাণ জমির মালিক, যা দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। তারা মিসর ও ভারতের কৃষকদের মতো দারিদ্র্য-পেরেশানিতে সাধারণত থাকে না। শাসকশ্রেণী যদি বুদ্ধিমান, চৌকস ও আন্তরিক হয় এবং তারা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী একটি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ও সফল হয়, তা হলে সিরিয়ায় অর্থনৈতিক মন্দাভাব থাকার কথা না। সে তার সকল চাহিদাই পূরণ করতে সক্ষম।

শিক্ষাব্যবস্থা

সিরিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি স্তর রয়েছে। ১. প্রাথমিক স্তর। ২. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। ৩. উচ্চতর শিক্ষা। প্রাথমিকের পূর্বের নার্সারি শিক্ষা আইনগত ও ভিত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃত না। এখানে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যে কিছু নার্সারি গড়ে উঠেছে। যার ইচ্ছা সে নিজের শিশুসন্তানকে এখানে পাঠায়।

প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। এর মোট সময়কাল পাঁচ বছর। সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি হয়। এর উদ্দেশ্য হল ভিত্তিগত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা। এটা নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ভিতরে পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুতিপর্ব। এর প্রথমবর্ষে সেই শিশুকে ভর্তি করা হয়, যার বয়স সাত বছর। এ শিক্ষাপদ্ধতি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। তবে এতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। প্রথম বর্ষে যে বিষয়গুলো পড়ানো হয় তা নিম্নরূপ।

১. দীনিয়াত ও তরবিয়ত। ২. গণিত ও জ্যামিতি। ৩. ইতিহাস ও ভূগোল। ৪. সাধারণ বিজ্ঞান ৫. আরবিভাষা [এতে শিখানো হয় আরবি শব্দ, কথাবার্তা ও বাক্যগঠন]। ৬. মাতৃভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ [এতে শিখানো হয় আচার-আচরণ ও নগরজীবনে প্রয়োজনীয় কিছু জ্ঞান]। পঞ্চমটি সবার শেষে শেখানো হয়।

দ্বিতীয় স্তর ঃ মাধ্যমিক এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা

এ স্তরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ও ধরন রয়েছে। সব কটিই প্রাথমিক শিক্ষার সার্টিফিকেট পাওয়ার পর শুরু হয়। এ স্তরকে আমরা দুটি শাখায় ভাগ করতে পারি। ১. মাধ্যমিত স্তর। এর সময় চার বছর। ২. উচ্চ মাধ্যমিক স্তর। এর সময় দুই বছর। মোট ছয় বছর।

মাধ্যমিক স্তরের কয়েকটি ভাগ

১. সাধারণ শিক্ষা।
২. ব্যবসায় শিক্ষা।
৩. কারিগরি শিক্ষা।
৪. কৃষি শিক্ষা।

সবকটি শিক্ষাই একটি পরীক্ষার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। দীনিয়াত ছাড়া অন্য যেসব বিষয় পড়ানো হয় তা হল– ১. আরবিভাষা। ২. ইংরেজি অথবা ফ্র্যান্স ভাষা। ইংরেজি এবং ফ্র্যান্সের মধ্যে ছাত্ররা যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাবোর্ড আরবিভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা রাখেনি। এটা আরবিভাষার প্রাধান্য এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে।

৩. গণিত। ৪. জ্যামিতি। ৫. ফিজিক্স। ৬. ক্যামিস্ট্রি। ৭. সায়েন্টিফিক ইতিহাস। ৮. ইতিহাস ও ভূগোল। ৯. মাতৃভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য

১. ভবিষ্যতে কঠিন কাজের জন্য ছাত্রদেরকে প্রস্তুত করা। যেমন, কারিগরি, কৃষি ও ব্যবসায় শিক্ষা।

২. উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য ভূমিকা হিসেবে সাধারণ শিক্ষা অর্জন করা।

উচ্চতর শিক্ষার স্তর

[এটা মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় শাখা]

এখানে প্রথম দুই স্তর থেকে আরও উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। এর মেয়াদকাল দুই বছর। বিজ্ঞান, আর্টস বা কৃষিশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট অর্জনের দ্বারা এর সমাপ্তি হয়। এ স্তরে তারাই ভর্তি হতে পারে, যারা এর সমোপযোগী জ্ঞান অর্জন করেছে। এখানে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির জন্য সাধারণ ও মাধ্যমিক স্তরের বিশেষ কোচিঙেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মাধ্যমিকের প্রথম চার বছর, যা পড়ানো হয় তা-ই এখানে পড়ানো হয়। তবে এখানকার পড়াশোনা হয় উচ্চতর মানসম্পন্ন।

ইউনিভার্সিটির শিক্ষা

সিরিয়া ইউনিভার্সিটি। এতে বিভিন্ন অনুষদ রয়েছে। প্রত্যেক অনুষদের শিক্ষার মেয়াদ তিন বছর। ছাত্ররা যে বিষয়ে পড়াশোনা করে সে বিষয়ের সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্যদিয়ে তার সমাপ্তি হয়। কোনো কোনো অনুষদে একটি শাখা আছে। যেমন আইন অনুষদ। এখানে বিভিন্ন অনুষদে যেসব বিষয় পড়ানো হয় তার যেকোনো একটিতে পিএইচ,ডি করা যায়। নির্ধারিত বিষয়ে থিসিস তৈরি করে পেশ করা হয়। সিরিয়া ইউনিভার্সিটির অনুষদগুলো হল–

১. আইন অনুষদ।
২. মেডিকেল অনুষদ।
৩. বিজ্ঞান অনুষদ।
৪. প্রকৌশল অনুষদ।
৫. চারুকলা অনুষদ।

প্রতিটি অনুষদের একটি বিশেষ শাখা আছে। এখানে ছাত্রদেরকে মাধ্যমিক স্তরে পড়ানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছাত্ররা এখানে সেসব বিষয় পড়ে, যা ইউনিভার্সিটির শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ শাখাটির নাম 'উচ্চতর শিক্ষক প্রশিক্ষণ অ্যাকাডেমি'। ইউনিভার্সিটির শিক্ষার পশাপাশি ছাত্ররা এ প্রতিষ্ঠানের ক্লাসগুলোতেও অংশগ্রহণ করে থাকে।

সারমর্ম

সাত বছরের বয়সসীমার পূর্বে সিরিয়ায় রয়েছে নার্সারি। তারপর প্রাথমিক শিক্ষা। এর সময় পাঁচ বছর। প্রাথমিক শিক্ষার সার্টিফিকেট অর্জনের মধ্য দিয়ে এটি সমাপ্ত হয়। প্রাথমিকের পর মাধ্যমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তর দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের মেয়াদকাল চার বছর। সার্টিফিকেট অর্জনের মাধ্যমে এটি শেষ হয়। এরপর মাধ্যমিকের উচ্চ স্তরের শিক্ষা। এর সময় দুই বছর। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে এটা শেষ হয়। তারপর ইউনিভার্সিটির শিক্ষা, যা স্নাতকের সনদ অর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আইন অনুষদ, চারু ও শিল্পকলা অনুষদ, মেডিকেল অনুষদ, প্রকৌশল অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ সব কটিরই শিক্ষার মেয়াদকাল তিন বছর করে। তারপর কারো কারো জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচ,ডি করার ব্যবস্থা রয়েছে।

সিরিয়ার বিভিন্ন ধর্ম ও দল

সিরিয়াকে আল্লাহ তায়ালা কুদরতিভাবে নৈসর্গিক সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ঋতুর মধ্যে দিয়েছেন ভারসাম্য। সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি দিয়ে সাজিয়েছেন পুরো দেশটিকে। এখানকার মানুষকেও দিয়েছেন প্রখর মেধা ও ধীশক্তি। এ ছাড়া সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ দেশটির অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাথে সাথে দুটি বড় ধরনের সমস্যাও আছে। একটি হল এখানে রয়েছে বহুধর্ম ও মতাদর্শের মানুষ। অধিক সংখ্যক ধর্ম ও নিত্য-নতুন মতাদর্শ বেড়ে ওঠার বড় কারণ সম্ভবত এখানকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য। এখানে রয়েছে অসংখ্য পর্বতের বীথি। পাহাড়গুলো সব সময় বিভিন্ন ধর্ম ও আকিদার আশ্রয়কেন্দ্রের কাজ দেয়। অধিকাংশ সময় রাষ্ট্রদ্রোহী ও দ্রোহপছন্দকারী ফেরকাগুলো বিভিন্ন প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত ও দুর্ভেদ্য জায়গায় আশ্রয় নিয়ে থাকে। এ কারণে মিসর থেকে সিরিয়ায় এসে বিভিন্ন ফেরকা ও ধর্মের লোকেরা স্থান গেড়েছে। স্বাধীনভাবে তারা নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে। বিভিন্ন ফেরকা ও গোষ্ঠির এ দেশে এসে বসবাস করার আরেকটি কারণ হল দেশটি খুব চমৎকার। চিত্তাকর্ষক দেখলেই যেকারো হৃদয় কাড়ে। কাছে টানে। স্থানীয় বাসিন্দারাও একেবারে সাদাসিধে সরল প্রকৃতির। তাদের অন্তর অনেক প্রশস্ত।

বলা বাহুল্য যে, এ এলাকাটি আবার উত্তর দিক থেকে আসা বিজেতাদের গমনস্থল। তাদের আসা-যাওয়ার ফলে এখানে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং গড়ে উঠেছে অনেক মতাদর্শ। এখান দিয়ে যারাই যেত তাদের সামনে এখানকার লোকজন মাথানত করত। প্রতিটি নতুনত্ব দ্বারাই তারা প্রভাবিত হত। এ কারণে বাতিনিয়্যা, দারুজিয়্যা, বাহাইয়্যাসহ বিভিন্ন ফেরকা, ভ্রান্ত ধর্ম ও মতাদর্শ এখানে স্থান গড়ার সুযোগ পেয়েছে।

দ্বিতীয় সমস্যা হল এখানে রয়েছে অনেক রাজনৈতিক দল এবং দৃষ্টিভঙ্গি। এ সমস্যা এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে জটিল ও ভয়াবহ। সিরিয়ার সব কর্মকাণ্ডই এদ্দ্বারা প্রভাবিত। এসব রাজনৈতিক দল ও মতাদর্শ সিরিয়ার ক্ষমতা ও নেতৃত্ব নিয়ে নিয়মিত লড়াই করে চলছে। এ কারণে সিরিয়ার ঐক্য ও স্বাধীনতা ভীষণ হুমকির মুখে। কেননা লড়াই নিজেদের রুহানি শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। রাজনৈতিক প্রভাব ও কার্যকারিতাকে খুইয়ে ফেলেছে। এখানকার এসব সমস্যা বিভিন্ন মাজহাব ও ধর্মীয় ফেরকার তুলনায় অনেক বড়। মারাত্মক। কয়েকটি দলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকদের সমীপে তুলে ধরা হচ্ছে।

রাজনৈতিক দল

১. বাথ পার্টি

এই দলটি মনে করে সমগ্র আরব একটি জাতি। তাদের একটি চিরন্তন পয়গাম রয়েছে। এ দলের লোকদের নিকট আরবদের মাতৃভূমি সেই অংশটুকু, যার মধ্যে আরবজাতি বসবাস করে। আর তা তুরুস পর্বত, বাশতুকুবিয়া পর্বত, বসরা উপসাগর, আরবসাগর, হাবশা পাহাড়, সাহারা মরুভূমি, আটলান্টিক মহাসাগর ও রোমসাগরের সমন্বয়ে। আরবরা এমন এক চিরন্তন পয়গামের ধারক, যা ইতিহাসের পর্দায় পুরোপুরি অলৌকিক প্রতিভাত হচ্ছে। মানবজাতিকে তারা এক নতুন জীবন দান করছে। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার প্রেরণা ও মনোভাব বৃদ্ধি করছে। এটি একটি রুহানি ও সাংস্কৃতিক দাওয়াত। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য ও ভেদাভেদ একটি অতিরিক্ত বিষয়। এটা এই পয়গাম ধারণ করলে মিটে যাবে। বাথ পার্টি মূলত একটি সমাজতান্ত্রিক দল। এর দৃষ্টিভঙ্গি হল

সমাজতন্ত্রের উৎপত্তি হয়েছে শুধু আরব জাতীয়তাবাদ থেকে। মোটকথা, এটি দীন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি আহ্বানকারী দল। দলটির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপার্সন হলেন মিশেল আফলাক। তিনি খ্রিস্টধর্মের অনুসারী। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিত লোকেরা এর সদস্য ও সমর্থক।

২. সমাজতান্ত্রিক পার্টি

এ দলটি সমাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত। এর চেয়ারপার্সন হলেন আকরাম হাওরানি। দলটির প্রতিষ্ঠা বাথ পার্টির অনেক পরে হয়েছে।

৩. সিরিয়ান জাতীয়তাবাদী দল

এটি সিরীয় মেজাজের দিকে আহ্বানকারী দল। তাদের দাবি হল সিরিয়া সিরীয়দের জন্য। সিরীয়রা একটি স্বতন্ত্র জাতি। তারা আরব জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে লোকজনকে নিরুৎসাহিত করে। দীনকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখার দাওয়াত দেয়। দলটি কিছু বিশেষ মূলনীতির উপর জোর দেয়। কিন্তু এগুলোর দীনের সাথে আদৌ মিল নেই। এর অধিকাংশ সদস্য খ্রিস্টান, অনারব সংখ্যালঘু। লেবাননে এর শক্তিমত্তা অনেক বেশি।

৪. সাম্যবাদী দল

এ দলের সদস্যরা অধিকাংশ শিক্ষিত। দলের আদর্শ ও মূলনীতির প্রতি তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল।

৫. সমাজতান্ত্রিক সমবায় পার্টি

এটা সমাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত একটি দল। মূলনীতির দিক দিয়ে দলটি কিছুটা ইসলামের নিকটবর্তী। তবে এর কিছু নেতার চরিত্র ও আমল ইসলাম থেকে অনেক দূরে। দলটি একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী। নেতাই এর সবকিছু। বর্তমানে এর চেয়ারম্যান ফয়সাল আসলি।

৬. জাতীয় দল

এই দলে এমন কিছু লোক ছিল, যারা শুরুতে দেশের নেতৃত্ব দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে জনসাধারণের কাছে তারা অযোগ্য ও স্বার্থবাজ প্রমাণিত হওয়ায় জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

৭. আওয়ামী পার্টি

এই দলে সেসব লোক রয়েছে, যারা জাতীয় দলের বিরোধিতা করে। এ দলের নগণ্য সংখ্যক লোক সুস্থ চিন্তা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক। তবে তাদের জীবন ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার মধ্যে কোনো মিল পাওয়া যায় না। সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এটা। রুশদি কুখিয়া ও ডক্টর নাজিম কুদসি এ দলের প্রাণপুরুষ।

সিরিয়া : কিছু গুণ, কিছু ত্রুটি

আমি এখন এমন কিছু বিষয় তুলে ধরব যেগুলোতে সিরিয়া এবং সে দেশের মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সিরিয়ার যাপিতজীবন এবং সামাজিক আচরণে যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তা উল্লেখ করব। সেসব ত্রুটিও বর্ণনা করব, যা একজন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

সিরিয়ায় প্রবেশ করতেই যে জিনিস আমাকে আকৃষ্ট করেছে তা হল সেখানকার দীনী জীবনধারা। ইসলামি ঐতিহ্যের যে অংশটুকু এখানে রয়েছে তা অন্য যেকোনো আরবদেশের তুলনায় পর্যটককে বেশি মুগ্ধ করেছে। সিরিয়ার মসজিদগুলো অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি আবাদ। লোকজনের মধ্যে নামাজ ও জামাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। এখানকার আলেম-ওলামা ও দীনদার লোকেরা অন্য দেশের আলেম-ওলামা ও দীনদার লোকদের তুলনায় দীনী শিয়ারের প্রতি খুব বেশি লক্ষ্য রাখেন। ব্যবসায়ী, কৃষকসহ সব শ্রেণীর লোক দীনদারিতে অন্যান্য দেশের তুলনায় এগিয়ে। তবে মিসরিরা রুহানিয়াত ও জজবার ক্ষেত্রে সিরীয়দের চেয়ে শক্তিশালী। জীবনযাত্রা, প্রাণশক্তি, দীনী দাওয়াত ও আন্দোলনে সিরীয়দের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। এখানকার মহিলাদের মধ্যে এখনো পর্দা জারি রয়েছে। তবে তা জামানার পবির্তনের সাথে সাথে কমতে শুরু করেছে। অথচ মিসরে এটি প্রায় নিঃশেষই হয়ে গেছে।

সিরীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বিতীয় বিষয় হল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। পুরো সিরিয়াই পরিচ্ছন্ন। বিশেষ করে দামেশক। তুরস্ক ছাড়া মুসলমানদের শহরগুলোর মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে সম্ভবত এই শহরটি। দামেশকের বিভিন্ন সড়ক, অলি-গলি ও ঘর-বাড়ি কায়রোর চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন। হ্যাঁ, মিসরের জিজা, নয়ামিসর এবং কায়রোর কিছু সড়ক অবশ্য এর ব্যতিক্রম। ওগুলোও বেশ পরিষ্কার।

সিরীয়দের শ্রেষ্ঠত্বের তৃতীয় বিষয় হল তাদের গাম্ভীর্য, সুন্দর চরিত্র, প্রখর অনুভূতিশক্তি ও ঠাণ্ডা মেজাজ। এ কথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, তাদের চরিত্রগঠনের পিছনে মৌসুম এবং দেশের কুদরতি অবস্থা ও অবস্থানের ভূমিকা রয়েছে।

সিরিয়ায় দীনী জীবনযাত্রা অবশিষ্ট থাকার সম্ভবত সবচেয়ে বড় কারণ সেখানে আহলে জিকর এবং মুখলিস দায়ীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের উপস্থিতি। তাদের উপস্থিতি বস্তুবাদের আন্দোলন এবং তার সম্প্রসারণ রুখে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা চারিত্রিক অবক্ষয় এবং লাগামহীন বস্তুবাদের অগ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা দুর্ভেদ্য এক সৈন্যব্যূহের কাজ করেছে। যেসব দেশের এই ব্যূহ ভেঙে গেছে সেই দেশগুলি বস্তুবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে অন্ধের মতো ধেয়ে গেছে। তাদের মধ্যে না আছে চিন্তার ভারসাম্য, না আছে চিন্তা করার যোগ্যতা।

বর্তমান এই ঘুণেধরা পৃথিবীতে সিরিয়ার রুহানি জীবনধারার মূলে রয়েছেন ত্রয়োদশ শতাব্দীর বুজুর্গ মাওলানা খালেদ রোমী। তিনি দিল্লিতে গিয়ে মির্জা মাজহার জানেজাঁনার খলিফা মাওলানা আবদুল্লাহ দেহলবীর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। তিনি শাহ গোলাম আলি নামে বেশি প্রসিদ্ধ। তার থেকে খেলাফত লাভ করে দেশে ফিরে গেছেন। সিরিয়া, রোম, কুর্দিস্তান, ইরাকে তার মুরিদের সংখ্যা প্রচুর। সিরিয়া, ইরাক ও তুরস্কে তার বহু স্মৃতি এখনো জীবন্ত আছে।

বাহ্যিকভাবে সিরিয়ায় আমি যেসব জিনিস দেখেছি তা উমাইয়্যা বংশের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। সিরীয়রা তাদের নাম ও বিভিন্ন স্মৃতি বুকের সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছে। বহু হোটেল ও দোকানে উমাইয়াদের নামসংবলিত বিলবোর্ড ও কাষ্ঠফলক দেখতে পাই। আপনি দামেশকে যদি ঘোরাঘুরি করেন, তা হলে হোটেল বনু উমাইয়া, তাজলিদে [হিমাগার] বনু উমাইয়া, মাদরাসা বনু উমাইয়া, মাদরাসায়ে মারওয়ান ইত্যাদি নামের বিলবোর্ড আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

একবার আমার সাথে একটি মজার ঘটনা ঘটে। আমি বিপদে পড়ে যাচ্ছিলাম। আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেছেন। একদিন খুব ভোরে হাঁটাহাঁটির জন্য বাইরে বেরুই। হাঁটতে হাঁটতে সিরিয়া ইউনিভার্সিটির খুব কাছে চলে যাই। আইন অনুষদ ভবনের নিকট পৌঁছুলে একটি বিলবোর্ড

দৃষ্টিগোচর হয়। তাতে লেখা দেখি 'ব্যারাক মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান'। বোর্ডটি আমাকে থামিয়ে দেয়। আমি খুব মজা নিয়ে শব্দগুলো পড়তে থাকি। লেখাটা বিস্মৃত অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন হযরত মুয়াবিয়া রা. পুরো মুসলিমবিশ্বের খলিফা ছিলেন তখন শুধু দামেশকই নয় বরং পুরো সিরিয়া তার মারকাজ ছিল। আমি কল্পনার জগতে এমনভাবে হারিয়ে যাই যে, আমার আশপাশের কোনো খবর ছিল না। আমার এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গভীরভাবে বোর্ড দেখার কারণে একব্যক্তির সন্দেহ হল। লোকটা ছিল পাহারাদার। তার গায়ে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম। কাছে এসে সে আমার পরিচয় জানতে চাইল। বললাম, আমি মুসলমান। সে বলল, আপনি সেনানিবাসটি এত গভীরভাবে কেন দেখছেন? আমি বললাম, কোনো বিশেষ কারণে না। এই বোর্ডটি আমাকে দারুণ আকৃষ্ট করেছে। এক মহান ব্যক্তির নাম আমাকে কল্পনার জগতে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে আমার এ ইতিহাসের রুচিবোধ বোঝেনি। তাই আমার কথা মানেনি। সম্ভবত সে আমাকে কোনো ইহুদি গুপ্তচর মনে করেছে। আমার ভারতীয় পোশাক তার এ সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে বলল, আপনার পাসপোর্ট কোথায়? বললাম, বাসায়। সে বলল, সাথে রাখেন না কেন? আমি আপনাকে পুলিশ চৌকিতে নিয়ে যাব। আমি বললাম, আরে ভাই, আমি তো মুসলমান। কিছু আয়াত পড়ে তাকে শোনালাম। অন্য কিছু দলিলের মাধ্যমে নিজের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ পেশ করলাম। এরপরও সে নিশ্চিত হয়নি। আমাকে পুলিশ চৌকির দিকে নিয়ে চলল। তখন আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে একটি কথা ঢেলে দিলেন। আমি তাকে বললাম, আমি মক্কায় হজ করতে যাব। কারণ হজ ও হাজিদের এসব ভাষা মূর্খরাও বোঝে। সমস্ত মুসলিমবিশ্ব বিশেষ করে মিসর ও সিরিয়ায় এ নামের অনেক কদর রয়েছে। আর তা-ই হয়েছে। আমি হজের কথা বলতেই সে আমাকে ছেড়ে দেয়। এবং চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

সিরিয়া এবং এখানকার লোকদের যেসব জিনিস আমার পছন্দ হয়নি তা হল, তাদের জীবনযাত্রায় সীমালঙ্ঘন, জীবনের প্রতিটি বিষয়ে লৌকিকতার অনুপ্রবেশ এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণের ব্যাপারে উদাসীনতা। অথচ তারা ইসরাইলের মতো একটি নতুন ও শক্তিধর প্রতিপক্ষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের উচিত ছিল

নিজেদেরকে সীমান্ত-সিপাহি মনে করা, সৈনিকসুলভ জীবনযাপন করা, কষ্টসহিষ্ণু হওয়া, বীরত্ব ও বাহাদুরি দেখানো এবং জীবনযাপনে ভারসাম্যের অভ্যাস করা। ভোগ-বিলাসিতায় গা এলিয়ে দিলে মোটেই তাদের চলবে না। জার্মানির মোকাবেলায় ফ্রান্সের পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হল ফরাসিরা বিলাসী ও আরামপ্রিয়। সিরিয়ার অবস্থা এখন মিসরের মতো। সিরিয়া এখন নানামুখী হুমকির সম্মুখীন, যা তার অস্তিত্বের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিসর সম্পর্কে হযরত আমর ইবনুল আস রা. বলেছিলেন, 'নিঃসন্দেহে তোমাদের চারপাশ শত্রুতে ভরপুর। তাদের ধ্যান-দৃষ্টি তোমাদের উপর নিবদ্ধ। মনে করবে তোমরা সব সময় যুদ্ধের পজিশনে রয়েছ।'

দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমার ভালো লাগেনি তা হল, আরবদের সব জায়গায় লৌকিকতা প্রদর্শন। কারো প্রশংসা ও উপাধি প্রদানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন। কাউকে অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষেত্রে শব্দের অপব্যবহার। এ বিষয়টি শুধু সিরিয়ায় না, আরবের সব দেশেই রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলো কিছুটা আরবসভ্যতার বাহ্যিক দিক, অন্তরের উন্নতি ও অগ্রগতি থেকে যা অনেক আগে বেড়ে গেছে। এটা অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে সাজানোর এবং তার স্তুতি গাওয়ার মধ্যে পড়ে। অর্থনৈতিক জীবনে যেমন ভারসাম্যের প্রয়োজন তদ্রূপ সমাজজীবনেও ভারসাম্য গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। যে সমাজ ইসলামি জীবনযাত্রার নকশা পেশ করতে চায় এবং যে সরকার নতুন সমাজব্যবস্থা উপহার দিতে চায় তার জন্য জরুরি হল এসব সূক্ষ্ম বিষয়ে তার হক অনুযায়ী খেয়াল রাখা।

দামেশক থেকে মদিনার পথে

১২ আগস্ট ১৯৫১

ফজর নামাজের পর আমরা মিজ্জাহ বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা করি। আমাদের সম্মানিত মেজবান শায়খ আবদুল ওহ্হাব সালাহী এবং শায়খ আবু ইজ্জত গিফারী আমাদেরকে এয়ারলাইন্সের অফিস থেকে বিদায় দেন। শায়খ আবদুর রহমান আলবানীসহ অনেকেই গাড়িতে উঠে বসেন। আমরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছুই। সেখানে বন্ধুবর শায়খ মুসতফা সিবায়ীর সাথে সাক্ষাত করি। অল্পক্ষণ অপেক্ষার পর আমরা সৌদি এয়ার লাইন্‌সের বিমানে উঠে বসি। বিমানটি মদিনার উদ্দেশে যাত্রা করে।

আমাদের এ সফর মক্কা থেকে শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ চাইলেন মক্কায় গিয়ে এর শুভ সমাপ্তি ঘটবে। মাঝে মিসর, সুদান, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও পূর্ব জর্দান সফর হয়েছে। তারপর যেখান থেকে শুরু সেখানেই শেষ।

জাজিরাতুল আরবের সামনে এ সফরের প্রতিবেদন

জেদ্দা থেকে রওনা করার সময় জাজিরাতুল আরবকে সম্বোধন করে বলেছিলাম, 'বিদায় হে জাজিরাতুল আরব, আমরা তোমায় রেখে চলে যাচ্ছি। তবে বিব্রত হয়ে না, চিরদিনের জন্যও না। আমাদের এ সফর মূলত তোমারই সম্পর্ক-সুবাদে। তোমার সেই প্রিয় বংশধরদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে, যারা লোহিতসাগর ও রোমসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা তাঁদের নিকট তোমার আস্‌সালাম পৌঁছিয়ে দেব। তাদের থেকে হিসাব নেব, তোমার কাছ থেকে আলাদা হওয়ার পর কালের আবর্তে ঘটে যাওয়া নানা দুর্যোগ-দুর্ঘটনা তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছে। আর তারা সে দাওয়াত ও তাবলিগের গুরুদায়িত্ব কতটুকু পালন করেছে, যা নিয়ে তাদের পূর্বসূরিরা পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা আবার তোমার বুকে ফিরে আসব এবং তোমার কাছে আরবের মুসলিম দেশগুলোর নানা উপাখ্যান তুলে ধরব। সেখানে তোমার আদর্শের অবমাননা, তোমার বাণীর অবহেলা ও অবজ্ঞার যে দৃশ্যই অবলোকন করব তোমাকে অবহিত করব। কাফেলার রাহবার কখনো মিথ্যা বলতে পারে না। কেননা এক্ষেত্রে বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখা কিংবা অতিরঞ্জন কিছু বলা তার সহযাত্রীদেরকে সমূহ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার শামিল।'

এখন সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার সময়। হে আরব উপদ্বীপ, শুনে খুশি হবে- এখনও ইসলামের সাথে তোমার বংশধরদের আত্মার সম্পর্ক অটুট আছে। তারা বুক উঁচিয়ে গর্ব করে তোমার পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা তাদের সম্পর্ক বরাবর তোমার সাথেই রেখে চলছে। নিজেদের দীন ও ভাষাকে তোমার পবিত্র ভূমির দুই নির্ঝরনী মক্কা-মদিনার দিকে সম্পৃক্ত করে। তারা নিজেদের সোনালি ইতিহাসের সূচনা সেই মোবারক দিনকেই মনে করে যেদিন হেরা-পর্বত থেকে হেদায়েতের প্রথম আলো বিচ্ছুরিত হয় এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে নতুন প্রভাত সূচিত হয়। সেসব দেশ তোমার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে তাদের আচলের নিচে জায়গা দিয়েছে।

তোমার ভাষাকে তারা আপন করে নিয়েছে। একে বুকের সাথে লাগিয়েছে। এ দুটি বিষয়ে তারা এ পরিমাণ উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করেছে, যা তুমি কখনও কল্পনা করোনি। তোমার জাহিলিযুগের কবি-সাহিত্যিকেরাও কখনো ধারণা করেনি। শোকরিয়া আদায় ছাড়া এর কোনো বিনিময় হতে পারে না। এসব দেশ তোমার ভাষা ও জাতীয়তার অফাদারি করছে। তোমার ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করছে।

তোমার আরব বংশধরেরা দীন থেকে একদিনও বিচ্ছিন্ন থাকেনি। তুমি বিদায়ের সময় তাদের থেকে নিশ্চয় এরই প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলে। তাদেরকে হেদায়েত ও পথনির্দেশ দিয়েছিলে পৃথিবী জয় করতে। তাদেরকে বলে পাঠিয়েছিলে জাহিলিয়ার ফাঁদ থেকে একে মুক্ত করতে। তারা এ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছে। হিংসুক ও কুচক্রিমহল প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছে ইসলাম থেকে তোমার প্রিয় খান্দানের সম্পর্ক ছিন্ন করতে, তাদেরকে বিগত জাহিলিয়ার দিকে ফিরিয়ে নিতে এবং নতুন জাহিলিয়াগুলোকে গ্রহণ করাতে। তারা ইসলামি আকিদা থেকে আলাদা থাকাকে এবং ইসলামি ঐক্য থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে অত্যন্ত সুসজ্জিত করে তাদের সামনে তুলে ধরেছে। তাদেরকে বুঝিয়েছে যে, তোমরা দুর্বল জাতীয়তাকে গ্রহণ করেছ, সংকীর্ণ মাতৃভূমিকে নিয়ে খুশি হয়ে আছ। কিন্তু এত কিছুর পরও তারা চুল পরিমাণও দীন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। বরং এসব কুপ্ররোচনা তাদের রুহানিয়াতকে বাড়িয়ে দিয়েছে। দীনী মূল্যবোধের জজবা সৃষ্টি করেছে। দীনের উপর তাদের ঈমান-একিন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদৃঢ় হয়েছে। হিংসুক ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

আমি আরবীয়দের মত অন্য কোনো খান্দানকে এত বেশি কৃতজ্ঞ ও আমানতদার দেখিনি। অতীতের সাথে এত গভীর সম্পর্ক সৃষ্টিকারী এবং ভাষার ব্যাপারে এত সচেতন কোনো খান্দান আমার চোখ দেখেনি। আরবের এ বংশধরেরা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যেই ছড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির স্রোতধারা ও রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে তারা জীবন কাটিয়ে আসছে। সব জিনিসের মাঝে পরিবর্তন এসেছে। এমনকি তাদের নিজেদের তাহজিব-তামাদ্দুন, নীতি-নৈতিকতা এবং জীবনাচারের অনেক কিছুই পালটে গেছে। কিন্তু এরপরও তারা

দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। আরবিভাষাকে মজুতভাবে আকড়িয়ে রেখেছে।

হে আরব উপদ্বীপ, তোমার সন্তানদের অফাদারি ও দৃঢ়তা তোমার জন্য মোবারক হোক। আরববিশ্বের নিঃসন্দেহে এমন বহুগুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তোমাকে আনন্দিত করবে। তোমার পূর্বসূরিরা যদি জীবন্ত হত তা হলে তারাও আনন্দে উদ্বেলিত হত।

আজানের ধ্বনি এখনো চারদিকে গুঞ্জরিত হয়। মিনার থেকে তাওহিদ ও রিসালাতের ঘোষণা এখনো শোনা যায়। সবখানে নামাজ আদায় করা হয়। মনকাড়া কণ্ঠস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। শোনলে এমনকি তুমিও আত্মহারা হয়ে পড়তে। তোমার মধ্যে স্পন্দন শুরু হত। তুমি যদি আলেমদের কুরআন তাফসির এবং দীন সম্পর্কে তাদের আলোচনা শোনতে তা হলে নিঃসন্দেহে তোমার এ ধারণা হত যে, কুরআন বিশুদ্ধভাবে এ জামানার লোকেরাই বুঝেছে। সেখানে ইলমের নানামুখী খেদমত হচ্ছে। এর প্রচার-প্রসারের কাজ চলছে। প্রতিনিয়ত দীনী কিতাবের এক স্রোতধারা বাজারে আসছে। এ ধারা সেই তেলের স্রোত থেকে মোটেই কম না, যা তোমার মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপের দিকে বয়ে চলছে।

আমি এসব বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছি। এর উপর তোমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। হে আরববিশ্বের প্রাণকেন্দ্র, তুমি তোমার চোখ শীতল করো! সন্তুষ্ট হও! এ বিষয়গুলোর উপর খুশি হওয়ার হকদার কেবল তুমিই। এর উপর মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য তোমার চেয়ে বড় কে আছে!

জেদ্দা নৌবন্দরে তোমাকে আলবিদা জানানোর সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তোমার কাছে কোনো বিষয় গোপন রাখব না। ফিরে এসে তোমাকে তিতা-মিঠা সব কথাই শোনাব। এ সফরের সব প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি তোমার কাছে বর্ণনা করব। হোক তা আনন্দময় কিংবা বেদনাহত। তোমার ভাষার একটি পুরনো প্রবাদ আছে, 'ভদ্রজন ওয়াদা রক্ষা করে'।[১]

---

[১] الكريم إذا وعد وفى

প্রিয় জাজিরাতুল আরব, বুঝে আসছে না, নিজের মিশ্র অনুভূতি কীভাবে কোন ধাচে ব্যক্ত করব। এ দীর্ঘ সফরে যা পেয়েছি এবং যা পাইনি তা কোন শব্দে তুলে ধরব। দুই বিপরীতমুখী অবস্থা কীভাবে চিত্রায়ন করব। আশার আলো ও আশঙ্কার কালো আবহকে কোন ভাষায় আলোচনা করব।

হে জাজিরা, তুমি জান তোমার পূর্বসূরিদের হৃদয় ছিল ঈমানে পরিপূর্ণ। আগ্রহ ও ভালবাসায় টইটুম্বুর। নির্ভীক মৃত্যুঞ্জয়ী। শাহাদতের তামান্নায় বিভোর। দুনিয়ার প্রতি উদাসীন ও বিমুখ। বস্তুনিচয় থেকে অমুখাপেক্ষী। এ কারণে তাদের আজানের ধ্বনি পাহাড়ে স্পন্দন শুরু হত। তাদের সেজদায় পুরো পৃথিবী কাঁপত। কালপরিক্রমায় এ দিল দুর্বল হয়ে যায়। পশ্চিমা বস্তুবাদ এবং বস্তুপূজারি শিক্ষা তার ভীষণ ক্ষতি করে ফেলে। ফলে সে জীবনের চঞ্চলতা হারিয়ে বসে। বাহাদুরি, নির্ভীকতা ও মনোত্তাপ খুইয়ে বসে। জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। এ এমন ব্যাপক রূপ ধারণ করে, মসজিদ-মাদরাসা, ঘর-বাজার সবই তার কাছে সমান হয়ে যায়।

এই পরিবর্তন যাদের অনুভব করার কথা ছিল না তারাও এখন অনুভব করছে। যেমন দামেশকের কবিসম্রাট শাওকিকে বলতে শোনা গেছে, 'মিনার থেকে ধ্বনিত এই আজান সেই আজান না। এ আজান শ্রবণকারী কানও সেই কান না'।

আমি এই পরিবর্তনের ব্যাপারে যুগ-যুগ ধরে বসবাস করে আসা তোমার বংশধরদের শহরগুলোর সঙ্গে একেবারে খুলে খুলে পরিষ্কারভাবে কথা বলেছি। যেমন একজন মুখলিস হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কারো সাথে বিশেষ কোনো বিষয়ে গোপনে আলাপ করে থাকে। কিন্তু আমি জবাব পেয়েছি এ পরিবর্তনের দায়ভার জাজিরাতুল আরবেরই। সে একসময় পুরো পৃথিবীর জীবনযাত্রা, শক্তি-সামর্থ্য ও রুহানিয়াতের প্রাণকেন্দ্র ছিল। সে শুধু আরববিশ্বই না বরং পুরো দুনিয়ার শিরা তন্ত্রীতে, রগ-রেশায় তাজা খুন সঞ্চালন করত। কিন্তু শেষ জামানায় এসে ঈমানি জীবনধারার খুন সঞ্চালনের পরিবর্তে পেট্রোল বণ্টনে লেগে যায়। দুনিয়াকে ঈমানি উপকরণ ও রুহানি খোরাক দেওয়ার পরিবর্তে বিদেশি সম্পদ উপার্জনে আত্মনিয়োগ করেছে।

হে প্রিয় আরব উপদ্বীপ, আমি তোমার পক্ষ হয়ে বহু সাফাই গেয়েছি। আল্লাহর অনুগ্রহে আমার বিতর্কের যোগ্যতা আছে। কিন্তু তারা দলিল-

প্রমাণের মাধ্যমে আমার জবান বন্ধ করে দিয়েছে। এখন তুমি তাদেরকে যেভাবে পার শান্ত করো, নিশ্চুপ করো। অকাট্য দলিল পেশ করে তাদেরকে লাজবাব করে দাও। কারণ তারা তোমার বংশধর। তোমার সবচেয়ে নিকট আত্মীয়।

তোমার মধ্যে অলসতা থাকুক বা না থাকুক, এই দুঃখজনক পরিবর্তনের জন্য দায়ী তুমিই হও কিংবা অন্য কেউ, আমি তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছি- আমি আরববিশ্বে তীব্রগতিতে ব্যাপকহারে ইসলামি জাগরণের নিদর্শন দেখেছি। সেখানকার জনগণ এখন সজাগ সচেতন হতে শুরু করেছে। অন্তরের অস্থিরতা এবং পরিবর্তিত অবস্থার বিরুদ্ধে রাগ ও গোস্বায় তারা কানাকানি শুরু করেছে। বিভিন্ন দেশে এর প্রভাবও পড়তে শুরু করেছে। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যানের আন্দোলন চারদিকে ধূমায়িত হচ্ছে।

পশ্চিমারা পুরো পৃথিবীর উপর তাদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। আরব বিশ্বের উপর একে আবশ্যক করে দিয়েছে। এমনকি তারা আরবের ধনভাণ্ডার, টাকা পয়সা ও উৎপাদিত উত্তলিত জিনিসসমূহের উপর কর্তৃত্ব চালাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে আরবরা একদম বেকুফ হয়ে গেছে। যেন অনুভূতিশক্তিহীন যন্ত্রমানব কিংবা কম বয়সী কিশোর। কিন্তু এখন এ নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দ্রোহের সুর শোনা যাচ্ছে। এর বিপক্ষে আন্দোলনের উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছে।

আরবজাতি এখন বাস্তবতা বোঝতে শুরু করেছে। তারা এখন এমন ভদ্র মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে যে নিজের ইজ্জত-সম্মান ও মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস রাখে, নিজের ব্যক্তিত্বের ওজন অনুভব করে। সে এখন জীবন্ত মানুষে পরিণত হয়েছে, যে রাগ করতে জানে, আবার নরম এবং গরম হতেও জানে। সে প্রয়োজনে দ্রোহের পতাকাও উত্তোলন করে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পশ্চিমাদের সামনে মাথানত করে থাকা, তাদের উপর ভরসা করা এবং তাদের চলার গতির সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করে নেওয়ার পর এখন আরববিশ্ব মাঝে মধ্যে চোখ গরম করতে শুরু করেছে। নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পৃথিবী-পরিবারের একজন সম্মানিত ও কার্যকরী সদস্য ভাবতে শুরু করেছে, যে এখন ভাল-মন্দ জানে-বোঝে। বন্ধু-শত্রুর মাঝে পার্থক্য করতে পারে। সন্ধি-যুদ্ধ, অঙ্গিকারও বোঝে। বন্ধুত্ব করার ক্ষেত্রে

নিজের অধিকার সংরক্ষণ করে। এখন সে দেশজ শিল্প, কল-কারখানা, উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য, আপন দায়িত্ব ও জীবনের প্রয়োজনে অন্য দেশের অমুখাপেক্ষিতার গুরুত্ব বোঝতে শুরু করেছে। আরবের কিছু দেশ তো এ উদ্দেশ্যের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও তাদের চলার গতি দীর্ঘ সময় ধরে ভারী বোঝার কারণে নুইয়ে পড়ে হাঁপাতে থাকা ব্যক্তির মতো মন্থর। কিন্তু তারা সেই শিশুর মতো চলতে শুরু করেছে, যে দীর্ঘ দিন পর ধীরে ধীরে চলতে শুরু করে। ইতঃপূর্বে তারা পশ্চিমাদের দেওয়া অনুদান, আসবাব উপকরণ ও যন্ত্রপাতির কারণে সব ভুলে যেত। যুগ যুগ ধরে মৃত্যুর স্বাদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার পর এখন তারা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে শিখছে। তারা বোঝতে শুরু করেছে জীবিত সে-ই থাকতে পারে যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে। এখন তারা বলতে শুরু করেছে, যে জীবিত থাকতে চায় সে যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে।

সবচেয়ে বড় যে জিনিস অন্তরে আশার আলো সঞ্চার করে এবং ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দেয় তা হল আরববিশ্বে নতুনভাবে ঈমানের নিশান ও নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। হে হেজাজ, তোমার ভালোই জানা থাকার কথা, তোমার সম্মানিত বংশধরদের জন্য, এমনকি পুরো ইসলামিবিশ্বের জন্য কোনো নতুন ঈমান, নতুন আকিদার প্রয়োজন নেই। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ধর্মাদর্শ ও চিন্তাধারা নিয়ে এসেছেন তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট। এ দীনই চিরস্থায়ী। এটাই শেষ ও শাশ্বত পয়গাম। আজও এটি জীবন্ত, শক্তিমান। জামানা অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে। তারপরও এ দীন পুরো পৃথিবীকে পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম। প্রতিটি জামানাকে সাথে নিয়ে চলতে সক্ষম। কিন্তু তোমার সেই বংশধরদের জন্য জরুরি হল এই চিরস্থায়ী এবং সব জামানা ও প্রজন্মের উপযোগী দীনের উপর ঈমান ও একিনকে পুনরায় তরতাজা করে নেওয়া।

তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে। নতুন নতুন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। নতুন নতুন দাওয়াতের জোরালো কার্যক্রম চলছে। এগুলো শিকড় আকড়িয়ে ধরেছে। সমস্যা এখন নানামুখী রূপ ধারণ করেছে। আরববিশ্ব এসব ফেতনা, সমস্যা ও দাওয়াতের মোকাবেলা দুর্বল ঈমান দিয়ে করতে পারবে না। প্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করা, আমিত্বকে আয়ত্তে আনা, দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা অথবা কোনো দাওয়াতের মোকাবেলায় দাঁড়ানো দূরের

কথা এ ভাঙাচোড়া ঈমান উন্নতি ও উন্নয়নের এ যুগে টিকে থাকতে পারে না। জিন্দাও থাকতে পারে না।

তবে আমি যেসব দেশ সফর করেছি সেখানে ঈমানি প্রভাবের নিদর্শন দেখেছি। জাগ্রত হচ্ছে এমন বহু তরতাজা ঈমান আমি দেখেছি। আমি এমন বহু নওজোয়ানকে দেখেছি, যাদের প্রশংসায় তাদের প্রতিপালক বলেছেন,

اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. وَرَبَطْنَا عَلٰى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوْا فَقَالُوْا رَبُّنَا رَبُّ السَّمٰوٰت وَالْاَرْضِ لَنْ نَّدْعُوَ من دُونه اِلٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا اِذًا شَطَطًا. هٰؤُلَاۤءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا من دُونه اٰلِهَةً لَّوْلَا يَاْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ اَظْلَمُ ممَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰه كَذبًا.

'তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর তারা বলল, আমাদের পালনকর্তা আসমান ও জমিনের পালনকর্তা। আমরা কখনও তার পরিবর্তে অন্য কোনো উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তা হলে তা হবে অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এরা আমাদেরই জাতি, এরা তার পরিবর্তে বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে'? [সুরা কাহফ, ১৩-১৫ আয়াত]

এসব নওজোয়ান বয়সে বেশি না হলেও ঈমানি শক্তিতে শক্তিমান। তারা মুসলমান হতে পেরে আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে। কারো বদনাম রটায় না। তারা বলে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন। ইসলামের মত দৌলত দান করেছেন। অন্য সব কিছুর তুলনায় তারা দীন নিয়ে বেশি অহঙ্কার করে। তারা দীনকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হিসেবে দেখে না। একে সেই বৃক্ষও মনে করে না, যা নিঃশেষ হয়ে গেছে। ফল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বরং একে উথলে ওঠা ঝর্না মনে করে যাতে অবগাহন করে শক্তি অর্জন করা যায়। জীবনযাত্রার পদ্ধতি

শেখা যায়। প্রদীপ্ত সূর্য মনে করে, যা থেকে আলো ও উষ্ণতা আহরণ করা যায়।

তাদের জীবনে ইসলাম ভাসা-ভাসা কোনো বিষয় নয়। আর হঠাৎ করে এসেছে এমনও নয়। বরং অন্তর ও কলিজা, আকল ও রুহের মতো তাদের রগ-রেশায় এটি প্রবহমান। তারা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো নিছক একটি ধর্ম মনে করে না। অন্যান্য জীবনব্যবস্থার মতো নিছক একটি জীবন-ব্যবস্থা হিসেবেও ভাবে না। বরং তারা একমাত্র সত্যধর্ম মনে করে। অন্য সবকে মিথ্যা ও ভ্রষ্ট মনে করে। তাদের মতে সেই ব্যক্তিই এ দীন থেকে বিমুখ হতে পারে, যার মস্তিষ্কে সমস্যা রয়েছে। তারা সেই লোক, যাদের মাধ্যমে প্রথম যুগে ইসলাম উন্নতির সুউচ্চ সোপানে পৌঁছেছে। বর্তমান জামানায় তাদের দিয়েই দীনের অগ্রগতি হবে। তাদের দিয়েই এর অস্তিত্ব টিকে থাকবে। তাদের দিয়েই এ দীন স্থায়িত্ব লাভ করবে।

মুসলিম জাহান ও আরববিশ্বের এই নতুন প্রজন্ম, কোনও সন্দেহ নেই, একটি বাস্তবতা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। এ ব্যাপারে বিতর্কের কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে- না জানি অন্য কোনো দেশ তোমার চেয়ে এগিয়ে যায়। আর তুমি অনেক পিছনে পড়ে থাক। অথচ তুমিই তাদের চেয়ে বেশি হকদার আগে বেড়ে যাওয়ার। তুমিই বেশি যোগ্য এই নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব দেওয়ার। কারণ তুমিই ইসলামের মূল কেন্দ্রবিন্দু। তুমিই এর রুহ ও প্রাণ। তুমিই এর নিরাপদ ভূমি ও আশ্রয়।

যাই হোক, হে হেজাজ, আমি আরববিশ্বের ব্যাপারে নিরাশ হইনি। তোমার ব্যাপারেও নিরাশ নই।

হে হেজাজ, এটা তোমারই হক যে, এই উর্বর মাটিতে যমযমের পানি ছিটিয়ে দিবে অথবা তোমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই অশ্রু ও রক্ত বিসর্জন দিবে যদি। এটি করতে পার তা হলে এই ভূমি আবার সতেজ হয়ে উঠবে। আবার সবুজ-শ্যামলিমায় ভরে যাবে। তুমিই ইসলামের প্রথম যুগে একে সিঞ্চিত করেছিলে। এখনও তোমারই জন্য এই অধিকার সংরক্ষিত। তুমি একে আবার সিক্ত করবে। ফসল ফলাবে। আল্লাহ তায়ালাই আলিমুল গায়েব। আগামীতে কী হবে তা তিনিই জানেন। কিন্তু তার দেওয়া জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের দৃষ্টি পর্যবেক্ষণ করছে।

লেবাননে তিনদিন

৯ এপ্রিল, ১৯৫৬ থেকে
১১ এপ্রিল, ১৯৫৬ পর্যন্ত

১৯৫১ সনের কথা। আমি মধ্যপ্রাচ্য সফর করি। তখন হেজাজসহ মিসর সুদান ফিলিস্তিনও ভ্রমণ করি। হেজাজ থেকে সফর শুরু হয়ে আবার সেখানে গিয়েই শেষ হয়। প্রোগ্রাম ছিল মিসর থেকে সিরিয়ায় নদীপথে সফর করব। মাঝে বৈরুতে নেমে লেবাননেও কিছু সময় কাটাব। কিন্তু পরবর্তী সময় নদীপথে সফর করার সিদ্ধান্ত বাতিল করে আকাশপথে সিরিয়া যাই। ফলে সেবার লেবানন সফর সম্ভব হয়নি। এর কারণ হল সময়টা ছিল রমজান মাস। অন্তরে দ্রুত ফিরে আসার এবং কোনো নিরিবিলি জায়গায় প্রশান্তচিত্তে অবস্থান করার চাহিদা ছিল প্রবল। আসলে সে সফরে লেবানন যাওয়া আমার ভাগ্যে ছিল না।

১৯৫৬ সনে আল্লাহ তায়ালা 'সিরিয়া ইউনিভার্সিটি'র ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দ্বিতীয়বার সিরিয়া ভ্রমণের তাওফিক দান করেন। তখন ইচ্ছা হল এ সুযোগে লেবানন ঘুরে যাই এবং রমজানের আগেই সফর শেষ করি। একজন ভালো সফরসঙ্গীর প্রয়োজন ছিল, এই সংক্ষিপ্ত সফরে যিনি আমার সঙ্গ দিবেন। আল্লাহ তায়ালা এর জন্য আমার পুরনো বন্ধু সা'দুদ্দীন অলিলীকে নির্বাচন করে দিলেন। তিনি আমার সফরসঙ্গী হয়ে আমাকে ধন্য করেন। তিনি অত্যন্ত ভালো সাথী। উত্তম রাহবার।

আমরা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শাবান দামেশকের 'হোটেল ইয়ারমুক' থেকে রওনা করি। সিরিয়ায় এসে হোটেলে উঠে ছিলাম। বন্ধুবর ডা. সায়িদ রমজান এবং সিরিয়া ইউনিভার্সিটির শরিয়াহ অনুষদে অধ্যয়নরত নদওয়ার ছাত্ররা আমাকে বিদায় জানান। মাগরিবের সময় আমরা রওনা করি। গাড়ি একটি সুন্দর ও প্রশস্ত সড়কের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে। দুধারে সারিসারি বৃক্ষরাজি। রাস্তাটি ছায়াঘেরা। একপাশ দিয়ে বয়ে চলছে বারদা নদী। ঢেউয়েরা আনন্দে নাচ জুড়েছে। এ ব্যাপারে বনু জাফনার তারিফ করতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সভাকবি হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত রা. বলেছেন, বারিসে যে তার সঙ্গে দেখা

করে সে তাকে বারদার খালেস শরাব মেশানো পানি দিয়ে আপ্যায়ন করে।

সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচার শহর এটি। যেন জান্নাতের একটি নমুনা। দামেশকের মফস্বলে এবং শহরে প্রবেশের রাস্তা অনেক মোহনীয়, চিত্তাকর্ষক। শহরের অন্য কোনো রাস্তা এত সুন্দর আমার নজরে পড়েনি। পথে আমরা রাবুহ, দুম্মার, হামাতসহ দামেশকের গ্রীষ্মকালীন শহরগুলো দেখি। বহুসংখ্যক পার্ক দেখি। পার্কগুলো সবুজ-শ্যামল। অত্যন্ত চমৎকার।

সুন্দর সুন্দর একের পর এক বহুদৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা সিরিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছি। একপর্যায়ে লেবাননে প্রবেশ করি। পুলিশফাঁড়ি, সিকিউরিটি অফিস ও কাস্টম অফিসের ঝামেলা শেষ করে দেখতে পাই জালিম উপনিবেশবাদীরা এই সুন্দর ও মনোরম দেশের সাথে কীরূপ ঠাট্টামূলক আচরণ করছে। তারা একে টুকরো টুকরো করে অপ্রকৃতিগতভাবে ভাগ করে ফেলেছে। এখানে সিরিয়ার সীমানা শেষ। কয়েক কদম এগুলেই লেবাননের সীমানা শুরু। ইতঃপূর্বে এই সমগ্র এলাকা ছিল একটিমাত্র মুসলিম দেশ, যে দেশের নাম ছিল শাম।

হে পাশ্চত্য, আল্লাহ তোমাকেও টুকরো টুকরো করে ফেলুক, যেভাবে ইসলামি প্রাচ্যকে তুমি খণ্ড-বিখণ্ড করেছ। আল্লাহ তোমার উপর এমন নির্দয় জালেমকে চাপিয়ে দিক যে তোমার প্রতিটি অংশকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে।

আমরা এখন লেবাননের ভিতরে। এখানে আমাদের মৌসুমের কোনো পরিবর্তন অনুভূত হল না। জমিনের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং এখানকার অধিবাসীদের রঙ-রূপ একই মনে হচ্ছে। এরা সবাই একই জাতিভুক্ত। তাদের ভাষাও সেই সিরিয়ার ভাষা। উভয়ের দীন-ধর্ম, আকিদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এক ও অভিন্ন।

কিন্তু লোকজন বলছে এবং আমাদেরও না মেনে কোনো উপায় ছিল না, আমরা এক দেশের সীমানা থেকে বেরিয়ে অন্য দেশের সীমানায় প্রবেশ করেছি। এক দেশকে বিদায় জানিয়ে অন্য দেশকে স্বাগত জানিয়েছি। সফরের ভিসা ও পাসপোর্টও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। এটা এমন সত্য, যা মিথ্যা হতে পারে না। পাসপোর্টের পৃষ্ঠাগুলো বিভিন্ন সিল-স্বাক্ষর ও রঙ-বেরঙের টিকিটে ভরে আছে।

আমরা কয়েকটি জনবসতি অতিক্রম করি। মনোমুগ্ধকর কিছু গ্রাম দেখি। এখানকার বাড়ি-ঘরগুলো আধুনিক স্থাপত্যশৈলী অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। এখানে শানদার আলীশান কিছু হোটেলও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হোটেল যাহরুল বায়দার, হোটেল রুলিসাত সুফির, হোটেল বিহামদুন ও হোটেল আলিয়া। জানতে পারলাম গ্রীষ্মকালে লোকজন এসে এসব হোটেলে আশ্রয় নেয়। এগুলোতে আরাম-আয়েশের সব উপকরণ রয়েছে। মদ, গান-বাজনা, নৃত্যসহ বিভিন্ন অশ্লীল জিনিসও রয়েছে। যে যা চায় তার ব্যবস্থা করা হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু হোটেল পাক-পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থাপনার দিক দিয়ে অনেক সুন্দর।

আমরা লেবাননের বহু পর্বতবীথি দেখেছি। পাহাড়গুলো আমাদের অনেক নিকটে। চূড়াগুলো বরফ দিয়ে ঢাকা। সারাবছর এমনই থাকে। বড় মনোলোভা দৃশ্য। মনোমুগ্ধকরও।

আসরের সময় আমরা বৈরুতের সীমানায় প্রবেশ করি। বৈরুত ও দামেশকের মাঝে একশ' পাঁচ কিলোমিটারের দূরত্ব। আমরা শহরে প্রবেশ করি। মনটা তেমন ভালো লাগছিল না। একটি আমেরিকান হোটেলে অবস্থান নিই। সেখানেই আসরের নামাজ আদায় করি। কাছের আরেকটি হোটেলে খানা খাই। জনাব অলিলী শহরের কয়েকজন বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বলেন। 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান আল-ইসলামিয়া'র রাহবার ও প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ওমর দাউককে আমার আসার সংবাদ দেন। ওমর দাউককে তার বন্ধু ও ছাত্ররা আবু ওমর নামে সম্বোধন করে থাকেন। অল্পক্ষণ পর প্রফেসর আবু ওমর আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তার সঙ্গে একজন লেবানিজ মুসলিম নওজোয়ানও ছিলেন। আমরা পরস্পর পরিচিত হই। আবু ওমর অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে আমাদেরকে খোশ আমদেদ জানান। তিনি বলেন, বিভিন্ন বই-পুস্তক ও লেখার মাধ্যমে, ইলমি ও ফিকরিভাবে আপনাকে চিনেছি বহু আগেই। আমরা চিন্তার দিক দিয়ে এক ছিলাম। শুধু সাক্ষাতের কমতি ছিল। তিনি 'আলবা'স আলইসলামি' পত্রিকার সম্পাদক আমার ভাতিজা মুহম্মদ আলহাসানীর কথা স্মরণ করেন। 'আলবা'সুল ইসলামি'র আলোচনা করেন। পত্রিকার সম্পাদকের কথা জিজ্ঞেস করেন। আমি বললাম, লেবাননে তার একজন বন্ধু আছেন।

তার নাম 'হানি ফাখুরি'। সে সবসময় চিঠিপত্রের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করে। প্রফেসর আবু ওমর তার সঙ্গে আসা নওজোয়ানটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ইনিই হানি ফাখুরি।

এখন আবু ওমর সম্পর্কে কিছু শুনুন। আবু ওমর লেবাননের একজন মুখলিস দায়ী। তিনি দাওয়াতে ইসলামিকে নিজের দায়িত্ব ও জিম্মাদারি বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি এ দেশে দাওয়াতের প্রাণপুরুষ। সব সময় তার মধ্যে দাওয়াতের চিন্তাই জাগরূক থাকে। প্রাণপুরুষ বলে আমি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছি। লেবাননি বন্ধুরা ক্ষমা করবেন। লেবানন সেই শহর, যাকে শিক্ষিত-সচেতন বন্ধুরা পূর্ব আরবের অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার মূল কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করে থাকেন। পশ্চিমারা নিজেদের পাপাচার ও অপসংস্কৃতির বিষক্রিয়া আরববিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য লেবাননকে সদরদপ্তর বানিয়ে নিয়েছে। এখানে ইসলামি দাওয়াতের স্থায়িত্ব অনেক জরুরি ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা এই দাওয়াতের কাজ করার জন্য, প্রশিক্ষণ দিয়ে নওজোয়ানদের মস্তিষ্ক ধোলাই করার জন্য এবং অন্যায়-পাপাচার মোকাবেলা করার জন্য এমন একজন নওজোয়ানকে নির্বাচন করেছেন, যিনি আলেম নন, দীনী পরিবেশে যিনি লালিত-পালিত হননি। বরং তিনি একজন মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার। একটি বড় কোম্পানিতে চাকুরি করেন। এই নেক লোকটিকে লোকজন ওমর দাউক নামে স্মরণ করে থাকেন। দাউক লেবাননের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম খান্দান। দাওয়াতের এই মহান কাজের জন্য কোনো আলেমকে নন আল্লাহ্ তায়ালা একজন ইঞ্জিনিয়ারকে নির্বাচন করেছেন। وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ 'তোমার প্রতিপালক যা চান তা সৃষ্টি করেন। যা চান তা নির্বাচন করেন।' [সুরা কাসাস, ৬৮ আয়াত]। وَلَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ 'তিনি যা করেন সে সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না। তিনি ব্যতীত অন্য সকলকে জিজ্ঞেস করা হবে।' [সুরা আমবিয়া, ২৩ আয়াত]

ইঞ্জিনিয়ার আবু ওমর আমাদেরকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা এশার নামাজ আদায় করি। তারপর রাতের খাবার খাই। আমরা 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান'র কার্যক্রম, তাদের শরীরচর্চা এবং এর ক্লাবগুলোর হালচাল সম্পর্কে অনেক কিছু জানি। তাদের সমুদ্রে সাঁতার

কাটা ও জাম্পিং দেখি। দৌড়, হাই জাম্পসহ বিভিন্ন ধরনের শারীরিক কসরত এবং স্কাউটিঙে তাদের সাহসিকতা দেখি। এগুলো তাদের ধৈর্যধারণ ও নিয়মানুবর্তিতার ক্ষেত্রে বড় বড় স্কাউটিং প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো অংশে কম নয়। এসবের পাশাপাশি তারা জামাতের সাথে নামাজের পাবন্দি করে। আবার নিজেদের ডিউটিও পালন করে যথাযথভাবে। ক্যাম্পগুলোতে দীনী তালিম হয়। এসব প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী এবং ক্যাম্পে অবস্থানকারী নওজোয়ানদের সংখ্যা কখনও পাঁচশ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাহরিকের নিজস্ব গাড়ি আছে। এসব গাড়িতে চড়ে সদস্যরা ক্যাম্পে যাওয়া-আসা করে। আমরা অনেক কিছু দেখলাম এবং শোনলাম। এরপর আমরা আনন্দচিত্তে হোটেলে ফিরে এলাম। আজকের সারা দিন এবং রাতের কিছু অংশ ঘোরাফেরা আর সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে ছিলাম। তারপর ঘুমিয়ে রাত পার করি।

১০ এপ্রিল ১৯৫৬

২৭ শাবান। আজ খুব আনন্দ ও উদ্যম নিয়ে ঘুম থেকে উঠি। কাছের একটি মসজিদে ফজরের নামাজ পড়ার চেষ্টা করি। সেখানে পৌঁছে দেখি মসজিদ তালাবদ্ধ। জানতে পারলাম এটা অমুসলিমদের মহল্লা। মুসলমান ব্যবসায়ীরা রাতে নিজেদের বাসায় চলে যান। পরিশেষে নামাজ হোটেলেই পড়ে নিই। নামাজের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিই। হোটেলের ডাইনিং হলে নাশতা করি। প্রফেসর তাওফিক হুরীর সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান'র উল্লেখযোগ্য সদস্য। ইঞ্জিনিয়ার আবু ওমরের সহকারী। বিভিন্ন কাজে তার সঙ্গে তিনিও হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি লেখাপড়া করেছেন 'আমেরিকান ইউনিভার্সিটি'তে। 'লন্ডন ইউনিভার্সিটি'তে লেখাপড়া শেষ করেছেন। আমরা তার অফিসে যাই। তিনি অফিসেই ছিলেন। তার সঙ্গে দেখা করি। তার গাড়িতে করে শহর দেখতে বের হই। আমরা শ্রমজীবী মানুষের জন্য নির্মিত 'আমিলিয়া মহাবিদ্যালয়ে'র পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করি। কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেছেন লেবাননি শিয়ারা। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এখানে এমন এমন আলেম আছেন যারা ভারত সফর করেছেন। সেখানে থেকেছেন। নুজহাতুল খাওয়াতিরে তাদের জীবনবৃত্তান্ত রয়েছে।

আমরা দেবদারু গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে 'সুবাক' সড়ক অতিক্রম করি। আলখারিজের সুন্দর এলাকা দেখতে বৈরুত এয়ারপোর্ট যাই। প্রাচ্যের সবচেয়ে সুন্দর ও শানদার এয়ারপোর্ট এটি। এয়ারপোর্টের রাস্তাটাও আমার দেখা দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর ও উন্নত রাস্তাসমূহের একটি। বাম দিকে ফিলিস্তিন উদ্বাস্তুদের ঝুঁপড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। এটি এখন প্রতিটি আরবদেশে ইসলাম ও আরবজাতির যেই ট্রাজেডি স্মরণ করিয়ে দেয় তা কখনো ভোলার নয়।

আমরা ফিরে আসার সময় শয়খ মুহম্মদ আলায়ার সাথে দেখা করি। তিনি লেবাননের গ্রান্ড মুফতি। আমরা একটি প্রশস্ত, সুন্দর ও সাজানো-গোছালো হলরুমে প্রবেশ করি। মনে হচ্ছিল এটা কোনো সরকার-প্রধান অথবা আগের যুগের কোনো জমিদার বা নবাবের দরবার। আমরা তাকে সালাম করি। অল্পক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলি। এখানকার সামগ্রিক অবস্থা দেখে আমার ভারতীয় আলেমদের সরলতা এবং চাকচিক্য বিমুখতার কথা খুব মনে হয়। আমি মনে করি ভারতীয় আলেমদের জীবনযাত্রার মান ও ধরন অত্যন্ত সুখকর এবং বরকতপূর্ণ। জানতে পারলাম উভয় ঈদে প্রাধানমন্ত্রী, পার্লামেন্টের স্পিকার এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তাকে সালাম করার জন্য এখানে উপস্থিত হন। আমরা 'শরিয়াহ কলেজ' দেখতে গিয়ে দরসে উপস্থিত হই। এখানকার শিক্ষকগণ আজহার থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। সকলে এক ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদের আলেম। প্রত্যেকে নিজ বিষয়ে প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। সকলের রয়েছে মাসায়েলের উপর উপস্থিত জ্ঞান। বয়ানের যোগ্যতা তো আছেই। আমরা শরিয়াহ আপিল বোর্ডের প্রধান বিচারপতি শায়খ শফিক ইয়ামুতের সাথে দেখা করি। পোশাক আশাক ও রীতি-নীতিতে আজহারি আলেমদের প্রতিচ্ছবি। আমরা অল্পক্ষণ তার সাথে কথা বলি। তারপর অনুমতি নিয়ে চলে আসি।

বাদশা সৌদ ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে আসি। রাস্তা থেকে প্রতিষ্ঠানটির ভবন দেখতে পাই। যতগুলো ভবন আমি এখানে দেখেছি এটি সবচেয়ে চমৎকার দৃষ্টিনন্দন। ভবনে একটি মসজিদ ও একটি ক্লাব রয়েছে। বৈরুতে ইসলাম বিষয়ে সেমিনার করার, প্রবন্ধ পাঠকের এটি সবচেয়ে বড় হলরুম। এর সাথে যুক্ত একটি মাদরাসা ও একটি কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র

আছে। মেয়েরা এখানে ঘরোয়া কাজকর্ম, হস্তশিল্প ও নিজস্ব দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করে। এখানে একটি হাসপাতালও রয়েছে। আমরা মসজিদে প্রবেশ করি। মসজিদটি দ্বিতীয় তলায়। এখানে আমরা জোহরের নামাজ আদায় করি। মসজিদটি খুব জাঁকজমকপূর্ণ। সাজানো-গোছালো। আমার অন্তরে খেয়াল হল মসজিদ হবে সাদাসিধে, অনাড়ম্বর। তা হলেই অন্তরে খুশুখুযু সৃষ্টি হবে। কিন্তু কীইবা করার আছে। অঢেল অর্থ খরচ করা হয় অপাত্রে। গরিব-দুঃখীদের দেওয়া হয় না। ভিটেমাটি ছাড়া উদ্বাস্তুরা কিছুই পায় না। চাকচিক্য আর জমকালো করার ক্ষেত্রে ব্যয় হয় বিপুল অর্থ। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মেয়েদের বের হতে দেখি। কিন্তু পার্থক্য করতে পারছিলাম না– তারা মুসলমান না কি খ্রিস্টান। অথচ তারা সবাই মুসলমান। তাদের দেহ অর্ধেক খোলা। যে পোশাক গায়ে জড়িয়ে আছে তা সারা শরীর ঢাকছে না। তারা অঙ্গ খুলে বেপর্দা হয়ে চলছে। আল্লাহর বান্দারা, এ অবস্থা আর কতদিন চলবে? আমার আরব ভাইয়েরা, পাশ্চাত্যের এ নির্লজ্জতার অন্ধ অনুকরণ আর কতকাল করবে? প্রতিষ্ঠানটিকে বাদশা সৌদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এ কারণে তিনি এর নির্মাণে দুই লক্ষ একষট্টি হাজার লিরা দান করেছেন। এটা ১৯৫০ সনের কথা। তখন তিনি শাহজাদা ছিলেন। খালিয়ায় এসেছিলেন। বড় হলরুমটিতে চারশ মানুষ ধরবে। ফ্লোরে গালিচা বিছানো। অ্যালমুনিয়ামের চেয়ার বিছানো। দেয়ালে বাদশা বালুতের সুন্দর কাষ্টফলক লাগানো। দেখলে মনে হয় মর্মর পাথরে খোদাই করে লাগানো হয়েছে। হলরুমের ভিতর বাদশার ছবি ঝুলানো। ছবিটি অনেক বড়। ছবিতে তার দুই বাহুর উপর সৌদিয়ান ও লেবানিজ পতাকা লাগানো। নিচে একটি কাঠের আলমিরা। সাধারণ হলও মনোরম। এতে রেডিও, গ্রামোফোন, লাউড স্পিকার ও টেপ রেকর্ডার লাগানো। আমি শৈল্পিক চেতনাধারীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলছি, আমি এ ইনস্টিটিউট দেখে বলতে বাধ্য হয়েছি যে, এটি অপূর্ব সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর একটি চিত্রমাত্র।

একটি দারিদ্র্যপীড়িত জাতির জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সাজানো কোনোভাবেই মানায় না, অন্তত যে জাতি সামান্য রুটি-রুজির মুখাপেক্ষী, নিজের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ যাদের নিত্যসঙ্গী।

মুহাদ্দিসে আজম, ইমাম আওজায়ী[১]'র মাজার দেখেছি। তার নাম জামে তিরমিযী[২]'র বিভিন্ন ফকিহর মাজহাব বর্ণনার সময় বারবার এসেছে। যেমন ইমাম আওজায়ীও এইমত পোষণ করেছেন। আওজায়ীর অভিমত... ইত্যাদি। বৈরুতের পুরাতন গেইটের পাশের গ্রামে তিনি সমাহিত। কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তার মহান ইলমি মাকাম ও অবস্থান, ইখলাস ও মাসলাকের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তার মাসলাক ও মাজহাবের অনুসারী পৃথিবীর কোথাও নেই। তবে হাদিস ও ফিকহের মধ্যে তার নাম বহুকাল জীয়ন্ত থাকবে। তার দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

ইমাম আওজায়ীর মাজার থেকে বের হয়ে বাদশাদের শাহিমহল হয়ে পথ অতিক্রম করি। সমুদ্র ভ্রমণ করি। সমুদ্রসৈকতে জাঁকজমকপূর্ণ বহু মোটেল রয়েছে। এগুলোতে সেসব জিনিসের ব্যবস্থা আছে, শরিয়ত যার আদৌ অনুমোদন দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা যা মোটেই পছন্দ করেন না। ভদ্রলোকেরা এ থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

রাস্তায় আমরা রুশার কঙ্করময় মরুভূমি দেখি। এটা মূলত আত্মহত্যার প্রান্তর নামে খ্যাত। এখানে অধিক হারে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। আত্মহত্যাকারীদের নিকট এ ভূমিটি অত্যন্ত পবিত্র। ভূমির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দৃশ্য দেখতে থাকি। এদিকে কল্পনার জগতে ভাবতে থাকি এই ভূমিতে জীবনের মতো নেয়ামতের নাশোকরকারী এবং আল্লাহর রহমত-বঞ্চিতদের ঘৃণিত কাজ নিয়ে। এমন সময় দৃষ্টিগোচর হয় একজন সিপাহি। আমাকে ভূমির দিকে ঝুকতে নিষেধ করতে করতে এগিয়ে আসছে। সম্ভবত তার সন্দেহ হয়েছে আমি আত্মহত্যা করব। নাউজু

---

[১] হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। কাতাদাহ, আতা' ইবনে আবি রবাহ, ইবনে শিহাব জুহরীসহ সমসাময়িক অনেকেই নিকট থেকে তিনি হাদিস সংগ্রহ করেছেন। বা'লাবাক্কু শহরে ৮৮ হিজরিতে তার জন্ম। ১৫৭ হিজরীতে বৈরুতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

[২] হাদিসের অন্যতম গ্রন্থ জামে তিরমিযীর সংকলক। নাম মুহম্মদ ইবন আবু ঈসা। ২০৯ হিজরিতে খোরাসানের তিরমিয শহরে জন্মগ্রহণ করেন। মেধার ক্ষেত্রে তাকে উপমা হিসেবে পেশ করা হয়। ইমাম বুখারী রহ. ইমাম তিরমিযী রহ.কে বলেছেন, আমার থেকে তুমি এ পরিমাণ উপকার লাভ করনি যেই পরিমাণ উপকার আমি তোমার কাছ থেকে অর্জন করেছি। তিনি .... হিজরি সনে ইনতেকাল করেন।

বিল্লাহ। জানতে পারলাম আত্মহত্যাকারীদের অধিকাংশ অমুসলিম। এ কথা স্পষ্ট যে, আত্মহত্যার ক্ষেত্রে ঈমানি দুর্বলতা সত্ত্বেও মুসলমানদের সংখ্যা অমুসলিমদের তুলনায় অনেক কম। কারণ এ কাজ ইসলামে মহাপাপ মনে করার বিশ্বাস মুসলমানদের অন্তরে রাসুল সা. বদ্ধমূল করে দিয়েছেন।

আমরা সৈকতের 'হোটেল বাহরাইন' যাই। সমুদ্রের পার ঘেষে বসি। জনাব তাওফিকের আতিথেয়তায় দুপুরের খাবার খাই। এখান থেকে উঠে একটি লাইব্রেরিতে যাই। লাইব্রেরির মালিকের সাথে 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান'র সম্পর্ক রয়েছে। লাইব্রেরিটি হোটেলের পাশেই অবস্থিত। সেখানে আমার বই 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো', 'পর্যটকের দিনলিপি'[৩] ও 'ইসলামের কবি' দেখতে পেলাম। তিনটি গ্রন্থেরই এক কপি করে সংগ্রহ করি। সেখান থেকে বেরিয়ে 'আমেরিকান ইউনিভার্সিটি'তে যাই। ইউনিভার্সিটিটি দেখলে মনে হয় একটি স্বতন্ত্র শহর। তারপর হোটেলে ফিরে এসে আরাম করি। আজকের সফরসঙ্গী ছিলেন এগ্রিকালচার কলেজের প্রফেসর আবদুল ওয়াদুদ। তিনি 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান'র উল্লেখযোগ্য সদস্য। ইঞ্জিনিয়ার আবু ওমরের ঘনিষ্ঠ লোক।

সন্ধ্যাবেলায় 'সজ্ঘাতের মুখে ইসলাম' গ্রন্থের বিখ্যাত লেখক মুহম্মদ আসাদের সাথে দেখা করি। তিনি নিজের পরিবার নিয়ে 'হোটেল আলিয়া'য় অবস্থান করছেন। বৈরুতে যাওয়ার সময় আমরা এখান দিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মক্কার পথ'র দ্বিতীয় অংশ রচনার কাজে ব্যস্ত আছেন। অল্পক্ষণ তার কাছে বসি। ১৯৫১ সনে মক্কায় তার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি সেইবারকার সাক্ষাতের কথা আলোচনা করেন। ইউরোপের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাবলীলভাবে আরবি বলতে পারেন।

আমরা তার কাছ থেকে ফিরে আসি। একজন আত্মমর্যাদাশীল মুসলমান ডক্টর মুসতফা খালেদীর সাথে সাক্ষাত করি। তার কথা অনেক

'পর্যটকের দিনলিপি' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ১৯৫৩ সনে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়। লেখকের লেবানন সফর হয়েছে ১৯৫৬ সনে। গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে লেবানন সফরের দিনলিপি যুক্ত করা হয়। 'মধ্যপ্রাচ্যের ডায়েরি' তারই অনুবাদ।

সময় শোনতাম। তার সাথে দেখা করে দারুণ আনন্দিত হই। ডক্টর খালেদীর মধ্যে ইসলামি সম্ভ্রমবোধ পরিপূর্ণ মাত্রায় রয়েছে। তিনি ইংরেজি ভাষায় ইসলামি শিষ্টাচারের প্রচার-প্রসার না করার কারণে মুসলমানদের অলসতা ও উদাসীনতার অভিযোগ তোলেন। আমাকে ইংরেজিতে লেখা তার কিছু বই হাদিয়া দেন। তারপর বলেন, আমার প্রবন্ধ 'ফিলিস্তিন বিপর্যয়' আনুমানিক পাঁচ হাজার কপি ছেপে প্রচার করা হয়েছে।

আলহাজ হাসান কিওয়া আমাদেরকে তার বাড়িতে নৈশভোজের দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি বৈরুতের একজন বড় ব্যবসায়ী। শহরের বিত্তশালী লোকদের একজন। ঘটনাক্রমে সেখানে আলজেরিয়ার প্রসিদ্ধ মুজাহিদ ফুজাইল অরতালানীর সাথে সাক্ষাত হয়। তার সঙ্গে এটা আমার প্রথম সাক্ষাত। ইলমি ও ফিকরি পরিচয় যদিও আগে থেকেই ছিল। তিনি আমাকে কিছু বলতে বললেন, আমি আরবদের দায়িত্ব ও জিম্মাদারি এবং পাক-ভারতে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্টতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক মনে যা আসে তাই তুলে ধরি। তারপর জনাব ফুজাইল অত্যন্ত যাদুময়ী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী এক বয়ান দেন। এদ্দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি আরবের প্রসিদ্ধ বাগ্মীদের একজন। তিনি আলোচনায় আমার ভূয়সী প্রশংসা করেন। আমার প্রতি তার মহব্বত ও সুধারণা প্রকাশ করেন। তারপর আমরা একসঙ্গে খানা খাই। খেতে বসে বোঝতে পারলাম এ দেশের জীবনযাত্রার মান বেশ উন্নত হয়েছে। পাক-ভারত তাদের তুলনায় বহুদূর পিছিয়ে আছে। খাবার শেষ করে আমরা ফিরে এলাম। আমাদের সাথে শায়খ ফুজাইলও আসেন। আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলি। তিনি তার মিষ্টি ও ভালবাসামাখা কথা দিয়ে আমাদেরকে খুশি করতে থাকেন। যার ফলে আজ আমাদের ঘুমোতে অনেক দেরি হয়ে যায়।

১১ এপ্রিল ১৯৫৬

গতকাল সিদ্ধান্ত হয়েছিল লেবাননের রাজধানী ত্রিপলিতে সংক্ষিপ্ত সফর করব। আমরা প্রস্তুত হয়ে নিই। আল্লাহর উপর ভরসা করে বেরিয়ে যাই। গাড়ি আমাদেরকে নিয়ে রোমসাগরের তীর ঘেষে চলতে লাগল। আমরা একটি সুন্দর গ্রাম ও মনোলোভা দৃশ্যের পাশ দিয়ে পথ চলতে থাকি। সমুদ্র তীর ধরেই গাড়ি চলতে থাকে। সমুদ্রও শেষ হয় না। রাস্তায় জাবিল

ও বিতরুন গ্রামও পড়ে। এ গ্রাম দুটোর মুসলমানদের মধ্যে অনেক উৎসাহ-উদ্দীপনা পাওয়া যায়। অনেক ভরপুর একটি এলাকা দেখি। আল্লামা রশিদ রেজা রহ. এর গ্রাম কালমুনও রাস্তায় পড়ে।

অবশেষে আমরা ত্রিপলিতে পৌঁছি। 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান'র কার্যালয়ে অবস্থান নিই। মুসলিম নওজোয়ানরা আসতে থাকে। অল্প সময়ে ভিড় লেগে যায়। তাদের মধ্যে অনেক উৎসাহ ও একনিষ্ঠ ভালবাসা অনুভব করি। এটি আমি মিসরের ইখওয়ান অনুসারী নওজোয়ানদের মধ্যেও লক্ষ্য করেছি। একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান' মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লেবানিজ সংস্করণ। ত্রিপলিতে এসে আমার অন্তর খুলেছে। এখানে এসে সে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে, যা বৈরুতে খুইয়ে ফেলেছিলাম। এই যুবকদের সাথে আমার সম্পর্ক হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমার নিকট আসতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

আমি এ সুযোগকে গনিমত মনে করে ভ্রমণে বের হই। মনে নেই আমরা শরিয়াহ কলেজ দেখলাম নাকি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। যাই হোক, সেখানে দীনী রঙের প্রাধান্য ছিল। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অবস্থা ছিল চোখে পড়ার মত। ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নত। প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষকের সাথে দেখা হয়। তিনি অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ। নাম মনে নেই। তিনি আলেমদের মতো করে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। নাম শুনেই আমাকে তিনি চিনে নিলেন। কারণ তার দাবি অনুযায়ী তিনি আমার বহু কিতাব পড়েছেন। কিতাবগুলোর প্রতি তার সন্তোষ ও আত্মতৃপ্তির কথা প্রকাশ করেন। কথাবার্তায় বোঝতে পারলাম আধুনিক ইসলামি সাহিত্যের সঙ্গে তার ভালো সম্পর্ক রয়েছে। তিনি খুব চিন্তাশীল ও সৎ আকিদার মানুষ। তার মধ্যে ওলামায়ে কেরামের মতো তাওয়াজু ও বিনয় পাওয়া যায়। আমি তার ব্যক্তিত্ব ও তাওয়াজুতে প্রভাবিত হই। লেবানন ও সিরিয়ায় আমি যতগুলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখেছি তার মধ্যে এ প্রতিষ্ঠানটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। শরিয়াহ বোর্ডের বিচারপতির সাথেও সাক্ষাতের সুযোগ হয় আমাদের। আমরা তার মধ্যে এমন চিন্তা-চেতনা অনুভব করি, যা অন্য লেবানিজ বন্ধুদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আমরা আবু সামারার সুন্দর সবুজ ভূমি দেখি, যেখানে পানি জমা হয়ে প্লাবনের রূপ নিয়েছে। এদ্‌দ্বারা শহরের ভীষণ ক্ষতি হয়। আমরা 'বু আলি'

নদী এবং প্লাবনের ধ্বংসাবশেষ দেখি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দেখতে যাই। ভেঙেচুরে বহু ঘরবাড়ি পড়ে রয়েছে। ব্রিজ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। এই সাধারণ নদীটি দেখে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল যে, এখান থেকে এত বড় বিপদ কীভাবে হয়।

আমরা মারকাজে মাওলুবিয়া দেখি। এর সম্পর্ক মাওলানা জালালুদ্দীন রোমীর সাথে। মাদরাসা ইবনে খালদুন ও মাদরাসা গাজালীও দেখি। উভয়টিই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত। শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করি। তারপর ত্রিপলির নৌবন্দর সফর করি। জানতে পারলাম বন্দরের সব হোটেলে মদ পরিবেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ মহামারি লেবাননে ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। শহরের এ সফরে আমার বন্ধুরা ইখলাস ও মহব্বত নিয়ে বরাবর আমার সাথে ছিল। তাহরিকের উল্লেখযোগ্য অর্থসহায়তা দানকারী ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রধান নিয়ন্ত্রক জনাব ফাতহি শরিফ, আজহারের ছাত্র সায়িদ শাবান, যুবনেতা মাহমুদ আব্বাস ও মেহজাম মুসলিম তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। মেহজাম মুসলিম তার একটি লেখা আমাকে দেখান। এতে আমার একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে মুসলমান'র উদ্ধৃতি ছিল। তিনি জানালেন, এ লেখাটি তিনি 'তাহরিকে ইবাদুর রহমানের' এক অনুষ্ঠানে পড়েছেন।

তাহরিকের কোনো সদস্য কিংবা এই দূরবর্তী বন্ধুদের কারো নাম যদি ছুটে যায় তা হলে আমাকে ক্ষমাসুন্দরদৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ আমি লেবাননের সফরনামা সফরের এক মাস পর লিখেছি। তাহরিকের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় একটি হোটেলে সুন্দর পরিবেশ, মনোরম আবহাওয়া ও মুগ্ধকর দৃশ্যের মাঝে বন্ধুদের সাথে আমরা খানা খাই। তাদের সকলের হৃদয় আমার ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সকলের চিন্তাধারাও এক।

তারপর আমরা কার্যালয়ে ফিরে আসি। বন্ধুরা সবাই একত্র হয়। তাদের অধিকাংশই মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র। প্রফেসর সাদুদ্দীন অলিলী তাৎক্ষণিক এক বক্তব্য দেন। এদ্দ্বারা তার বক্তৃতার দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। অধিকাংশ ইখওয়ানির মতো তিনিও একজন বক্তা। আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। সময় কম ছিল। দ্রুত বৈরুতে ফিরতে হবে। কারণ 'বাদশা সৌদ কমপ্লেক্সে' আমার আলোচনার প্রোগ্রাম আগে থেকে নির্ধারিত ছিল।

এই সাক্ষাতে শুধু যুবকদের মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। কথা বলার আশা অন্তরেই রয়ে যায়। মেহমানেরও একই অবস্থা। যুবকদের সাথে সালাম-কালাম এবং এই প্রিয় দেশে আরও কিছু সময় কাটানোর আকাঙ্ক্ষা-আফসোস রয়েই গেল। বন্ধুরা রমজানের পর আবার ত্রিপলি আসার জন্য জোরদার আবেদন জানান।

ত্রিপলি সম্পর্কে কিছু কথা

ত্রিপলি একটি জেলার প্রাণকেন্দ্র। সিরিয়ার কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে লেবানন। এটা উত্তরাঞ্চলগুলোর রাজধানী। এর জনসংখ্যা সত্তর কি আশি হাজার। ত্রিপলিতে জনসংখ্যার ৭৫% মুসলমান। এলাকাটি এখন সিরিয়া থেকে আলাদা হয়ে লেবাননের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সিরিয়ার প্রতি এর ঝোঁক বেশি। কারণ দীনদারি ও ইসলামের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে ত্রিপলি অনেকটা সিরিয়ার মতো। এখনও একে 'সিরিয়ার ত্রিপলি' বলা হয়। আমি দেখলাম ত্রিপলিতে 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান' অনেক সক্রিয় শক্তিশালী সংগঠন। শহরে এর মজবুত কার্যক্রম চলছে। দাওয়াতের মেহনতও চলছে ব্যাপক আকারে। যুবকদের মধ্যেও এর অনেক প্রভাব রয়েছে। বর্তমানে চারদিকে ইসলামি আন্দোলনের যে ডঙ্কা বাজছে সে সম্পর্কে যুবসমাজ ভালোভাবে খবর রাখে। সেখানকার বয়স্ক শিক্ষিতরা নদওয়াতুল ওলামার আন্দোলন ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানেন। নদবী ফুজালা [নদওয়ার শিক্ষাসমাপনকারী] এবং তাদের রচনাবলীকে অনেক সম্মানের চোখে দেখেন। পাকিস্তানের 'জামায়াতে ইসলামী' সম্পর্কেও তাদের আত্মতৃপ্তি রয়েছে। দলটির আন্দোলনকে তারা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন।

আসরের নামাজ পড়ে আমরা বৈরুতের উদ্দেশে রওনা করি। কালমুনে মুফতি মুহম্মদ শফি বহু যুবককে সঙ্গে নিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে আল্লামা রশিদ রেজার ভাতিজার সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়। নদওয়ার এক ইসলামি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করার জন্য মরহুম রশিদ রেজা ভারত সফর করেছিলেন। বিষয়টি তিনি জানেন। বন্ধুরা কালমুনে কিছু সময় থাকার জন্য অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু আলোচনার প্রোগ্রামের কারণে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিই।

আমরা যথাসময়ে বৈরুত পৌঁছে যাই। কমপ্লেক্স মসজিদে অনেক বিলম্বে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। আলোচনার সময় নিকটবর্তী। আমরা হলরুমে প্রবেশ করি। শায়খ ফুজাইল ওরতালানী আসেন। বহু সংখ্যক নওজোয়ান উপস্থিত হয়েছে। সাদুদ্দীন অলিলী স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর আমি উঠে দাঁড়াই। আলোচনা শুরু করি। আলোচনার প্রতিপাদ্য ছিল কোনো জাতি নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। বরং দাওয়াত ও পয়গামের মাধ্যমে এর স্থায়িত্ব আসে। রুহানিয়ত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে উন্নতি লাভ করে। আমি এই জাতীয় পয়গামের বিশ্লেষণ করি। আত্মশক্তি ও সেসব জাতিগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করি, যা দিয়ে এ জাতি অন্যান্য জাতির উপর বিজয় লাভ করতে পারে। বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে 'ঈমান বিল গায়েব'ও ছিল। আমি ঈমান বিল গায়েবের শক্তি, প্রভাব এবং তার আশ্চর্য ও অস্বাভাবিক ফলাফল পেশ করি। এ সম্পর্কে ইসলামের প্রথম যুগ থেকে কিছু দীপ্তিমান দৃষ্টান্তও তুলে ধরি। জীবনের সে পথ ও পদ্ধতির আলোচনা করি, যা সাহাবায়ে কেরাম গ্রহণ করেছেন। সে জীবনপদ্ধতি কীভাবে মানুষের হৃদয় জয় করেছে তাও বর্ণনা করি। এর বিভিন্ন উপমা পেশ করি। বস্তুবাদের উপর তাদের বিজয়, এর ধোঁকা ও চাকচিক্য থেকে বেঁচে থাকা, দুনিয়াবিমুখতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে পরহেজ করা সম্পর্কে আলোচনা করি। তারপর বলি, এ জীবনপদ্ধতিই মানুষের হৃদয় জয় করার শক্তি রাখে। মস্তিষ্কের উপর এরই জাদু ক্রিয়া কার্যকর হতে পারে। এ জাতীয় আরও অনেক কথা বলি, যা আল্লাহ তায়ালা তখন বলার তাওফিক দিয়েছিলেন।

তারপর ইঞ্জিনিয়ার আবু ওমর উঠে দাঁড়ান। আলোচনার সারমর্ম উপস্থিতির সামনে তুলে ধরেন। আলোচকের শোকরিয়া আদায় করেন। তারপর মজলিস সমাপ্ত হয়।

কমপ্লেক্স থেকে আমরা আবার শায়খ হাসান কিওয়ার বাড়িতে যাই। সেখানে জনাব রাশেদ হুরীসহ শহরের সম্মানিত ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত হয়। অনেক আলেমের সাথেও দেখা হয়। সেখানে একটি আকস্মিক বিষয় সামনে আসে। তা হল মাহে রমজানের আগমন ও শরিয়াহ আদালতে চাঁদ দেখার সত্যায়ন। তারপর আমরা থাকার জায়গায় ফিরে আসি। এবারকার মত বৈরুতে আমাদের শেষ রাত্রি অতিবাহিত করি

বিদায় বৈরুত

আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা সকালবেলা রোজা রেখে দামেশকের উদ্দেশে রওনা করি। আমি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি বৈরুতে আমার মন ভালো ছিল না। এ কারণে শহরের ভালো দিকগুলো তুলে ধরা এবং নিজের অনুভূতি প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক কমতি হয়ে গেছে। জনাব সাদুদ্দীন বলেছেন, এ শহরে খ্রিস্টানদের প্রাধান্য বেশি। জায়গায় জায়গায় দেখা যায় খ্রিস্টান ও তাদের গির্জা। সেখানে চারিত্রিক অবক্ষয় অধঃপতন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। খ্রিস্টীয় সভ্যতায় প্রভাবিত-শহরে শুধু 'তাহরিকে ইবাদুর রহমান'ই একমাত্র ইসলামি আন্দোলন। আমি অনুভব করেছি 'তাহরিকে ইবাদুর রহমানের' উপর স্কাউটিং এবং আধুনিক বিভিন্ন সংগঠনের রঙের প্রাধান্য বেশি। এতে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে আন্দোলনগুলোর সামনে অগ্রসর হওয়া এবং উন্নতির সুউচ্চ সোপানে পৌঁছার জন্য এ দুটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে লেবাননে। ইবাদুর রহমান আন্দোলন ইসলামি মতাদর্শ বিস্তারের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আন্দোলনটি সম্মান পাওয়ার যোগ্য। আমার আশা দলটি রুহানি ও আত্মিক বিষয়ের প্রতিও মনোনিবেশ করবে। কারণ এটাই দীনী আন্দোলনের মূল ভিত্তি। যদি আল্লাহ তায়ালা দলটির নেতৃবৃন্দ এবং আন্দোলন পরিচালনায় প্রভাবশালী ও কর্মচঞ্চল মুরুব্বিকে সুন্নত জিন্দা করার এবং পুরোপুরি মনোযোগসহকারে ইসলামি শিষ্টাচারের প্রতি মনোনিবেশ করার তাওফিক দিত, তা হলে শহরে এর ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হত। শক্তিশালী ও জোরদার ইসলামি চেতনা সৃষ্টি হত।

এ বিষয়টি দলের রাহবার ও কর্ণধারদের সাধ্যের ভিতরেই রয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা এটা করতে পারে। এই সুযোগ তাদের আছে। দাওয়াতের প্রভাব ও এই কার্যকারিতা অনির্বচনীয়। ইঞ্জিনিয়ার আবু ওমরের ইখলাস, ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধির মানসিকতা ও সুস্থ চিন্তা দ্বারা এবং আল্লাহ তায়ালা এ দলটিকে যে তাওফিক ও ক্ষমতা দিয়েছেন তা থেকে অনেক কিছুর আশা করা যায়। আল্লাহর জন্য কোনো কাজ কঠিন না। সঠিক পথে পরিচালিত করার শক্তি একমাত্র আল্লাহর।

সমাপ্ত